ইস্টিশন
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব

উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের সাম্প্রতিকতম ধারণা

মীজান রহমান | অভিজিৎ রায়

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব

উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাম্প্রতিকতম ধারণা

মীজান রহমান ও অভিজিৎ রায়

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব

মীজান রহমান ও অভিজিৎ রায়

© বন্যা আহমেদ
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

মুদ্রন প্রকাশক: শুদ্ধস্বর

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫

দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ইবুক প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৬

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক
ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: তৌহিন হাসান

আলোকচিত্র: সংগৃহীত

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

ISBN: 978-984-91081-2-2

Shunyo Theke Mohabishyo | Mizan Rahman and Avijit Roy
Published by: Istishon eBook
First Published in February 2015
eBook Published in Decemmer 2016

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম

(ফেব্রুয়ারি ২৪, ১৯৩৯ - মার্চ ১৬, ২০১৩)

ছিলেন বাংলাদেশের জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে

বহির্বিশ্বে সবচেয়ে পরিচিত মুখ;

যিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারেও।

এবং

ড. এ এইচ জাফর উল্লাহ

(নভেম্বর ৩, ১৯৪৮ - অগাস্ট ২১, ২০১৩)

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ এ সংস্কৃতিমনা

সেক্যুলার লেখক ছিলেন মুক্তমনাদের অন্যতম সুহৃদ এবং

মুক্তমনা ব্লগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

"এক এক জন লোক আছে, তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে, একটা শূন্য মাত্র, কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি দশ হইয়া পড়ে। একটা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে! সংসারে শত সহস্র 'শূন্য' আছে, বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করিয়া থাকে- তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসিয়া তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না, কাজেই তাহাদের অস্তিত্ব না থাকার মধ্যেই হইল"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'লোকে বলে, বলে রে
ঘরবাড়ি ভালা নাই আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যেরও মাঝার'....

হাসন রাজা

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

ভূমিকা: ০৭

শূন্য অধ্যায়: অশূন্য মতামত **১২**

প্রথম অধ্যায়: কিছু না **১৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়: শূন্যের ভীতি **১৮**

তৃতীয় অধ্যায়: পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে **৩৫**

চতুর্থ অধ্যায়: শূন্য এল ইউরোপে **৫১**

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ? **৭৬**

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিজ্ঞানে শূন্যের আভাষ **১২৭**

সপ্তম অধ্যায়: আইনস্টাইনের বিশ্ব **১৫৮**

অষ্টম অধ্যায়: শূন্যতার শক্তি **১৭৮**

নবম অধ্যায়: মহাবিস্ফোরণের কথা **১৯৪**

দশম অধ্যায়: বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল? **২২৪**

একাদশ অধ্যায়: কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি **২৭১**

দ্বাদশ অধ্যায়: হিগস কণার খোঁজে **৩৩৯**

ত্রয়োদশ অধ্যায়: মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি **৩৮৭**

চতুর্দশ অধ্যায়: অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান-শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন **৪৩৪**

পঞ্চদশ অধ্যায়: অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে? **৪৬৪**

ভূমিকা

সৃষ্টির আদিতে কিছুই ছিল না ইহসংসারে – এক শূন্য ছাড়া। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে 'শূন্য' থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। অর্থাৎ 'নাই'তেই 'আছে'র জন্ম। ধাঁধার মতো লাগছে তো? ধাঁধাই বটে, কিন্তু মিথ্যে নয়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার মহাপণ্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রকৃতির মাঝেই প্রতীয়মান শুধু নয়, বহুলাংশে দৃশ্যমানও।

এই 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইটি সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণগুলোর গ্রন্থিত রূপ। এই বইটির লেখকদের একজন পেশাগত জীবনে গণিতবিদ, এবং অন্যজন পেশায় প্রকৌশলী এবং পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে জনপ্রিয় ধারার লেখালিখির সাথে জড়িত। শূন্য নিয়ে দুজনেরই আগ্রহ অসীম। বাংলা ব্লগে, পত্রপত্রিকায় এবং অন্যত্র বহু প্রবন্ধ আমরা লিখেছি শূন্যের মায়াবী রহস্য নিয়ে। আমাদের একজন গণিতবিদের চোখ দিয়ে শূন্যতাকে দেখেছে, অন্যজন পদার্থবিজ্ঞানের চোখ দিয়ে। এই বইটি আমাদের দুই শ্যেনদৃষ্টির সম্মিলন।

হ্যাঁ, শূন্য নিয়ে বরাবরই আমাদের দুর্বিনীত কৌতূহল। শূন্য যেন আমাদের দিয়েছে অসীমকে জানার প্রেরণা। আসলে শূন্য আর অসীম – একই সাথে পরস্পরের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিপক্ষ। দুয়ে মিলে রচনা করেছে সংসারের গূঢ়তম রহস্যের আধার। প্রাচীন গ্রিক দর্শনে এরা সৃষ্টি করেছিল বিতর্ক এবং সংশয়, ভারতীয় চিন্তায় আধ্যাত্মবাদ ও দৈবাত্মার দ্বৈতসত্ত্বাবোধ, এবং সেই বোধেরই ফলে গঙ্গার কল্যাণবহ সলিলধারার মতো জন্ম নিয়েছে গণিতের 'শূন্য'। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও আর

শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে গণিতকে 'প্রকৃতির ভাষা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তা এমনি এমনি নয়। গণিতের পাশাপাশি বইয়ে এসেছে পদার্থবিজ্ঞানের শূন্যতার ধারণাও। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের চোখে শূন্যতাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কোয়ান্টাম জগতের শূন্যতা এখনো আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের জন্য এক মূর্তিমান রহস্যের আঁধার,বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি রহস্য উদঘাটনের স্বপ্নের জীয়নকাঠি। তাই শূন্য ব্যাপারটা চির-পুরাতন হয়েও যেন চিরনবীন। স্টিফেন হকিং,স্টিফেন ওয়েনবার্গ,অ্যালেন গুথ, আঁদ্রে লিন্ডে, আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন, লরেন্স ক্রাউসসহ মূলধারার প্রায় সকল পদার্থবিজ্ঞানী আজ মনে করেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব একটি 'কোয়ান্টাম ঘটনা' হিসেবেই একসময় আত্মপ্রকাশ করেছিল কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে একেবারে 'শূন্য' থেকে। পশ্চিমে বিগত কয়েক বছরে এই ধারণার ওপর গবেষণাপত্র তো বটেই, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানের বইও প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলো লিখেছেন এ বিষয়টি নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করা প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে এম.আই.টির অধ্যাপক অ্যালেন গুথের 'The Inflationary Universe', রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিনের 'Many Worlds in One',বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং–ম্লোডিনোর 'The Grand Design', বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউসের 'Universe from Nothing' বইগুলো উল্লেখ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলায় এই বহুল আলোচিত ধারণাটির ওপর কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের এই 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইটি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে।

বইটি লেখার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য আমাদের – বাংলাভাষী কিশোর ও তরুণদের মধ্যে আগ্রহ ও কৌতূহল সংক্রমিত করা। আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের অনেকেই গণিত অলিম্পিয়াড কিংবা পদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছে, কিংবা ভবিষ্যতেও করবে। অনেকেই হয়তো বড় হয়ে পদার্থবিজ্ঞান কিংবা গণিত নিয়ে পড়াশোনা করবে। ধারণা করি তারা 'শূন্য'কে

ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শিখবে আমাদের এ বইটি পড়ার পর। ‘গণিত’ অথবা ‘বিজ্ঞান’ কোনো ভীতিকর জন্তুর নাম নয় – এরা জীবনের প্রতিটি আনাচে-কানাচে বন্ধুর মতো, প্রিয়জনের মতো, প্রতিক্ষণে উপস্থিত।

তবে বইটি কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা ভাবলে বিরাট ভুল হবে। বইটিতে ঘটানো হয়েছে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে আধুনিক ধারণাগুলোর সমাবেশ। সে ধারণাগুলোর অনেকগুলোতেই রয়েছে জটিল গাণিতিক বিমূর্ততা। সেগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য জনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা অনেকাংশেই দুরূহ। তার পরও আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাধ্যমতো। আমরা মনে করি বইটি সকল বয়সের পাঠকদেরই তৃপ্ত করবে যারা গণিত ও বিজ্ঞান ভালোবাসেন। বিশেষ করে যারা দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের প্রান্তিক সমস্যাগুলো নিয়ে উৎসাহী; আর এ নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কাজের হদিস পেতে আগ্রহী, তারা এই বইটিতে ভাবনার অনেক নতুন উপকরণ খুঁজে পাবেন।

আমাদের বইয়ের বেশ কিছু অংশ মুক্তমনা ব্লগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলো প্রকাশের সময় আমরা পাঠকদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো পাণ্ডুলিপির সংশোধন ও মানোন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। মুক্তমনা ছাড়াও বিডিনিউজ২৪ এবং ‘জিরো টু ইনফিনিটি’ পত্রিকায় বইটির কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। ফেসবুকে অনেক সময়ই ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ বইটির পেজটিকে ঘিরে চলেছে নিরন্তর আলোচনা। অনেকেই ইমেইল করে বা ম্যাসেজ দিয়ে বইটি প্রকাশের তাগাদা দিয়েছেন। বিশেষ করে আমেরিকা-প্রবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সুলেখক ড. দীপেন ভট্টাচার্যের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। তিনি পুরো পাণ্ডুলিপি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন, জায়গায় জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান সংযোজন ও পরামর্শগুলো বইটিকে প্রায় নিখুঁত করে তুলতে সাহায্য করেছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এসেছে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী পদার্থবিদ ড.প্রদীপ দেবের কাছ থেকেও। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ বইটির

মান বৃদ্ধি করেছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ এবং উদীয়মান লেখক রায়হান আবীরের মূল্যবান অভিমতগুলোও প্রণিধানযোগ্য। 'বিবর্তনের পথ ধরে' গ্রন্থের লেখক বন্যা আহমেদও পাণ্ডুলিপির মানোন্নয়নের ব্যাপারে নিরলস ভাবে সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপিতে থেকে যাওয়া বহু জটিল বাক্য ভেঙে-চুরে সহজ করে দিয়েছেন। তার এ সংশোধনীগুলো বইটিকে দিয়েছে বাড়তি গতিময়তা। তাদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী।

আমরা দুজন লেখক বয়সের বিচারে প্রায় ভিন্ন দুই জগতের অধিবাসী। আমাদের সময়, সমাজ, অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে লেখার ধরন পর্যন্ত বহু কিছুতেই ভিন্নতা আছে, ভিন্নতা আছে আমাদের উপস্থাপনের পদ্ধতিতেও। কাজেই দুই লেখকের লেখাকে এক সূত্রে গাঁথার প্রয়াস কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য। তারপরও এটা সম্ভবপর হয়েছে সম্ভবত এই কারণে যে বয়স, দেশ ও কালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে আমরা দুই লেখক চিন্তায়-চেতনায় খুব কাছাকাছি। মুক্তবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক চেতনা, যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে আমরা এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র মনে করি। আমরা দুজনেই চাই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা কার্ল স্যাগান, স্টিফেন হকিং, আইনস্টাইন কিংবা জামাল নজরুল ইসলামের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখুক, চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো অপমানবের 'অলৌকিক মুখ' দর্শন করে, কিংবা পুরনো ধর্মগ্রন্থের বাণীতে 'আধুনিক বিজ্ঞান' খুঁজে নয়। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি জীবনের বড় একটা অংশ আমরা দুজনেই নিবেদন করেছি লেখালেখির জগতে, চেষ্টা করেছি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকতে। সে হিসেবে আমাদের লেখায় অমিলের চেয়ে মিলই বেশি। তার পরও যে সমস্ত জায়গায় পুরোপুরি 'মিলিয়ে দেয়া' সম্ভব হয়নি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার চলে এসেছে, সেখানে সঠিক লেখককে শনাক্ত করতে বন্ধনীর মধ্যে নামের আদ্যক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মীজান রহমানের ক্ষেত্রে (মী.র), এবং অভিজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে (অ.রা)।

আমাদের বইটি উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাম্প্রতিকতম ধারণা নিয়ে। 'এই যে আমাদের চারিদিকের প্রকৃতি — চাঁদ, তারা, সূর্য, পৃথিবী,গাছপালা,পশুপাখি,মানুষজন – এই সবকিছু এল কোথা থেকে?' এই ধরনের প্রশ্ন প্রতিটি যুগে বিজ্ঞানী, দার্শনিক থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিকেরা করে গেছেন। এই ধরনের প্রশ্নের ধাক্কায় জীবনের কখনো না কখনো আমরা সবাই কমবেশি আলোড়িত হয়েছি। কেননা, এ প্রশ্নগুলো আসলে আমাদের অস্তিত্বের একদম গোড়ার প্রশ্ন।

আমরা আশা করছি, আমাদের এই বইটি থেকে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দেওয়া সর্বশেষ উত্তর খুঁজে পাবেন পাঠকেরা। আমাদের বইটি পড়ে কারো ভালো লাগলে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করব। কিন্তু বইয়ের কোথাও ভুলভ্রান্তি থাকলে সেই দায়ভার একান্তই আমাদের।

অধ্যাপক মীজান রহমান

mrahman@math.carleton.ca

ড.অভিজিৎ রায়

charbak_bd@yahoo.com

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শূন্য অধ্যায়

অশূন্য মতামত

বাংলায় বিজ্ঞানের মৌলিক লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি নেই। যা আছে তারও অধিকাংশকে সাহিত্যের বিচারে মানোত্তীর্ণ বলা যায় না। এই বইয়ের লেখক ড. মীজান রহমান আর ড. অভিজিৎ রায়, দুজনেই সুলেখক হিসেবে পাঠকনন্দিত। দুজনেরই একাধিক পাঠকপ্রিয় বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠকদের সৌভাগ্য, বাংলা ভাষায় দক্ষ দুজন সুলেখক এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বই লেখার কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফলে, আমরা শুধু একটা অমূল্য বিজ্ঞানের বই-ই পাইনি, পেয়েছি প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য, মজাদার একটা বই, একটা অত্যন্ত উঁচুমানের সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ রচনা। এই বই নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করবে। এই বইটা বাংলার সাহিত্যানুরাগীদের জন্য একটা দুর্লভ উপহার, তার ওপরে বিষয়ের আধুনিকতা আর অভিনবত্ব তো আছেই। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই বইটা শুধু একটা সংযোজনা নয়, অচিরেই একটা যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে পরিচিত হবে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

লেখকদ্বয় শুধু লেখক হিসেবেই পরিচিত নন, দুজনেই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী—একজন গণিতজ্ঞ, আরেকজন প্রকৌশলী। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা মুক্তচিন্তক, মুক্তমনের অধিকারী। বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁদের মননে, চিন্তায়, চেতনায়। নইলে যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন,এই বই তাঁদের পক্ষে লেখা সম্ভব হতো না। আর এজন্যই এই বইটা বিজ্ঞানের অন্য অনেক বই থেকে স্বতন্ত্র।

ভূমিকায় তাঁরা লিখেছেন, "মুক্তবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক চেতনা,যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদকে আমরা এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে মূলমন্ত্র মনে করি"। তাঁরা এই মন্ত্র জপেছেন বইয়ের পাতায় পাতায়, আর পাঠকদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন মুক্তবুদ্ধির চেতনায় সমৃদ্ধ হতে। এই বইয়ের সবচেয়ে বড় অবদান চেতনার সেই সমৃদ্ধি।

অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ

ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ;
'আমার চোখে একাত্তর' গ্রন্থের লেখক।

এক কথায় অনবদ্য। বাংলা ভাষায় লেখা যতগুলো বিজ্ঞানের বই আমি পড়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম সেরা বই প্রফেসর মীজান রহমান ও ড. অভিজিৎ রায়ের 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব'। গাণিতিক শূন্য থেকে শুরু করে লেখকদ্বয় কী অবলীলায় ব্যাখ্যা করেছেন মহাশূন্যের পদার্থবিজ্ঞান। এ যেন বিজ্ঞানের এক মহাকাব্য, বিশাল তার ব্যাপ্তি, অথচ একটা এপিসোড থেকে অন্য এপিসোডের মাঝখানে নেই কোনো তাত্ত্বিক শূন্যতা। 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' পড়ে মুগ্ধতায় যেমন পূর্ণ হয়েছি, তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী সব তথ্যে ও তত্ত্বে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

ড. প্রদীপ দেব

পদার্থবিজ্ঞানী, অস্ট্রেলিয়া;
'আইনস্টাইনের কাল' গ্রন্থের লেখক।

অধ্যাপক মীজান রহমান ও ড.অভিজিৎ রায় লিখিত 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইটি গণিতের শূন্যের মূর্ছনার ঘোড়ায় চড়িয়ে পাঠককে নিয়ে যাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান কালের সেরা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম ধারণার এক বৈজ্ঞানিক সংগীতানুষ্ঠানে। 'সৃষ্টির সূচনা' ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আগ্রহের বিষয়, যদিও দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক বিজ্ঞান

থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে আমরা আজ বুঝতে পারছি মহাপরাক্রমশালী কোনো সত্ত্বার হাতে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি' হয়নি। বরং মহাবিশ্বের 'উদ্ভব' ঘটেছে শূন্য থেকে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং আমাদের অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচনে। বাংলাভাষী বিজ্ঞান ও দর্শনে কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য তাই এই বইটি।

রায়হান আবীর

গবেষক, বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্সঅ্যান্ড টেকনোলজি, ঢা.বি;

'মানুষিকতা' গ্রন্থের লেখক।

"শূন্য থেকে মহাবিশ্ব" বইটি একদিকে সময় ও স্থান এবং অন্যদিকে সময়াতীত ও স্থানাতীত চিন্তার মাঝে এক রোমাঞ্চকর অভিযান। বিজ্ঞান যে গতকালের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয় না, বরং নতুন দিগন্তপ্রসারী চিন্তার প্রবর্তনে ক্রমাগতই আমাদের মনোজগতের বিবর্তন ঘটায়, সেই ধারণাই মীজান রহমান ও অভিজিৎ রায় এক অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এক অবোধ্য মহাবিশ্বকে বোধগম্য করতে বিজ্ঞানের অক্লান্ত প্রচেষ্টার যে ইতিহাস লেখকদ্বয় তুলে ধরেছেন তা যেমন পাঠককে বিস্মিত ও অভিভূত করবে, তেমনই সেই প্রচেষ্টার পরবর্তী ধাপটি কী সেটি জানার জন্য কৌতূহলী করে তুলবে"।

ড. দীপেন ভট্টাচার্য

অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

রিভারসাইড কলেজ, ক্যালিফোর্নিয়া

গামা-রশ্মি জ্যোতির্বিদ,

রিভারসাইড ক্যাম্পাস (ইউসিআর)

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া;

'দিতার ঘড়ি' গ্রন্থের লেখক।

প্রথম অধ্যায়

কিছু না

'Can you make no use of nothing, nuncle?
Why, no, boy; nothing can be made out of nothing'.

—**Shakespeare**, King Lear

ছোটবেলায় এক পাগলাটে শিক্ষক ছিলেন আমাদের স্কুলে। সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কি বলতেন আপন মনে। উসকোখুসকো চুল, কোনদিন আঁচড়াতেন কিনা সন্দেহ, অনেকগুলো উকুন পরিবার সেখানে নিরাপদ বাসা করেছিল নিশ্চয়ই। বিয়েথা করেননি জীবনে, পোশাকআশাক আলুথালু,ময়লা,এখানে ওখানে তালি দেওয়া। হেডমাস্টার সাহেব সুযোগ পেলেই তাঁকে ধমকাতেন,চাকরি খোয়াবার হুমকি দিতেন,অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু ছাত্রদের কাছে এই শিক্ষকটিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। তিনি ক্লাসে এসে অন্যান্য শিক্ষকদের মত বই খুলে গড়গড় করে পড়ে যেতেন না,বা বোর্ডের ওপর লিখতে শুরু করতেন না। গল্প করতেন,দেশবিদেশের মজার মজার গল্প,নানা যুগের নানা দেশের উত্থান ও পতনের গল্প। কেমন করে মানুষ গড়ে নতুন জিনিস, আবার কেমন করে সেই একই মানুষ তা নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলে। এসব আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য গল্প। আমরা চুপ করে শুনতাম, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

তিনি আমাদের ইংরেজি ব্যাকরণ আর রচনা শেখাতেন।

একদিন ক্লাসে এসে গল্পসল্প না করে রচনা লিখতে বললেন আমাদের। রচনার বিষয়? একটা অর্থমূলক হাসি দিয়ে বললেন: 'কিছু না'।

আমরা থ। বেকুব। পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। 'কিছু না'র ওপর লেখার কী আছে? কিছু না তো কিছুই না, অস্তিত্বহীন। নাথিং, নট, ননএক্সিস্টেন্ট। শূন্য। আমাদের মধ্যে একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করল, স্যার, যা নাই তার ওপর কী লিখব আমরা?

বললেন, তোমাদের কল্পনা কোথায় গেল? যা নেই তার মধ্যে 'কিছু'কে সৃষ্টি করা, কল্পনা তো তাকেই বলে। অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দাও,সুন্দর করে তোলো নিজের মনের মতো করে,তখনই বুঝবে কিছু না থাকার কী শক্তি।

আমরা খেই হারিয়ে অথৈ সাগরে ভাসছি তখন। মাথা চুলকাচ্ছি। কল্পনার ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে ছোটাবার চেষ্টা করছি। আমাদের দুরবস্থা দেখে উনার একটু মায়া হলো হয়তো। বললেন, অঙ্কের ক্লাসে 'শূন্য' শিখেছ নিশ্চয়ই। সেই শূন্য নিয়ে লেখো। শূন্যকে তোমরা কিভাবে দেখো তা নিয়ে লেখো।

এর চেয়ে পাগল আর কে হতে পারে, বলুন।

বলা বাহুল্য, সেদিন আমরা সবাই লাড্ডু মেরেছিলাম। আমি (মী.র) নিজে কী লিখেছিলাম, মনে নেই। ওই বয়সের ওটুকু জ্ঞানে কীই বা লেখা যায়। কোনো রকমে পৃষ্ঠা ভরামাত্র। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

তার অনেক অনেক কাল পর যখন আমি (মী.র) নিজেই শিক্ষা-পেশাতে মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত, দু-চারজন জ্ঞানীগুণী মানুষের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে, দু-চারটে ভালো বই পড়বার সুযোগ পেয়েছি, পুরাকালের দু-চারটে সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস জানবার অবকাশ হয়েছে, তখন হঠাৎ একদিন সেই পাগল

শিক্ষকটার কথা মনে পড়ে গেল। উনি হয়তো এক গরিব স্কুলের ছোটখাটো শিক্ষক ছাড়া আর কিছু হতে পারেননি জীবনে, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের মনের পর্দায় দূরদিগন্তের রঙ ছড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, মহাকাশের বিপুল শূন্যতার বুকে কান পেতে তার নীরব বার্তা শুনতে শিখিয়েছিলেন, আমাদের অজান্তে তিনি প্রতিটি ছাত্রের অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছিলেন অজানার পিপাসা, বাজিয়েছিলেন অচেনার বাদ্য। তাঁর জ্ঞান অবশ্যই বড় বড় পণ্ডিতদের সমতুল্য ছিল না, কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল ঋষিতুল্য। আজকে,এত দিন পরে আমরা বুঝি, 'শূন্য' মোটেও শূন্যগর্ভ নয়, তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। আছে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। আজকে আমরা জানি, শূন্যের মতো শক্তিশালী জিনিস সংসারে বেশি নেই। শূন্য একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তারপর সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে। ইতিহাসে তার নজিরও রয়েছে। শূন্য আর অসীম, এরা একে অন্যের যমজ। যেখানে শূন্য সেখানেই সীমাহীনতা। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবলে যেখানে কিছু নেই, সেখানেই সবকিছু। শূন্য দ্বারা বৃহৎকে পূরণ করুন, বৃহৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই একই শূন্য দ্বারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে ভাগ করুন, ক্ষুদ্র অসীমের অঙ্গ ধারণ করবে। শূন্য সবকিছু শুষে নিয়ে অসীমের দরবারে পাঠিয়ে দেয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? শুনুন তাহলে...

দ্বিতীয় অধ্যায়

শূন্যের ভীতি

শূন্য –
যেখানে রয়েছে সকল আনন্দের সূচনা
আর সর্বত্র অহেতুক গণনার উৎপাত।
— **হাফিজ,**
I Heard God Laughing: Poems of Hope and Joy

অঙ্ককে মানুষ ভয় পায়। অঙ্কের মাস্টার শুনলেই লোকে আমাকে এড়াতে চায়। ভাবে, একজন উজবুক ব্যক্তি হবেন নিশ্চয়ই। আমরা যেমন ছোটবেলায় ব্যাকরণের টিকিওয়ালা পণ্ডিত মশাইকে দেখে ভয় পেতাম। যেন অঙ্ক আর ব্যাকরণ বাস্তব জীবনের জন্যে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন দুটি বস্তু।

অথচ ব্যাকরণ যেমন ভাষার বিশ্বস্ত প্রহরী, অঙ্কও তেমনি প্রকৃতির প্রাণসখা। আমি (মী.র) অঙ্ককে গ্যালিলিওর মতো ‘প্রকৃতির ব্যাকরণ’ বলেও প্রচার করেছি কোনো কোনো মহলে। ‘অঙ্ক দিয়ে যে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায়’, এই ব্যাপারটা একইসাথে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে। তিনি বলেছিলেন[1],

---

[1] Mario Livio, Why Math Works, Scientific American, August 2, 2011

কীভাবে এটা সম্ভব যে, গণিতের মতো একটা জিনিস – যেটা কিনা অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ মানব মনসঞ্জাত একটা সামগ্রী বৈ আর কিছু নয় – সেটা বস্তুজগতের বাস্তবতাকে এত সুচারুভাবে উপস্থাপন করতে পারে?

অথচ আমদের অনেকেই ভাবি, দৈনন্দিন জীবনে অঙ্কের স্থান নেই। ভুল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনেই অঙ্কের চেতনা জেগেছিল মানুষের মনে। আজ থেকে কয়েক সহস্র বছর আগে মানুষ যখন হালচাষ করে খাদ্য সংগ্রহ করতে শেখে, তখনই সে 'সংখ্যা'র কথা ভাবতে শুরু করে। তার গোয়ালে কতগুলো গরু তার হিসাব রাখার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে শুরু করে। কত মণ ধান হলো খেতে,কত বিঘা জমির মালিক সে, কতগুলো সন্তান তার সংসারে, কতগুলো মরে গেল, তারও হিসাব রাখা দরকার। হাতের আঙুল কটি, হাতে-পায়ে মিলিয়ে কটা আঙুল, তা-ও এক রহস্য। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তায় 'সংখ্যা'র বোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ তার আপন আপন ভাষায় 'এক', 'দুই', 'তিন' শব্দগুলো আবিষ্কার করতে শুরু করে, যদিও সেগুলো একসাথে মিলে একটা নিয়মমাফিক সংখ্যাপ্রণালিতে পরিণত হতে আরো কয়েক হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয় তাকে।

কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সংখ্যাটির কখনো প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ (এবং সাধারণভাবে, এখনও করে না), সেটা হলো 'শূন্য'। খেতের চাষিকে কখনো 'শূন্য' সংখ্যক বীজ বপন করতে হয় না, 'শূন্য' গরুর দুধ দোয়াতে হয় না, 'শূন্য' সন্তানের মৃত্যুতে কাতর হতে হয় না। এমনকি ১-এর ডান পাশে একটা শূন্য বসালে যে দস্তুরমতো একটা পূর্ণসংখ্যা দাঁড়িয়ে যায়, সে বোধটুকু উদয় হতে অনেক অনেক যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছিল মানুষকে।

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সাধারণত চীন ও মিসরীয় সভ্যতার কথাই উল্লেখ করা হয় বেশি। ভারতীয় সভ্যতারও কম অবদান ছিল না মানব ইতিহাসে,তবে তার বয়স সম্ভবত তিন-চার হাজার বছরের বেশি নয়, যেখানে চীন-মিসর, বিশেষ করে

মিশর, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসরতা অর্জন করেছিল আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে। মিসরের বিজ্ঞানীদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পঞ্জিকার ওপর। চন্দ্রগ্রহণ আর পূর্ণিমার হিসাব রেখে রেখেই মিসরীয়রা চান্দ্রবর্ষ আবিষ্কার করেন। এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণের যতটা সময় ততটাকেই তাঁরা ‘এক মাস’ বলে নামকরণ করেন। পরে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ‘চান্দ্রবর্ষের’ সমস্যা আছে,কারণ চাষবাসের ক্ষেত্রে ভীষণ তালগোল পাকিয়ে ফেলে, এবং কালক্রমে তাঁরাই সূর্যভিত্তিক পঞ্জিকার সূচনা করেন। তবে তাঁদের মূল পঞ্জিকাতে মাসের দৈর্ঘ্য ছিল ৩০ দিন, অনেকটা চান্দ্রমাসের মতো, তারপর শেষ মাসটি পূর্ণ হলে তাঁরা আরো ৫ দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনের বছর পূরণ করে দিতেন। মিসরীয়দের সৌরবর্ষ পরবর্তীকালের গ্রিকরা গ্রহণ করে নেয়, এমনকি গ্রিকদের পরাজিত করে যখন রোমানদের রাজত্ব শুরু হয় তখন তাঁরাও সেই মিসরীয় ক্যালেন্ডারই ব্যবহার করতে থাকেন, যদিও রোমানরা সেই ‘বাড়তি ৫ দিন যোগ’ করার নীতি বাদ দিয়ে লিপইয়ারের প্রথা সূচনা করেন।

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ এক দারুণ অগ্রগতি, সন্দেহ নেই। সেই সৌরবর্ষ আজো মোটামুটি অসংস্কৃত অবস্থায় অনুসৃত হচ্ছে অধিকাংশ দেশে। সৌদি আরব আর ইসরায়েলই বলতে গেলে একমাত্র ব্যতিক্রম, যারা এখনও সেই প্রাচীন চান্দ্রবর্ষের আঁচল ধরে বসে আছে।

অথচ, এত উন্নতি, এত অগ্রসর চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও ‘শূন্য’ কারো কল্পনার দুয়ারে করাঘাত করেনি। না করার আরেকটা কারণও ছিল। সেটা হলো মিসরীয়দের জ্যামিতি আবিষ্কার। অনেকের ধারণা জ্যামিতির গুরু হলেন গ্রিক পণ্ডিতেরা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়েই বড় হয়। ইউক্লিডের নাম শোনেনি এমন শিক্ষিত লোক একটিও খুঁজে পাবেন না সারা সংসারে। হ্যাঁ, এটা মিথ্যা নয় যে গ্রিকরাই জ্যামিতি শিখিয়েছেন সারা পৃথিবীকে। কিন্তু গ্রিকরা শিখেছিলেন কোত্থেকে সেটা জানে কজন? তাঁরা শিখেছিলেন

মিসরীয় গুরুদের কাছ থেকে। কথিত আছে যে পিথাগোরাস, থ্যালিস, এইসব জাঁদরেল গ্রিক পণ্ডিতরা মিসরে গিয়েই লেখাপড়া শিখেছিলেন।

মিসরীয়দের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই জ্যামিতি আবিষ্কারের জরুরি তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই তাগিদের গোড়ায় ছিল একটি নদী—নীল। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী বলে খ্যাত নীলের যে অবস্থান মিসরীয় জীবনে, বাংলার পদ্মা-যমুনা আর মেঘনার গুরুত্ব সে-তুলনায় নগণ্যই বলা চলে। নীল ছিল বলেই এত বড় একটা সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছিল। নীল তাদের অন্নপূর্ণা, তাদের ধাত্রীমাতা। ওদিকে দারুণ রাগীও বটে। আমাদের বাংলাদেশের রাগিণী বাঘিনী পদ্মার মতোই তার মেজাজ। বর্ষায় তার বজ্র রূপ, যেদিকে যায় সেদিকেই সব ভেঙেচুরে ধ্বংস করে দেয়, জমিজমা সব গিলে খায় সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মতো। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরই সে রেখে যায় কৃষকের সোনার ফসলের পলিমাটি। সেই ফসলের অধিকার ভোগের জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে তখন লেগে যায় ঝগড়া, অন্তত সেকালে লাগত, যার কারণে সরকারকে বাধ্য হয়েই কার কত জমি সেটা জরিপ-সরিপ করে একটা ফায়সালা বের করতে হতো। সেই 'জরিপ'-এর প্রয়োজনেই জন্মায় পুরাকালের জ্যামিতি। কে কয় বিঘা জমি পাওয়ার যোগ্য, কার কতটা জমি নষ্ট হয়ে গেল নীলের স্রোতে, কাকে কতটা ক্ষতিপূরণ করতে হবে, তার হিসেব রাখার জন্য সরকার থেকে পাঠানো হতো জরিপদারদের। তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের সূত্র ধরেই আস্তে আস্তে গণিতের একটা নতুন শাখা তৈরি হয়ে যায়-জ্যামিতি। কালে কালে এটা এমন বৃদ্ধি পেতে থাকে যে মিসরীয়রা একসময় ঘন বস্তুর ঘনত্বের মাপ করতেও শিখে ফেলে। এবং এভাবে তাদের মনে উদয় হয় পিরামিডের ধারণা। দেড় হাজার বছর লেগেছিল পিরামিড তৈরি করতে, কিন্তু তারা শুধু তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, অঙ্ক কষে তার ঘনত্ব বের করতেও শিখেছিল। এমনই উন্নতমানের জ্যামিতিচর্চার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা।

তবু, এত বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও মিসরীয়দের মাথায় শূন্যের বোধ জেগে ওঠেনি। বড়সড় কোনো সংখ্যা নিয়ে একটু-আধটু সমস্যা যে তাদের হতো না তা

নয়,কিন্তু কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে নিত। আজকে যেমন সংখ্যাসূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সে যুগে অবশ্য সেসব বের হয়নি। তার বদলে তারা কাঠি বা পশুর হাড়, গাছের বাঁকল,এসব ব্যবহার করত। কাজ চলে যেত সে সময়কার জীবনের জন্য। তারপর যখন গ্রিকদের সাম্রাজ্য শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ-ছয় শতাব্দী থেকে তখন তারা মিসর থেকে শেখা জ্ঞানের ওপর আরো অনেক নতুন জিনিস যোজন জিনিস যোগ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আরো অনেক এগিয়ে দেয় জ্যামিতির জ্ঞান। জ্যামিতির কিংবদন্তীয় পুরুষ ইউক্লিড (আ. ৩২৫-২৬৫ খ্রি.পূ.)ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্যামিতিকে গণিতশাস্ত্রের একটি প্রথম সারির শাখাতে পরিণত করেন। গুটিকয় স্বতঃসিদ্ধ তথ্যকে সম্বল করে পুরো একটা শাখা নির্মাণ করে ফেললেন তিনি, যাকে আজ আমরা 'ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি' বলে অভিহিত করি। তিনিই প্রথম 'যুক্তিপ্রমাণ' দিয়ে একটা উপপাদ্য প্রমাণ করার তরিকা শেখালেন। আড়াই হাজার বছর ধরে তাঁর শেখানো জ্যামিতি পড়েই ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ পাস করেছে, প্রকৌশল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থাপত্যশিল্প শিখেছে, ভাস্কররা ভাস্কর্য শিখেছে, চিত্রশিল্পীরা আঁকতে শিখেছে। একজন সত্যিকার ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন তিনি।

কিন্তু তিনিও, এত বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি হয়েও, 'শূন্য'কে তাঁর চিন্তায় স্থান দেননি। দেননি, কারণ সেকালের গ্রিক সংস্কৃতিতে শূন্য বলতে বোঝাত, যা নেই, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন। 'শূন্য' ইঞ্চি সরলরেখা হয় না, 'শূন্য' এলাকার বর্গক্ষেত্র হয় না। অনেকের ধারণা, জ্যামিতিতে গ্রিকদের বিশেষ ব্যুৎপত্তিই গণিতের অন্যান্য শাখাতে তাদের অগ্রগতিকে খানিকটা বাধাগ্রস্ত করে ফেলেছিল। তাদের চিন্তার জগতে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত আর ঘনবস্তু ছাড়া কোনো অদৃশ্য বস্তুর আশ্রয় ছিল না। তারা ভালো করেই জানত যে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে ঠিক 'শূন্য' না হলেও শূন্যজাতীয় একটা কিছুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হতে শুরু করেছে।

মিসরে না হলেও ব্যাবিলনে তো অবশ্যই। ব্যাবিলনের সভ্যতা সেকালে গ্রিকদের

প্রায় সমতুল্যই ছিল বলা যায়। কোনো কোনো বিষয়ে তারা বরং গ্রিকদের চেয়েও অগ্রসর ছিল। যেমন গণিতের অন্যান্য শাখা। পাটিগণিত, বীজগণিত, এসবের কোনো বোধ গ্রিকদের চিন্তায় ঢোকেনি, কিন্তু ব্যাবিলনীয়দের চিন্তায় ঢুকেছিল। আরো একটি দিক ছিল, যাতে গ্রিকচিন্তার চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল তাদের চিন্তা।

গ্রিকচিন্তায় গণিত আর দর্শনশাস্ত্র ছিল একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁরা ভাবতেন যে জ্যামিতির ত্রিভুজ বহুভুজ বৃত্ত আর গোলক—এসবের মধ্যে প্রকৃতি, অর্থাৎ সৃষ্টিরই কোনো গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে। এর বাইরে যা কিছু তা সবই মানুষের কল্পনাপ্রসূত, সুতরাং তার অস্তিত্ব নেই এবং তা ধর্তব্য নয়। ব্যাবিলনীয় চিন্তায় গণিত, বিজ্ঞান, আর দর্শন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। একটির সঙ্গে আরেকটিকে সংযুক্ত করা ঠিক নয়। সে কারণে তাঁদের গণিত অগ্রসর হয় তার নিজস্ব গতিতে, নিজেরই প্রয়োজনে। ব্যাবিলনের গণনাপদ্ধতির ভিত্তি ছিল ৬০, গ্রিক আর মিসরীয়দের মতো ১০ বা ২০ নয়। ৬০-এর ব্যবহার খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়, তদুপরি সেকালে কোনো দেশেই ১, ২, ৩,...এসব চিহ্ন দিয়ে সংখ্যা লেখার প্রথা চালু হয়নি। (উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে ৬০-কে ভিত্তি করে সময় ভাগ করার রীতি চালু করেন—৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা) ব্যাবিলনীয়দের লেখার ধারা ছিল সংখ্যাকে ছোট ছোট মদের বোতলের-মতো-দেখতে দাগ বসিয়ে। শূন্যের প্রয়োজনীয়তা দাঁড়িয়ে গেল সেখানেই। দুটো বোতল পাশাপাশি বসালে ৬১ হতে পারে, আবার ৩,৬০১-ও হতে পারে। সেই ধাঁধাটা দূর করবার জন্যই মাঝখানে একটা আধবাঁকা দাগ বসিয়ে সংখ্যাটির একটা একক মান দাঁড় করানো হতো। এই বিশেষ 'দাগ'ই পরবর্তীকালে 'শূন্য' হয়ে গেল। সেজন্যই বলা হয় যে 'শূন্যের' আদি প্রবর্তক ছিলেন ব্যাবিলনীয় গাণিতিকেরা।

এ সবই জানা ছিল গ্রিকদের। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই শূন্যকে গ্রহণ করবেন না। শূন্য তাঁদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের যে ধ্যানধারণা,

তাকে নাকচ করে দেয় 'শূন্য'। শূন্যকে গ্রহণ করা মানে বিপদ ডেকে আনা। শূন্য তাঁদের শত্রু; তাকে যে করেই হোক রুখতে হবে,এই মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন সেকালের অনেক গ্রিক চিন্তাবিদ,যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন মহামতি পিথাগোরাস (খ্রি.পূ. ৫৬৯-৫০০)।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য শেখেনি এমন ছাত্র কি পৃথিবীতে আছে? কিন্তু তিনি যে একজন বড় দার্শনিকও ছিলেন, সেটা হয়তো সবার জানার সুযোগ হয়নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কতগুলো ধ্যানধারণা ছিল যা তিনি অন্ধভাবে আঁকড়ে ছিলেন সারা জীবন। ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর কতগুলো অদ্ভুত আচরণ ছিল যা তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর জন্ম হয়েছে অন্য এক মৃত ব্যক্তির আত্মার ওপর ভর করে। শুধু তা'ই নয়। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে জীবজগতের প্রতিটি প্রাণীই যখন মরে যায় তখন তার আত্মা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রাণীর দেহে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে কারণে তিনি সারা জীবন অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিরামিষব্রত পালন করেছেন। তবে মটর, বুট, এ-জাতীয় খাদ্য বর্জন করতেন এই বিশ্বাসে যে এগুলো খেলে পেট ফাঁপে! এবং তাঁর মতে, সংসারের যাবতীয় রোগের আকর হলো বদহজম!

পিথাগোরাস

তবে একটা জিনিস ছিল পিথাগোরাসের চরিত্রে যা মানুষকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করত তাঁর প্রতি—বর্তমান যুগে যাকে বলে ‘ক্যারিজমা’। দারুণ বাকপটু মানুষ ছিলেন তিনি। বক্তৃতায় দাঁড়ালে লোকজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত তাঁর কথা। ফলে, কালে কালে তাঁর একটা অন্ধ অনুগত ভক্তগোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়। তিনি যা বলতেন বা যা চাইতেন তা তারা বিনা প্রশ্নে, চোখ বুজে মানত ও পালন করত। পুরাকালের ধর্মীয় নেতাদের মতো। আসলে তাঁর ঘরানাটা ছিল অনেকটা ‘কাল্ট’-এর মতো। কারো কারো মতে, গুপ্ত ও ভীতিকর কাল্ট। পিথাগোরাসের আইনে ক’টি নিষিদ্ধ শব্দ বা বিশ্বাস ছিল যা লঙ্ঘন করার অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিতেও ইতস্তত করেননি তিনি। সেসব নিষিদ্ধ শব্দের একটি ছিল ‘শূন্য’। আরেকটি ছিল ‘ইররাশনাল’ সংখ্যা, (যেমন ২-এর বর্গমূল), যাকে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। কড়া নির্দেশ ছিল, এগুলো যেন ভুলক্রমেও কেউ উচ্চারণ না করে তাঁর সামনে, বা কেউ করেছে এমন সংবাদ যেন তাঁর কানে না পৌঁছায়। দুঃখের বিষয় হিপসাস নামক এক হতভাগা সে আইন অমান্য করেছিলেন। সেজন্য পিথাগোরাস তাঁর শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন: স্বেচ্ছায় পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ (এ কাহিনির সত্যমিথ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে যদিও)।

গ্রিকদর্শনে শূন্য আর অসীম, দুটিই ছিল পরম শত্রু। তাদের মতে, অসীম বলতে একমাত্র ঈশ্বরকেই বোঝায়, আর সবই সীমার মাঝে গণ্ডিবদ্ধ। শূন্য হলো শয়তানেরও অধম, কারণ শূন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই বিশ্বাসের কারণেই ‘জেনোর ধাঁধা’ (এ নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব) বলে খ্যাত প্রহেলিকার সমাধান খুঁজে পাননি গ্রিক দার্শনিকেরা। মজার ব্যাপার যে এ ধাঁধার সমাধান পশ্চিম তথা গ্রিক চিন্তাধারাতে পুরোপুরি মীমাংসা পেতে আরো প্রায় দু’হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে আরেক লম্বা ইতিহাস।

সে ইতিহাস বলার আগে পিথাগোরাসের গণিত ও দর্শন নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

পিথাগোরাসের শূন্য-ভীতি

বর্তমান যুগের সামান্য লেখাপড়া জানা যেকোনো লোক অনায়াসে বলে দিতে পারবে 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' বলতে কী বোঝায়। সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত বাহুটির দৈর্ঘ্যের বর্গ হলো পাশের বাহু দুটির যে দৈর্ঘ্য তাদের বর্গের যোগফল। মজার ব্যাপার হলো, উপপাদ্যটির ঐতিহাসিক প্রণেতা হিসেবে তাঁর নাম সর্বজনবিদিত হলেও আসলে এটা এক হাজার বছর আগেও জানা ছিল আদিম গ্রিকদের। সম্ভবত মিসরীয়দেরও অজানা ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরাসের নাম ছড়ায় প্রধানত গাণিতিক হিসেবে নয়, সংগীতস্রষ্টা হিসেবে। অর্থাৎ সংগীতই তাঁকে গণিতের পথে এগিয়ে দেয়।

প্রথম যৌবনে একদিন তিনি খেলা করছিলেন একটি একতারা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। একটি তার টানটান করে আটকানো দুই প্রান্তের দুটি খুঁটিতে। কৌতূহলবশত তারটির মাঝখানে টোকা দিয়ে দেখলেন, একটা শব্দ বের হয়। এটি মৌলিক সুর—ফাণ্ডামেন্টাল নোট। তারপর এক বুদ্ধি এল তাঁর মাথায়। খালি হাতে টোকা না দিয়ে সেই তার বরাবর একটা ধাতব কিছু বসালে কেমন হয়। ছোট একটা রড-জাতীয় জিনিস মাঝখানে বসিয়ে তিনি তারটির দুই পাশে টোকা দিলেন। ভিন্নরকম আওয়াজ বেরোল। এভাবে রড ও টোকার জায়গা বদল করে করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুরের আওয়াজ পেতে থাকলেন। কোনোটা শ্রুতিমধুর, আবার কোনোটি একেবারেই বেসুরো। কোনোটা ভারি, কোনোটা মিহি। যে জিনিসটা সবচেয়ে চমকপ্রদ মনে হলো তাঁর কাছে সেটা হলো, তারের যে জায়গাটিতে টোকা দিলে ভালো শব্দ আসে, সেটা তার মধ্যিখানে নয়, এমন এক বিন্দুতে যাতে ছোট অংশটির সঙ্গে বড় অংশটির অনুপাত একটি সহজ ভগ্নাংশে দাঁড়ায়, যেমন ৩/৫ বা ৮/১১, যাকে গণিতের ভাষায় বলা হয় র‍্যাশনাল নাম্বার—মূলদ সংখ্যা। আরো আশ্চর্য যে এই অনুপাতটি যখনই অমূলদ সংখ্যা হয়ে যায় তখনই বিশ্রী আওয়াজ বেরোতে থাকে তাঁর একতারা থেকে। পিথাগোরাসের তখন মনে হলো যে এই সরল অনুপাতের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো

গভীর অর্থ আছে। প্রকৃতির যা কিছু সুন্দর,যা কিছু মধুর মনোহর হয়তো তাতেই আছে এই অনুপাতের প্রকাশ। আস্তে আস্তে এই সহজ চিন্তাটি তাঁর মনে একটি গূঢ় দার্শনিক ধারণার রূপ ধারণ করে ফেলল। তাইতো, এ শুধু গানে নয়,সুরে নয়, প্রকৃতির বিবিধ রূপ আর বর্ণশোভায় নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই সে ব্যাপৃত। যা কিছু দেখছি আমরা,যা কিছু আমাদের অনুভবের মধ্যে ধরা দিচ্ছে,যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,তার সবকিছুতেই লুকিয়ে আছে কোনো-না-কোনো মূলদ সংখ্যা। অর্থাৎ সৃষ্টির সবকিছুরই মূল হলো সংখ্যা। শুধু সংখ্যাই নয়, মূলদ সংখ্যা।

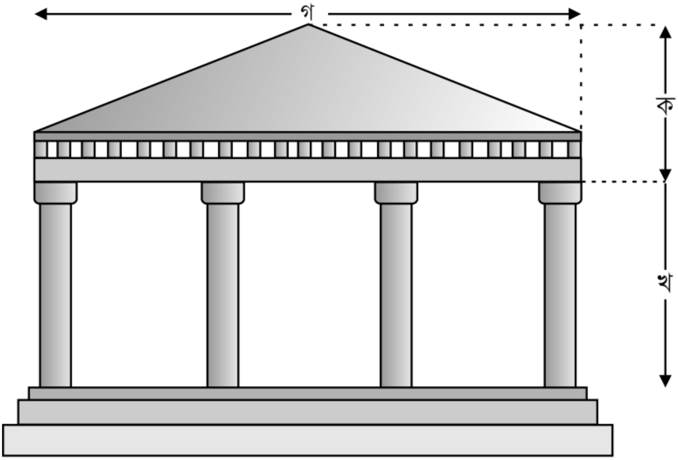

$$\frac{খ}{ক}=\frac{গ}{ক+খ}$$

পার্থেনন

এই ধারণাটি এমনই গেঁথে গেল পিথাগোরাসের মনে যে একে ভিত্তি করে গোটা বিশ্বসৃষ্টিরই একটা চিত্র দাঁড় করিয়ে ফেললেন তাঁর কল্পনায়। সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত আর কিছু নয়, পৃথিবী (অর্থাৎ বিশ্বজগতের আর সবকিছুকে ছাড়িয়ে আমাদের এই জল-বায়ু-মৃত্তিকানির্মিত পৃথিবীটা একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে), এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র তার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে তাদের নিজ নিজ গোলাকার কক্ষপথে। শুধু তা-ই নয়, এই গোলকগুলোর আকৃতির মধ্যে

একটা সহজ আনুপাতিক সম্পর্ক বজায় রয়েছে। গোলকের ভেতরে আবদ্ধ থেকে গ্রহ-তারাগুলো আপন সুরে গান করে যাচ্ছে অবিরাম, ঠিক যেমন করে একতারার তারে আনুপাতিক নিয়মের টোকাতে সৃষ্টি হয় অনুপম বাদ্য। পিথাগোরাসের বিশ্বদর্শনে সংগীত, সংখ্যা, জ্যামিতি ও সৃষ্টি সব একাকার হয়ে গেল। যেকোনো সংখ্যা হলে চলবে না,তাকে মূলদ হতে হবে। অমূলদ সংখ্যাকে তিনি একধরনের পাপাচার বলে মনে করতেন। পাপাচার এই কারণে যে অমূলদ অনুপাত সুরের ব্যাঘাত ঘটায়, সুন্দরকে অসুন্দর করে । স্রষ্টার সৃষ্টিতে অসুন্দরের স্থান নেই। এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

মুশকিল এই যে বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, পিথাগোরাসের কঠোর নির্দেশে সেটা উগ্র ধর্মবিশ্বাসের রূপ ধারণ করে। উগ্র ও হিংস্র। তাঁর মতবাদের বিপক্ষে কোনো কথা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষ করে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর কাছ থেকে তিনি দাবি করতেন অন্ধ আনুগত্য। কোনোরকম প্রশ্ন, সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। ফলে তাঁর ঘরানাটি অচিরেই একটি গুপ্ত সংস্থার আকার ধারণ করে। সেখানে বাইরের কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। ভক্তরা নিজেদের সংসারধর্ম ত্যাগ করে গুরুকে ঘিরে একই গৃহে বাস গ্রহণ করে এবং কঠোর জীবনধারাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে তারা কোনোক্রমেই ঘরানার কোনো গোপন সংবাদ কারো কাছে ফাঁস করে দেবে না। দুঃখের বিষয় যে ফাঁস করার মতো গোপন সংবাদ যে ছিল না সেই ঘরানার তা নয়। পিথাগোরাস এবং তাঁর শিষ্যরা একসময় আবিষ্কার করলেন যে সংসারের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মধুর যে সুর, সবচেয়ে সুদর্শন যে দৃশ্য, তার সঙ্গে যে অনুপাতটি জড়িত সেটা আসলে মূলদ সংখ্যা নয়, একটি অমূলদ সংখ্যা। এই অনুপাতটিকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'গোল্ডেন রেশিও' বা সুবর্ণ অনুপাত। এই অনুপাতের উপস্থিতি আসলেই প্রকৃতির সর্বত্র। শিল্পী যখন ছবি আঁকেন, ভাস্কর যখন সৃষ্টি করেন তাঁর প্রস্তরমূর্তি, স্থপতি যখন তাঁর স্বপ্ন-ভবনের নকশা তৈরি করেন, তখন তাঁর নিজেরই অজান্তে, অজ্ঞাতসারে এই

অনুপাতটি কাজ করে মনের ভেতরে। গ্রিসের পুরাকালীন কিংবদন্তীয় অট্টালিকা—পার্থেনন প্রাসাদ—শীর্ষচূড়া থেকে ছাদ পর্যন্ত যে মাপ তাকে ভাগ করুন ছাদ থেকে মেঝে অবধি যে দৈর্ঘ্য,তা দিয়ে। দেখা যাবে যে দুটি সংখ্যা হুবহু মিলে গেছে। এটাই হলো 'সুবর্ণ অনুপাত'। মজার ব্যাপার যে এই একই অনুপাত নিসর্গের আরো অনেক কিছুতে দেখা যায়। যেমন আনারস, শামুক, গাছপালা, তরুলতা।

পিথাগোরাসের সমস্যাটি ছিল এখানে যে তথ্যটি তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারছিলেন না। তাঁর দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তিটাই ছিল মূলদ সংখ্যা। বিশ্বভুবনের গোটা ছবিটা তিনি দাঁড় করিয়েছেন সেভাবে। সারা দেশের মানুষ সেটা মেনে নিয়েছে। এখন তিনি কিভাবে বলবেন যে আসল জিনিসটা তা নয়—গোঁড়ার সংখ্যাটি একটি অমূলদ সংখ্যা। কিছুতেই তা হয় না। লোকে ভাববে পিথাগোরাস একটা ভণ্ড। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে কথাটা চেপে যেতে হবে। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে প্রকৃত তথ্যটি। সেই মর্মে আদেশ জারি হয়ে গেল ঘরানাতে যে অমূলদ সংখ্যার খবরটি চূড়ান্ত গোপন—টপ সিক্রেট। ক্লাসিফাইড ম্যাটেরিয়াল, খবরদার, কেউ যেন মুখ না খোলে। খুললে তার সাজা আছে। এই সাজারই ভুক্তভোগী হয়েছিলেন হতভাগা হিপসাস।

পিথাগোরাসের গুপ্ত সঙ্ঘ ও তাঁর নিজের অন্তিম পরিণতি খুব সুখময় হয়নি। এবং তার জন্য দায়ী ছিল প্রধানত তাঁর অতিরিক্ত গোপনপ্রিয়তা ও উৎকেন্দ্রিক আচার-আচরণ। তাঁর সময়কালে তিনি এবং তাঁর ভক্তগোষ্ঠী এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে সেই গোষ্ঠীতে প্রবেশাধিকার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু পিথাগোরাস তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করেননি। তাঁরা হতাশ হতে হতে একসময় তিক্ত দ্রোহিতার ভাব পোষণ করতে থাকে, ভেতরে ভেতরে। সেই তিক্ততা ও বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত সহিংস রূপ ধারণ করে। এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিরোধী দল যে তারা একদিন দল বেঁধে পিথাগোরাস গোষ্ঠীকে সশস্ত্র আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। প্রথমে ভক্তদের ধরে ধরে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে একে একে, শেষে ধাওয়া করে

স্বয়ং গুরুদেবকে। পিথাগোরাস পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। হয়তো পারতেনও পালাতে, কিন্তু বাদ সাধল একটি মটরের খেত! মটরের প্রতি তাঁর কী মনোভাব সেটা তো আগেই বললাম। এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক ছিলেন তিনি যে জীবন যাক, তবু মটরখেত পার হবেন না। ফলে যা হবার তা'ই হলো। শত্রুরা তাঁকে মটরখেতের ভেতরেই কুপিয়ে হত্যা করে ফেলল। এই হলো পিথাগোরাসের জীবনাবসানের প্রচলিত গল্প। সত্য কি মিথ্যা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক এখনো শেষ হয়নি।

সীমার মাঝে অসীম তুমি

পিথাগোরাস ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের করুণ পরিণতি অবশ্য গ্রিক সমাজের ওপর তাঁর গণিত বা তাঁর মতবাদের প্রভাবকে মোটেও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। বরং পরবর্তীকালের দুই দিকপাল প্লেটো (খ্রি.পূ. ৪২৮-৩৪৮ আ.) এবং অ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)—এঁরাও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর দর্শন দ্বারা। প্লেটোর ধারণা, সংসারে যা কিছু নিখুঁত ও সত্য-সুন্দর তার ওপর সময়ের ছাপ পড়ে না, তা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়।

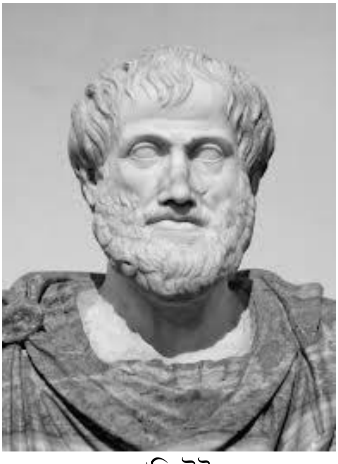

অ্যারিস্টটল

পরিবর্তন মানেই পতন, স্খলন, যা অস্থায়ী ও অবাস্তব। সেই কারণে তিনি কোনো বস্তুর গতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। গতি মানে চক্রাকার গতি নয়, কারণ চক্রাকার পথে বস্তু তার যাত্রাবিন্দুতেই প্রত্যাবর্তন করে, যেমন পিথাগোরাসের গ্রহ-নক্ষত্র। কিন্তু সরল পথে তারা ফিরে আসে না, সুতরাং সরল রাস্তা প্রকৃতিবিরোধী। প্লেটোর মতবাদের পূর্ণ সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল। পিথাগোরাসের মতো অ্যারিস্টটলও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি রূপনকশা দাঁড় করালেন নিজের মনে। সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু আমাদের এই স্থবির পৃথিবী, একথা তিনি অকপটে মেনে নিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করলেন নিজের কিছু চিন্তাভাবনা। বললেন যে আমাদের এই গ্রহটির অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী যে গ্রহ সে কিন্তু স্থবির নয়, সে তার কক্ষপথে অনন্ত ঘূর্ণ্যমান, একটি গোলাকার খোলসের ভেতরে চির আবদ্ধ থাকা অবস্থায়। সেই খোলসটি কেবল ওই গ্রহটিরই নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র। এখানে অন্য কারোর প্রবেশাধিকার নেই। কথা হলো এই যে অনন্তকাল ঘুরতে থাকা, তার জন্য যে জ্বালানিশক্তি প্রয়োজন হয়, সেটা আসে কোত্থেকে? অ্যারিস্টটলের মতানুসারে সেটা স্থির দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীর কাছ থেকে আসতে পারে না, সুতরাং আসতে হবে তার অপর পাশে যে বৃহত্তর গ্রহ বা নক্ষত্রটি রয়েছে তার কাছ থেকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় নক্ষত্রটি তার চলার শক্তি পায় কার কাছ থেকে? নিশ্চয়ই তার পার্শ্ববর্তী নক্ষত্র থেকে। এভাবে তিনি ছোট থেকে বড় এক সারি গ্রহ-নক্ষত্র দাঁড় করালেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুড়ে। তখনকার দিনে আকাশের যত গ্রহ-তারার খবর জানা ছিল, সবাই নিজ নিজ স্থান পেয়ে গেল অ্যারিস্টটলের মানচিত্রে। একটা বড় প্রশ্ন স্বভাবতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন। এর পর কী? অর্থাৎ সবচেয়ে বাইরের যে সর্ববৃহৎ নক্ষত্রটি সেটি তার চলার শক্তি পেল কোথায়? ওটার পাশে যদি বৃহত্তর কোনো প্রতিবেশী না থাকে তাহলে তাকে চালাবে কে? কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু অ্যারিস্টটল তার সহজ সমাধান বের করে ফেললেন। বললেন, আহা, শোনো বাছারা। এই যে সবার বাইরে থেকে সবকিছুকে চলবার শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে তারই নাম ঈশ্বর—সৃষ্টিকর্তা। এই যুক্তিটা এমনই পাকাপোক্তভাবে স্থান করে নিল তাঁর চিন্তায় যে তিনি দাবি করলেন যে ঈশ্বর

বলতে যে সত্যি সত্যি কেউ আছেন এটাই তার প্রমাণ। মজার ব্যাপার যে এই যুক্তিটি আধুনিক চিন্তাবিদদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক বিশ্বাসমালা কিন্তু এই মতবাদের ওপরই ভিত্তিশীল। এই মতবাদই সম্ভবত প্রভাবিত করেছিল সেকালের নানাবিধ ধর্মগ্রন্থসমূহকে। প্রভাবিত করেছিল পরবর্তী দু'হাজার বছরের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানকে।

পিথাগোরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, এঁরা সবাই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বভুবন একটি কঠিন পদার্থ, এর মধ্যে ফাঁকফোকর কিছু নেই। ফাঁক মানে শূন্যতা, যেখানে ঈশ্বর অস্তিত্বহীন, বাস্তবতা অনুপস্থিত। সেটা অসম্ভব, তাই খালি জায়গা বলে কিছু থাকতে পারে না ইহজগতে। মানুষের চামড়ার চোখে যা খালি বলে মনে হয় তা আসলে খালি নয়, সেখানেও বস্তু আছে। ‘ভ্যাকুয়াম’ নামক কোনো বাস্তব জিনিস নেই সংসারে, ওটা মানুষের কল্পনা মাত্র। এ কারণে তাঁরা খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকে গ্রিক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ এপিকিউরাসের (খ্রি.পূ. ৩৪২-২৭০) আণবিক তত্ত্ব নাকচ করে দিয়েছিলেন। তারও আগে একই মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন ডেমোক্রিটাস (খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০) নামক এক দার্শনিক। অণুতত্ত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও ওজস্বী প্রবক্তা ছিলেন লুক্রেসিয়াস (খ্রি.পূ. ৯৮-৫৪)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুর মৌলিক উপাদান অণু-পরমাণু, সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম, চোখে দেখা যায় না এমন সব কণা। তারা নিরন্তর ঘুরে বেড়ায় বিশ্বচরাচরে। ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা তাদের লাগে প্রতিনিয়তই, আবার দুই ধাক্কার ফাঁকে তাদের মুক্ত বিচরণের জন্য খালি জায়গাও থেকে যায়। এই ‘খালি’ জায়গা আর ’মুক্ত বিচরণের’ ব্যাপারটাই অ্যারিস্টটলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ‘মুক্ত বিচরণ’ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ!

শূন্যতা, এবং তার বিপরীতে সীমাহীনতা—এ দুটি ধারণার প্রতি গ্রিক দার্শনিকদের মজ্জাগত অনীহার কারণেই খ্রি.পূ. পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জেনোর ধাঁধাটির কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি অনেক শতাব্দী ধরে।

ধাঁধাটি এরকম। একটি দ্রুতপদী খরগোশ আর একটি শ্লথগতি কচ্ছপ দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যেহেতু কচ্ছপ বেচারির পায়ের জোর কম সেহেতু তাকে কয়েক কদম আগে থাকতে দেওয়া হলো। ধরুন, ১ গজ আগে। মনে করুন খরগোশের গতি কচ্ছপের দ্বিগুণ- তার মানে কচ্ছপ যে সময় নেবে ১ গজ দৌড়ুতে, সে সময়ে খরগোশ চলে যাবে ২ গজ। তাহলে দেখা যায়, খরগোশ যখন কচ্ছপের যাত্রা-বিন্দুতে পৌঁছাল ততক্ষণে কচ্ছপ ১/২ গজ এগিয়ে গেছে। এই আধা গজ দূরত্ব যখন পার হয়ে যায় খরগোশ, ততক্ষণে কচ্ছপ আরো ১/৪ গজ এগিয়ে যায়। এর পর খরগোশ যায় ১/৪ গজ, কচ্ছপ তার থেকে এগিয়ে থাকে আরো ১/৮ গজ। এভাবে তাদের দূরত্ব কমতে থাকে ধাপে ধাপে, কিন্তু একেবারে শূন্যতে পৌঁছায় না। ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬,...,এরকম করে সীমাহীন ধাপে চলতে থাকে তাদের প্রতিযোগিতা, কিন্তু খরগোশ বেচারার কখনোই ভাগ্যে জোটে না কচ্ছপকে ছাড়িয়ে যাওয়া। অথচ প্রকৃতপক্ষে আমরা সবাই জানি যে খরগোশ অতি সহজেই কচ্ছপকে টপকে অনেক দূরে চলে যায়। তাহলে অঙ্কের অকাট্য যুক্তিতে সেটা পাচ্ছি না কেন আমরা? মহা সমস্যা, তাই না? এই সমস্যা শুধু সে যুগের গ্রিক দার্শনিকদেরই দারুণ মাথাব্যথা সৃষ্টি করেনি, বর্তমান যুগেও অনেক সময় মানুষকে চিন্তায় ফেলে।

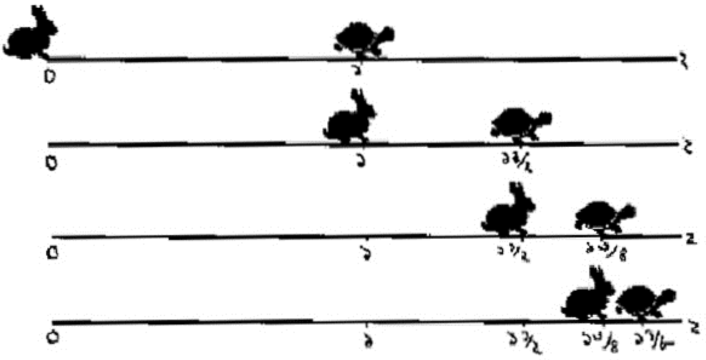

খরগোশ-কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতা

মূল সমস্যা এখানে একটি নয়, দুটি। এক, ওপরের ভগ্নাংশগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। এত ছোট যে প্রায় 'শূন্য'তে পৌঁছার অবস্থা। তার অর্থ গ্রিকদের সেই চিরশত্রু 'শূন্য'টি আলগোছে উঁকি মারছে পেছন থেকে। দুই, সংখ্যাগুলো তো শেষ হচ্ছে না, চলে যাচ্ছে একেবারে অসীমের দিকে। সুতরাং পিথাগোরাস আর অ্যারিস্টটল যা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, 'অসীম' সংখ্যা, সেটাই দেখা দিচ্ছে এখানে। অথচ জেনোর যুক্তি খণ্ডাবেনই বা কেমন করে তাঁরা। শূন্য আর অসীম আসলে নেই, অথচ জেনোর ধাঁধাতে আছে,তার কী সুরাহা হবে? অ্যারিস্টটল অবশ্য দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না তাতে। বললেন, 'শূন্য' আর 'অসীম', দুটোই সত্য, তবে বাস্তবে নয়, জেনোর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাতে। এক কথাতে তিনি জেনোর ধাঁধাকে উড়িয়ে দিলেন, যেন এর কোনো গুরুত্বই নেই।

পশ্চিম সভ্যতাকে অনেক অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল জেনোর ধাঁধার পূর্ণ সমাধান পেতে। ঘটনাটি হলো এই যে সংখ্যায় সীমাহীন হলেও ওপরের ক্রমহ্রাসমান ভগ্নাংশগুলোর যোগফল কিন্তু অসীম নয়,একটি ছোটখাটো সংখ্যা—২। অর্থাৎ

১+১/২+১/৪+১/৮+....=২

কচ্ছপ আর খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতাকে বিচার করতে হবে সীমাহীন দূরত্ব দিয়ে নয় (যদিও সীমাহীন সংখ্যাগুলোর যোগফল একটি ছোটখাটো সীমিত সংখ্যা), সীমিত কালক্ষেপণের মাপে। এক গজ যেতে তার এক মিনিট লাগে, দুই গজ যেতে লাগবে দুই মিনিট। দুই মিনিটে খরগোশ কত দূর যায়, আর কচ্ছপ যায় কত দূর, সেটা বের করলেই তো সমস্যা চুকে যায়। সুতরাং ধাঁধার গোঁড়ায় ছিল গ্রিক পণ্ডিতদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা, 'শূন্য' আর 'অসীম'-এর দ্বন্দ্ব নয়।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিমে নয়, পুবের দিকে

সন্ধে নামার সময় হলে, পশ্চিমে নয় পুবের দিকে,
মুখ ফিরিয়ে ভাববো আমি, কোন দেশে রাত হচ্ছে ফিকে...
—**কবীর সুমন**।

বৈষয়িক গণনাকর্মে শূন্যের প্রয়োজনীয়তা যে মিসরীয় আর গ্রিকরা উপলব্ধি করেননি তা নয়। ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর তাঁরাও মেনে নিয়েছিলেন যে দর্শনশাস্ত্রে যত অবাঞ্ছনীয়ই হোক শূন্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করারও উপায় নেই। শূন্যের ব্যবহার কোন জাতি কার কাছ থেকে শেখে, কে'ই বা প্রথম তার সূচনা করে, তার সঠিক ইতিহাস হয়তো কখনোই পুরোপুরি জানা যাবে না। কারো কারো মতে, দক্ষিণ আমেরিকার মায়া বা তারও পূর্বেকার কোনো সভ্যতাতেই শূন্যের বোধ জন্মেছিল প্রথম। কেউ বলেন চীনে। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত যে শূন্যকে তারা কেউই সংখ্যা হিসেবে গণ্য করেনি। শূন্য একটা চিহ্ন মাত্র—বড় রাস্তাতে যেমন থাকে দিকনির্দেশক ফলক, বা দূরত্বের ফলক। ১, ২, ৩,... এগুলোর সঙ্গে তুলনীয় কোনো সংখ্যা নয়। শূন্য যে আসলেই একটি সংখ্যা, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা সেই উপলব্ধিটা পশ্চিমে জন্মায়নি, মধ্যপ্রাচ্যেও নয়, জন্মেছিল দক্ষিণপ্রাচ্যে—ভারতবর্ষে।

সব গাছ সব মাটিতে হয় না, সব মাছ থাকে না সব নদীতে। উপযুক্ত পরিবেশ লাগে। জলবায়ু, তাপ ইত্যাদি ঠিকমতো হতে হয়। একটা জাতির চিন্তার জগতৎটিও

অনেকটা সেরকম। ওটা কিভাবে বিকশিত হবে তা নির্ভর করে সে জাতির ধ্যানধারণা ও রীতিনীতির ওপর, তার প্রাণশক্তির ওপর। অনুকূল পরিবেশ পেলেই একটা জাতির মেধা প্রস্ফুটিত হতে পারে শতমুখী সৃজনশীলতায়।

প্রলয়নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ

'শূন্য আর 'অসীম'—দুটি আইডিয়াই দু'হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের মনমানসের সঙ্গে হুবহু খাপ খেয়ে যাবার মতো ছিল। 'শূন্য'কে পশ্চিম দেখত ভীতির চোখে, ভারতে 'শূন্য' ছিল দেবীর আসনে। পরম পূজনীয় সত্তা। শূন্য আর অসীম এই দুই সত্তার মাঝে ভারতবাসী তাদের আত্মার আশ্রয় খুঁজে পেতেন। হিন্দুধর্মে সব ভগবানের সেরা ভগবান হলেন ব্রহ্মা। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহারক। তিনি আছেন

সর্বত্র, আবার তিনি কোথাও নেই। তিনি একাধারে মহাশূন্যের চির-শূন্যতায় বিলীন, আবার সর্বব্যাপী তাঁর উপস্থিতি। এক অন্তহীন দ্বৈততার শরীরে তাঁর নিবাস। শিবের মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কেউ? এক হাতে তাঁর সৃষ্টির দণ্ড, আরেক হাতে ধ্বংসের অগ্নি-মশাল। তার অর্থ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শূন্য আর অসীমের দ্বৈত অস্তিত্ব। এ বিশ্বাস একান্তই ভারতীয় বিশ্বাস। এখানে শূন্য আর অসীম একে অন্যের স্বভাব দোসর, একে অন্যের পরিপূরক। ভারতীয় দর্শনে 'শূন্য' হলো স্বাগত অতিথি-আত্মার পবিত্র মন্দির। তাই ভারতের মাটি ছিল 'শূন্য' আর 'অসীমের' আদর্শ জন্মভূমি। কিন্তু 'শূন্য' যে দস্তুরমতো একটি গাণিতিক সংখ্যার সম্মান পাবার যোগ্য সেই বোধটা জন্মাল কেমন করে ভারতীয় চেতনায়? গণিত আর দর্শন তো ঠিক অবিচ্ছিন্ন জিনিস নয় গ্রিকদের মতো। সুতরাং ব্রহ্মার দ্বৈত-সত্তার উপলব্ধি থেকে গণিতের সংখ্যামালাতে শূন্য তার নিজের স্থানটি স্বাভাবিকভাবে দখল করে নেবে, সেটা খুব বাস্তবসম্মত মনে হয় না। কোনো দেশের কোনো সভ্যতাতেই এমন উদাহরণ নেই যে একটা বড় আবিষ্কার আপনা আপনি জন্ম নিয়েছে কোনো ঐতিহাসিক, সামাজিক বা এধরনের কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া। সাধারণত আইডিয়ার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। বর্তমান যুগে সেগুলো প্রচার হয় বই-পুস্তকের মাধ্যমে, বা অন্যান্য শত প্রকারের যোগাযোগসূত্রে। দু'হাজার বছর আগে সেভাবে কোন কিছু ছড়াবার উপায় ছিল না অবশ্য। ছিল যেটা সেটা হলো রাজ্যজয় বা ব্যবসাবাণিজ্য। গণিতের শূন্য হয়তো ঐভাবেই প্রবেশ করেছিল ভারতবর্ষে। খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকে সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি শুধু জাঁদরেল সেনানায়ক ছিলেন না, উঁচুমানের লেখাপড়া জানা ব্যক্তিও ছিলেন। স্বয়ং অ্যারিস্টটলের ছাত্র। ধারণা করা হয় যে তিনি এবং তাঁর গ্রিক সৈন্যসামন্তদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় ভারতবাসী খবর পায় যে ব্যাবিলনীয়রা শূন্যের ব্যবহার বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছেন, সংখ্যা হিসেবে না হলেও সংখ্যাফলক হিসেবে। এই ছোট্ট আইডিয়াটি ভারতের উর্বর পলিমাটিতে নতুন জীবন পেয়ে যায়। শুধু ফলক কেন হবে, সংখ্যা হতেই বা দোষ কোথায়। গ্রিকদের মতো তাদের তো সেই 'শূন্য মানে নিরীশ্বরবাদ'-জাতীয় মানসিক

প্রতিবন্ধকতা ছিল না, বরং উলটোটাই। ভারতে শূন্য মানেই ঈশ্বর। তাই অচিরেই শূন্য তার জায়গা করে নেয় সংখ্যামালাতে। তবে তারা ব্যাবিলনীয়দের মতো ৬০-ভিত্তিক গণনা বর্জন করে নিজেদের ১০-ভিত্তিক সংখ্যার ব্যবহার বলবৎ রাখলেন। আজকে আমরা যাকে আরবি নিউমারেল বলে আখ্যায়িত করি, ভারতীয়দের সে সময়কার লিখনপদ্ধতি বলতে গেলে প্রায় একই রকম ছিল: ১, ২, ..., ৯, ০। অনেকে মনে করেন, আধুনিক সংখ্যার লিখনপদ্ধতি প্রবর্তনের কৃতিত্বটা আরবদের না দিয়ে বরং ভারতীয়দের দেওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল, কারণ ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে আরবরা শেখে ভারতের কাছ থেকে, রাজ্য জয় করার পর। তারপর পশ্চিম শেখে আরবদের কাছে, ইসলামের যখন স্বর্ণযুগ। পরে পশ্চিমই এর নামকরণ করে আরবি সংখ্যা।

যা-ই হোক, শূন্যের নবার্জিত সম্মান গণিতের জগতে এক নবযুগের সূচনা করে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে। (সম্ভবত চীনদেশেও প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞজনেরা শূন্যের বহুবিধ ব্যবহারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন।) তাদের কল্পনা নতুন নতুন উদ্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। যেমন, ঋণাত্মক সংখ্যা। আগে কেউ-১ বা-৭ বলতে কী বোঝায় কল্পনা করতে পারত না। ভারতীয় গাণিতিকেরা শেখালেন যে ঋণাত্মক সংখ্যাকে অনেকটা ঋণের মতোই দেখা যেতে পারে। কারো কাছ থেকে ধার করলে সেটা ঋণ, নিজে কামাই করলে সেটা ধন, অর্থাৎ ধনাত্মক। আন্দাজ করা হয় যে বাংলা ভাষায় ‘ধনাত্মক’ আর ‘ঋণাত্মক’ শব্দ দুটির উৎপত্তিই সেখানে। সপ্তম শতাব্দীর বিশিষ্ট ভারতীয় গাণিতিক ব্রহ্মগুপ্ত শিখিয়েছিলেন কেমন করে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় প্রকার সংখ্যা দিয়ে যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করতে হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করলেন যে ‘ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ বা পূরণ করলে ফলাফল দাঁড়াবে ঋণাত্মক, এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে আরেকটি ঋণাত্মক সংখ্যা দিয়ে ভাগ বা পূরণ করলে দাঁড়াবে ধনাত্মক’। বর্তমান যুগের সাত বছরের ছেলেমেয়েরাও তা জানে, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে সেটা ছিল এক বিস্ময়কর আবিষ্কার।

ব্রহ্মগুপ্ত এ-ও জানতেন যে শূন্য দিয়ে যেকোনো সংখ্যাকে পূরণ করলে সেটা শূন্য হয়ে যাবে। সে অর্থে শূন্য সবকিছুকে শুষে নেয়। তবে তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন শূন্য দিয়ে ভাগ করার চেষ্টা করতে গিয়ে। ০/০ বা ৫/০ কততে দাঁড়ায়? খুব ভাবনাচিন্তা না করেই বলে বসলেন, এগুলোও শূন্য, যা অবশ্য ঠিক নয়। তখনকার চিন্তাধারাটাই ছিল ওরকম—শূন্য হলো এমন জিনিস যার সংস্পর্শে এসে সবই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

ব্রহ্মগুপ্ত

এই ভ্রান্ত ধারণাটি তৎক্ষণাৎ শুধরানো হয়ে ওঠেনি। আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর আরেক প্রখ্যাত ভারতীয় গাণিতিক, ভাস্কর, তিনি এই সমস্যার সঠিক মীমাংসা দিতে সক্ষম হন। তিনি বললেন, ১/০ শূন্য নয়, অসীম। আর ০/০-এর মানে কী? এর কোনো মানেই নেই। আজকে আমরা জানি যে এরও একটা অর্থ আছে। একে বলা হয় 'ইনডিটারমিনেট নাম্বার' বা অনির্দিষ্ট সংখ্যা। এর মান যেকোনো সংখ্যা হতে পারে। তবে এর গণিতসম্মত অর্থ প্রথম দিয়েছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি গাণিতিক 'লোপিতাল'। সেটা বোঝার জন্য মধ্যযুগের

ইউরোপিয়ান গণিতের ইতিহাস জানা দরকার। সেসব কথায় পরে আসা যাবে, এখন প্রাচ্যের গণিতটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করা যাক।

প্রাচ্য গণিতের স্বর্ণযুগ

ভারতীয় গণিত বিশেষভাবে উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছিল সপ্তম শতাব্দীতে। তবে এর আগেও বেশ কিছু প্রথিতযশা গাণিতিক মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন গণিতশাস্ত্রে। আসলে ৪০০ থেকে ১,২০০ সাল পর্যন্ত সময়কালটি ভারতীয় গণিতের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সেকালের অন্যতম সেরা গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট (৪৭৬-৫২০) মাত্র তেইশ বছর বয়সে 'আর্যভাটিয়া' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা থেকে ধারণা করা হয়, দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখার ধারণাটি তিনিই প্রথম সূচনা করেন। ভাস্কর (এক) (৬০০-৬৮০)-এর লেখা আর্যভাটিভাষ্য (৬২৯ সাল) বইটিতে আরো একধাপ এগিয়ে শূন্য(০)সহ দশমিক সংখ্যা কিভাবে লিখতে হয় তার বর্ণনা দেন। এই গ্রন্থটিকে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয় ভারতে। অবশ্য এতে কোনো দ্বিমত নেই সুধীমহলে যে শূন্যকে পাটিগণিতের সংখ্যামালাতে অন্যান্য পূর্ণ সংখ্যার সমাধিকার—পূর্ণ স্থান করে দেওয়ার কৃতিত্ব মূলত ব্রহ্মগুপ্তের (৫৯৮-৬৬৮) প্রাপ্য। শূন্য দ্বারা গুণ-ভাগের সঙ্গে জড়িত যে ভাস্কর, যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হলো, তিনি হলেন দ্বিতীয় ভাস্কর (১১১৪-১১৮৫)।

শূন্যকে সংখ্যার সারিতে স্থান দেওয়া এবং ঋণাত্মক সংখ্যার আবিষ্কার, দুটোই ছিল সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী ঘটনা। ওদিকে পশ্চিমের সূর্য তখন প্রায় অস্তমিত। দীর্ঘ সাত শ বছর রাজত্ব করার পর পরাক্রান্ত রোমান সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসের মুখে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দের 4 সেপ্টেম্বর রোমান সম্রাট রমুলাস অগাস্টাস যখন শত্রুপক্ষের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন, তখনই সত্যিকার অর্থে ইউরোপের মাটি থেকে রোমের আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এত দিনের একটা বিশাল সভ্যতা একটি

পরাজয়ের ঘটনাতে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে কোনো এক বিশেষ দিবসে, সেটা অবশ্য কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। একটা সভ্যতা আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না, আপনা-আপনি পড়েও যায় না। ওঠার যেমন একটা প্রক্রিয়া আছে, নামারও আছে। অনুমান করা হয় যে রোমান সাম্রাজ্য ৩২০ বছর ধরে আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে হতে শেষে সামান্য খোঁচাতেই একেবারে বিলীন হয়ে গেল। তখন আর পশ্চিমের কিছু থাকল না পৃথিবীকে দেবার। সাম্রাজ্য নয়, সমৃদ্ধি নয়, নতুন কোনো জ্ঞান নয়, কোনো যুগান্তকারী আইডিয়া নয়। পশ্চিমের ভাণ্ডার তখন শূন্য হয়ে গেছে।

শূন্যের মূল আবিষ্কারক কে?

শূন্যের মূল আবিষ্কারক কে, ব্রহ্মগুপ্ত, না আর্যভট্ট? কেউ বলে আর্যভট্ট, কেউ বলে ব্রহ্মগুপ্ত। ভারতীয় লেখকদের বেশির ভাগই আর্যভট্টের পক্ষে, পশ্চিমের গাণিতিক মহল বরং ব্রহ্মগুপ্তের গলাতেই জয়মাল্য পরাতে চান। তবে, প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে ইতিহাসের ঠিক কোন মুহূর্তে, ঠিক কোন ব্যক্তির কল্পনাতে এই ধারণাটির জন্ম নিয়েছিল সেটা আর এখন হলফ করে, দিন-তারিখ সহকারে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও নেই। 'শূন্য' এমন একটি আইডিয়া যা বাগানের ফুলের মতো কোনো এক সুন্দর সকালে হঠাৎ ফুটে ওঠেনি, ধীরে ধীরে অনেক সময় লাগিয়ে তার বিকাশ ঘটেছে। শূন্য আবির্ভূত হয়নি, বিবর্তিত হয়েছে। আড়াই হাজার বছর আগে মিসরীয়রাও শূন্য ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু না জেনে। মিসরীয়দের আগে ব্যাবিলনীয়রাও শূন্য নিয়ে কাজ করেছিলেন, কিন্তু তা-ও অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ শূন্যকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের খাতিরে তাঁরা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, আছে তার নিজস্ব সম্মান, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। গ্রিক গুণীজনরা ভালো করেই জানতেন এসব খবর, এমনকি ইউক্লিডের

জ্যামিতির মধ্য দিয়ে শূন্য প্রতিদিনই একটি জলজ্যান্ত বিন্দুর আকারে তাঁদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে, কিন্তু তাতেও তাঁদের টনক নড়েনি, কারণ শূন্যের দার্শনিক আইডিয়ার সঙ্গে গাণিতিক আইডিয়ার সরাসরি সংঘাত। এবং সেকালের গ্রিক মননে গণিত আর দর্শন ছিল একই দেহের দুটি অঙ্গ—একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতবর্ষে শূন্যকে সহজেই বরণ করা সম্ভব হয়েছিল ঠিক দার্শনিক কারণে না হলেও আধ্যাত্মিক কারণে। তাদের দৈব-প্রকৃতির ধ্যানধারণার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল শূন্য। কিন্তু কথা হলো দেবদেবী নিয়ে নয়, গণিত নিয়ে চিন্তা করলে, গণিতের সংখ্যামালাতে শূন্যকে আসন দিলেন কে? আর্যভট্টের জন্ম ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে, ঠিক যে বছর রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ৪৯৯ সালে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ ‘আর্যভাটিয়া’ প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থের বেশির ভাগই ছিল গ্রহ-নক্ষত্র নিয়। তিনি সেকালের একজন সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। পৃথিবী যে তার অক্ষরেখার চারপাশে রোজ একবার ঘুরে আসে সে তথ্যটি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের সঠিক কারণ সর্বপ্রথম তিনিই জানিয়েছিলেন আমাদের। জ্যামিতির ওপরও তাঁর প্রচুর কাজ—যেমন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা, পিরামিডের আয়তন (ফর্মুলায় ভুল ছিল যদিও)। বেশ কটি দ্বিঘাতী সমীকরণের সমাধানও ছিল তাঁর গ্রন্থে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে ‘শূন্য’ যে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা সে বোধটাও সম্ভবত তাঁর ছিল। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। বরং ইঙ্গিত আছে এরকম যে তিনি শূন্যকে ব্যবহার করেছিলেন হয়তো অনেকটা গ্রিকদের মতো করেই, অজ্ঞাতসারে, তার পূর্ণ মর্যাদা না দিয়েই। তাছাড়া তাঁর পুরো কাজটাই ছিল বর্ণনামূলক, যেখানে কোনোরকম গাণিতিক ভাষা তিনি ব্যবহার করেননি। ফলে তিনি যে শূন্যের মূল্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন তার দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত ভালো করে জেনেশুনেই শূন্যকে ব্যবহার করেছেন, শূন্যকে সংখ্যামালার ঠিক মধ্যিখানে বসিয়ে তাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। তিনি ‘শূন্য’ নিয়ে যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ করেছেন (ভুল-শুদ্ধ যা-ই হোক)। ঐতিহাসিকদের কোনো দ্বিমত নেই এবিষয়ে যে ব্রহ্মগুপ্তই প্রথম ‘শূন্য’কে সংখ্যার সম্মান দিয়ে গণিত-সভাতে স্থান দেন।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে মধ্যপ্রাচ্যে উদয় হতে থাকে এক নতুন সূর্য—ইসলামের চাঁদ-তারা মার্কা সূর্য। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ (সা.) এন্তেকাল করার দশ বছরের মধ্যেই দুর্ধর্ষ আরব বাহিনী তাদের দিগ্বিজয়ের সীমানা মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া আর পারস্য পর্যন্ত বিস্তার করে ফেলে। ইহুদি আর খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত জেরুজালেম তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারা পশ্চিমে আলজেরিয়া আর পূর্বে সিন্ধু নদ পর্যন্ত দখল করে ফেলে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারা স্পেনের পতন ঘটায়। ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে তাদের জয়যাত্রা চীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে তোলে।

আল-খোয়ারিজমি

সেকালের মুসলমানরা অবশ্য সাম্রাজ্যবিস্তার আর ধর্মপ্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, যেখানে গেছেন সেখান থেকেই সাগ্রহে আহরণ করে এনেছেন বিজিত জাতির ধনভাণ্ডার শুধু নয়, জ্ঞানভাণ্ডারও। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ

পায় বাগদাদের আব্বাসি আমলে। বিশেষ করে খলিফা হারুন-অর-রশিদের ছেলে আল-মামুনের (৭৮৬-৮৩৩) শাসনকালে। আল-মামুন অসম্ভব জ্ঞানপিপাসু মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত উঁচুমানের প্রগতিশীল চিন্তার নৃপতি। তিনিই ছিলেন মুসলিম জগতের প্রথম সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর হোতা ও অভিভাবক অনেকের মতে, ওটাই ছিল ইসলামের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রেনেসাঁ। সারা মুসলিম জাহানে তিনি নিয়ে এসেছিলেন মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার এক দুর্বার কল্লোল। ধর্মীয় গোঁড়ামি পিছুটান নিতে বাধ্য হয়, মোল্লা সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। আধুনিক যুক্তিবাদী ও প্রশ্ন-মুখি চিন্তাধারা প্রবেশ করে মুসলিম মননে। আল-মামুনের সময়ই মোতাজিলা মতবাদ মাথা চাড়া দেয়। এই মতবাদ অনুসারে সংসারের কোনোকিছুই প্রশ্নের অতীত নয়, এমনকি ধর্মও। বিশেষ করে ধর্ম। মোতাজিলারা বিশ্বাস করতেন যে কোরান পবিত্র গ্রন্থ ঠিকই, কিন্তু দৈব গ্রন্থ নয়, মনুষ্য-প্রণীত। সুতরাং যুগবিশেষে এর রদবদল সম্ভব ও সংগত। মোতাজিলারা অমুসলমান ছিলেন তা নয়, নামাজ-রোজা তাঁরা করতেন ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে এ-ও বিশ্বাস করতেন যে ধর্মকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, উল্টোটা নয়।

বলা বাহুল্য যে এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় শুধু সনাতন মোল্লা-সমাজের কাছ থেকে নয়, সাধারণ জনসাধারণের কাছ থেকেও। খলিফা মামুন সেই বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে গেছেন তাঁর আধুনিকতার সংগ্রামে। রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের একসাথে জড়ো করে নির্দেশ দিয়েছিলেন নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানচর্চার সাধনায় আত্ম-নিমগ্ন হতে। আল-মামুন প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট ছিলেন গ্রিক দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান আর গণিতের প্রতি। ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জ্ঞানসাধনার সংস্কৃতিকেও তিনি সম্মান করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের পণ্ডিতকুলের প্রতি তাঁর প্রথম নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন উঠে পড়ে লেগে যান গ্রিক, ইহুদি আর খ্রিষ্টান-প্রণীত বইপত্র যা যেখানে পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন বাগদাদে। তারপর সেগুলো ভালো করে পাঠ করে অনুবাদ করেন আরবি

ভাষায়। শেষে নিজেরাই যেন একনিষ্ঠভাবে গবেষণার কাজে লিপ্ত হয়ে যান। এমনই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা ছিলেন তিনি যে নিজ প্রাসাদের বিলাসী-জীবন উপেক্ষা করে মত্ত হয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিশেষ ভবন তৈরি করাতে। এ ছিল তাঁর বড়ই শখের স্বপ্ন—এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে জ্ঞানীরা কেবল জ্ঞানচর্চা করবেন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবেন, নির্বাধ ও নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার সঙ্গে। ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর এই স্বপ্ন কার্যকরী হয় শেষ পর্যন্ত। বিশ্বের সর্বপ্রথম গবেষণা-গৃহ, জ্ঞান-মন্দির (House of Wisdom), বায়তুল হিকমা, তার নির্মাণপর্ব সমাপ্ত হয় বাগদাদে। আজকে পশ্চিম জগতের সর্বত্র, প্রাচ্যেরও অনেক দেশে, গবেষণাগারের ছড়াছড়ি। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ইসলামের সেই গৌরবযুগে, সে তথ্য হয়তো সবার জানা নেই।

আল-মামুনের উৎসাহ, প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামি মেধা শতবর্ণে পল্লবিত হয়ে ওঠে। এই প্রস্ফুটিত জ্ঞানবৃক্ষের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন আবু মুসা আল - খোয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০) নামক এক গণিত-প্রেমী জ্ঞানসাধক। ইতিহাস তাঁকে জানে অঙ্কের অন্যতম প্রধান শাখা, বীজগণিত, তার স্রষ্টা হিসেবে। তাঁর প্রণীত গ্রন্থ ‘হিসাব-আল-জবর-ওয়াল-মোকাবেলা’। সেই আল-জবর থেকেই ইংরেজি নাম ‘অ্যালজেব্রা’। আরবি আল-জবরের আক্ষরিক অর্থ কিন্তু গণিতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মোটেও নয় বরং চিকিৎসাশাস্ত্রেই বেশি প্রযোজ্য। এর মানে ‘সারানো’, কোনোকিছু ‘মেরামত’ করা, যেমন ভাঙা হাড়। তিনি বললেন, অস্ত্রোপচার করে যেমন ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো যায়, তেমনি সমীকরণ সমাধান করে উদ্ধার করা যায় অজানা সংখ্যার মান। উদাহরণ:

$$x+3=5$$

এখানে x-এর মান কত? সোজা উত্তর: 2 . কিন্তু যদি এমন হয় যে:

$$ax^2+bx+c=0,$$

তাহলে x-এর মান বের করব কী করে? আজকে যেকোনো স্কুলের বারো-তেরো বছরের যেকোনো ছাত্রছাত্রী মুখস্থ বলে দিতে পারবে তার উত্তর:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

কিন্তু নবম শতাব্দীতে এই সহজ সমাধানটি কারোরই জানা ছিল না। পৃথিবীতে প্রায় সব স্কুলেই শিক্ষার্থীরা শেখে এই সূত্রটি। কিন্তু কজন ছাত্রছাত্রী, বা কজন শিক্ষক অবগত আছেন যে এই সূত্রের আবিষ্কারক ছিলেন সেই আরব গাণিতিকটি। আল-খোয়ারিজমি ছিলেন সত্যিকার সাধক পুরুষ- দিনরাত গণিত নিয়েই পড়ে থাকতেন। তিনি বলতেন যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবধারিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে গণিত। তাঁর আরো একটি বড় আবিষ্কার ছিল। অনেকটা ধারাপাতের মতো-যোগবিয়োগ পূরণ ভাগের ধারাপাত, ইংরেজিতে যাকে বলি 'অ্যালগরিদম'। তাঁর নামানুসারেই বর্তমান যুগের শাখা: অ্যালগরিদম।

আল-খোয়ারিজমির উপরিউক্ত সূত্র অনুযায়ী

$$x^2 = 1,$$

এর সমাধান কত? কোনো সূত্র প্রয়োগ না করেই বলা যায় ১। এটুকু তিনি জানতেন-বাগদাদের জ্ঞানভবনের সকলেরই জানা ছিল। যেটা জানা ছিল না তাঁদের, এমনকি আল-খোয়ারিজমি সাহেব নিজেও টের পাননি প্রথম প্রথম সেটা হলো এই সমীকরণটির দ্বিতীয় সমাধান: -১। সেযুগের মানুষের মন এতই আচ্ছন্ন ছিল অখণ্ড এবং পূর্ণ সংখ্যা (natural numbers) দ্বারা যে 'ঋণাত্মক' সংখ্যা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্বই তাঁদের মাথায় ঢোকেনি। ওই জ্ঞানটুকু তাঁরা আহরণ করেন ভারতীয় পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসার পর। ব্যাবিলনীয়দের শিক্ষা থেকে তাঁরা জানতেন যে 'শূন্য' একটা দরকারি জিনিস, কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তাঁরা শিখলেন যে শূন্য শুধু সাময়িক প্রয়োজন মেটায় না, দস্তুরমতো একটা সংখ্যাও, ১, ২, ৩, ...-এর মতোই।

বড় কথা, তাঁরা বুঝলেন যে x+3=1 জাতীয় সমীকরণেরও একটা সমাধান আছে, -২, যেটা হাতে গোনার মতো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা না হলেও অত্যন্ত মূল্যবান সংখ্যা। তাঁরা এ-ও বুঝলেন যে দ্বিঘাতী সমীকরণের (quadratic equation) সমাধান একটি নয়, দুটি, যদিনা এরকম হয় যে: $(x-1)^2=0,$ যার একটাই উত্তর, ১। এই যুক্তিতে আল-খোয়ারিজমির ঐতিহাসিক সূত্রটিতে -b-এর ডান পাশে শুধু যোগচিহ্ন নয়, তার নিচে একটা বিয়োগচিহ্নও বসাতে হবে। এই ফর্মুলাটিই পৃথিবীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী আজীবন মুখস্থ রাখে।

'শূন্য'কে সংখ্যার আসরে বসাবার পর পুরো একটা 'সংখ্যারেখা'র ধারণা নির্মিত হবার সুযোগ পায় মানুষের মনে। 'শূন্য' হয়ে গেল ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যামালার মাঝখানে একটা সেতুর মতো। অন্যভাবে ভাবতে গেলে শূন্য যেন একটি কাচের আরশি, যেখানে দাঁড়িয়ে ধনাত্মক রাশি তার প্রতিবিম্ব দেখতে পায় ঋণাত্মক রাশিতে। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক সংখ্যা একে অন্যের সখা হয়ে গেল, তাদের মাঝে সৃষ্টি হলো এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতিসাম্য। এ যেন সৃষ্টিরই দ্বৈত রূপ: এক দিকে ধন, আরেক দিকে ঋণ; এক দিকে জন্ম, আরেক দিকে মৃত্যু-দুটি একই বাস্তবতার বন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ।

'শূন্য' সভ্যতাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দেয় মধ্যযুগের আরব-প্রভাবিত পৃথিবীতে।

'শূন্য' শব্দটি ইংরেজিতে 'zero' হয়ে গেল কেমন করে, তারও একটা ইতিহাস আছে। শুরুতে ভারতে এর সংস্কৃত নাম ছিল 'শূনিয়া', যার অর্থ খালি, নেই, অবিদ্যমান, যা থেকে বাংলা নাম শূন্য। আরবরা সেই 'শূনিয়া'কে তাদের নিজেদের ভাষায় 'সিফর'এ পরিণত করেন। পশ্চিম বিজ্ঞজনদের হাতে এসে আরব 'সিফর' ল্যাটিন গন্ধযুক্ত 'সিফাইরাস'-এ দাঁড়িয়ে যায়, যা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একসময় জিরোতে রূপান্তরিত হয়।

বুদ্ধিজীবী মহলে শূন্যের একটা সম্মানজনক স্থান হওয়া সত্ত্বেও এর দার্শনিক ব্যঞ্জনার্থের সঙ্গে চিন্তাবিদেরা খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন গোড়া থেকেই তা কিন্তু নয়। কারণ তাঁদের মন থেকে তখনো অ্যারিস্টটলের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। শূন্যের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদিতার একটা সম্পর্ক আছে, এই অস্বস্তিটুকু কিছুতেই দূর হচ্ছিল না তাঁদের চিন্তা থেকে। কিন্তু গণিতের অগ্রগতির কল্যাণে তাঁদের এই অমূলক বিশ্বাসের ভিত্তি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। তাঁরা মেনে নিতে থাকেন ধীরে ধীরে যে 'শূন্য' একটা সংখ্যা মাত্র, তার বেশি নয়, কমও নয়। শূন্যের পৃথিবী গণিতে, দর্শনশাস্ত্রে নয়। শূন্যের সঙ্গে ঈশ্বর আছে কি নেই সে প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই এবং থাকতে পারে না, এই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিটি তাঁদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

ওমর খৈয়াম

সেই জ্ঞানমন্দিরের এক পরবর্তীকালীন সদস্য ছিলেন কিংবদন্তীয় পারসি কবি ওমর খৈয়াম (১০৪৮-১১৩১)। গোটা বিশ্বে বোধ হয় এমন কোনো শিক্ষিত মানুষ নেই যে ওমর খৈয়ামের নাম শোনেনি। তাঁর ছয় শতাধিক ছড়াকাব্য-সংবলিত গ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ' সম্ভবত পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থসমূহের অন্যতম-সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও সর্বাধিক পঠিত, আলোচিত ও নন্দিত তো অবশ্যই। মজার ব্যাপার যে যে যুগে

তাঁর জন্ম সেযুগে তাঁর অধিকতর পরিচয় ছিল বিশিষ্ট গাণিতিক, জোতির্বিজ্ঞানী ও সংগীতবিশারদ হিসেবে। তিনি ছিলেন সেকালের সর্বজ্ঞপুরুষ। ইস্ফাহান শহরে তিনি একটি আন্তর্জাতিক মানের মানমন্দির (observatory) তৈরি করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি বছরের দৈর্ঘ্য আশ্চর্য নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতটাই সুনাম ছিল তাঁর নভোদর্শী বিজ্ঞানী হিসেবে যে সে সময়কার সুলতান, জালালুদ্দিন, তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটা আধুনিক সৌরভিত্তিক পঞ্জিকা প্রস্তুত করতে। সেই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যে পঞ্জিকাটি তৈরি করেছিলেন তিনি তার নাম দেয়া হয় ‘জালালিয়ান ক্যালেণ্ডার। নির্ভুলতার বিচারে সে ক্যালেন্ডার আধুনিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ।

গণিতে ওমর খৈয়ামের পাণ্ডিত্য কোনো সংকীর্ণ এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। জ্যামিতির আদ্যোপান্ত সব তথ্যই ছিল তাঁর নখদর্পণে। গ্রিকদের মতো তাঁর চিন্তাও ছিল জ্যামিতিক, অর্থাৎ জ্যামিতিক আকারাদির রীতিনীতি দিয়ে প্রভাবিত। আল-খোয়ারিজমির নতুন গণিত, বীজগণিত, তার প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন একসময়। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন নিজের কাছে: দ্বিঘাতী সমীকরণের সমাধান দিয়ে গেলেন আল-খোয়ারিজমি, কিন্তু ত্রিঘাতী সমীকরণের (cubic equation) সমাধান তো দেয়নি কেউ। সেই দায়িত্বটি তিনি নিজে পালন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনেও কিন্তু তাঁর জ্যামিতিক চিন্তাধারার প্রভাব ছিল। তাঁর যুক্তি ছিল এরকম: দ্বিঘাতী সমীকরণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে দ্বিমাত্রিক সমতল ক্ষেত্রের, সুতরাং ত্রিমাত্রিক ঘনবস্তুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে ত্রিঘাতী সমীকরণের। অনেক পড়াশোনা আর গবেষণার পর একটা নতুন এবং অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন—ত্রিঘাতী সমীকরণ প্রধানত ১৪ প্রকারের। সমীকরণের পুরো সমাধান হয়তো তিনি দিতে পারেননি সে সময়, কিন্তু এই যে সমীকরণের একটা শ্রেণী

আবিষ্কার করতে পারা, এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, সমীকরণ সমাধানের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে যাঁরা ত্রিঘাতী সমীকরণের ওপর কাজ করেছেন, তাঁদের জন্য এই তথ্যটির মূল্য ছিল অপরিসীম। ওমর খৈয়াম যে একেবারেই কোনো সমাধান দিতে পারেননি তা নয়, তবে আংশিকভাবে, গুটি কয়েক বিশেষ বিশেষ সমীকরণের সমাধান তিনি অবশ্যই দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুরোটা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। তার কারণ যে তাঁর বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা তা নয়, দ্বাদশ শতাব্দীর জ্ঞান দিয়ে সেটা বের করা মোটেও সম্ভব ছিল না। তাঁর অর্ধসমাপ্ত কাজটি শেষ হতে আরো চারশো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল গণিতজগৎকে-গুটি কয়েক ইতালিয়ান গণিতজ্ঞ সে কাজটি সমাপ্ত করেন।

সমীকরণকে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজটির ভেতরে সুপ্ত ছিল ভবিষ্যতের এক বিশাল সম্ভাবনার বীজ। দ্বাদশ শতাব্দীতে দল-তত্ত্ব (group theory) নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব কারো জানা ছিল না। এই বিষয়টি বর্তমান যুগের গণিতশাস্ত্রের অন্যতম বড় শাখা, যার প্রভাব শুধু গণিতেই নয়, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, এমনকি সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত বিস্তৃত। ওমর খৈয়ামের শ্রেণীকরণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সেই দল-তত্ত্বের আইডিয়া।

পাঠক হয়তো ভাবছেন, ওঁর গবেষণায় শূন্য কোথায়? সংগত প্রশ্ন। না, প্রত্যক্ষভাবে হয়তো নেই, কিন্তু পরোক্ষে সেটা সর্বত্র। সমীকরণ মানে তো বিসমিল্লাতেই 'শূন্য'। শূন্যের বোধ ছিল বলেই তো মানুষ বুঝতে পারল যে একটা দ্বিঘাতী সমীকরণের দুটি সমাধান। একই কারণে ওমর খৈয়াম সাহেবও জানতেন, একটি ত্রিঘাতী সমীকরণের সমাধান একটি নয়, তিনটি, সাধারণত। ধনাত্মক, ঋণাত্মক তো আছেই, হয়তো, আরো কিছু। এই 'আরো কিছু' (যেটা পরে complex number বা জটিল সংখ্যা নামে আত্মপ্রকাশ করে), তার জন্যও মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বেশ কয়েক শতাব্দী। সে কথায় পরে আসব।

চতুর্থ অধ্যায়

শূন্য এল ইউরোপে

যদি কোনো দিন ছন্দিত পায়ে আগন্তুকরা আসে,
তারকাখচিত তৃণের আসনে, এই বাগিচার পাশে
ফুল্ল হৃদয়ে তুমিও সেখানে চরণচিহ্ন এঁকো,
একটি শূন্য সুধার পেয়ালা নিভৃতে উপুড় করে রেখো।
—**ওমর খৈয়াম**, রুবাইয়াৎ[2]

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সূচনা থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত পরিচিত ধারাটি হলো, এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে মেধাবী ছেলেমেয়েরা নিজ দেশের 'সর্বোচ্চ ডিগ্রি' অর্জন করার পর 'উচ্চতর' শিক্ষার জন্য চলে যায় পশ্চিমে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও মধ্যযুগের প্রাক্কালে কিন্তু স্রোতটা ছিল ঠিক বিপরীত। বরং পশ্চিম থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিভাধর ছেলেদের (সেকালে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াটাই ছিল অশ্রুতপূর্ব) স্বপ্ন ছিল প্রাচ্যের বড় বড় শিক্ষানিকেতনগুলোর কোথাও গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করা। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সে শিক্ষাগারের পীঠস্থান ছিল আরব। তখনকার দিনে উন্নততর জ্ঞানকেন্দ্র ছিল মিসর, ইরাক, সিরিয়া, ইরান এইসব মুসলিমপ্রধান দেশ।

এমনি এক উচ্চাভিলাষী শিক্ষার্থী ছিলেন লিওনার্দো ফিবোনাচি (১১৭০-১২৫০)। ইতালির পিসা শহরে তাঁর জন্ম। ব্যবসায়ী পিতার আর্থিক সহায়তায় তিনি উত্তর আফ্রিকায় গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য। সেখানে তিনি অঙ্ক শেখেন মুসলিম

[2] অনুবাদ : শ্যামল কান্তি দাশ

গণিতজ্ঞদের কাছে। কালক্রমে তিনি নিজেই একজন বিশিষ্ট গাণিতিক হয়ে ওঠেন। আফ্রিকার গণিতচর্চা শেষ করে তিনি ফিরে আসেন মাতৃভূমিতে। ইউরোপে তখন প্রাচ্যের গণিত, বিশেষ করে আরব-সূচিত সংখ্যা-লিখনপ্রণালি সবে পরিচিত হয়ে উঠছে। 'শূন্য' তখনো ঠিক তাদের সচেতন মনে ঠাঁই করে উঠতে পারেনি। গণিতের ঐতিহাসিকদের কারো কারো ধারণা, ফিবোনাচিই ছিলেন প্রথম ইউরোপিয়ান যাঁর হাতে করে আরবি গণিত এবং আরবি 'শূন্য' সগৌরবে পদার্পণ করে ইউরোপের মাটিতে, এবং স্থায়ীভাবে আসন করে নেয় ইউরোপের মনমানসে।

ফিবোনাচি

১২০২ সালে Liber Abaci (গণনাগ্রন্থ) নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন ফিবোনাচি। তাতে অত্যন্ত হালকা মেজাজে একটা আপাত-তুচ্ছ সমস্যা দাঁড় করালেন তিনি। সমস্যাটি এরকম:

ধরুন এক কৃষক একজোড়া বাচ্চা খরগোশ কিনে এনেছে বাজার থেকে। ধরা যাক, খরগোশ প্রজাতির প্রজনন-প্রকৃতির ধারাটাই এরকম যে বাচ্চা অবস্থা থেকে পুরো দুমাস সময় লাগে তাদের প্রসব-যোগ্য বয়স হতে। এই দুমাস কেটে যাবার পর

প্রতি মাসের প্রথম দিনটিতে তাদের একজোড়া সন্তান জন্মায়। এই সন্তান-জোড়াও দুমাস অপেক্ষা করার পর ঠিক একই নিয়মে প্রতি মাসে একজোড়া সন্তানের জন্ম দেয়। সমস্যাটি হলো এই: একটা নির্দিষ্ট-সংখ্যক মাস, ধরুন, n অতিক্রম করবার পর, $n+1$-তম মাসের প্রথমে তাহলে সর্বমোট কত জোড়া খরগোশের মালিক হলেন সেই কৃষক?

একটা ছেলেমানুষি মডেল, মানছি, কিন্তু এর একটা বিস্ময়কর সমাপ্তি আছে।

গোনার কাজটি কিন্তু খুবই সহজ। প্রথম মাসে সংখ্যা ১। দ্বিতীয় মাসেও ১, কারণ উৎপাদন তো শুরু হয় দ্বিতীয় মাস শেষ হবার পর। তৃতীয় মাসের ১ তারিখে সংখ্যা দাঁড়ায় ২। তার পরের মাসে সন্তানেরা সাবালক হয়ে ওঠেনি বলে শুধু তাদেরই একজোড়া বাচ্চা হয়, সুতরাং মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩। তার পরের মাসে কিন্তু বাবা-মা এবং তাদের প্রথম সন্তানদ্বয়, দুয়েরই একজোড়া করে সন্তান জন্ম নেয়। তাহলে এবার সংখ্যা দাঁড়াল ৫। এভাবে হিসাব করে যে সংখ্যামালাটি অনায়াসেই উদ্ধার করে ফেলি আমরা সেটা হলো:

১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ...

এই ধারাবাহিক সংখ্যাগুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালে একটা সুশৃঙ্খল প্যাটার্ন ধরা দেবে যেকোনো আনাড়ি চোখেও। তৃতীয় সংখ্যা থেকে শুরু করে ডান দিকের প্রতিটি সংখ্যা তার পূর্ববর্তী সংখ্যা দুটির যোগফল। এই অবলোকনটি থেকে একটা গাণিতিক সূত্র লিখে ফেলা যায়, কী বলেন? x_n যদি হয় n-তম মাসের খরগোশ-জোড়ার সংখ্যা, তাহলে সেই সূত্রটি নিশ্চয়ই এরকম:

$$x_{n+1} = x_n + x_{n-1}.$$

এখানে n-কে শুরু করতে হবে ১ থেকে, এবং ধরে নিতে হবে যে, $x_0 = 0, x_1 = 1,$ সুতরাং $x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 5, ...,$ এই যে sequenceটি,

বা অনুবর্তী রাশিমালা, এটি গণিত-জগতে বিশেষভাবে পরিচিত ফিবোনাচি সিকুয়েন্স নামে। আট শ বছর পর এখনো গণিত-বিশারদদের অনেকে এর ওপর কাজ করছেন, পেপার লিখছেন। এ এক আশ্চর্য রহস্যময় সংখ্যামালা। এত সহজ, এত সাদাসিধে, অথচ এত গভীর তার তাৎপর্য। এই তাৎপর্যের পরিসর অবিশ্বাস্য রকম বিস্তৃত। তার মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে যদি একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাই আনুবর্তিক সংখ্যাগুলোর দিকে। বাঁ থেকে ডান দিকে এগিয়ে চলুন। প্রতিটি সংখ্যাকে তার পূর্ববর্তী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করুন। যেমন ৩/২=১.৫, ৮/৫=১.৬, ১৩/৮=১.৬২৫, ২১/১৩=১.৬১৫৩৮...,৩৪/২১= ১.৬১৯০...। পরিচিত মনে হচ্ছে কি? এই অনুপাতটি যতই এগোবে ডান দিকে, একেবারে অন্তহীন মাত্রায়, ততই এটি একটি বিশেষ সংখ্যার নিকটে চলে যাবে। সেই সংখ্যাটি হলো পূর্ববর্ণিত ওই জাদুকরি সংখ্যাটি: ১.৬১৮...; পিথাগোরাসের সেই সুবর্ণ সংখ্যা যাকে ফাঁস করে দেওয়ার জন্য হতভাগ্য হিপসাসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল!

আশ্চর্য, তাই না? শুধু তা-ই নয়, পণ্ডিতরা খুঁজে বের করেছেন যে অনেক প্রাণী আর উদ্ভিদের জীবনেও এই ফিবোনাচি রাশির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ যেন এক দৈব ডিজাইন। (এবিষয়ে বেশ কিছু সুপাঠ্য বই লেখা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক ইয়ান স্টুয়ার্টের Mathematics of Life গ্রন্থখানা পড়ে দেখতে পারেন) যারা দৈবতায় বিশ্বাস করেন না (যাঁদের মধ্যে এই বইয়ের দুই লেখকই আছে), তাঁদের কাছেও এ এক বিস্ময়কর রহস্য প্রকৃতির- যেন প্রজন্ম-বৃদ্ধির এই সহজ নিয়মটির সারল্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি তার নিজেরই সারল্য-প্রীতি প্রকাশ করেছে।

প্রকৃতির আইনকানুনের সঙ্গে যাঁরা মোটামুটি পরিচিত (অর্থাৎ সফল গবেষণাকর্মে লিপ্ত) তাঁরা অবশ্য অনেক আপাত-রহস্যেরই ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন, এবং অহরহ খুঁজে চলেছেন (এই অন্তহীন কৌতূহলই বিজ্ঞানীদের চালিকা শক্তির উৎস)। যেমন আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। অভিকর্ষের ফর্মুলাটি $1/d^2$র ২ হলো কেন, ৩ হলো না কেন, বা ২.১৭ বা অন্য কোনো সংখ্যা,

সেটা ভাববার বিষয় বৈকি (উক্ত ফর্মুলাটিতে d হলো দুটি বস্তুর দূরত্ব, যেমন সূর্য এবং পৃথিবী।) মজার ব্যাপার যে এই একই ফর্মুলা প্রকৃতির আরো কয়েক জায়গায় কাজ করে, যেমন তাড়িতচৌম্বক ক্ষেত্রে। ফর্মুলার ২ সংখ্যাটি অন্য কোনো সংখ্যা হলে তার কী পরিণতি হতে পারত সেটা নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে- -গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সব প্রকারেরই। তাতে দেখা গেছে যে ২-এর অন্যথায় আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির চেহারা একবারে ভিন্নরকম হতো, সম্ভবত এর স্থায়িত্ব নিয়েই নানারকম সমস্যা দেখা দিত। তার অর্থ, এই যে সহজ-সরল নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে প্রকৃতি তার একটুখানি উনিশ-বিশ হলে আমাদের অস্তিত্ব আর স্থিতি দুটিই বিপন্ন হয়ে পড়ত।

ফিবোনাচির উপরক্ত সূত্র বা সমীকরণটির সমাধান বের করা কিন্তু এমন কোনো শক্ত কাজ নয়। ধরুন সমাধানটি এরকম:

$$x_n = t^n, t$$

কোনো সংখ্যা, মূলদ-অমূলদ কিছু আসে যায় না। এই ধারণাকৃত সমাধানটি আসলেই উক্ত সমীকরণের শর্ত পালন করে কিনা তা যাচাই করতে হলে দেখতে হবে ওটাতে স্থাপন করার পর t ভিত্তিক কী সমীকরণটি বের হয়ে আসে। এটা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় যে সমীকরণটি হচ্ছে:

$$t^2 - t - 1 = 0,$$

এর সমাধান কী করে বের করতে হয় সেটা তো আমাদের আগেই শেখা হয়ে গেছে আল-খোয়ারিজমি সাহেবের আবিষ্কার থেকে। এই সমাধান থেকেই চলে আসবে সেই বিপুল রহস্যে ভরা সংখ্যাটি:

$$(5^{1/2} + 1)/2 = 1.618....,$$

বিচিত্র এই বিশ্ব, তাই না?

এই অনুচ্ছেদের মূল প্রসঙ্গটি হলো 'শূন্য' ও তার ঘনিষ্ঠ সহচর 'অসীম'। ফিবোনাচি সূত্রে শূন্য হয়তো আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, যদিও প্রচ্ছন্নভাবে সেটা

আছেও, কিন্তু অসীম তো একেবারে নাকের ডগায়। এই যে বলা হলো সংখ্যাগুলো (অর্থাৎ কৃষকের খরগোশের সংখ্যা) বেড়ে বেড়ে চলে যাচ্ছে অসীমের দিকে, সেখানেই তো ছিল গ্রিক চিন্তাবিদদের জুজুর ভয়। ফিবোনাচির রাশিতে অসীম (এবং পরোক্ষে শূন্য) দেখা দিতে পেরেছে বলেই পিথাগোরাসের সযত্নে লুক্কায়িত জুজু, সুবর্ণ অনুপাত, আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

Liber Abaci ফিবোনাচির একমাত্র গ্রন্থ নয়। তাঁর আরেকটি গ্রন্থে ত্রিঘাতী সমীকরণ, যা কিনা ছিল ওমর খৈয়ামের প্রিয় বিষয়, তাঁর ওপর অনেক মূল্যবান গবেষণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন:

$$x^3 + 2x^2 + 10x = 20.$$

এটির কোনো মূলদ সমাধান থাকা যে সম্ভব নয়, এবং $a + b^{1/2}$ জাতীয় কোনো সংখ্যা, এধরনের আধুনিক গোছের মন্তব্যও তিনি রেখে গেছেন (উল্লেখ্য যে এখানে a এবং b উভয়কেই মূলদ সংখ্যা হতে হবে।)

মোনালিসার ছবিতে অঙ্ক ?

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্ধকার ভালো করে কেটে ওঠেনি। উন্নততর আরব এবং ভারতবর্ষসহ দূরপ্রাচ্যের নানা দেশ থেকে নতুন নতুন আইডিয়ার বাতাস ভেসে এলেও প্রাচীন অ্যারিস্টটলিয়ান চিন্তাধারা তাদের বিজ্ঞান আর গণিতের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। ফিবোনাচির যুগান্তকারী আবিষ্কার আর আরব সংখ্যামালার প্রভাব তখনো প্রবেশ করেনি ইউরোপের গণমানসে, এমনকি বুদ্ধিজীবী মহলেও।

কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের নানারকম বিধিনিষেধ সত্ত্বেও সত্যিকার কোনো আকর্ষণীয় আইডিয়া যখন অঙ্কুরিত হয় কোনো দেশে তখন সেটা ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বেই কোনো-না-কোনোভাবে, চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করতে থাকবে চিন্তাশীল মানুষদের। সব বড় আইডিয়ারই ধর্ম সেটা। ‘শূন্য’ তেমনি এক বড় আইডিয়া। একে আর বেশিদিন চেপে রাখা সম্ভব হয়নি ইউরোপে। ধর্মযুদ্ধের

ধ্বংসস্তূপ থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসবার পর 'শূন্যের' আইডিয়াটি যে-সম্প্রদায়কে সবার আগে টেনে আনতে সক্ষম হয় সেটা ছিল যাঁরা ছবি আঁকতেন—পেশাজীবী না হলেও শখের শিল্পী, যাদের বেশির ভাগই ছিলেন চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (সেকালে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলতে সাধারণত তাই বোঝাত, ল্যাটিন ভাষা-জ্ঞানসম্পন্ন পাদ্রি বা সাধু বা ভিক্ষু বা ঐ-জাতীয় কোনো উপাধিযুক্ত পুরুষ)। ফিলিপো ব্রুনেলিসি (১৩৭৭-১৪৪৬) ছিলেন তেমনি এক মননশীল ইতালিয়ান বুদ্ধিজীবী যিনি পেশাতে ছিলেন স্থপতি, নেশাতে শিল্পী, চিন্তায় গাণিতিক। এক বিরল ব্যতিক্রম সেকালের, যাঁর সঙ্গে চার্চের কোনো সরাসরি সম্পর্ক ছিল না, তবে চার্চের জন্য ছবি আঁকতেন। ১৪২৫ সালে তাঁর আঁকা ছবি, যা পরবর্তীকালে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে, সেটা এখনো ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নামকরা চার্চের দেয়ালে সগৌরবে বোদ্ধা দর্শকদের চিত্তরঞ্জন করে চলেছে। ছবিটির বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শূন্যের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষতার পর্দায় তুলে নিয়ে আসা। তাঁর আগে অঙ্কন-শিল্পের কোনো জীবন ছিল না- নিষ্প্রাণ সমতল ভূমিতে শবদেহের মতো ছিল তাঁদের ছবি। ব্রুনেলিসি শূন্যের সাহায্যে তাতে একটা তৃতীয় মাত্রা যোগ করে দিলেন। শিল্প জীবন্ত হয়ে উঠল। জন্ম নিল 'পার্সপেক্টিভ' নামক এক নতুন আইডিয়া। দ্বিমাত্রিক পটে তিনি প্রবেশ করালেন ত্রিমাত্রিক বাস্তবতাকে। শূন্য আর অসীম তাতে হাত মিলিয়ে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, মনকে তুলে নিল লোক থেকে লোকান্তরে।

ব্রুনেলিসি এবং তাঁর আঁকা ছবি

সে ছবি ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের প্রত্যুষকালের এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। ব্রুনেলিসির উত্তরসূরি ছিলেন আরেক বিশিষ্ট ইতালিয়ান, রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান কর্ণধার, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫০৯)। ভিঞ্চি ব্রুনেলিসির কাজ দ্বারা খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কৈশোর আর যৌবনে। রীতিমতো একটা বই লিখে ফেলেছিলেন 'পার্সপেক্টিভ' বিষয়টির ওপর। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির নাম শোনেনি এমন কোনো শিক্ষিত লোক পৃথিবীর কোথাও আছে কি না জানি না। জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনাতে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হলে আর কোথাও যেতে হবে না, ভিঞ্চির দুয়েকটা কাজের কথা শুনলেই যথেষ্ট। তাঁর মতো শতমুখী প্রতিভার মানুষ ইতিহাসে কখনো জন্মেছে কিনা সন্দেহ। তাঁকে বলা হয় 'সব জিনিয়াসের সেরা জিনিয়াস'। কিংবদন্তীয় শুধু নয়, অবিশ্বাস্য, অপার্থিব, অসামান্য প্রতিভা। সাধারণ লোক তাঁর নাম শুনেছে 'মোনালিসা'র শিল্পী হিসেবে।

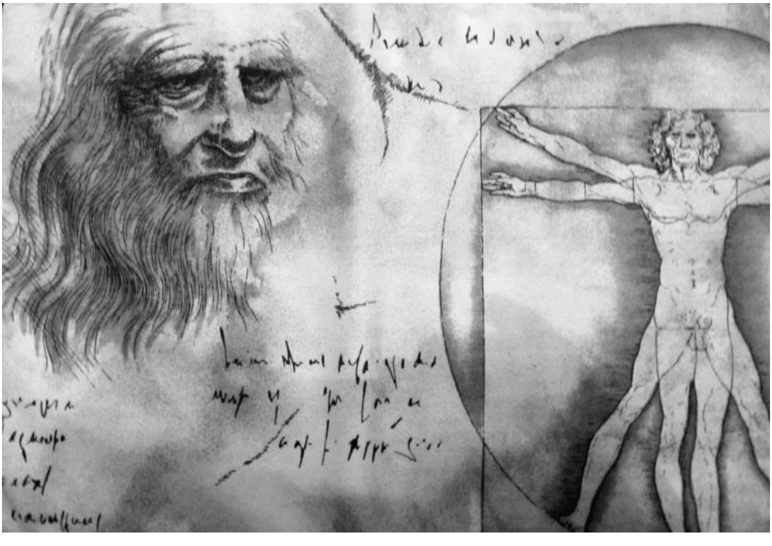

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং তাঁর অনন্য শিল্পকর্ম 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান'

কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র যে শিল্পের বাইরে কত অসংখ্য পথে বিস্তৃত ছিল—গণিত, পদার্থবিদ্যা, প্রকৌশল, বিমান নির্মাণ, শারীরবিজ্ঞান, বিশেষ করে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ জগতের যাবতীয় রহস্য, যা বর্তমান যুগের মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীরা হিউম্যান অ্যানাটমি বলে জানে (সে খবর হয়তো সবার জানা নয়)। আমাদের বিশেষ অনুরোধ বাঙালি পাঠকদের কাছে তাঁরা যেন আগ্রহ করে এই লোকটার জীবনী পড়ার চেষ্টা করেন।

যা-ই হোক, আজকের প্রসঙ্গে যা বলতে চাচ্ছি তা হলো ভিঞ্চি কী ধারণা পোষণ করতেন অঙ্ক আর শিল্পের সম্পর্ক নিয়ে। তিনি লিখেছিলেন এক জায়গায়: 'আমার কাজ যদি ভালো করে বুঝতে চায় কেউ তাহলে সে যেন অঙ্কের জ্ঞান ছাড়া বুঝতে চেষ্টা না করে'। ইউরোপের মধ্যযুগে গণিত আর অঙ্কন-শিল্প ছিল একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। অনেকটা প্রাচীন গ্রিকদের মতো, যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে গণিত আর দর্শন প্রায় সমার্থক শব্দ।

যেহেতু ব্রুনেলিসির ছবিতে শূন্যের উপস্থিতি ছিল প্রায় আক্ষরিকভাবেই, এবং সেই শূন্যই প্রকারান্তরে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিল অনন্ত অসীমতার, প্রধানত সেই কারণেই, এবং আনুষঙ্গিক আরো কিছু কারণে চার্চের মন আস্তে আস্তে নরম হতে লাগল এ দু'টি অ্যারিস্টটল-বিরোধী আইডিয়ার প্রতি। ফলে চার্চ-সংশ্লিষ্ট আরো কিছু গুণীজন সাহস করে এগিয়ে এলেন তাঁদের নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে। ব্রুনেলিসির সমসাময়িক এক চার্চনেতা, কুসা শহরের জনৈক নিকোলাস, আকাশের নক্ষত্রমালার গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করবার পর দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে 'পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়'। এবং সে মর্মে প্রকাশ্য ঘোষণাও দিয়ে ফেললেন। সেসময়কার মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী অত্যন্ত সাহসী, বৈপ্লবিক ও বিপজ্জনক ঘোষণা। কিন্তু এত বড় দুঃসাহসী ঘোষণা প্রচার হবার পরও চার্চের কোনো তাৎক্ষণিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। ব্রুনেলিসির ছবি হয়তো চার্চকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল কিছুদিন। এরপর টেম্পিয়ার নামক আরেক ব্যক্তি বলে বসলেন: 'ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান, যা

ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। সুতরাং তিনি যদি চান তাহলে শূন্যতা থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করতে পারেন (এটিই হলো ইহুদি-খ্রিষ্টান-ইসলাম এই তিন আব্রাহামিক ধর্মের মূল বিশ্বাসের ভিত্তি), চাইলে অ্যারিস্টটলকেও ভুল প্রমাণিত করতে পারেন'। ভীষণ উদ্ধত উক্তি সন্দেহ নেই, কিছুদিন আগে বা কিছুদিন পরে হলেও অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। চার্চ সেটা অগ্রাহ্য করে গেলেন। বিভোর ঘুম, নিঃসন্দেহে।

কুসার নিকোলাস কেবল ভূকেন্দ্রিক মতবাদের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি এ-ও বললেন যে, মহাবিশ্বে শুধু একটি নক্ষত্রমণ্ডল থাকবে কেন, কোটি কোটি, এমনকি অসংখ্য মণ্ডল থাকতেই বা বাধা কোথায় (পদার্থবিজ্ঞানের অত্যাধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আশ্চর্যরকম খাপ খেয়ে যায় এ ধারণা)। আমরা যেমন পৃথিবীতে বসে আকাশের তারাদের উজ্জ্বলতা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, তেমনি অন্যান্য নক্ষত্রের অধিবাসীরাও হয়তো পৃথিবীর উজ্জ্বলতা দেখে একইভাবে মুগ্ধ হচ্ছে। তাহলে পৃথিবী কেন সবার থেকে আলাদা আসন পাবে সৃষ্টির মাঝে? পৃথিবী কেন হবে মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু?

অসম্ভব বিপ্লবী কথাবার্তা। পঞ্চাশ বছর পর জন্মগ্রহণ করলে লোকটাকে নির্ঘাত শূলে চড়ানো হতো। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তার গতানুগতিক ক্ষমতার মোহাবিষ্টতায় এমনই বিভোর যে ক্ষুদ্র মানুষেরা তাদের ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে কোথায় কী আবোলতাবোল বকে যাচ্ছে, সেসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।

কুসার নিকোলাসের বলিষ্ঠ ঘোষণা বিস্মৃতির গহ্বরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আরেক নিকোলাস উদয় হলেন ইউরোপের সদ্যজাগ্রত বিজ্ঞানজগতে—নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামক এক পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতিক। তখনকার ইউরোপে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আসন ছিল পোল্যান্ডের। গণিত ও বিজ্ঞানের স্নায়ু-কেন্দ্র ছিল পোল্যান্ডের বিখ্যাত ক্র্যাকো বিশ্ববিদ্যালয়। কোপার্নিকাস তাঁর গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞানলাভ করেন প্রধানত সেখানেই।

তাঁর পাণ্ডিত্য কেবল গণিত আর জ্যোতির্বিজ্ঞানেই ছিল তা নয়, আইন, চিকিৎসাশাস্ত্র—এসব বিষয়েও ছিল তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি। তিনি কুসার নিকোলাস-প্রবর্তিত ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব দ্বারা—আমাদের সৌরমণ্ডলে সূর্যই একমাত্র নক্ষত্র যা তার নিজের অবস্থানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, এবং পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ তার চারপাশে নিজ নিজ বৃত্তপথে প্রদক্ষিণ করছে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে। তাঁর এই দুঃসাহসী তত্ত্বটি এককথায় সম্পূর্ণ উৎখাত করে দেয় টলেমি, পিথাগোরাস আর অ্যারিস্টটলের বহুদিনের সযত্নে লালিত ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বকে। যে বছর তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব-সংবলিত গ্রন্থ (১৫৪৩) প্রকাশ লাভ করে ঠিক সে বছরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ভাগ্যবান লোক। নইলে কপালে অনেক দুঃখ ছিল।

প্রায় একই সময় আরো দু-চারটে অলক্ষুনে ঘটনা ঘটে ইউরোপে যাতে রোমের ধর্মীয় সিংহাসন একটু কেঁপে উঠতে শুরু করে। প্রথম বড় ধাক্কাটা আসে তাদের নিজেদেরই এক পাদ্রির কাছ থেকে—মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) নামক এক ‘কুলাঙ্গার’। জার্মানির আইলবোনে তাঁর জন্ম, ১৫০৭ সালে অগাস্টানিয়ান মনাস্টারি থেকে তাঁর সন্ন্যাসত্ব প্রাপ্তি, এবং তার বছর পাঁচেক পর উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের ফলে বাইবেল-বিষয়ক শাস্ত্রাদিতে অধ্যাপনার পদে নিযুক্তি।

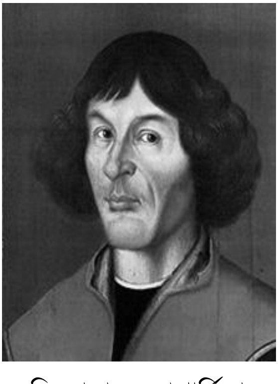

নিকোলাস কোপার্নিকাস

ইস্টিশন ইবুক

অধ্যাপনা-জীবনের প্রথম চারবছর তাঁর কেটেছিল বহু অন্তর্দ্বন্দ্ব আর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে, চরম মানসিক বিবর্তন ও মৌলিক সংশয়-চিন্তায়। তাঁর মন বুঝতে চেষ্টা করে বিশ্বজগতে ঈশ্বরের যথার্থ প্রকৃতি কী, কিই বা চার্চের ভূমিকা, কেন মানুষের জীবন এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা চার্চের সীমাহীন বিধিনিষেধের বেড়াজালে, সেসব প্রশ্নও। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা আর ক্যাথলিক চার্চের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির যোজন যোজন দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছিল ক্রমেই। সাথে সাথে আরো একটি যন্ত্রণার মধ্যে আজীবন বন্দী ছিলেন তিনি—কোষ্ঠকাঠিন্য। হাসি পাবে জানি, কিন্তু সমস্যাটি এতই গুরুতর ছিল তাঁর বেলায় যে মার্টিন লুথারকে নিয়ে যত বই-পুস্তক লেখা হয়েছে এযাবৎ তার প্রায় প্রতিটিতেই এই সমস্যাটির উল্লেখ আছে। এমনও দাবি করেন কোনো কোনো লেখক যে লুথারের বড় বড় আইডিয়াগুলো শৌচাগারের নির্জনতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার সময়ই মাথায় উদয় হয়। যা-ই হোক, তিনি তাঁর সংশয়ী মনের নানা প্রশ্নকে কিছুতেই নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারেননি। ১৫১৭ সালে উইটেনবার্গের চার্চে একদিন প্রকাশ্যে রোমের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ একে একে লিপিবদ্ধ করে প্রচার করে দিলেন।

অর্থাৎ চার্চের কৃষ্ণ-বেড়াল তখন থলের অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে বহিরাঙ্গনে আবির্ভূত। সে ধাক্কার জের সামলাতে না সামলাতেই ইংল্যান্ডে লেগে গেল আরেক ফ্যাঁকড়া—বিয়েপাগলা রাজা অষ্টম হেনরি ১৫৩০ সালে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেই একটি আলাদা ধর্ম সৃষ্টি করে ফেললেন, এবং সে ধর্মের প্রধান নিযুক্ত করলেন নিজেকেই। এর নাম হলো চার্চ অব ইংল্যান্ড। পরপর দুটি বড় বড় 'ধর্মবিরোধী' ঘটনা ঘটে যাওয়াতে চার্চকে এবার নড়েচড়ে বসতে হলো। আর চুপ করে থাকা যায় না।

বলতে গেলে চার্চের শক্তহস্ত দমননীতি শুরু হয়ে গেল ১৫৪৩-এর অব্যবহিত পরই। কোপার্নিকাস মরে গিয়ে বেঁচে গেলেন। বাঁচেননি বেচারা জিয়োর্দিনো ব্রুনো।

চার্চের রোষবহ্নি

ব্রুনো ছিলেন ডমিনিকান মতবাদী (১২১৫ সালে সেন্ট ডমিনিক প্রতিষ্ঠিত একটি ক্যাথলিক ধর্মগোষ্ঠী) ধর্মযাজক। পেশা ও বিশ্বাসে ধর্মগতপ্রাণ হলেও বুদ্ধি ও চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, জ্ঞানপিপাসু মানুষ, যাঁর নৈতিক আনুগত্য গির্জার প্রতি থাকলেও বৌদ্ধিক আনুগত্য ছিল যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি। ষোড়শ শতাব্দীর আশির দশকে তিনি On the Infinite Universe and Worlds নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নাম থেকেই বোঝা যায়, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে লোকটার চিন্তাভাবনা কতখানি প্রগতিশীল ছিল, এবং কত দুঃসাহসী। একে তো তিনি বিশ্বজগৎকে infinite, অর্থাৎ সীমাহীন বলছেন, যা প্রচলিত অ্যারিস্টটলিয়ান মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তার ওপর বলছেন worlds-একটাদুটো নয়, অসংখ্য পৃথিবী। তার অর্থ আমাদের এই অতিপরিচিত বিশ্বস্ত পৃথিবীটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু তো নয়ই, আমাদেরটির মতো আরো বহু বিশ্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সারা মহাকাশব্যাপী, হয়তোবা অগণিত সংখ্যায়।

আরো একটি মারাত্মক জিনিস ছিল গ্রন্থটিতে—কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের সঙ্গে একমত পোষণ করা। এটা ছোটখাটো বেয়াদবি নয়, রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

ব্রুনো ভালো করেই জানতেন, ১৫৪৩-এর পর থেকে কতটা কড়াকড়ি হতে শুরু করেছেন ইঙ্কুইজিশনের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে ইতালিতে, যেখানে চার্চের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর পরপরই তাঁর বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, এবং সে বই থেকে সংগৃহীত কোনো তথ্য বা তত্ত্ব ব্যবহার করাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। ভালো করেই জানতেন তিনি ইঙ্কুইজিশনের ভয়ংকর জল্লাদ-বাহিনী কতখানি তৎপর হয়ে উঠেছে তাঁর মতো "আইন ভঙ্গকারী"দের নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে। কিন্তু লোকটার বুকে ছিল ভয়ানক সাহস, ছিল প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। যা তিনি সত্য বলে জানতেন, প্রাণের ভয়ে তাকে চেপে রাখার কোনো যুক্তি তিনি মানতে

রাজি ছিলেন না। চার্চের তরফ থেকে এক বিচারের প্রহসনে ব্রুনোকে অগ্নিদগ্ধ করে মারার রায় দেওয়া হয়। আগুনে পোড়ানোর আগ পর্যন্ত চার্চ থেকে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল যেন তিনি কোপার্নিকাসের ভুল মতবাদ পরিত্যাগ করে বাইবেলের বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক' মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অবিচল ব্রুনো ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বরং বিচারকের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় ব্রুনো বলেছিলেন[3], 'বিচারপতি, মনে হচ্ছে আমার চেয়ে আপনিই অধিকতর ভীত হয়ে এই বিচারের রায় উচ্চারণ করছেন'। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে এই অসমসাহসী বীর বিদ্রোহীকে সত্য ও যুক্তির সপক্ষে নিরাপস অবস্থান রাখার অপরাধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

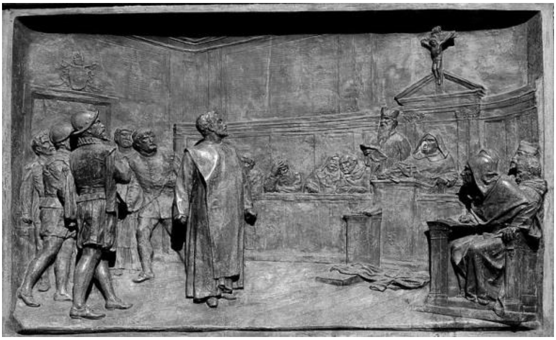

'বিচারপতি, মনে হচ্ছে আমার চেয়ে আপনিই অধিকতর ভীত হয়ে
এই বিচারের রায় উচ্চারণ করছেন'

ব্রুনোর এই ভয়াবহ পরিণতির খবর পেয়ে তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি এমন ঘাবড়ে গেলেন যে কোপার্নিকাস তত্ত্বের নির্ভুলতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যে সেটা প্রচার করায় বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কী মতামত সেটা কারোরই অজানা ছিল না। চার্চের রোষবহ্নি

3 'Perhaps you, my judges, pronounce this sentence upon me with greater fear than I receive it.' – Giordano Bruno (1548 – February 17 1600)

থেকে ছাড়া পাওয়া তাঁর সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত। একদিন কার্ডিনাল বেলার্মিন নিজে তাঁকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দিলেন যাতে এসব বাজে মতামত প্রকাশ করা বন্ধ করেন। মনে মনে যা-ই ভাবুন বাইরে যেন কাকপক্ষী কেউ টের না পায় গ্যালিলিও কী ভাবছেন। তাহলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

গ্যালিলিও গ্যালিলি

কার্ডিনাল ম্যাটিও বার্বেলিনি ছিলেন একজন অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পাদ্রি। এবং গ্যালিলির দারুণ ভক্ত ও ব্যক্তিগত বন্ধু। সৌভাগ্যবশত কার্ডিনাল বার্বেলিনি অষ্টম আর্বান নাম ধারণ করে পোপ হয়ে এলেন রোমে। বন্ধুর পোপ নিযুক্ত হওয়া দেখে গ্যালিলিও একটু ভরসা পেলেন বুকে—হয়তো বিপদ কেটে গেল এবার। সেই ভরসাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলবেন—এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। বই প্রকাশ করতে চার্চের অনুমতি নিতে হতো। ভাবলেন, বন্ধু যেখানে সর্বেসর্বা সেখানে অনুমতি আটকাবে কে। কিন্তু দেখা গেল, চার্চের স্বার্থ যেখানে সেখানে বন্ধুত্বের খুব মূল্য নেই। অনুমতি পেলেন না। তাতে দমে গেলেন খানিক, কিন্তু একেবারে নিরুৎসাহ হলেন না। ঠিক আছে, রোমে হলো না, অন্যত্র হবে। শেষ পর্যন্ত ফ্লোরেন্সের চার্চ থেকে প্রকাশের অনুমতি পাওয়া গেল,

১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। বই বেরোল দীর্ঘ শিরোনামে – 'টলেমীয় এবং কোপার্নিকান – দুটি প্রধান বিশ্বজগৎ-সম্পর্কিত কথোপকথন'। সাথে সাথে বেজে উঠল বিপদের শিঙা।

ফ্লোরেন্সের সাধারণ চার্চ তাঁকে প্রকাশের অনুমতি দিলেও ইঙ্কুইজিশনের পাদ্রিদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল তাঁর গ্রন্থটি। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে, বই বেরিয়ে গেছে, কিছু করা যাবে না, কিন্তু খবরদার, বইটা যেন প্রচার না হয় কোনোভাবে, যেন কোনো ক্রেতার হাতে না পড়ে, কোনো বাইরের লোকের চোখ না পড়ে তাতে। ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল না কিন্তু। এবার এল স্বয়ং রোমের ইঙ্কুইজেশন। তাঁরা সমন পাঠালেন গ্যালিলিকে চার্চের আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য। ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুন তিনি আসামির কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে কঠিন জেরার সম্মুখীন হলেন। চার্চের বিচারে সাব্যস্ত হলো যে তাঁর গুরুতর অপরাধের সুযোগ্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তবে সেটা মকুব করে গৃহবন্দিত্বের সাজায় নামানো যেতে পারে যদি তিনি নতজানু হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন চার্চের বিচারকবৃন্দের কাছে, এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে এসব বেআইনি কথাবার্তা জীবনে আর কখনো উচ্চারণ করবেন না। প্রাণের দায়ে ঠিক তা-ই করলেন গ্যালিলিও। সেই যে বন্দী হয়ে থাকলেন ১৬৩৩ সাল থেকে, সেই বন্দিদশাতেই ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুবরণ করেন এই মহাপুরুষ নয় বছর পর।

জিয়োর্দিনো ব্রুনো আর গ্যালিলিও গ্যালিলির করুণ কাহিনি সেকালের খ্রিষ্টধর্মের করুণা ও ক্ষমার আদর্শের চেয়ে বরং মধ্যযুগের পৈশাচিক রূপটাই বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছিল। দুঃখের বিষয় যে কোনো কোনো ধর্মের সেই পৈশাচিক রূপ আজকের অত্যাধুনিক যান্ত্রিক যুগেও নির্মূল হয়ে যায়নি।

সৌভাগ্যবশত যা সত্য ও শাশ্বত, যা স্বচ্ছ, সুন্দর ও পবিত্র তাকে অগ্নি, অস্ত্র আর বাহুবল, কোনোকিছু দিয়েই দমিয়ে রাখা যায় না বেশি দিন। শত আবর্জনার স্তূপ থেকেও বুনোফুল একসময় বের হয়ে আসে সূর্যের পিপাসায়। আলোর পুণ্যধারাতে অবগাহনই প্রাণের প্রকৃতি। ইঙ্কুইজিশনের শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কোপার্নিকাসের

সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ইউরোপের বুদ্ধি-জগতে সাড়া সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, শতদলে প্রস্ফুটিত হয়ে নানা বর্ণে নানা পত্রপুষ্পে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

আইজ্যাক নিউটন

মধ্যযুগের ইতালিতে ধর্মের কৃপাণ যখন বিজ্ঞান আর গণিতের মুণ্ডচ্ছেদের যজ্ঞানুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত, ইউরোপের অন্যত্র তখন রেনেসাঁর অগ্নিশিখা অনির্বাণ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। পোল্যান্ডের কোপার্নিকাস যে আলোর বর্তিকা নিয়ে এলেন ইউরোপে, সেই আলোর পুণ্যধারাতে সিক্ত হয়ে জার্মানির ইওহান কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) বেরিয়ে এলেন তার চেয়েও গূঢ়তর বাণী নিয়ে। কোপার্নিকাস শুধু বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে বৃত্তাকার পথে, কেপলার তাঁর দুরবিন দিয়ে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন: না, ঠিক বৃত্ত নয়, উপবৃত্ত (ellipse)। তিনি আরো বললেন যে, সূর্য থেকে পৃথিবী বা অন্য যেকোনো গ্রহ পর্যন্ত যদি একটি সরলরেখা কল্পনা করা যায় তাহলে সেই রেখাটি একই বেগে পরিক্রমণ করবে একই সমতল ক্ষেত্র। অর্থাৎ এই প্রদক্ষিণের আঞ্চলিক গতিবেগের কোনো পরিবর্তন নেই। কেপলারের তৃতীয় একটি সূত্র আছে যা বছরের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে এই আঞ্চলিক গতির

একটা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। এই তিনটি সূত্রই আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায় প্রকৃত পর্যবেক্ষণের সাথে।

মজার ব্যাপার যে, সে সময় আইজ্যাক নিউটনের যুগান্তকারী অভিকর্ষ তত্ত্ব কারো জানা না থাকলেও কেপলারের তত্ত্ব থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব যে পৃথিবী ও সূর্যের ভেতরে একটা আকর্ষণের ব্যাপার আছে এবং সেটা বিপরীত দূরত্ববর্গের সূত্র পালন করে। কিন্তু এই আকর্ষণটি যে একটি সর্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং তা শুধু সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুড়েই তার বিস্তার, সেই বিপুল অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন স্যার আইজ্যাক নিউটন। এবং সেই অসামান্য দূরদর্শী পদক্ষেপটি তিনি নিয়েছিলেন কোনো দুরবিন বা অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে নয়, গণিতের সাহায্যে। এবং সে গণিত ছিল তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত গণিত। প্রচলিত গল্প অনুযায়ী বাগানে আপেল পতনের দৃশ্য থেকেই সেই দিব্যজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মনে যে আপেলটি ওপরে না গিয়ে নিচে নেমেছে, তার কারণ বিশ্বপৃষ্ঠ তাকে টেনে নিয়েছে বিপরীত দূরত্ববর্গের নিয়ম অনুসারে। সব গল্প সব সময় সত্য হয় না, এ গল্পও হয়তো কেবল গল্পই। তবে এটা সত্য যে পৃথিবীর বড় বড় আবিষ্কারগুলোর বেশির ভাগেরই প্রায় একই ইতিহাস—হঠাৎ, দৈববাণীর মতো উদয় হয় সাধকের মনে—হয়তো বাগানে, গোসল করতে গিয়ে, কিংবা খেলার মাঠে। এমনকি টয়লেটে বসেও মহান দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন অনেকে, যেমন মার্টিন লুথার। আইজ্যাক নিউটন এই একটি কাজ ছাড়া আর কোনো বড় কাজ যদি না-ও করতেন তাহলেও তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ছিল তাঁর অসংখ্য যুগান্তকারী সৃষ্টির অন্যতম মাত্র। গণিত-জগতে তিনি বিশেষভাবে খ্যাত ক্যালকুলাসের আবিষ্কারক হিসেবে, যদিও ওটা নিয়ে খানিক বিতর্ক আছে। সত্যি সত্যি নিউটন এর প্রথম আবিষ্কারক, না জার্মানির গটফ্রিড উইলেম লিবনিজ (১৬৪৬-১৭১৬), সে নিয়ে এক বিরাট ঝগড়া ব্রিটেন আর বাদবাকি ইউরোপের মধ্যে। ব্রিটেন বলে নিউটন, ইউরোপ বলে লিবনিজ। এই বিতর্ক বিংশ

শতাব্দী পর্যন্ত দুই দলকে বিভক্ত করে রেখেছে, যার পরিণতি ইউরোপের চাইতে ব্রিটেনের জন্যই হয়েছে বেশি ক্ষতিকর। সৌভাগ্যবশত উভয়পক্ষেরই এখন মাথা ঠান্ডা হয়েছে খানিক, ফলে দুই দেশেই গণিত-সাধনায় এসেছে নবজীবনের প্রাণোচ্ছ্বাস।

গ্যালিলিওর বিচার

১৬৩৩ সাল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে – বাইবেলবিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে চার্চ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করল 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাঁটু ভেঙে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক —পৃথিবী স্থির অনড়—সৌরজগতের কেন্দ্রে[4]। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তা-ই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মুখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞানসাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল[5]:

> আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বছর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হয়ে এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ

[4] পবিত্র বাইবেলে আছে,
'আর জগৎও অটল—তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
'জগৎও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)
'তিনি পৃথিবীকে অনড় ও অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)
'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।

[5] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬

ধর্মযাজকদের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রিষ্টীয় সাধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হয়ে স্বহস্তে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হয়েছে ও যা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে, আমি তা সব সময় বিশ্বাস করে এসেছি, এখনো করি এবং ঈশ্বরের সহায়তা পেলে ভবিষ্যতেও করব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কিরূপ শাস্ত্রবিরোধী সেসব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোনো সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি; এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রিষ্টধর্মবিরূদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। ... অতএব সংগত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তঃকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। ...আমি শপথ করে বলছি যে, আমার ওপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে,এরূপ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর

কখনো কিছু বলব না বা লিখব না। এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও ওপর ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের নিকট আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে,এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার ওপর যেসব প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যেকোনো একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথ ভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব, ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি, এঁরা আমার সহায় হোন। আমি ওপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপর্যুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্রুত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্ত-লিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের নিকট সমর্পণ করছি। (২২ জুন, ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট)।

শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন- ‘তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে’। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরীণ অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরীন করে নির্যাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারল ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরও কি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

কথিত আছে যে নিউটনের পর্বতপ্রমাণ কর্মকাণ্ড—গণিত, পদার্থবিজ্ঞানের একাধিক শাখা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তার অধিকাংশ কাজই তিনি করেছিলেন ১৬৬৫ আর ১৬৬৭, এই দুটি বছরের মধ্যে, যখন ব্রিটেনব্যাপী এক ভয়াবহ মহামারির কারণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দু'বছর বন্ধ থাকাকালে তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিরিবিলি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স তেইশ থেকে পঁচিশ! এই দুই বছরের ভেতর তিনি ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছিলেন, অভিকর্ষ তত্ত্ব, শক্তিশালী দুরবীন ও আলোকরশ্মিবিষয়ক আরো অনেক মৌলিক তথ্য, বলবিদ্যার মৌলিক সূত্রাবলি (বস্তুর ভর ও ত্বরণের গুণফল যে গতির চালিকা শক্তির সঙ্গে আনুপাতিকভাবে সম্পর্কিত, এ তথ্যটি তাঁর গতিতত্ত্বের তিন সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র নামে খ্যাত), সবই সেই দুটি অবিশ্বাস্য বছরের ফসল। নিউটন সম্বন্ধে আইনস্টাইনসহ অনেক বড় বড় মনীষী এমন মন্তব্য করেছেন যে তিনি প্রকৃতির আজ্ঞাবহ ছিলেন না, বরং উল্টোটাই সত্য ছিল তাঁর বেলায়। প্রকৃতি যেন নিউটনের কাছে এসে তার সব রহস্য উজাড় করে দিয়েছিল। প্রকৃতি ছিল তাঁর পোষা জীব। এজন্যই ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি মানুষই নিউটনের অনন্যসাধারণ প্রতিভায় ছিলেন বিস্মিত, অবিশ্বাসের ঘোরে আচ্ছন্ন। নিউটন সাধারণ রক্তমাংসে গড়া মানুষ ছিলেন না।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, নিউটনের কাজের সঙ্গে শূন্যের সম্পর্ক কোথায়? সম্পর্ক আছে। কতটা আছে সেটা হয়তো নিউটন নিজেও অতটা বুঝতে পারেননি সে সময়, কারণ তাঁর ক্যালকুলাসের ভেতরেই যে সূক্ষ্মভাবে লুকিয়ে ছিল শূন্য, সেটা পরিষ্কার হতে আরো অনেক দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিজ্ঞানজগৎকে। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব আমরা। এখানে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে সম্পর্কটি দার্শনিক না হলেও বৈজ্ঞানিক তো অবশ্যই। দুটি বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ, সেটা কেন্দ্রিক, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় central force, সেই 'কেন্দ্র' শব্দটিতেই আছে 'শূন্যে'র আভাস। কেন্দ্র একটি বিন্দু যার কোনো মাত্রা নেই, যা সাংখ্য-গাণিতিক 'শূন্যের'ই জ্যামিতিক রূপায়ণ। সেই বিন্দু ইউক্লিডের কাজে

ছিল, গ্রিসের 'শূন্য'বিদ্বেষী পণ্ডিতদের কাজেও ছিল প্রচ্ছন্নভাবে, কিন্তু তাঁরা তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি তাঁদের দর্শনের সঙ্গে সংঘাত ঘটার কারণে। নিউটনের দর্শনে অবশ্য সমস্যাটি ছিল না। তিনি ধার্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু শূন্য আছে কি নেই সে প্রশ্ন তাঁর বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেনি।

দর্শন কি অঙ্ক বোঝে?

নিউটনের জন্ম যে বছর, সে বছর ইউরোপের আরেক যুগস্রষ্টা পুরুষ, ফ্রান্সের রেনে ডেকার্ট ৪৬ বছর বয়সে পা দিলেন। তাঁর দর্শন ও গণিতের ভক্ত তখন সারা ইউরোপ জুড়ে। আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের জনক বলে ভাবা হয় তাঁকে। দর্শনের ব্যাকরণ ও রচনাপ্রণালি তাঁরই হাতে গড়া। কিন্তু তাঁর অমরত্ব যদি দর্শনশাস্ত্রে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত না-ও হয়ে থাকে, তাঁর গণিতের কাজ তাঁকে চিরঞ্জীব করে রাখবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গণিতের প্রাচীন দুটি শাখা— জ্যামিতি ও বীজগণিত এ দুটিকে একসাথে যুক্ত করে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এর নাম Coordinate Geometry; বাংলা অভিধান অনুযায়ী বৈশ্লেষিক জ্যামিতি। জ্যামিতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় আদিযুগ থেকে, সেই মিশরীয় সভ্যতার সময়ই জ্যামিতির জন্ম। কিন্তু বীজগণিতের প্রথম অঙ্কুর সম্ভবত গজায় ভারতবর্ষে, তারপর তা পূর্ণতা পায় আরবের আল-খোয়ারিজমির হাতে। সেটা ঘটে মধ্যযুগের প্রাক্কালে। তখন কারো পরিষ্কার ধারণা ছিল না যে দুটি আপাত-বিচ্ছিন্ন শাখার মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক থাকতে পারে। জ্যামিতির প্রধান বাহক হলো ছবি, রেখাচিত্র (figures), আর বীজগণিতের ভাষা হলো সংখ্যা -১ ,২, ৩, ..., $a, b, c, \ldots\ldots$ইত্যাদি। একটা ত্রিভুজের সঙ্গে এগুলোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? ডেকার্ট দেখিয়ে দিলেন যে গণিতের সংখ্যা দিয়েই ত্রিভুজ করা যায়, আঁকবার দরকার হয় না। দুটিকে এভাবে জোড়া লাগিয়ে নতুন একটা শাখা তৈরি করাতে মৌলিক যে জিনিসটা ব্যবহার করতে হয়েছিল তাঁকে সেটা হলো 'শূন্য'। ধরুন একটা দ্বিমাত্রিক সমতল। সেখানে একটা বিন্দু স্থাপন করা দরকার যেখান থেকে দূরত্ব গণনা করা হবে সরাসরি ডানে, বামে বা সরাসরি ঊর্ধ্বে, নিচে,

অর্থাৎ আনুভূমিক (horizontal), অথবা উল্লম্ব (vertical) রেখা। সেই বিন্দুটিকে বলা হয় মূল (origin), এবং তা প্রকাশ করা হয় এভাবে: (0,0) । ত্রিমাত্রিক ঘনক্ষেত্রে তা হবে (0,0,0) । যতই মাত্রা বাড়বে ততই বাড়বে শূন্যের সংখ্যা। এভাবে 'শূন্য' তাঁর নতুন গণিতে অপরিহার্যভাবেই প্রবেশাধিকার অর্জন করে নিল। উদাহরণস্বরূপ (২,৪) এমন একটি বিন্দু যার দূরত্ব মূল থেকে দুই একাঙ্ক (unit) ডান দিকে, আর চার একাঙ্ক লম্বতে, সে একাঙ্ক একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে (ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ইত্যাদি)। ডেকার্টের নতুন তত্ত্ব অনুযায়ী একটা সরলরেখাকে বর্ণনা করা যায় এভাবে:

$$ax + by = c,$$

যেখানে a, b, c হলো তিনটি পূর্বনির্ধারিত সংখ্যা যার কোনো পরিবর্তন হয় না রেখাটির একবিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে। এগুলোকে বলা হয় প্যারামিটার, বা নির্দিষ্ট সংখ্যা। কিন্তু x ও y দুটোই চলমান সংখ্যা, একেক বিন্দুতে তাদের একেক মান। এমন করে শুধু সরলরেখা কেন পুরো একটা ত্রিভুজ, একটা চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ইত্যাদি সব রকম জ্যামিতিক আকারকেই বীজগণিতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ইউক্লিডের সমস্ত উপপাদ্য, সম্পাদ্য ইত্যাদিও প্রমাণ করা সম্ভব কেবল বীজগণিতের ব্যবহার দ্বারা। ডেকার্টের এই অভিনব আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। বর্তমান যুগের সেরা গবেষকদের অন্যতম বড় আকর্ষণীয় বিষয়, Algebraic Geometry,তার পূর্বসূরি হিসেবে ডেকার্ট সাহেবকে চিহ্নিত করা হয়তো অন্যায় হবে না।

অথচ মানুষের বুদ্ধির জগৎ আর বিশ্বাসের জগতে যে কতটা সংঘাত ঘটতে পারে ডেকার্টের জীবনই তার উজ্জ্বল উদাহরণ। 'শূন্য' সংখ্যাটি এক হিসেবে তাঁর নবসৃষ্ট গণিতের মূল স্তম্ভ, কিন্তু তা সত্ত্বেও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'শূন্যের' আইডিয়াকে পুরোপুরি গ্রহণ করাটাও ছিল তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন গোঁড়া জেসুটপন্থী ক্যাথলিক। জেসুট স্কুল থেকেই তাঁর ছোটবেলার শিক্ষাদীক্ষা। সমগ্র

ইউরোপ মহাদেশব্যাপী যখন প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের ঝড় উঠেছে, ঠিক তখনই তিনি ঘোর ক্যাথলিক বিশ্বাসী ধার্মিক পুরুষ। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের ভক্ত, ছিলেন শূন্য-বিরোধী, ছিলেন সরলগতি-বিরোধী। অথচ তাঁর গণিতই শূন্যনির্ভর। এ এক মহা যন্ত্রণা। একদিকে তাঁর বুদ্ধির পূর্ণ সমর্থন কোপার্নিকাস তত্ত্বের প্রতি, আরেক দিকে অ্যারিস্টটলের ভূকেন্দ্রিক বিশ্বকেও তিনি বর্জন করতে পারছিলেন না। বিজ্ঞান আর ধর্ম পরস্পরবিরোধী নয়, এই মতবাদ যারা আঁকড়ে থাকতে চান, তারা সম্ভবত ডেকার্টের জীবনকাহিনির সঙ্গে পরিচিত নন।

'শূন্য' ও তার বিপরীত 'অসীম'কে নিয়ে ডেকার্টের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান তিনি নিজেই করেছিলেন। প্রাচীন দার্শনিকদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যার অস্তিত্ব নেই তার ভেতর থেকে হঠাৎ করে কিছু বের হয়ে আসতে পারে না (nothing can come out of nothing), যা আসলে রোমান কবি ও দার্শনিক লুক্রেসিয়াস (৯৯-৫৫ খ্রি.পূ.) বলে গিয়েছিলেন অনেক আগেই (আমাদের এ গ্রন্থের শেষের দিকে দেখব যে এ দৃষ্টিভঙ্গিটির আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানে)। এমনকি জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য বলে ভাবতেন ডেকার্ট, অর্থাৎ নতুন জ্ঞান বলতে কিছু নেই, বা নতুন চিন্তা, নতুন ধারণা। বাহ্যত নতুন মনে হলেও এসব কোনোকিছুই নতুন নয়। সেগুলো কোনো সর্বজ্ঞ সত্তার কাছ থেকে একপ্রকার সূক্ষ্ম দৈবসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিভাস মাত্র। সেই সর্বজ্ঞানের জ্ঞানী সত্তা, সেই সর্বজ্ঞ অধীশ্বরের অস্তিত্ব যিনি ধারণ করেন তিনিই ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা। তিনি অসীম, একমাত্র অসীম। বাদবাকি সব সীমার মধ্যে আবদ্ধ—মানুষ, প্রকৃতি, বিশ্বজগৎ, জ্ঞান, সাধনা, প্রেম-ভালোবাসা। গোটা সৃষ্টি দুটি বিপরীত মেরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—একদিকে অসীম অর্থাৎ ভগবান। আরেক প্রান্তে শূন্য, অর্থাৎ যা অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ে গণিতের বিমূর্ত জগতে বিরাজমান। তার অর্থ, অ্যারিস্টটল যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন শূন্য আর অসীমকে অস্বীকার করে, ডেকার্ট সেই একই ঈশ্বরকে প্রমাণ করার প্রয়াস পেলেন দুটিকে স্বীকার করেই।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতির শূন্যবিদ্বেষ?

‘উন্মুক্ত আকাশ বসে আছে দেয়ালে হেলান দিয়ে।
যেন প্রার্থনায় মগ্ন এক মহাশূন্যতায়।
আর এই মহাশূন্যতায় কে যেন
আমাদের চোখে চোখ রেখে বলে যায়,
আমি শূন্য নই, আমি উন্মুক্ত’।
—**টমাস ট্রান্সট্রোমার**, আমি শূন্য নই, আমি উন্মুক্ত[6]

ঠিক আছে, ‘শূন্যের’ একটা ঠিকানা হয়ে গেল অবশেষে; বাস্তবে না হলেও গণিতের পৃষ্ঠায়, চিন্তায়, দর্শনেও হয়তো বা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তখনো। সত্যি সত্যি কি শূন্য বলে কিছু আছে প্রকৃতিতে? অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব অনুযায়ী: শূন্য অস্তিত্বহীন। শূন্যাবস্থাকে ঘোর অপছন্দ করে প্রকৃতি (nature abhors a vacuum)। তার অর্থ জড়জগতে ফাঁকা জায়গা নেই কোনোখানে। ফাঁকার উপক্রম হওয়ামাত্র প্রকৃতি তাকে ভরাট করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যাবে।

সত্যি কি তাই? এটা কি কেবলই বিশ্বাস, না, বৈজ্ঞানিক তথ্য?

গ্যালিলিওর জীবনকালে ইতালির একদল শ্রমিক একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন তাঁর কাছে। কুয়ো থেকে নল আর পিস্টনের সাহায্যে, বা খাল থেকে, পানি তোলার সময় দেখা যায় যে নলের ওপর দিকটায় খালি জায়গা থাকা সত্ত্বেও পানি বড়জোর

[6] টমাস ট্রান্সট্রোমারের পঙক্তিমালার অনুবাদ করেছেন আজীজ রহমান

৩৩ ফুট পর্যন্ত ওঠে, তার ওপরে কিছুতেই তোলা যায় না, হাজার পরিশ্রম করেও না। তার কারণটা কী?

গ্যালিলিও ছিলেন মূলত গণিতের লোক, ল্যাবরেটরির কাজ সাধারণত করতেন টরিসেলি (ইতালীয় উচ্চারণ টরিচেলি) নামক তাঁর সুযোগ্য সেক্রেটারি। ১৬৪৩ সালে, অর্থাৎ গ্যালিলিওর মৃত্যুর বছর খানেক পর, এই রহস্যের সমাধান খোঁজার চেষ্টায় টরিসেলি একটা লম্বা টিউব জোগাড় করে সেটাকে পারদ দিয়ে ভরে ফেললেন একেবারে কানায় কানায়। তারপর টিউবটিকে উপুড় করে ডোবালেন এক পারদভর্তি পাত্রের ভেতর, যাতে একফোঁটা পারদও বের না হয়ে আসে নল থেকে। তিনি ভাবলেন, যেহেতু নলটি টায়ে টায়ে ভরা, এক কণা বায়ু বেরোবার বা ঢুকবার কোনো পথ নেই, সেহেতু উপুড় অবস্থাতেও ঠিক একই রকম ভরাট অবস্থায় থাকবে নলটি। কিন্তু পরম বিস্ময়ে তিনি দেখলেন, বারবার পরীক্ষা করার পরও, পারার ওপরের দাগটি নল বেয়ে ৩০ ইঞ্চি (৭৬ সেমি) পর্যন্ত উঠছে, তার ওপরে যেতে চাচ্ছে না, বা যেতে পারছে না। তার অর্থ, যেখানে খালি থাকার কথা নয়, সেখানেও খালি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। তাহলে সেই ৩০ ইঞ্চির ওপরের জায়গাটুকু কী? কিছুই না। বাতাস ঢুকবার তো কোনো উপায়ই ছিল না, সুতরাং সেটা নিশ্চয়ই শূন্যতায় ভরা, অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম! এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ না করলেও অপছন্দের একটা সীমা আছে, ঐ ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত, পারাভর্তি নলে, আর ৩৩ ফুট (১০ মিটার) পর্যন্ত পানির টিউবে।

টরিসেলির ভ্যাকুয়াম

কিন্তু বিজ্ঞানের ধর্মই এমন যে এক সমস্যার সমাধান সাধারণত নতুন সমস্যার বীজ বুনে দেয়। ডেকার্টের চেয়ে ২৭ বছরের ছোট ছিলেন ব্লেই প্যাস্কেল (১৬২৩-৬২) নামক এক তীক্ষ্ণধী ফরাসি বিজ্ঞানী-গাণিতিক। তিনি প্রশ্ন দাঁড় করালেন: ঠিক আছে, বুঝলাম, পানি ওঠে ৩৩ ফুট, আর পারা ওঠে ৩০ ইঞ্চি, কিন্তু কেন? বিষয়টা কী? কী এক খেয়ালের বশে, এক সহকর্মীকে যন্ত্রপাতিসহ পাঠিয়ে দিলেন এক উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে ঠিক একই পরীক্ষা করে দেখা গেল, নলের পারদ ৩০ ইঞ্চিও উঠছে না, তার আরো নিচে উঠেই যেন দম হারিয়ে ফেলছে। প্যাস্কেল ভাবলেন, পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যটা কী?

ব্লেই প্যাস্কেল

কম বায়ুচাপ, সমতলের তুলনায়। তাহলে রহস্যটা নিশ্চয়ই আর কিছুতে নয়, বায়ুচাপে। পাহাড়ে বায়ুর তেমন শক্তি নেই বেশি ওপরে ঠেলার, কিন্তু নিচে চাপ একটু বেশি হওয়াতে পারা বা পানি ঠেলে ওপরে তুলতে অতটা বেগ পেতে হয় না।

যাই হোক, একটা জিনিস তো মীমাংসা হয়ে গেল: প্রকৃতির সেই শূন্যভীতির ব্যাপারটি। অবস্থাবিশেষে প্রকৃতি শূন্যকে প্রশ্রয় দেয় বৈকি। সুতরাং অ্যারিস্টটলের শূন্যতত্ত্ব আর পিথাগোরাসের সরলগতি-বিরোধী তত্ত্ব একেবারেই অমূলক। প্রকৃতি যখন যে অবস্থা সে অবস্থাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। টরিসেলি আর প্যাস্কেলের

পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তটিই যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। শূন্য সত্যি সত্যি আছে পৃথিবীতে। ভ্যাকুয়াম কোনো আজগুবি কথা নয়। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে।

কয়েক শতাব্দী কেটে গেল তারপর। শূন্য আছে এই বিশ্বাসটি বিজ্ঞানমানসে প্রায় স্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে। ভ্যাকুয়াম টিউবের ব্যবহার আধুনিক প্রযুক্তি জগতের সর্বত্র। তাহলে কি প্রকৃতিতে শূন্যের অস্তিত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল? হয়তো বা। আবার হয়তো না। আধুনিক বিজ্ঞানে, বিশেষ করে অণুপরমাণুবিষয়ক পদার্থবিজ্ঞানে, এই শূন্যতাবাদী চিন্তাভাবনা একটু নতুন আলোকে পরীক্ষিত হতে শুরু করেছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন: আপাতদৃষ্টিতে যা শূন্য তা আসলে শূন্য নয়, সেখানেও পদার্থ আছে। ঠিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হয়তো নয়, কিন্তু পদার্থপদবাচ্য অবশ্যই। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়, বরং পরের কোনো অধ্যায়ের জন্য তোলা থাকুক।

ভিন্ন আলোচনায় যাবার আগে ব্লেই প্যাস্কেল সম্বন্ধে দুচারটে মন্তব্য করার লোভ সামলানো যাচ্ছে না। প্যাস্কেলের জন্ম এক প্রচণ্ড রকমের গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারে, অনেকটা ডেকার্টের মতোই। কিন্তু ডেকার্ট পরিবার ছিল জেসুটপন্থী, আর প্যাস্কেলরা ছিল জ্যানসেনবাদী। জ্যানসেনপন্থীরা এতটাই উগ্র মতবাদের ছিলেন যে তাঁরা বিজ্ঞানকে পাপাচার ভাবতেন, বিজ্ঞানসাধনা ছিল শয়তানের অনুগামী হওয়ার শামিল। সৌভাগ্যবশত প্যাস্কেল নিজে ধর্মকর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। বিজ্ঞানচর্চা নিষিদ্ধ জেনেও বেশির ভাগ সময় বিজ্ঞান নিয়েই কাটত তাঁর। প্যাস্কেল ছিলেন এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, এত বড় প্রতিভার মানুষ শতাব্দীতে একজন কি দুজন জন্মায় সারা পৃথিবীতে। কৈশোর আর যৌবনে খানিক উচ্ছৃঙ্খলতা হয়তো ছিল তাঁর চরিত্রে। বিজ্ঞানচর্চা থেকে যেটুকু বিরতি পেতেন, সেটুকু তাঁর কাটত জুয়ার আড্ডায়। ভীষণ জুয়ার নেশা ছিল লোকটার। নিজে যে জুয়া খেলতেন তেমন তা নয়, কিন্তু তাঁর অঙ্কের মাথা দিয়ে পেশাদার জুয়ারিদের পরামর্শ দিতেন কখন কোথায় কত টাকা বাজি রাখলে কত লাভ হতে পারে, কত লোকসান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ

কাজে লেগে যেত। ফলে অত্যন্ত বিত্তশালী জুয়ারিরা টাকার বস্তা নিয়ে তাঁর কাছে ধরনা দিতেন বাজির পরামর্শ নেবার জন্য। এতে প্যাস্কেল নিজে জুয়া না খেলেও প্রচুর ধনসম্পদ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত লাভ। সেটা সাময়িক, অস্থায়ী। চিরস্থায়ী লাভটা হয়েছিল গোটা বিশ্বের।

তাঁর বাজিবিদ্যার সূত্র ধরে কালে কালে একটা নতুন শাখা তৈরি হয়ে যায় গণিতশাস্ত্রের: সম্ভাবনা তত্ত্ব (Probability Theory)। বর্তমান জগতে probability আর statistics-এর ব্যবহার নেই এমন কোনো শাখা বিজ্ঞানে তো নেইই, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি—এধরনের যাবতীয় মূল বিজ্ঞানবহির্ভূত বিষয়েও এর ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে জুয়ার মতো একটি খারাপ নেশা, যার প্রতি ধর্ম এবং সমাজ দুটিরই বিরূপ দৃষ্টি, সেই ঘৃণিত জিনিসটি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই পথভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল যুবক তার আদি জনক (যদিও এই জনকত্বের অংশীদার হিসেবে গেলার্মো কার্ডানো এবং পিয়ের ফার্মার নামও উল্লেখ করা হয়)। আমার (মী.র) ব্যক্তিগত মত: সম্ভাবনাতত্ত্বের আবিষ্কার অনেকটা অভিকর্ষ তত্ত্বের মতোই এক যুগান্তকারী, মৌলিক আবিষ্কার। প্রকৃতির অন্যান্য মৌলিক সত্যের মতো সম্ভাবনাও একটি মৌলিক সত্য, আমার বিচারে।

প্যাস্কেলের গল্প অবশ্য এখানেই শেষ হয়ে যায় না। ১৬৫৪ সালের ২৩ নভেম্বর। তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। পুরাকালের পয়গম্বররা যেমন দৈববাণী বা অহি লাভ করতেন হঠাৎ হঠাৎ, তেমনি প্যাস্কেলেরও এক অতি-প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা হয়ে গেল সেদিন। কোথা থেকে এক ঐশী বাণী এসে তাঁর জীবনের মোড় আগাগোড়া বদলে দিল এক রাতের মাঝে। ধর্মকর্মে পরম উদাসীন মানুষটি হঠাৎ পরম ধার্মিক হয়ে উঠলেন। গণিত, জুয়া, বিজ্ঞান সব ছেড়েছুড়ে সাধু-ব্রত গ্রহণ করলেন পরের দিন থেকে। একেবারে ভিন্ন মানুষ। ৩১ বছর বয়সে প্যাস্কেল ফিরে গেলেন তাঁর পৈতৃক ধর্মচর্চায়।

কিন্তু ঐশী বাণী হলে কী হবে, সহজাত মেধা যাবে কোথায়। কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা যার রক্ত-মজ্জায় তাকে ধর্মের তাবিজ দিয়ে বশ মানানো কি সম্ভব? ধর্ম তাঁর একপ্রকারের অস্থিরতা কমাতে সক্ষম হলেও বুদ্ধির অস্থিরতা অন্যরকমের অশান্তির ঝড় তুলল মনে। চার বছর পর একটা শক্ত অসুখ হলো তাঁর। তখন তিনি জ্ঞাতসারেই প্রভুর কাছে কিছুদিনের জন্য ছুটি কামনা করে জ্ঞানসাধনায় মনোযোগ দিলেন। ঠিক বিজ্ঞান না হলেও বিজ্ঞানসংক্রান্ত, সাথে সাথে ধর্মবিষয়কও। ভাবলেন, তাহলে নিশ্চয়ই মহাপ্রভু ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখবেন তাঁর কর্মকাণ্ডকে। ঠিক করলেন, জুয়ার বাজিতত্ত্ব দিয়েই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। ঈশ্বর বিশ্বাস করাতে কত ঝুঁকি আর না করাতে কত ঝুঁকি তার একটা আনুমানিক সংখ্যা দাঁড় করিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে বিশ্বাস করাটাই কম ঝুঁকিপূর্ণ, না করাতে বিস্তর বিপদের আশঙ্কা। রীতিমতো অঙ্ক কষে বের করা সব ফলাফল, যদিও অঙ্কটা কিভাবে করা হলো, কী ধ্যানধারণার ভিত্তিতে সে বিষয়ে আধুনিক চিন্তাবিদদের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে বৈকি। প্যাস্কেলের যুক্তি ছিল অনেকটা এরকম: ধরুন, খোদা আছে। তাহলে তাঁকে বিশ্বাস করাতে ‘অসীম’ ফায়দা। তিনি যদি না থাকেন তাহলে বিশ্বাস করে লাভ বা লোকসান কোনোটাই নেই, তার অর্থ ‘শূন্য’ ফায়দা। আর যদি খোদা থাকেন এবং তা সত্ত্বেও বিশ্বাস করা হচ্ছে না তাহলে তার শাস্তি গুরুতর, অর্থাৎ ‘অসীম’ বিপদ। তবে তিনি না থাকলে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস তাতে কিছু আসে যায় না। মোটমাট তাঁর হিসাব মতে বিশ্বাস স্থাপন করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, এতে কোনো ঝুঁকি নেই। পাকা ধার্মিকের যুক্তি হয়তো নয় এটা, তবে পাকা জুয়ারির যুক্তি তাতে সন্দেহ নেই। জুয়ারির যুক্তি দিয়ে তিনি একাধারে শূন্য, অসীম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে ফেললেন। অবশ্য সেই যুক্তিতেও বেশ কিছু ফাঁক আছে, সেটা পরবর্তী কালের যুক্তিবাদীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই বইয়ের লেখকদের একজন (অ.রা) এ নিয়ে মুক্তমনায় একটি বিস্তৃত পোস্ট লিখেছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে প্যাস্কেলের বাজির অসারতা নিয়ে। ২০১২ সালের জুন মাসে মুক্তমনায়

প্রকাশিত লেখাটির শিরোনাম ছিল –‘প্যাস্কেলের ওয়েজার—আস্তিক হওয়াটাই কি একমাত্র নিরাপদ বাজি?’[7]।

ব্লেই প্যাস্কেলের বর্ণাঢ্য জীবনের বিচিত্র কাহিনি বিস্তৃতভাবে জানবার আগ্রহ থাকলে পাঠককে তাঁর পূর্ণ জীবনী পড়তে হবে।

জেনোর ধাঁধা ফিরে এল

এবার কিছুক্ষণের জন্য জেনোর ধাঁধাতে ফিরে যাব আমরা। ধাঁধাটির সূত্রপাত কোথায় সে ইঙ্গিত তো আগেই দিয়েছি। সেকালের পণ্ডিতরা বুঝতে পারছিলেন না

$$1, 1/2, 1/4, 1/8, \ldots, 1/2^n, \ldots$$

এই যে অন্তহীন সংখ্যামালা, এগুলো তো যাচ্ছে না কোথাও, এদের কোনো গন্তব্য নেই। শুধু তা-ই নয়, এগুলোকে যোগ করলে দাঁড়ায় আরেক অদ্ভুত জিনিস:

$$1 + 1/2 + 1/2^2 + 1/2^3 + \ldots + 1/2^n + \ldots$$

এরই বা শেষ কোথায়? অন্তহীন সংখ্যার যোগফল তো অন্তহীন হবারই কথা, তাই না?

আমরা যেন ভুলে না যাই যে যুগটা ছিল যিশুখ্রিষ্টের জন্মের দু-চার শ বছর আগে। এবং সমাজটি ছিল এমন যে বড় বড় পণ্ডিতরাও ভাবতেন, ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’ দুটোই অমঙ্গলের সহোদর, দুষ্ট লোকের কল্পনাতেই আশ্রয় পায় তারা, বাস্তবে নয়।

এই দুটি প্রশ্নকেই একটু উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করা যাক। জেনোর ধাঁধাতে ১/২ একটি বিশেষ সংখ্যা। এটি ১/২ না হয়ে ১/৩ বা ১/৫ হতে পারত, কিংবা অন্য যেকোনো ভগ্নাংশ, যার মান ১-এর কম, 0-এর বেশি। সার্বজনীনতার খাতিরে বরং ধরা যাক

$$1, x, x^2, x^3, \ldots, x^n, \ldots,$$

[7] অভিজিৎ রায়, প্যাস্কেলের ওয়েজার—আস্তিক হওয়াটাই কি একমাত্র নিরাপদ বাজি?, মুক্তমনা, জুন ২৮, ২০১২

যেখানে x একটি সাংকেতিক সংখ্যা, যার মান শূন্য থেকে একের মাঝে। 'অসীম' নিয়ে যেহেতু কিঞ্চিৎ সমস্যা আছে আমাদের, সেহেতু n -সংখ্যক সংখ্যা নিয়ে আমরা অসীম পর্যন্ত না গিয়ে

$$1+x+x^2+x^3+.....+x^{(n-1)} \qquad (১)$$

এই সীমিত রাশিটির যোগফল বের করার চেষ্টা করব। ছোটবেলার স্কুলে পড়া বিদ্যা দিয়েই আমরা অনায়াসে বুঝে ফেলতে পারছি যে সংখ্যাগুলো পরস্পরের সঙ্গে একটা গুণোত্তর প্রগতিসূত্রে বাঁধা। এধরনের গুণোত্তর রাশি নতুন কিছু নয়। ব্যাবিলনীয়রা দুহাজার বছর আগেই এরকম রাশি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। মিসরের 'আহমেস প্যাপিরাস'(আ. ১৫৫০ খ্রি.পূ.) নামক গণিতগ্রন্থে একটি গুণোত্তর রাশির বর্ণনা পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হলো যে আহমেসে যে পদ্ধতি দেওয়া আছে, প্রায় একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন ইতালির ফিবোনাচি তাঁর ১২০২ সালের গ্রন্থটিতে। আরকিমেডিস (আ. ২২৫ খ্রি.পূ.) নিজেও একটি অধিবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে গিয়ে (১)-এর মতো রাশি ব্যবহার করেছিলেন, যাতে x-এর মান ছিল ১/৪।

n যদি ছোট হয়, তাহলে হাতে গুণেই ফলাফল বের করে ফেলা যায় রাশিটির যোগফল। কিন্তু গাণিতিকেরা হলেন কুঁড়ে প্রকৃতির লোক, সব সময়ই একটা সহজ পথ বের করার তালে থাকেন। এই সহজ পন্থা বা চালাকিটির গাণিতিক নাম হলো 'ফর্মুলা' বা আর্যা। দেখা যাক ওপরের (১)-এর জন্য এমন একটি আর্যা বের করা যায় কি না। প্রথমত x=0 হলে ওপরের সব x শূন্য হয়ে থাকে কেবল প্রথম সংখ্যাটি, অর্থাৎ ১। এবার ধরুন x=১. তাহলে সব সংখ্যাই ১-এর সমান। যেহেতু সর্বমোট সংখ্যা হলো n, সেহেতু তার যোগফলও n.

এবার মনে করুন x শূন্য বা ১ কোনোটাই নয়। তাহলে কী হবে? সুবিধার জন্য রাশিটির একটা নাম দেওয়া যাক, ধরুন $S(x)$। (বন্ধনীর ভেতরে x বেচারিকে

আটকে ফেলার উদ্দেশ্য হলো x-এর মান বদলালে যে S-এর মানও বদলাতে বাধ্য, সেটাই পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া) এখন আমরা ওপরের রাশিটিকে নতুন করে লিখব:

$$S(x) = 1 + x + x^2 + ... + x^{(n-1)} \qquad (২)$$

এবার দুধারে x দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায়

$$xS(x) = x + x^2 + ... + x^{(n-1)} + x^n \qquad (৩)$$

এ পর্যায়ে আমরা (২) থেকে (৩) বিয়োগ করব। ডান দিকে x থেকে $x^{(n-1)}$ পর্যন্ত ওপরে-নিচে কাটাকুটি হয়ে বাকি থাকে কেবল ১ আর একেবারে শেষেরটি, x^n,সুতরাং ফল দাঁড়াচ্ছে:

$$(1-x)S(x) = 1 - x^n. \qquad (8)$$

উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা। বাকি রইল কেবল $(1-x)$ দিয়ে ভাগ করা দুদিকে। (ভাগ করা কাজটি কিন্তু ভেবেচিন্তে করা দরকার, সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে পাঠকের)। যা-ই হোক আপাতত ওসব জটিল চিন্তায় না গিয়ে সোজা হিসেবে দেখা যাচ্ছে:

$$S(x) = (1 - x^n)/(1 - x). \qquad (৫)$$

অলস গাণিতিকের জন্য একটি শিশুবোধ দাওয়াই বা ফর্মুলা বেরিয়ে গেল; কষ্ট করে এতগুলো সংখ্যা যোগ করবার প্রয়োজন নেই, (৫)-এর কল্যাণে চট্ করে সেরে ফেলা যায় কাজটি। যেমন ধরুন, জেনোর ধাঁধার ক্ষেত্রে x হলো ১/২।

তাহলে

$$S(1/2) = (1 - 1/2^n)/(1 - 1/2) = 2(1 - 1/2^n) \qquad (৬)$$

আরকিমেডিসের বেলায় $x = 1/4$. সেক্ষেত্রে

$$S(1/4) = 4/3(1 - 1/4^n).$$

দশ বছরের বাচ্চাও বেশ মজা পেয়ে উঠবে। তবে দশ বছরের বাচ্চা হয়তো যেটা ভাববে না সেটা এক মৌলিক প্রশ্ন:

(৪) নম্বর সূত্রটি কি সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য? না, তা নয়। অন্তত সোজা পূরণ-ভাগের ব্যাপার নয় সেটা। প্রথমত দেখা যাক x-এর মান 0 আর ১ থেকে কী পাই আমরা।

$$S(0)=1/1=1,$$

যা মিলে যাচ্ছে আগেকার পাওয়া ফলাফলের সঙ্গে। এবার $x=1$ বসানো যাক। (৪) দিচ্ছে $0/0$, যার কোনো অর্থ নেই। অথচ (১) আর (২) থেকে সোজা হিসাব করেই আমরা পেয়েছিলাম $S(1)=n.$ তাহলে কি বোঝায় $0/0$ আর n এক জিনিস? না, তাই বা হয় কিভাবে? n তো যেকোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে। তার অর্থ $0/0$ ভগ্নাংশটির কোনো নির্দিষ্ট মান নেই, যা আমরা আগেও উল্লেখ করেছিলাম একবার। এ এক ধাঁধা বটে!

লিবনিজ

এর পূর্ণ সমাধান পেতে অনেক অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল গণিতজগৎকে। এর মূলে আছে সেই শূন্য দিয়ে ভাগ করবার নিষিদ্ধ ব্যাপারটি। x যদি 1 হয়, $1-x$ তাহলে শূন্য হবে, এবং সেটা দিয়ে (৪)-এর দুপাশে ভাগ করা রীতিমতো বেআইনি। এই ডামাডোল থেকে আমাদের উদ্ধার করে দিয়েছে নিউটন আর লিবনিজের আবিষ্কৃত নতুন শাস্ত্র—ক্যালকুলাস। তবে এদুই মহারথীর কেউই ঠিক $0/0$-এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি; সেটা করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর

গাণিতিক জ্যাঁ বার্নলি (১৬৬৭-১৭৪৮) [যদিও এর কৃতিত্ব নিয়েছিলেন ফ্রান্সের আরেক কৃতি গাণিতিক লোপিতাল (১৬৬১-১৭০৪), এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সে নামেই পরিচিত এই জনপ্রিয় সূত্রটি]। সে প্রসঙ্গে আমরা যাব ক্যালকুলাসের মূল বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনার পর।

আচ্ছা, x যদি 0 আর ১-এর মধ্যে কোনো সংখ্যা হয় তাহলে x^n-এর মান কী দাঁড়ায়? মনে করুন, x =১/৩। তাহলে ১/৩^2=১/৯, ১/৩^3 =১/২৭, ১/৩^4 =১/৮১, ১/৩^5= ১/২৪৩,..., অর্থাৎ দ্রুত ছোট হয়ে যাচ্ছে এর মান, n-এর মান যত বাড়ছে। সুতরাং n যদি লক্ষকোটি বা তারও বেশি কোনো সংখ্যা হয় তাহলে ভগ্নাংশটির কী দশা হবে? একেবারে তুচ্ছ, তাই না? যাকে অঙ্কের ভাষায় বলা যায় নগণ্য, negligible. এই যে n বেড়ে বেড়ে অসীমের দিকে ছোটা আর সাথে সাথে x^n-এর মান কমে কমে শূন্যের দিকে ছোটা, এর মধ্যেই চুপিসারে এসে যাচ্ছে সেই 'শূন্য' আর 'অসীম'-এর ব্যাপারটি। শুধু তা-ই নয়, আরো একটি বড় আইডিয়ার অঙ্কুর গজিয়ে উঠছে, যাকে গণিতের ভাষায় বলা হয় লিমিট (limit). ভাসাভাসাভাবে আমরা এখনি বলে দিতে পারি যে n যখন অসীম লিমিটে যায়, x^n তখন যায় 0 লিমিটে। সাংকেতিক ভাষায় এটাকেই আমরা লিখি এভাবে:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0,$$

অর্থাৎ যখন n যায় অসীম লিমিটে। অবশ্য তার জন্য শর্ত দরকার যে x-কে একটি সত্যিকার ভগ্নাংশ হতে হবে, মানে তার মান যেন ১-এর কম হয়। এই 'কম হওয়া' ব্যাপারটিকে আমরা '<' চিহ্ন দিয়ে নির্দেশিত করি। বেশি হওয়াকে লিখি '>' চিহ্নের সাহায্যে। সুতরাং $0 < x < 1$ হলে

$$\lim_{n\to\infty} S(x) = 1/(1-x),$$

যখন n যায় অসীম লিমিটে।

জেনোর ধাঁধার বেলায় যেহেতু x-এর মান ১/২, সেহেতু $S(1/2)$-এর লিমিট হলো ১/(১-১/২) অর্থাৎ ২, অসীম নয়। সুতরাং 'অসীম'সংখ্যক ধাপ অতিক্রম করতে

হলেও খরগোশকে অসীম দূরত্বে যেতে হয় না, বা অসীম সময় ক্ষেপণ করতে হয় না, এক লাফেই পার হয়ে যায় দুই একক সময়ের মধ্যে—মাত্র তো ২ ফুট, ২ গজ বা ২ সেকেন্ড বা ২ মিনিটের ব্যাপার। এই সামান্য ঘটনাটি সেকালের মহা মহা পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকেনি, যার একটাই কারণ, শূন্য আর অসীমের অস্তিত্ব নিয়ে সমস্যা, এবং লিমিটের কোনো ধারণা না থাকা।

অথচ কাজে কর্মে কিন্তু লিমিট বারবারই উঁকি মারছিল পুরাকালের গবেষকদের মস্তিষ্কে। সে গল্প করব পরবর্তী অধ্যায়ে। আপাতত শূন্য আর অসীম নিয়ে আরো কিছু সময় কাটানো যাক। ওপরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে

$$S(x) = 1 + x + x^2 + ... + x^n + ... \qquad (৭)$$

যদি দিগদিগন্ত পার হয়ে অসীম পারাপারে চলে যায়, তাহলেও এর একটা সীমিত মান আছে, $1/(1-x)$, যার অর্থ দাঁড়ায়:

$$S(x) = 1/(1-x). \qquad (৮)$$

এই উদাহরণ থেকে পাঠক যেন ভেবে না বসেন যে ১-এর চেয়ে কম এরকম অসীমসংখ্যক সংখ্যার সব যোগফলই সীমার মধ্যে থাকবে। যেমন,

১+১/২+১/৩+১/৪+.... (৯)

এই সহজ রাশিটি অসীমের দিকে যাচ্ছে ঠিকই, এবং সংখ্যাগুলোর মানও ছোট হতে হতে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি কোনো সসীম সংখ্যায় পৌঁছুচ্ছে না, বরং যাচ্ছে অসীমেরই দিকে। ক্যালকুলাসের ছাত্রদের যেটা শিখতে হয় সেটা হলো যে অসীম রাশির সংখ্যাগুলো ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট নয়, কত দ্রুত ছোট হচ্ছে সেটাই হলো আসল প্রশ্ন। গুণোত্তর রাশির বেলায় সে হারটি যথেষ্ট দ্রুত বলেই (৭) থেকে (৮) পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হলো, কিন্তু (৯)-এর বেলায় তা পারা গেল না, কারণ ১,১/২,১/৩,... এ সংখ্যাগুলোর শূন্যে যাওয়ার গতিটা বড় ঢিলে।

অসীমসংখ্যক সংখ্যার যোগফল নিয়ে কাজ করার আরো অনেক বিড়ম্বনা আছে। সংখ্যাগুলো যদি সব ধনাত্মক হয়, বা সব ঋণাত্মক, তবু খানিক রক্ষা, মিশ্রিত হলে তো সেরেছে। যেমন ধরুন:

১-১+১-১+১-১+....   (১০)

এর যোগফল কী হবে? আদৌ কোনো যোগফল আছে কি না? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, এতে ভাববার কী আছে? (১০)-এর প্রথম জোড়ার যোগফল ০, দ্বিতীয় জোড়া, তৃতীয় জোড়া, চতুর্থ, পঞ্চম,...,এভাবে যেতে যেতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব জোড়া থেকে একই ফল পাচ্ছি আমরা: শূন্য।

অর্থাৎ:

(১-১)+(১-১)+(১-১)+....=0 .   (১১)

এতে ভুলের কী আছে? কিন্তু না, এত সহজে ছাড় পাবেন না। বন্ধনীগুলোকে (১১)-এর মতো করে না সাজিয়ে একটু অন্যভাবে সাজানো যাক। যেমন—

১-(১-১)-(১-১)-(১-১)-...   (১২)

এখন কী দেখছি আমরা? সবগুলো বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাদ্বয় কাটাকুটি করে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, থাকছে শুধু প্রথম সংখ্যাটি, অর্থাৎ ১। সুতরাং (১২)-এর যোগফল মনে হচ্ছে ১। কিন্তু একটু আগেই তো দেখলাম যোগফল শূন্য। শূন্য আর ১ এক হয় কী করে? কোনটা সত্য? সত্য হলো যে কোনোটাই সত্য নয়, আবার দুটোই সত্য। তার অর্থ এধরনের যোগ-বিয়োগযুক্ত রাশি বড়ই ঝামেলা সৃষ্টি করে। বড় বড় মাথাওয়ালা ব্যক্তিদেরও মাথা ঘামিয়ে ফেলে। সুতরাং সে প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করব। এগুলো শিখবার জায়গা প্রথম বর্ষের ক্যালকুলাস নয়, তারও এক ধাপ ওপরের কোর্স, যাকে বলা হয় রিয়েল অ্যানালিসিস, বেশ জটিল বিষয়, সেখানে ঢুকতে হবে।

লিমিটের ছলাকলা

আমার (মী.র) ছাত্রজীবনে ক্যালকুলাস শেখা শুরু হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে। বিসমিল্লাতেই যে জিনিসটা শিখতে হয়েছিল আমাদের সেটা হলো লিমিট, কারণ লিমিটই হলো ক্যালকুলাসের ভিত্তি। প্রথম সংজ্ঞাটিই বর্ণনা দেয় লিমিট কাকে বলে। একে এড়ানোর কোনো উপায় নেই। প্রকৌশল আর ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্ররা লিমিট পছন্দ করে না (তারা মনে করে, এটা অনর্থক সময় নষ্ট করা মাত্র), ডাক্তাররা ভাবে, এটা অনাবশ্যক, কলার ছাত্রদের মনোভাব, লিমিট একটি রসকষহীন শুষ্ক বিষয় যা মানবচিত্তের বিকাশ সাধনে বিন্দুমাত্র সহায়তা করে না। আর প্রথম বর্ষের গণিত ছাত্ররা? বেচারিদের কোনো গত্যন্তর নেই। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা অবশ্যই খেতে হবে সাথে। আক্কেল হারিয়েছিলাম বলেই তো অঙ্কতে অনার্স নেওয়া, এখন তিতে ওষুধটা আগেভাগে গিলে ফেলাই ভাল। তাই আমরা গিলে ফেলতাম। চোখ বুজে। মনে পড়ে না আমি (মী.র) বা আমার সহপাঠীদের এমন কেউ ছিল যে হলপ করে বলতে পারত সে সত্যি সত্যি বুঝেছিল লিমিট জিনিসটা আসলে কী। মুখস্থ করা এক জিনিস আর সত্যি সত্যি বুঝে ফেলা আরেক জিনিস। এমনিতেই আমাদের দেশে বোঝার চেয়ে পড়া আর মুখস্থের ওপরই জোর বেশি, তার ওপর লিমিটের মতো একটি দুরূহ বিষয় যা নিয়ে পুরাকালের বড় বড় পণ্ডিতদেরও মাথার তালু দিয়ে ধোঁয়া ছুটত। আমি (মী.র) সারা জীবন অঙ্ক পড়িয়েছি-ক্যালকুলাস আর লিমিট পড়িয়েছি অসংখ্যবার। অথচ এই আমিও লিমিট ব্যাপারটা অনার্সের একেবারে শেষ পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ঠিক বুঝিনি। যন্ত্রের মতো অঙ্ক কষে যেতে পারতাম, কিন্তু কোনো আনাড়ি মানুষকে সহজ ভাষায় বোঝানো যায় এমন করে বুঝিনি। 'ভালো করে শেখা' বলতে এই বুঝি আমি—এটাই বুদ্ধির পরীক্ষা—রাস্তার মানুষকে রাস্তার ভাষাতেই জটিল একটা বিষয় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারা, সেটাই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। সেই শেখাটুকু আমার শেখা হয়েছে ক্যানাডায় শিক্ষকতা শুরু করার বেশ কিছু পরে।

কিন্তু কেন? কেন লিমিটকে ঘিরে এত রহস্য? মিথ্যে প্রবঞ্চনায় বারবার কেন বিভ্রান্ত করা মেধাবী-অমেধাবী সবাইকে সমানভাবে? প্রথম কারণ, এতে 'শূন্য' দেখা দেয় খেলার সঙ্গী হবার জন্য, ধরা দেওয়ার জন্য নয়। সে এসেও ধরা দিতে চায় না। এখানে 'শূন্য' আসে $0/0$-এর ভয়ংকরী মূর্তি নিয়ে, অথচ পুরোপুরি তা-ও নয়। এ এক অদ্ভুত জিনিস। 'শূন্যের' কাছে যাব, অতি কাছে, যত কাছে তোমার কল্পনায় আসে তত কাছে, তবু ঠিক শূন্যের গায়ে উপুড় হয়ে পড়ব না। প্রিয় তোমার সঙ্গটুকু দাও শুধু, ছোঁয়াটুকু নয়, এই যেন লিমিটের কামনা।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। ভারতীয় গাণিতিক ভাস্কর তাঁর স্বদেশি ব্রহ্মগুপ্তের ভুল সংশোধন করে বলেছিলেন, সঠিকভাবেই, যে ১/০ বা (১৫৫৫৬)/০-জাতীয় ভগ্নাংশের মান হলো অসীম। কিন্তু ধরুন কোনো বিশেষ সংখ্যার উল্লেখ না করে আমরা চাচ্ছি, x সূচক একটি সংখ্যা শূন্যের দিকে অগ্রসর হলে, $1/x$, এই ভগ্নাংশটি কোন পথে ধাবিত হবে তা জানতে। অর্থাৎ

$$\lim_{x \to o} (1/x) = ? \qquad (১৩)$$

এক মুহূর্ত অমনোযোগী হলেই কিন্তু ফাঁদে পড়ে যাবেন, বলবেন, কেন, এটা তো পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে অসীম। ১/০ যদি অসীম হয় তাহলে ওপরের লিমিটটি অসীম হবে না কেন? বলছি না যে আপনি ভুল বলছেন; না, ভুল নয়, আংশিক ভুল। অসীম বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি অসীম বড় কোনো সংখ্যা, অর্থাৎ ধনাত্মক অসীম। সেটা ঠিক, যদি (১৩)-এর লিমিটটিতে x শূন্যের দিকে যায় ডান দিক থেকে, যার অর্থ ধনাত্মক দিক থেকে। কিন্তু লিমিট বলতে তো ডান দিক বাঁ দিক উভয় দিক বোঝাতে পারে। বাঁ দিক থেকে যদি x আসে শূন্যের দিকে তাহলে তো এটা ধনাত্মক অসীম থাকছে না, থাকছে ঋণাত্মক অসীম। এ থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছুব আমরা? দুটো লিমিটই ঠিক? না, তা নয়। এখানে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো যে ওপরের লিমিটটির আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। এই যে লিমিটের অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা, এর

ওপরই গা ছড়িয়ে আছে অ্যানালিসিস শাখাটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যার প্রাথমিক পর্যায়ের নাম হলো ক্যালকুলাস।

ক্যালকুলাসের একেবারে গোড়াতে যে আইডিয়াটি সেটা হলো 'ক্ষুদ্র সংখ্যা'। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় infinitesimal. সেই যে বললাম, শূন্যের নিকটতম প্রতিবেশী অথচ শূন্য নয়, যা চালাক মানুষকেও বোকা বানিয়ে ফেলে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ এই আইডিয়াটি নিয়ে হিমশিম খেয়েছে। এটা নিয়ে কাজ করেছে, ব্যবহার করেছে দৈনন্দিন প্রয়োজনে, কিন্তু স্পর্শ করতে সাহস পায়নি। গরম লোহার মতো, যা না হলে দা-কুড়াল বানানো যায় না, অথচ ছোঁয়া মানে নির্ঘাত হাত পোড়ানো।

'ক্ষুদ্র সংখ্যা'র ব্যবহার আজকের নয়, পুরাকাল থেকেই।

দৈনন্দিন জীবনে ক্যালকুলাস

ব্যবহারিক প্রয়োজন বলতে কী বোঝায়? আহার্য। পরিধেয়। আলোবাতাস, জল, বৃষ্টি। বাসগৃহ। জমিজমা। জমিজমার মাপজোক করতে হয়। গৃহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপতে হয়। প্রাচীন মিসরীয়রা সেভাবেই জ্যামিতি আবিষ্কার করেছিলেন। সেভাবেই তাঁরা প্রথম সূচনা করেছিলেন সরলরেখা, সমতল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, কোণ, সমকোণ, এসব শব্দ। একই সময় চীন, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য জাতির চিন্তাবিদদের মাথায় অনুরূপ ভাবনা জেগে থাকতে পারে, তার কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস আমাদের জানা নেই। সরলরেখার দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝায় সেটা আমরা জানি, একটা পাঁচ বছরের শিশুও সেটা বোঝে। দৈর্ঘ্য মাপার জন্য আছে মানদণ্ড (রুলার)। আমেরিকায় ইঞ্চি, ফুট, গজ, ইত্যাদি, ক্যানাডা-ইউরোপে মিটার-সেন্টিমিটার-কিলোমিটার। অবশ্য দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝায় সে-ও এক মৌলিক প্রশ্ন। সক্রেটিস হলে হয়তো বলতেন, দৈর্ঘ্য মাপার আগে বাপু, আমাকে বুঝিয়ে দাও 'দৈর্ঘ্য' শব্দটার অর্থ কী। বর্তমান যুগের বিশুদ্ধতাবাদী তাত্ত্বিক গাণিতিকেরা (pure mathematicians) বলবেন: দৈর্ঘ্য? কিসের দৈর্ঘ্য? সেট

(set) টা কী? ওটা কি ফাঁকা ফাঁকা, না একটানা (discrete or continuous)? পরিমাপনীয় (measurable), না অপরিমাপনীয়? সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা দাঁড়াবে। বিশুদ্ধ গাণিতিকেরা বড় খুঁতখুঁতে জাতি, আগেকার দিনের দার্শনিকদের মতো। যুক্তির শক্ত গাঁথুনিতে বাঁধা না হলে কিছুতেই তাদের তুষ্টি হয় না। আপাতত আমরা সেই যুক্তিযুদ্ধ থেকে দূরত্ব বজায় রাখব।

আলোচনার সুবিধার জন্য দু-চারটে তথ্য আমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেব, বিশেষ করে ইউক্লিডের বইতে যেসব তথ্য দেওয়া আছে, ধরে নেব যে সেগুলো বিনা প্রশ্নেই মেনে নেওয়া যায়। তাহলে একটা সমকোণী চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হলো তার ‘দৈর্ঘ্য’ ও ‘প্রস্থে’র গুণফল। (লক্ষ করুন যে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুটি শব্দতেই ‘ ’ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ চতুর্ভুজের কোন বাহুটা তার দৈর্ঘ্য, কোনটি প্রস্থ, সেটা নেহাতই দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে)। আমরা এ-ও ধরে নেব যে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফলের অর্ধেক। এই সামান্য দু-তিনটে তথ্য জানা থাকলেই এক আশ্চর্য উপায়ে ক্যালকুলাসের দুটি মুখ্য শাখা, অন্তরকলন (differential calculus), এবং সমাকলন (integral calculus), তাদের একটা প্রাথমিক ধারণা দাঁড় করানো সম্ভব। এ দুয়ের মাঝেই চুপটি করে লুকিয়ে আছে ‘শূন্য’ আর 0/0-জাতীয় অনির্ণেয় সংখ্যার বীজ।

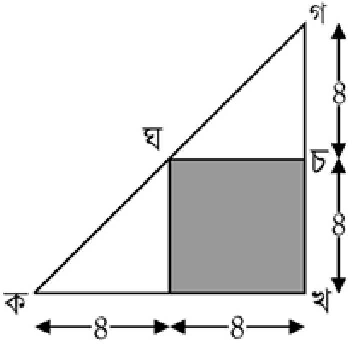

একটি সমদ্বিবাহু ও সমকোণী ত্রিভুজ, যার দৈর্ঘ্য ও লম্ব ৮ সেন্টিমিটার

ধরুন একটি সমদ্বিবাহু (isosceles) ও সমকোণী (right-angle) ত্রিভুজ, যার দৈর্ঘ্য-লম্ব দুই-ই ৮ সেন্টিমিটার। ভূমিতে ক হলো এক কোনায়, খ আরেক কোনায়, আর গ হল লম্বের মাথায়। অর্থাৎ ক থেকে গ রেখাটি ত্রিভুজের অতিভুজ। ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে আমরা জানি, এর ক্ষেত্রফল হলো (৮×৮)/২=৩২ বর্গসেন্টিমিটার।

এখন এক কাজ করা যাক। ভূমির ঠিক মধ্যিখানে, অর্থাৎ ক থেকে চার একক দূরত্বে যে বিন্দুটি সেখান থেকে একটা লম্ব আঁকা যাক যেটা মিশছে, ধরুন, অতিভুজ কগ রেখাটির ঘ বিন্দুতে। ঘ থেকে ভূমির সমান্তরাল একটি রেখা আঁকুন খগ অবধি। এটা মনে করুন চ বিন্দুতে মিশল। এভাবে গঠিত যে বর্গক্ষেত্রটি পেলাম আমরা তার ক্ষেত্রফল কত? ৪×৪=১৬, সোজা হিসাব। পুরো ত্রিভুজটির অর্ধেক।

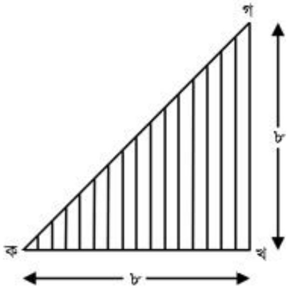

একটি ত্রিভুজকে ছোট ছোট টুকরায় ভাগ করে ফেলা যায়

আন্দাজ হিসেবে চলনসই, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম আন্দাজ নয়। তার চেয়ে ভালো অনুমান পেতে হলে ভূমিতে আরো বেশি খণ্ড বিন্দু নিতে হবে। দুভাগ না করে সমান করে যদি চার ভাগ করেন, তাহলে বর্গক্ষেত্র পাবেন না, পাবেন সমকোণী চতুর্ভুজ, যাদের সম্মিলিত ক্ষেত্রফল (সেটা আপনি অনায়াসে বের করে নিতে পারবেন) দাঁড়াবে ২৪ বর্গসেন্টিমিটার—আরেকটু কাছিয়ে আসা হলো। ছবিটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে, আশা করি। যত বেশিসংখ্যক খণ্ড বিন্দু নেবেন, ক আর খ-এর মাঝে ততই ৩২ বর্গমিটারের কাছে যেতে পারবেন ফলশ্রুত চতুর্ভুজগুলোর সম্মিলিত ক্ষেত্রফল যোগ করে। রেখাটিকে কত মিহি করে ভাগ করতে পারবেন আপনি? যত সূক্ষ্ম ইচ্ছে

আপনার, একেবারে শূন্য না হলেই হয়। এই খণ্ডগুলো সব সমান মাপের হতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে সমান হলে গুনতে সুবিধা, এই যা। তাছাড়া সমান-অসমান দুটিতে একই ফল পাওয়া যায় সচরাচর।

ভূমি-রেখার এই ছোট ছোট টুকরোগুলো অঙ্কের বইতে সাধারণত Δx সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়। এই Δx দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেখাখণ্ডের বাম বা ডান প্রান্তের বিন্দুর দূরত্ব যদি হয় x, আর সেখানকার লম্বরেখাটির উচ্চতা হয় $f(x)$, তাহলে সেই সরু চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল হবে $f(x)\Delta x.$ সুতরাং এরকম সব ক্ষেত্রফল যোগ করলে একটি সংখ্যা দাঁড়াবে যাকে আমরা $\sum f(x)\Delta x$ ধরণের সাংকেতিক ভাষায় লিখতে পারি। ($\sum$ দিয়ে sum অর্থাৎ যোগফল বোঝাচ্ছে) এই Δx সংখ্যাটি শূন্য না হয়ে শূন্যের একেবারে গায়ে গায়ে ঘেঁষে যাওয়ার অবস্থায় দাঁড়ালেও যদি এই যোগফল কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাতে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে সেই সংখ্যাটিকেই গণিতের সংজ্ঞায় বলা হয় ইন্টিগ্রাল (এক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল)। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে ক্ষেত্রফলও একটি লিমিট:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \sum f(x)\Delta x = \text{ক্ষেত্রফল} \qquad (১৪)$$

সজাগ পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন, এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই, যে সামান্য একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে অনর্থক এত পরিশ্রম করার কী দরকার ছিল, যেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি বইতেই তার জবাব দেওয়া আছে পরিষ্কার অক্ষরে? আমাদের উত্তর: ঠিক সেই কারণেই উদাহরণটি বাছাই করা, সবাই পরিচিত এর সঙ্গে। পরিচিত জিনিস দিয়ে একটা অপরিচিত আইডিয়া ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ, আমাদের মতে।

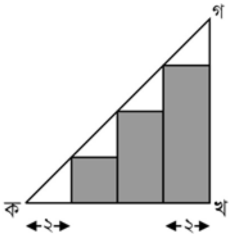

এটা সত্য যে ত্রিভুজের বেলায় কাটাকুটি, আন্দাজ-অনুমান এসবের কোনোকিছুরই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এর চেয়ে জটিলতর এলাকার ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ইউক্লিড সাহেবের সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালে লাভ হবে না, সেখানে এই কাটাকুটি, আন্দাজ-অনুমানই বলতে গেলে একমাত্র ভরসা। যেমন ধরুন একটা বৃত্তাকার মাদুরের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছেন আপনার স্ত্রী। কিংবা একটা বড়সড় কলাপাতার ক্ষেত্রফল বের করতে বললেন কেউ। সেক্ষেত্রে ছোট ছোট চতুর্ভুজ বা ত্রিভুজ আকারের টুকরায় ভাগ করে শেষে লিমিটে চলে যাওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে আমি জানি না।

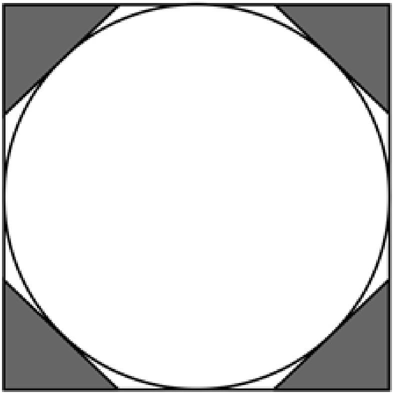

আহমসের 'পাই' গণনা

লিমিট নামের আইডিয়াটি বলতে গেলে বেশ আধুনিক, সপ্তদশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে পূর্ণ অবয়বে বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেকগুলো ছোট চতুর্ভুজ যোগ করে বৃত্তজাতীয় কোনো জটিল এলাকার আনুমানিক ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা আজকের নয়, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। খ্রি.পূ. সপ্তম শতকে জন্মলব্ধ মিসরীয় গাণিতিক আহমেস বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা করেছিলেন দারুণ বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে। প্রথমে একটি ৯ একক

ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্ত নিয়ে সেটাকে আটকালেন ঠিক ৯ একক লম্বা বর্গক্ষেত্রের ভেতর। খুব মোটা অনুমান হিসেবে এই বর্গের এলাকা আর বৃত্তের এলাকায় তেমন তফাত নেই। তবে এতে তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন না। বর্গের চার কোনাতে চারটে স্পর্শক টেনে তৈরি করলেন চারটে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এই চারটে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা এমন কোনো শক্ত ব্যাপার নয়। সেই সম্মিলিত ক্ষেত্রফলকে তিনি বিয়োগ করে ফেললেন পুরো বর্গের ক্ষেত্রফল থেকে। এভাবে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তিনি যে ৯ একক ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল আর একটি ৮ একক ক্ষেত্রফল সমান।

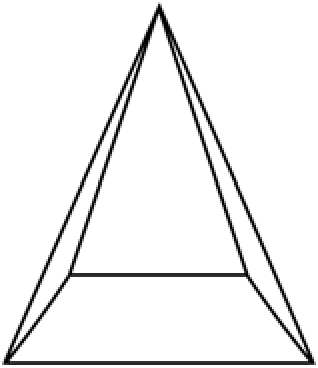

পিরামিড

সেটা অবশ্য ঠিক নয়, কিন্তু এতে গণিতের একটি সর্বজনীন অমূলদ সংখ্যা, π (পাই), যার আবিষ্কারের পেছনে সবচেয়ে বেশি প্রেরণা ছিল বৃত্তের, এবং যার আনুমানিক মান হিসেবে ধরা হয় ২২/৭ সংখ্যাটিকে, আহমেসের গণনাতে সেটা বেরিয়ে এল ১৯/৬-তে। অর্থাৎ তাঁরটি হলো ৩+১/৬, আর আসলটি ৩+১/৭। আশ্চর্য মিল, যখন চিন্তা করি দুয়ের মাঝে প্রায় ৪০০০ বছরের ফারাক। সেকালে মানুষ কীই বা জানতেন, তবু তাঁদের উপজ্ঞা (intuition) ছিল প্রখর, ‘আন্দাজ’ ছিল অসাধারণ। ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস সে সময়কার মিসরীয় পণ্ডিতেরা পিরামিডের আয়তন বের

করেছিলেন অঙ্ক কষে, যদিও তাঁদের ‘প্রমাণ’ কতখানি নির্ভরযোগ্য সেটা বিতর্কের বিষয়। সঠিক ফর্মুলাটি হলো:

$$\text{পিরামিডের আয়তন} = \frac{১}{৩}\ (\text{উচ্চতা} \times \text{ভূমির ক্ষেত্রফল})$$

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মিসরীয়দের জানা ছিল এটি, সে যেভাবেই হোক। অ্যারিস্টটলের মতে এর নির্ভুল প্রমাণ দিয়েছিলেন গ্রিক গাণিতিক ডেমোক্রিটাস(জ. ৪৬০ খ্রি.পূ., আ.), যদিও সে দাবিটাও প্রমাণসাপেক্ষ।

আধুনিক লেখকদের মতে, হয়তো একটা প্রমাণ তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত বর্তমান যুগের উন্নতমানের যুক্তির বিচারে ধোপে টেকার মতো ছিল না। ভারতবর্ষের আর্যভট্ট নিজেও একটা সূত্র দিয়েছিলেন পিরামিডের ঘনফলের জন্য, কিন্তু তাঁর ফর্মুলাতে ৩-এর জায়গায় ছিল ২ (হয়তো ত্রিভুজের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণেই)। গাণিতিকভাবে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ, সেটা পিরামিডের ঘনফলই হোক আর বৃত্তের ক্ষেত্রফলই হোক, তাতে ক্যালকুলাসের সমকক্ষ আর কিছু নেই। অন্তত এখনো পর্যন্ত।

খেয়াল করুন যে আমরা এখনো ক্যালকুলাসের দ্বিতীয় শাখাটি নিয়ে টুঁ শব্দ করিনি—অন্তরকলন ক্যালকুলাস (Differential Calculus)। স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে প্রথমে শেখানো হয় অন্তরকলন, তারপর সমাকলন। আমরা ঠিক উলটো পথটা বাছাই করলাম এখানে, কারণ মৌলিক যুক্তিতর্কের দিক থেকে অন্তরকলনই হল বেশি জটিল। এতে, পর্দার আড়ালে, আছে সেই 0/0 এর ব্যাপারটি, যদিও কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দু-তিন ক্লাস করার আগে টেরই পায় না সেই জটিলতাটুকুর উৎস কোথায়, বা আদৌ কোনো জটিলতা আছে কি না। যান্ত্রিক দক্ষতার সাথে অঙ্ক কষে ভালো নম্বর পাওয়া এক জিনিস, আর তার মর্মমূলে গিয়ে সারবস্তুটুকু উদ্ধার করতে পারা অন্য জিনিস। একটু আগেই তো বললাম, লিমিট বড় রহস্যময় জিনিস। প্রথম বছর তারা শেখে, দ্বিতীয় বছর মুখস্থ করে, যাতে কাজ

চালানোর দক্ষতা আসে, তৃতীয় বছর তারা ভাবে, এত দিনে ব্যাপারটা সত্যি সত্যি বোঝা গেল। কতগুলো জিনিস আছে সংসারে যেগুলো বুঝতে একটু সময় লাগে। শুধু বই-পুস্তক আর শিক্ষক-অধ্যাপকই যথেষ্ট নয়। তার জন্য লাগে মানসিক ও বৌদ্ধিক পরিপক্কতা, একটু সৃজনশীলতাও। হ্যাঁ, এটা আমার (মী.র) ব্যক্তিগত অভিমত যে কোনো সৃজনশীল মানুষের কাজ ভালো করে বুঝতে হলে নিজেরও খানিক সৃজনশীলতা থাকা দরকার। সেটা শিল্পকলাই বলুন আর গণিত বিজ্ঞানই বলুন। স্রষ্টার মস্তিষ্কের ভেতরে প্রবেশ করার আগে কি কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারে কারো কাজ?

অন্তরকলন বোঝাতেও সেই একই ত্রিভুজের (১০১ নং পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন) উদাহরণ ব্যবহার করব। সহজ, চোখে দেখা যায়, অথচ এতেই একটা মোটামুটি ধারণা দাঁড় করানো সম্ভব। এবার আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করব না। আমরা কল্পনা করব যে সমকোণী ত্রিভুজটির অতিভুজ একটা পাহাড়ি জায়গার খাড়া রাস্তা। ক থেকে গ পর্যন্ত পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হলে আমাদের জানা দরকার কতখানি চড়াই, অর্থাৎ তার ঢাল (slope) কত। কিভাবে বের করব সেটা? সোজা! লম্ব খ-গ রেখাটির দৈর্ঘ্যকে ভাগ করুণ ভূমিস্থ ক-খ রেখাটির দৈর্ঘ্য দিয়ে। একেই আমরা বলি ‘ঢাল’। খেয়াল করুন যে ‘ঢাল’ যদি শূন্য হয় (যার অর্থ গ আর খ একসাথে মিশে যাওয়া), তাহলে একেবারে সমতল, অর্থাৎ কোনো রকম চড়াই-উতরাই নেই। আবার যদি অসীম হয় তাহলে কী হবে? তার অর্থ খাড়া পাহাড়, একেবারে লম্বালম্বি উঠে গেছে। ‘অসীম’ কিন্তু এসে গেল এখানে। কেন হলো এরকম? হলো এজন্য যে পর্বত খাড়া হওয়া মানে খ বিন্দুটি ক-এর নিকটে আসতে আসতে একেবারে মিশে যাবার উপক্রম হচ্ছে, আর ওদিকে খ-গ রেখাটির দৈর্ঘ্য মোটেই বদলাচ্ছে না। তার অর্থ একটা সসীম সংখ্যাকে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে। সেই কারণেই ভগ্নাংশটি অসীমের পানে ছুটে যাচ্ছে সোল্লাসে।

যেহেতু ত্রিভুজটি গোড়া থেকেই ছিল সমদ্বিবাহু ও সমকোণী, আমরা জানি যে লম্ব/দৈর্ঘ্য=১, কারণ ক-খ আর খ-গ দুটি রেখারই সমান দৈর্ঘ্য। এবার কল্পনাতে

আপনি খ-গ রেখাটির সমান্তরালতা বজায় রেখে তাকে সরিয়ে আনুন কেন্দ্রের পাশে, অর্থাৎ ক-এর কাছে। দুটি দৈর্ঘ্যই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের অনুপাত থাকছে একই। কাছে বলতে কিন্তু কাছেই বোঝানো হচ্ছে, মানে যত কাছে আসা সম্ভব, যতক্ষণ না অবশ্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় ক-এর ঘাড়ের ওপর। ক্ষুদ্র ত্রিভুজটি বড়টির সদৃশ হলেই হলো, অর্থাৎ বাহুগুলোর অনুপাতে যেন কোনো রদবদল না হয়। এবার মাপ নিয়ে দেখুন দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য, এত ছোট হয়ে গেছে যে রুলার বসানোরও উপায় নেই বলতে গেলে। ধরা যাক, ভূমিটুকুর দৈর্ঘ্য Δx আর লম্বের দৈর্ঘ্য Δy .সুতরাং অতিভুজটির ঢাল দাঁড়াচ্ছে $\Delta y / \Delta x$, যা আমরা একটু আগেই দেখলাম। এবং যার মান আগের মতোই অপরিবর্তিত—১। তাহলে কি আমরা লিখতে পারি না

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y / \Delta x = 1? \qquad (১৫)$$

অবশ্যই পারি।

আশা করি আইডিয়াটির একটা ভাসা ভাসা ধারণা পাওয়া গেল। একটা ভগ্নাংশের লব আর বিভাজক যদি একেবারে শূন্য হয়ে যায়, তাহলে সে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তার কোনো মানে থাকে না। কিন্তু যদি দুটোই সমান হারে ছোট হয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ শূন্যতায় পৌঁছায়, তাহলে তাদের যে অনুপাত, সেটির একটা 'লিমিট' থাকলে থাকতেও পারে, এবং সেই লিমিটের একটা জ্যামিতিক তাৎপর্য আছে বৈকি—এক ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে কোনো রেখাবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র, আরেক ক্ষেত্রে হয়তো বা রেখার ঢাল।

ওপরের উদাহরণটি একটা ছেলেমানুষি উদাহরণ, মানছি, ছোট বাচ্চাও বুঝবে অনায়াসে। এবং সেই কারণেই নেওয়া। আমাদের বক্তব্য হল যে ত্রিভুজ আর সরলরেখা না হয়ে যদি বৃত্ত, পরিবৃত্ত, অধিবৃত্ত কিংবা তার চেয়েও জটিল কোনো রেখা হতো, তাহলেও প্রায় একই যুক্তি চালানো যেত। ঢালের সংজ্ঞাতে যা করা হয় সাধারণত, সেটা হলো দুটি কাছাকাছি বিন্দু নেওয়া রেখাটির ওপর। এবং প্রথমে বিন্দু

দুটিকে একটি সরলরেখাতে যুক্ত করে তার ঢাল মাপা, ওপরে যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হলো, ঠিক সেই পদ্ধতিতে। তারপর সেই বিন্দুদ্বয়কে পরস্পরের কাছে টেনে নেওয়া; কাছে, আরো কাছে, যত কাছে আপনার কল্পনায় সম্ভব। সবশেষে সেই ঢালটির 'লিমিট' নেওয়া, ঠিক আগেরই মতো করে। রেখাটি যদি যথেষ্ট 'সুশীল' হয়, অর্থাৎ হঠাৎ খাড়া হয়ে না যায়, বা বলা নেই কওয়া নেই, অকস্মাৎ বেঁকে না যায়, অথবা রেখাটি সেই বিন্দুতে গিয়ে একেবারে উধাও হয়ে না যায়, তাহলে সেই লিমিটটিও সাধারণত ভদ্র ব্যবহার করবে, অর্থাৎ তার একটা সসীম মান থাকবে।

এই সহজ আইডিয়াগুলো আজকের মনমানসিকতায় একেবারে ডালভাত মনে হতে পারে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর উষালগ্নে সেগুলো মোটেই সেরকম ছিল না। বরং লোকে হাসাহাসি করত যখন কেউ উল্লেখ করত। শূন্য অথচ শূন্য নয়, 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র' তবে একেবারে শূন্য নয়, এসব তো স্রেফ হেঁয়ালি বলে অভিযোগ করত অনেকে। আইজ্যাক নিউটন নিজেও, infinitesimalশব্দটা মনেমনেই ভেবেছিলেন, প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস পাননি, পাছে না কেউ পাগল ভেবে বসে তাঁকে। সেজন্য তাঁকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে হয়েছে একই কথা—নানা রকম উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করে। যেমন 'ফ্লাক্সিয়ন'।

আইজ্যাক নিউটন মানবেতিহাসের সেরা প্রতিভাদের একজন ছিলেন তাতে কারোই কোনো সন্দেহ নেই; এত বড় মাপের মানুষ হাজার বছরে দু-চারজনই জন্মায়। ভিঞ্চি ছিলেন সেই ক্ষণজন্মা পুরুষদের একজন। তারপর গ্যালিলি। তারপরই আমি (মী.র) স্থান দিই এই লোকটিকে। সাধারণ মানুষদের কল্পনাতে নিউটন আর আইনস্টাইন যেন দুটি কিংবদন্তীয় যুবরাজ, সর্বগুণে গুণবান, সর্বরূপে রূপবান, সর্বমেধায় মেধাবী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রতারকাদের মতো। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের খবর অনেকেরই জানা নেই, এবং এক হিসেবে জানার দরকারও নেই। মহৎ সৃষ্টির স্মৃতিই হোক মহৎ স্রষ্টার জীবনকাহিনি, এটা আমি সব সময়ই বলে থাকি। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে না-ই বা করলাম অহেতুক ঘাঁটাঘাঁটি। তবু কথা

থাকে, বিশাল প্রতিভাই জাগায় বিপুল কৌতূহল। লোকটা কে? তিনি কি আমাদের মতোই রক্তমাংসে গড়া মানুষ? আমাদের মতোই ভাত-কাপড় আর সংসারধর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন তাঁরা? হয়তো ঠিক তা নয়। তবে তাঁদের জীবনও অনেক সময় চিত্রতারকাদের মতোই বিচিত্র মনে হয়। তাঁরা আমাদের মতো রক্তমাংস আর সুখদুঃখ, রোগশোকে গড়া মানুষ হয়েও আমাদের চেয়ে আলাদা।

নিউটনের কথাই ধরুন। কথিত আছে যে তিনি জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর আর সব নবজাতকদের থেকে আলাদা ছিলেন। ১৬৪২ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিন। অপূর্ণকালিক জন্ম। এত ছোট আকারের শিশু গোটা ব্রিটেনে সম্ভবত জন্মায়নি তার আগে-দু-চার পাউন্ডের বেশি ওজন ছিল না তাঁর। গ্রামের লোকেরা বলত, নিউটনকে একটা মদের গ্লাসের ভেতর পুরে রাখা যাবে অনায়াসে। তাঁর কৃষিজীবী বাবা-মা কারোরই কোনো আশা ছিল না ছেলে বাঁচবে। কিন্তু ছেলে যে বেঁচে ছিল সেটা পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে আজকে। দুর্ভাগ্যবশত নিউটনের বাবা ছেলের কীর্তিকাহিনি কিছুই দেখে যেতে পারেননি; মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেলেন যুবতী স্ত্রীর ওপর বৈধব্যের ভার গছিয়ে, নিউটনের জন্মেরও দুমাস আগে। দু-তিন বছর পর অবশ্য বিধবা আবার বিয়ে করেন স্থানীয় চার্চের পাদ্রিকে, যেটা বোধ হয় শিশু নিউটন খুব একটা পছন্দ করেননি। ছেলে চলে যায় নানার বাড়িতে। মনে মনে এমনই রাগ ছেলের যে কয়েক বছর পর যখন মা তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠান, তখন মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, তিনি নাকি এমন হুমকি দিয়েছিলেন যে গ্রামে গেলে মায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন। পরে অবশ্য মা-ছেলেতে মিটমাট হয়ে গিয়েছিল সব। এমনকি পরিণত বয়সে নিউটন দারুণ মাতৃভক্ত হয়ে পড়েছিলেন, নিউটনের জীবনীকারদের অনেকেই সেটা উল্লেখ করেছেন।

নিউটনের মা কোনো দিন ভাবেননি ছেলেকে স্কুলে পাঠাবেন; কৃষকের ছেলে কৃষিকর্ম করবে, খেতখামার, গরু-ছাগল দেখবে, বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষ যা করে

এসেছে, এই ছিল তাঁর মনোবাসনা। কিন্তু ছেলের যে চাষবাসের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই, অবসর সময়টা বরং গ্রামের লাইব্রেরিতে কাটাতেই বেশি আগ্রহ, সেটা তিনি জেনেও না জানার ভাব করে থাকতেন। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে—যেমন করে ভাবেন সব দেশেরই বাবা-মায়েরা। সৌভাগ্যবশত নিউটনের এক কাকা ছিলেন চার্চের পাদ্রি। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের মেধার গন্ধ পেয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন যে এ ছেলে হালচাষ করে সুখী হবার নয়। তিনিই মাকে বুঝালেন যে নিউটনকে স্কুলে যেতে না দেওয়া অন্যায় হবে। মা মেনে নিলেন তাঁর যুক্তি—কত ভাগ্য আমাদের! তার পরই তাঁর লেখাপড়ার জীবন শুরু। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি নিউটনের বিশাল মেধার পরিচয় প্রভাতের রবিকরের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল? মোটেও না। তাঁর চেয়েও ভালো রেজাল্ট করা ছেলে আরো দু-চারজন ছিল একই ক্লাসে। বন্ধুবান্ধবও ছিল না বেশি। একা একা থাকতেই যেন বেশি পছন্দ করতেন। লাজুক, আড়ালপ্রিয়, লোকভয়, এর সবই ছিল তাঁর চরিত্রে, ছোটবেলায় শুধু নয়, পরিণত বয়সে যখন তিনি ইউরোপব্যাপী গৌরবের চরম শিখরে আরূঢ়, তখনো। তাঁর স্কুলজীবনের সেই ছাড়া ছাড়া ভাব, সেই আপাত-বৈরাগ্য, অন্য কারো সাথে মেলামেশা না করার প্রবণতা, তাঁকে সহজেই নানা রকম হাসিঠাট্টা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার করে তুলেছিল। একবার স্কুল-প্রাঙ্গণে এক ছেলের সঙ্গে বেশ বড়-রকমের ঝগড়া বেঁধে যায় তাঁর; ছেলেটি ছিল সেবছরের সেরা ছাত্র। সবার সামনে ভীষণভাবে অপমান করে তাঁকে, মারধরও করে থাকতে পারে। স্কুলবয়সে ছেলেমেয়েদের কতই বা হিতাহিতজ্ঞান। মজার ব্যাপার যে সেই প্রকাশ্য অপমান আর লাঞ্ছনাই বোধ হয় নিউটনের ভেতরকার সুপ্ত বজ্রকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। স্কুলের বাঁদর ছেলেমেয়েদের উৎপীড়নে অস্থির হয়ে বাচ্চারা যেমন রাগে-দুঃখে পণ করে মনে মনে যে একদিন তাকে দেখিয়ে দেবে সত্যিকার জোর কার গায়ে, তেমনি কোনো পণ করেছিলেন কি না নিউটন নিজের সঙ্গে জানি না, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে সেই যে পড়াশোনার জগতে ঢুকলেন তিনি, বলতে গেলে, সেখানেই আত্মবন্দী হয়ে থাকলেন সারা জীবন। সেই বছরই তিনি সেই উৎপীড়ক ছেলেটিকে হার মানিয়ে

অনেক অনেক ওপরে চলে গেলেন, যেখানে আরোহণ করার সাধ্য ছিল না কারো। পাঠ্যবিষয়ের সবকিছুতেই সমান পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন নিউটন তেমন দাবি করা যাবে না, কিন্তু গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান (সে যুগে যাকে natural philosophy বলা হতো ব্রিটেনে, সম্ভবত ইউরোপের গ্রিক-প্রভাবিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই কারণে), এই দুটি বিষয়ে নিউটনের দখল সারা মহাদেশে আর কারো ছিল কি না সন্দেহ, সেই স্কুলবয়সেই।

যা-ই হোক, স্কুল পাস করলেন তিনি কৃতিত্বের সাথেই, যদিও গণিত আর বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বভাবজাত ঔদাসীন্যের কারণে সর্বমুখী সাফল্যের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্কুল পাসের পর তিনি গেলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত কলেজ ট্রিনিটিতে ভর্তি হতে, ১৬৬০ সালে, যখন তাঁর বয়স আঠারো। ভর্তি তিনি অনায়াসেই হয়ে গেলেন, কিন্তু সেই লাজুক স্বভাব আর লোকচক্ষুর বাইরে থাকার আজন্ম প্রবণতা, দুয়ে মিলে কেম্ব্রিজেও কারো চোখে পড়ার মতো দারুণ কিছু করে ফেলেননি। তার ওপর নিউটনের ছিল আর্থিক সমস্যা। মাসিক খরচ চালানোর জন্য সেই ছাত্রাবস্থাতেই টুকিটাকি কাজ করতেন তিনি কলেজের কিচেন বা অধ্যাপক পাড়ায়। স্কুলের মতো কেম্ব্রিজেও নিউটন ছিলেন আর দশটা ছাত্রের মতোই-অলক্ষণীয় ও অবিশিষ্ট। তবে নিজের ঘরের নিরালাতে বসে তিনি জ্ঞানসাধনা করেননি তা নয়। বলা হয় যে স্নাতক ছাত্র থাকাকালেই বেশ কিছু মৌলিক চিন্তা তাঁর মাথায় আসে যা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি বা কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেননি সেসব বিষয়ে। এই আরেকটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল লোকটার-ভীষণ গোপন-প্রিয়তা। সব সময় যেন একটা আতঙ্কে থাকতেন পাছে না কেউ তাঁর আইডিয়া চুরি করে নেয়। একটা অসুস্থ সন্দেহপরায়ণতা, এমন অনুকূল উক্তিও করেছেন বেশ কিছু জীবনীকার।

১৬৬৫ সালে বিএ পাস করলেন বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই, যদিও তাঁর মতো অসামান্য মেধাবী ছাত্রের কাছ থেকে যতটা সাফল্য আশা করা যেত সেটুকু সাফল্য হয়তো অর্জন করা হয়নি। সম্ভবত একই কারণে, গণিত আর বিজ্ঞান-বহির্ভূত

বিষয়ের প্রতি নিদারুণ অনাগ্রহ। কিন্তু গণিতে তিনি ছিলেন ক্লাসের উজ্জ্বলতম তারকা। অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করেছিলেন গণিতে, কিন্তু সেখানেও সারা বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে যে নাম করে ফেলা, সবার চোখে তাক লাগিয়ে দেওয়া, সেটা হয়ে ওঠেনি, প্রধানত সেই লোকচক্ষুর-দূরে-থাকা স্বভাবেরই জন্য। গোটা গণিত বিভাগের কেবল একটি গুণী লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি—কেম্ব্রিজের সে সময়কার লুকাসিয়ান প্রফেসর আইজ্যাক ব্যারো। তিনিই ছিলেন একমাত্র শিক্ষক নিউটনের যিনি তাঁর ছাত্রটির ভেতরের আগুন দেখতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন এ ছেলে বড় কিছু করবে ভবিষ্যতে। যেটা তিনি জানতেন না তা হলো সেই ভবিষ্যৎ তখনই সমুপস্থিত দুয়ারে। পৃথিবী এখনই কেঁপে উঠবার উপক্রম। অনাগত ভবিষ্যৎ স্বাগতের অপেক্ষায় আঙিনায় দাঁড়িয়ে।

১৬৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে সারা দেশব্যাপী এক মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। এমন সর্বনাশা সেই মহামারি যে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে যায় অনির্দিষ্টকালের জন্য। সে বন্ধ বন্ধই থাকল পুরো দুবছর। নিউটন কলেজ ছুটির পরমুহূর্তেই চলে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। শুধু গেলেনই না, বলতে গেলে, দরজা বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন সাধুসন্ন্যাসীর মতো জ্ঞানসাধনার একনিষ্ঠ ব্রততে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকলেন। খাওয়া-পরা-ঘুম-আরাম সব বাদ দিয়ে এক আবিষ্ট আত্মার মতো বইখাতা আর অঙ্কের মধ্যে ডুবে রইলেন। বিপুল এই পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে, কোথায় কী ওলটপালট হচ্ছে, কে কোন রহস্যপুরীর সন্ধান নিয়ে এল জড়জগতের মরমানবের জন্য, তার কোনোকিছুতেই তাঁর ছিল না বিন্দুমাত্র আগ্রহ। প্রথম যৌবনের পরিচিত আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিউটনের জীবন থেকে ছিল সম্পূর্ণ নির্বাসিত। ওসবের কোনো অনুভূতিই যেন ছিল না তাঁর। ইউরোপের প্রখ্যাত গাণিতিক ও আইনজ্ঞ মারকুই লোপিতাল নিউটনকে দেখতেন একরকম জ্যোতিষ্কের মত, যেন এ জগতের কেউ ছিলেন না তিনি। লোপিতালের বিখ্যাত উক্তি[8] 'আমার মানসপটে আমি তাঁকে দেখি

[8] মূল উক্তি - 'I picture him to myself as a celestial genius'.

দূরনীহারিকাবাসী এক নভোচারী প্রতিভা হিসেবে’। পরবর্তীকালের বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ট্রিনিটি কলেজ প্রাঙ্গণে নিউটনের প্রস্তরমূর্তি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন:

‘...Newton, with his prism and silent face
The marble index of a mind
Voyaging through the strange seas of thought alone’.

আসলেও তাই। নিউটনের জীবনী পড়লে অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না সাধারণ মানুষের।

এবার বলি গ্রামের বাড়িতে সেই দুটি অপ্রত্যাশিত ছুটির বছর তিনি কিভাবে কাটিয়েছিলেন। ১৬৬৫-এর আগস্ট থেকে ১৬৬৭-এর আগস্ট—এই দুটি বছরই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময়, সবচেয়ে দিব্যজ্যোতিপূর্ণ, সৃজনোল্লাসমুখর সময়কাল। বলা হয় যে ওই দুটি বছরের মধ্যে যুবক নিউটন যা আবিষ্কার করেছিলেন তার সমতুল্য কাজ তাঁর ৮৪ বছরের দীর্ঘ আয়ুষ্কালে আর কখনো করা হয়নি, এবং সে কাজের সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন বিরল প্রতিভাধর মানুষ তাঁর আগে বা পরে জন্মগ্রহণ করেননি, অন্তত বিজ্ঞান-গণিতের ক্ষেত্রে। বর্ণনাটি নিউটনের নিজের ভাষাতেই দেওয়া ভালো[9]:

[9] মূল উক্তি: 'In the beginning of the year 1665, I found the method of approximating series and the rule for reducing any [power] of any binomial to such a series [i.e.,binomial theorem]. The same year in May [probably while still at Cambridge] I found the method of tangents of Gregory and Slusius, and in November had the direct method of fluxions [differential calculus] and the next year in January had the theory of colours and in the May following I had the entrance into the inverse method of fluxions [integral calculus] and in the same year I began to think of gravity extending to the orb of the moon.... and having thereby compared the force requisite to keep the moon in her orb with the force of gravity at the surface of the earth, I found them to answer pretty nearly. All this was in the two years 1665 to 1666 for in those years I was in the prime of my age for invention and minded mathematics and philosophy more than anytime since.'

> ১৬৬৫-এর গোড়াতে আমি দুটি জিনিস আবিষ্কার করলাম। এক: সংখ্যার রাশিমালার যোগফল বের করার পদ্ধতি; দুই: দ্বিসংখ্যাবিশিষ্ট ঘাতকে (power) কিভাবে যোগরাশিতে প্রকাশ করতে হয় (binomial theorem বা দ্বিঘাতী সূত্র)। একই বছর মে-তে (সম্ভবত কেম্ব্রিজে থাকাকালেই) আমি পেলাম গ্রেগরি আর স্লুসিয়াসের স্পর্শক পদ্ধতি। নভেম্বরে পেলাম ফ্লাক্সিয়নের সরাসরি তত্ত্ব (অন্তরর্কলন ক্যালকুলাস)। পরবর্তী জানুয়ারিতে আবিষ্কার করলাম বর্ণতত্ত্ব। সেই মে-তেই পেয়ে গেলাম অন্তরকলনের বিপরীতটি, সমাকলন। একই বছর চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিষয়টি নিয়ে, যে শক্তি চাঁদের অক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। নিজ অক্ষপথে চন্দ্রগ্রহণের নিয়মানুগ প্রদক্ষিণের জন্য বিশ্বপৃষ্ঠ হতে যে পরিমাণ আকর্ষণশক্তির প্রয়োজন তার মাপজোক করে একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। এ সবই আমি করতে পেরেছিলাম ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৬, এই দুটি বছরের মধ্যে। ওটিই ছিল আমার উদ্ভাবনী জীবনের স্বর্ণযুগ। ওই সময়টুকুতে আমি যতটা মনোযোগ দিতে পেরেছি গণিত আর দর্শনের ওপর ততটা কখনোই দেওয়া হয়নি।

মাত্র দুটি বছর! যৌবনে যা আমরা অলস দিবাস্বপ্নতেই কাটিয়ে দিই, যার কোনো মূল্যই দেওয়া হয়না সময় থাকতে, সেই দুটি অমর বছরই তিনি উপহার দিয়ে চিরধন্য করে গেছেন বিশ্ববাসী গোটা মানবজাতিকে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে। সেকথা নিউটন নিজেও হয়তো জানতেন না তখন। মানুষ কি কখনো জানতে পারে তার সৃষ্টির পূর্ণ তাৎপর্য বা মূল্য কতটুকু। কিন্তু আমরা জানি নিউটন আর সকল স্রষ্টার চেয়েও বড় স্রষ্টা ছিলেন।

(*Portsmouth Collection,*Sec.I,div.X, number 41, quoted from the article 'Newton on Particles and Kinetics' in The world of the Atom, ed.Henry A. Boorse and Lloyd Motz, Basic Books, Inc., publishers, New York and London, 1966).

অনেকে মনে করে, বিশেষ করে জ্ঞানসৃষ্টির যথার্থ প্রকৃতির সঙ্গে যারা পরিচিত নয়, যে আলবার্ট আইনস্টাইন নিউটনের বলবিদ্যাকে 'ভুল' প্রমাণিত করে গেছেন। যারা এ কথা বলেন, তাঁরা হয়তো বুঝবেন না যে নিউটনের বিজ্ঞান জানা না থাকলে আইনস্টাইনও হয়তো আইনস্টাইন হতে পারতেন না। জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো শাখারই কোনও নতুন আবিষ্কার হঠাৎ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে না। সবকিছুরই একটা পরিক্রমা আছে, একটা যৌক্তিক ধারাবাহিকতা আছে। নিউটনের বিস্ময়কর সৃষ্টিশীলতার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক ভাষ্যকারই ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকে বলেছেন, নিউটন এমনই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকতেন একটা জিনিস নিয়ে, এবং দিনের পর দিন, রাতের পর রাত না খেয়ে, না নেয়ে তা নিয়ে মনের ভেতর বারবার ঘুরপাক খাওয়াতেন যে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিদেবী স্বয়ং তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে তার সমস্ত রহস্য উদোম করে দিতেন তাঁর কাছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতির প্রিয়তম বরপুত্র, এধরনের মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ।

পাঠক হয়তো খেয়াল করে থাকবেন যে নিউটন তাঁর 'দুটি বছরের' বয়ান শোনাতে আরেকটি মস্ত বড় আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন, বা তিনি ওটাকে একেবারেই উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। সেটা হলো পদার্থের গতিসম্পর্কীয় গতির চালিকাশক্তির উৎস কোথায়। কী সমীকরণ দ্বারা আবদ্ধ গতি আর শক্তি যাকে আমরা বই-পুস্তকে গতিসূত্র (laws of motion) বলে জানি, সেগুলোও সেই দুটিমাত্র বছরের মধ্যেই করা। সে যে কী সুদূরপ্রসারী কাজ তার মর্ম শুধু পদার্থবিদেরাই জানে না, প্রতিটি প্রকৌশলী, প্রতিটি বিজ্ঞানসাধককে জানতে হয়, বিশ্বব্যাপী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রীকে জানতে হয়, মুখস্থ করতে হয়। মোটমাট তিনটি সূত্র তাতে:

(১) জাড্যনীতি (law of inertia), যেটা আসলে গ্যালিলির সূত্র বলেই ধরা হয় (আগের একটি অধ্যায়ে আমরা উল্লেখও করেছি সেটা), একটা জিনিস যদি অলসভাবে কোথাও ঠায় বসে থাকে তাহলে তাকে 'ঠেলে' নাড়ানো ছাড়া অন্য

কোনোভাবে নাড়াতে পারবে না কেউ। অর্থাৎ তাকে ‘জোর’ করে সরাতে হবে। ঠায় বসা না থেকে যদি কেউ ধীরবেগে চলতে থাকে সরলরেখাতে তাহলে তার ‘ধীরতা’ বদলাবার জন্যও একটু ঠেলার প্রয়োজন। নিউটন এটিকে তাঁর সূত্রাবলির প্রথম সূত্রের সম্মান দিলেন।

(২) ভর$\times$ত্বরণ=বল (mass$\times$acceleration=force)।

(৩) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একবারে সমান সমান ও বিপরীতমুখী (action and reaction are equal and opposite)।

এই তিনটি সূত্রতে মিলে বিশ্বভুবনে যা কিছু চলে বা একেবারে চলেই না, কিংবা চললেও ভীষণ ঢিমেতালে, যে শক্তি নিজেকে কোনো কিছুর ওপর আরোপ করে তাকে চালাতে চেষ্টা করে, তার সবকিছুর ওপরই নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করে গেছে নিউটনের ত্রিসূত্রমালার এই আশ্চর্য আলোকবর্তিকাটি। অথচ এই অসামান্য রকম ‘সামান্য’ জিনিসটির কথা তাঁর মনেই ছিল না আত্মজীবনী লেখার সময়! এমনই বিস্ময়কর ছিল নিউটনের মেধাজগৎ।

তিনটি সূত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বোধ হয় দ্বিতীয়টি, যাকে সাধারণ ভাষায় গতির দ্বিতীয় সূত্র বলে আখ্যায়িত করা হয় (second law of motion)। তবে এ সূত্রটি ততটা শক্তি হয়তো পেত না যদি না তিনি এটিকে তাঁর নিজেরই সদ্য আবিষ্কৃত অন্তরকলনের ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। এই ভাষাতে সূত্রটি দাঁড়ায়:

$$F = mdv/dt \qquad (১৬)$$

এখানে F হলো বল বা force, m হলো ভর, আর v গতি বা velocity. নিউটনের সমসাময়িক যুগে কোনো বস্তুর ভর গতির সঙ্গে বদলায় না, এটাই ছিল সর্বস্বীকৃত বিশ্বাস। সে কারণে উপরোক্ত সূত্রটিকে আরো একভাবে লেখা যেতে পারত:

$$F = dp/dt, \qquad (১৭)$$

যেখানে p অক্ষরটি বোঝায় ভরবেগ বা momentum. আধুনিক বিজ্ঞানের দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু (১৬)-এর চাইতে (১৭)টিই বেশি শক্তিশালী, কারণ এটি অপরিবর্তিত থাকবে ভর গতির ওপর নির্ভরশীল হলেও, কিন্তু (১৬) থাকবে না। (আইনস্টাইনের গতিবিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপটিই তো ছিল স্থান আর সময় উভয়কে গতিনির্ভর করে ফেলা, যার ফলে ভর বেচারিকেও গতির মেজাজ অনুযায়ী ব্যবহার করা শিখতে হয়।)

পাঠককে যে জিনিসটা এখনো বলা হয়নি সেটা হলো ‘গতি’ শব্দটির গাণিতিক সংজ্ঞা কী। ক্যালকুলাস বের হওয়ার আগে আসলে কোনো সঠিক সংজ্ঞা ছিলও না। গতির সঙ্গে নিউটনের ফ্লাক্সিয়ন আইডিয়াটির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এবং নিউটন ঠিক তা-ই করলেন। যে মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে তাইতো, গতি তো ফ্লাক্সিয়ন ছাড়া কিছু নয়, তৎক্ষণাৎ যেন তিনি দিব্যবাণী-প্রাপ্ত হয়ে লিখে ফেললেন:

$$v = dx/dt \qquad (১৮)$$

এখানে x হলো একটা বস্তুর অবস্থান, বা দূরত্ব কোনো কেন্দ্রবিন্দু থেকে, যেমন ডেকার্টের ভূমিস্থ অক্ষরেখা।

$$0 - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - \rightarrow x - axis$$

সে হিসেবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি দাঁড়ায়:

$$F = d^2x/dt^2,$$

বা

$$F = (d/dt)(dx/dt), \qquad (১৯)$$

অর্থাৎ ত্বরণ হলো অবস্থানের দ্বিতীয় অন্তরকলন (second derivative with respect to time). আজকে এগুলো ডালভাত আমাদের কাছে। সে যুগে ছিল রীতিমতো বিপ্লব।

আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয় থেকে খানিক ভিন্ন দিকে চলে যাওয়া হচ্ছে হয়তো, তবে আশা করি, নেহাত অপ্রাসঙ্গিকও মনে হবে না পাঠকের কাছে।

ক্যালকুলাসের জন্ম

ফ্লাক্সিয়ন (fluxion) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'প্রবহণ' বা 'পরিবর্তন'-যা ক্রমাগত বইছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। আইডিয়াটি কী প্রসঙ্গে উদয় হয়েছিল ২৪ বছর বয়স্ক যুবকের মস্তিষ্কে জানি না, কিন্তু এর প্রয়োগ যে গণিত আর বিজ্ঞানকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় যে একে গণিতে ব্যবহারযোগ্য করার উদ্দেশ্যে যে গাণিতিক সংকেত বা প্রতীক তিনি ব্যবহার করেছিলেন, সেটা এমনই বিদঘুটে আর ব্যবহার-অযোগ্য ছিল যে একমাত্র তিনি এবং তাঁর কিছু ভক্ত ব্রিটিশ গণিতবিদ ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করেছিলেন কি না সন্দেহ। এখানে বিজ্ঞানের গাণিতিক ভাষার একটা মৌলিক সত্য উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। সেটা হলো এই 'প্রতীকের' ব্যাপারটি। তত্ত্বের সাথে সেই তত্ত্ব প্রকাশের ভাষাকেও কিন্তু বিজ্ঞানমাফিক হতে হয়, যাতে প্রথমত তার একটা যৌক্তিক সংগতি থাকে, দ্বিতীয়ত থাকে সহজ ব্যবহারযোগ্যতা, তৃতীয়ত থাকে পরবর্তীকালের গবেষকদের জন্য ভাবসম্প্রসারণ বা অধিকতর সর্বজনীনতার পথে অগ্রসর হবার সহজ পন্থা। উদাহরণস্বরূপ ওপরের (১৬) আর (১৭)-এর পার্থক্যটা লক্ষ করুন। একই সমীকরণ, আইনস্টাইনের আগ পর্যন্ত। আইনস্টাইন এবং তাঁরও আগেকার দু-চারজন গবেষকের জন্য (১৬)-এর চেয়ে (১৭)-ই ছিল বেশি মূল্যবান। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটেনে বসে কাউকে ক্যালকুলাস শিখতে হলে নিউটনের সেই কিম্ভূতকিমাকার প্রতীকই ব্যবহার করতে হতো। সৌভাগ্যবশত নিউটনের অল্প কয়েক বছর পর প্রায় একই আইডিয়া জন্ম নিয়েছিল ইউরোপের আরেক মনীষীর মাথায়, যাঁর নাম গটফ্রিড লিবনিজ (১৬৭৬-১৭১৬)। জার্মানির এই আশ্চর্য প্রতিভাধর ব্যক্তিটি গণিতে যতটা পারদর্শী ছিলেন তার চেয়েও বেশি ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে। এমনকি পদার্থবিজ্ঞানেও যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন তিনি। ক্যালকুলাসের মূল আবিষ্কারক যে

নিউটন তাতে কারো কোন সন্দেহ নেই (সনতারিখ মেলালেই তো বের হয়ে যায় সেটা), প্রশ্ন হল লিবনিজ কি নিউটনের আবিষ্কারের কথা শোনার আগে নিজে থেকেই ভেবেছিলেন কিনা। যাই হোক, এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে লিবনিজ যে প্রতীক সঙ্কেত ব্যবহার করেছিলেন সেটা ছিল সত্যিকার ব্যবহারযোগ্য সংকেত, এবং এই অধ্যায়ে এযাবৎ যেসমস্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, তার সব কটিই তাঁরই প্রবর্তিত প্রতীক। লিবনিজের চিন্তায় dx, dy, dt-এগুলো হলো সেই 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র' সংখ্যা, যাকে গাণিতিক ভাষায় বলা হয় infinitesimal, যা স্বয়ং নিউটন সাহেবও খুব একটা সুদৃষ্টিতে দেখতেন না এবং যা নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী তর্কযুদ্ধ চলেছে তাত্ত্বিকদের মাঝে। কিন্তু লিবনিজ নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে গণিতের সম্পূর্ণ নতুন একটা শাখা তৈরি করে বিজ্ঞান আর গণিতকে তুমুল বেগে চলমান হয়ে উঠতে সাহায্য করেন। তাইতো বলি, আইডিয়াই পৃথিবী বদলায়। মানুষ চলে যায়, কিন্তু তার আইডিয়া থাকে, যদি তা থাকবার মতো হয় আদৌ।

এবার দুটি-একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক নিউটন কিভাবে তাঁর 'ফ্লাক্সিয়ন' দ্বারা অনেক অজানা বা কঠিন জিনিসের সহজ সমাধান দিতে পেরেছিলেন। প্রথমেই নেয়া যাক যা পাঠক আগেই দেখেছেন: সেই সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজটি— ক থেকে খ, ভূমিতে, খ থেকে গ লম্বালম্বি—একই দৈর্ঘ্য দুটি রেখারই। কগ এই অতিভুজটির ঢাল আমরা জ্যামিতির কাছ থেকেই পেয়েছি, ১। এবার দেখা যাক আমাদের নতুন শেখা ক্যালকুলাস কী দেয় এবং কত সহজে। ডেকার্টের বীজগাণিতিক জ্যামিতি আমাদের দিচ্ছে:

$$y = x, \quad (২০)$$

কগ-এর সমীকরণ—ক্যালকুলাস ব্যবহার করতে হলে এটি অপরিহার্য। এবার x বিন্দু থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি দূরত্ব নিন, যেমন Δx, এবং সেখানে y-এর যে পরিবর্তন সেটাকে বলুন Δy. তাহলে (২০) আমাদের দিচ্ছে, কগ রেখাটিতে দুটির সম্পর্ক: $\Delta y = \Delta x$.যার ফলে এ বিন্দুটিতে রেখাটির ঢাল হলো ১। যেহেতু ১ সংখ্যাটি কখনো

বদলাবার নয়, এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যেতে সেহেতু রেখার ঢালেও কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং সমস্ত রেখাটির একই ঢাল: ১, যা আগেরটির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ছোট বাচ্চাকেও শেখানো যায়, তাই না? ছোট বাচ্চা হয়তো যেটা শিখতে পারবে না চট করে সেটা হলো একই উদাহরণ প্রয়োগ করে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল, যা ৩২ বর্গ একক বলে আগেই আমরা জেনেছি, তা বের করা ক্যালকুলাসের সাহায্যে। প্রথমত ভূমিটিকে সমান n ভাগে ভাগ করুন, n-কে যথেষ্ট বড় ধরনের সংখ্যা হতে হবে, যে-কোনো বড় সংখ্যা হলেই চলবে আপাতত। তাহলে প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশের দৈর্ঘ্য দাঁড়াল $8/n.$ এবার r-সংখ্যক অংশের দূরত্বে, অর্থাৎ মূল ক থেকে যার দূরত্ব হচ্ছে $8r/n,$ সেখানে লম্বের দৈর্ঘ্যও সেই একই-$8r/n.$ সুতরাং সেখানে দাঁড় করানো ছোট একটি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য$\times$লম্ব, যার অর্থ, $(8r/n)\times(8/n)=64r/n^2.$ এখন আমরা r-কে ক থেকে খ বিন্দুতে নিয়ে যাব অর্থাৎ 0 থেকে n পর্যন্ত। সুতরাং ত্রিভুজটির আনুমানিক ক্ষেত্রফল দাঁড়াচ্ছে:

$$Area = 64(1+2+3+....+n)/n^2 \quad (২১)$$

ওপরের 1 থেকে n অবধি সমান্তর রাশিটির যোগফল স্কুলের দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েদেরও শেখা। সেটি ধার করে লেখা যায়:

$$Area = 32(n(n+1))/n^2 \qquad = 32 + 32/n. \qquad (২২)$$

এযাবৎ একবারও কিন্তু লিমিট বা infinitesimal-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। (২২) পর্যায়ে সেটি করা হবে। ৩২/n-কে যত ছোট করা সম্ভব করে যান, (যার মানে, n যাবে অসীম লিমিটে) যতক্ষণ না তার অস্তিত্বই প্রায় লোপ পেয়ে যায়। একেই তো বলি লিমিট, infinitesimal,তাই না? এই লিমিটে তাহলে $32/n$ সংখ্যাটির কী দশা দাঁড়াচ্ছে? প্রথম সংখ্যাটির তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। অর্থাৎ এর লিমিট হচ্ছে 0। এভাবেই ক্যালকুলাসে সমাকলন শাখা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এনে দেয় সমতল ভূমির ক্ষেত্রফল বের করার সহজ পদ্ধতি।

ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে এ পথে যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু সরলরেখার চেয়ে হাজার জটিল রেখার ক্ষেত্রে ক্যালকুলাস ছাড়া অন্য কোনো পথ এখনো পর্যন্ত কারো জানা নেই।

কোনো কোনো পাঠকের বিচারে ওপরের উদাহরণগুলো নেহাত ছেলেখেলা মনে হতে পারে। তাই আগের সেই অধিবৃত্তের উদাহরণটি নিয়ে ক্যালকুলাসের কী দারুণ শক্তি তার একটা আবছা আভাস দেবার চেষ্টা করব। ধরা যাক অধিবৃত্তটির সমীকরণ হলো

$$y = x^2, \qquad (২৩)$$

সুতরাং

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^2$$

$$= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 \qquad (২৪)$$

এখন (২৪) থেকে (২৩) বিয়োগ করুন।

থাকছে: $\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$

যাকে Δx দিয়ে ভাগ করে পাই:

$$\Delta y / \Delta x = 2x + \Delta x \qquad (২৫)$$

এ পর্যায়ে লিমিটের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। Δx আর Δy উভয়কে শূন্যের দিকে পাঠালে ডান দিকে কী থাকে? শুধু $2x$, কারণ Δx তো শূন্যেই চলে যাচ্ছে। তার অর্থ, এই (x, y) বিন্দুটিতে রেখাটির ঢাল হলো $2x$. গণিতের প্রচলিত সাংকেতিক ভাষাতে এটিকে এভাবে ব্যক্ত করা হয়:

$$dy / dx = \lim_{\Delta x \to 0} \Delta y / \Delta x = 2x \qquad (২৬)$$

ধারণা করা যায়, এভাবেই নিউটন তাঁর জীবনীতে বর্ণিত স্পর্শক-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

স্পর্শক

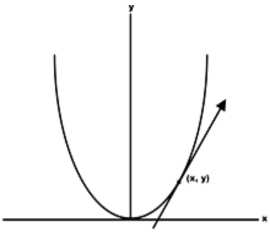

এবার এই রেখাটিরই নিচের এলাকাটির ক্ষেত্রফল বের করার চেষ্টা করব লিমিটের সাহায্যে। আগেকার সেই ত্রিভুজের মতো এটিরও ভূমি ধরা যাক ক থেকে ৮ একক দূরত্বে খ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে আগের মতো খ থেকে গ অবধি যে লম্ব রেখাটি তার দৈর্ঘ্য বদলে গিয়ে দাঁড়াবে ৮-এর বর্গে, অর্থাৎ ৬৪।

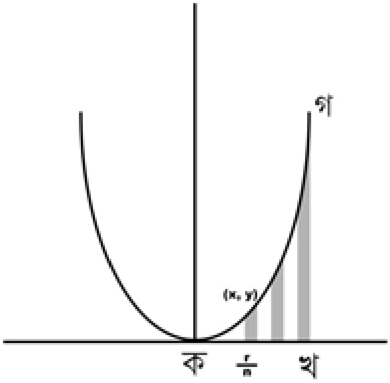

অধিবৃত্তের ক্ষেত্রফল

কথা হলো: এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বাঁকা রেখা-পরিবেষ্টিত এলাকাটি, তার ক্ষেত্রফল কি? আগের সেই ত্রিভুজটির মতো করেই ভূমিকে ভাগ করব n-সংখ্যক ক্ষুদ্র অংশে যাতে মূল থেকে x একক ডানে এর দূরত্ব দাঁড়াচ্ছে $8r/n$, এবং সেখানে তার উচ্চতা হলো $(8r/n)^2 = 64(r/n)^2$.সুতরাং মোটমাট গোটা এলাকাটির একটা আনুমানিক পরিমাপ লেখা যায় এভাবে:

$$Area = \sum (64(r/n)^2)(8/n)$$

$$= (512/n^3)\{1 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2\} \quad (২৭)$$

$\{ \quad \}$বদ্ধ রাশিগুলোর যোগফলের জন্য স্কুলপাঠ্য বীজগণিত বইয়ের সাহায্য নিতে হবে। এটা হলো:

$$(n(n+1)(2n+1))/6$$

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? $n = 1,2,3,....$ এরকম ছোট ছোট সংখ্যা নিয়ে গুনে দেখুন মেলে কি না। ওই যে বললাম, গণিতের লোকেরা ভীষণ কুঁড়ে, তাদের ফর্মুলা না হলে চলে না। তবে ফায়দাটা লক্ষ করুন। এবার যে সংখ্যাটি পাচ্ছি আমরা এই ক্ষেত্রফলের জন্য সেটা হলো:

$$Area = 512n(n+1)(2n+1)/6n^3 \qquad (২৮)$$

এইখানে এসে আমরা সেই একই কাজ করব, লিমিট নেব n-কে অসীম যাত্রায় পাঠিয়ে, মানে $1/n$ -কে শূন্যের দিকে নিয়ে।

শেষমেশ পাচ্ছি ৫১২/৩। এলাকাটির বর্গফল। ক্যালকুলাসের সমাকলন নিয়ম দিয়ে কষতে গেলে এত সময় লাগবে না এবং একই ফল পাওয়া যাবে।

ক্যালকুলাস নতুন বিদ্যা হলেও এরকম খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে সেগুলোকে একসাথে যোগ করে ক্ষেত্রফল বের করার পদ্ধতি অতি পুরাতন সেটা তো আগেই বলেছি। পুরনো জ্ঞানের ওপর ভর করেই তো নতুন জ্ঞান জন্ম নেয়। নিউটন সেটা নিজেই স্বীকার করে গিয়েছেন।

ক্যালকুলাসের জনক কে?

কলন-শাস্ত্রের জনক কে তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সেকালের ইউরোপে। এক পক্ষ বলে নিউটন, আরেক পক্ষ লিবনিজ। অনেকটা বাংলাদেশের ‘জাতির জনক’ সমস্যাটির মতো। অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যারা ভাল করে জানে তাদের মনে এ নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই, সমস্যা হলো যখন একদল আরেক দলকে ঘায়েল করার চেষ্টায় গোটা ইতিহাসটাকেই বিকৃত করে ফেলে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর ক্যালকুলাস বিতর্কে ব্যাপারটি অত সাদামাটা ছিল না।

সমস্যার গোড়াতে কিন্তু, অনেকের মতে, দায়ী ছিলেন নিউটন নিজেই। তাঁর সেই অতিমাত্রিক গোপনীয়তা, সেই স্বভাবসিদ্ধ সবাইকে-সন্দেহের চোখে দেখার প্রবণতা, পাছে না কেউ কিছু চুরি করে নেয় তাঁর কাছ থেকে, সেই ভয়ে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করা। সেসব কারণে ক্যালকুলাসের ওপর তাঁর যুগান্তকারী ফলাফলগুলো, আবিষ্কারের বহু বছর পর, ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে, প্রকাশ করেছিলেন। ওদিকে লিবনিজ তাঁর নিজের আইডিয়াগুলো পেয়েছিলেন ১৬৭৫ সালে। তারপর সেগুলোকে ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশযোগ্য করে ছাপতে দিয়েছিলেন ১৬৮৪ সালে। খবর পেয়ে নিউটন ভাবলেন, বেটা নিশ্চয়ই তাঁর রেজাল্ট চুরি করে নিজের নামে ছাপিয়ে দিয়েছে। অভিযোগটা যে একেবারে দুনিয়াছাড়া গাঁজাখুরি ব্যাপার ছিল তা-ও বলা চলে না। লিবনিজ পেশাতে ছিলেন আইনজ্ঞ, ফরাসি নাগরিক পিয়ের ফার্মার মতো, এবং ফার্মারই মতো দারুণ বড়লোকের ছেলে, বিত্তবান ও প্রভাবশালী। তিনি পেশাগত কারণেই ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ সাল পর্যন্ত পাকা তিন বছর কাটিয়েছিলেন লণ্ডনে। তার আগে নিউটনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও হতো চিঠিপত্রের মাধ্যমে। নিউটনের 'ফ্লাক্সিয়ন' তত্ত্বের খবর হয়তো তাঁর জানা ছিল, কিন্তু তার কোনো প্রভাব পড়েছিল কি না তাঁর ওপর সে কথা কারো পক্ষেই হলফ করে বলা সহজ নয়। নিউটন তো ধরেই নিলেন যে লিবনিজ সাহেব লণ্ডনে থাকাকালে কোনো-না-কোনোভাবে বের করে নিয়েছে তাঁর গোপন আবিষ্কার। পয়সাওয়ালা জার্মান দুলালদের কি কোনো বিশ্বাস আছে? সে কী ঝগড়া দুজনের! নিউটন যেমন ছিলেন সন্দেহপ্রবণ, লিবনিজ ছিলেন একটু উদ্ধত প্রকৃতির, ছেড়ে দেবার পাত্র মোটেও ছিলেন না তিনি। সেই ঝগড়া শেষ পর্যন্ত সারা ইউরোপের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। ব্রিটেন আর ইউরোপ কেউ কারো মুখদর্শন করবে না এমন অবস্থা।

বেশ কয়েক শতাব্দী লেগেছে দুপক্ষের মাথা ঠাণ্ডা হতে। ইতোমধ্যে আসল ক্ষতিটা হয়েছে ব্রিটেনেরই। ইউরোপ যেখানে আধুনিক গণিতের

বিবিধ শাখাতে শাঁই শাঁই করে এগিয়ে চলেছে, ব্রিটেন তখন নিউটনের অন্ধ অনুকরণে গতানুগতিকতার শেকলে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই নিউটনীয় ধারারই ঢেউ লেগেছিল ভারতবর্ষসহ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে। সম্ভবত সে কারণেই ভারতের গণিতচর্চাতে সত্যিকার কোনো গতি সৃষ্টি হয়নি গত কয়েক শতাব্দী। একই ধরনের সেকেলে ধারায় গৎবাঁধা জিনিস নিয়ে মগ্ন থেকেছি, এমনকি দেশ স্বাধীন হবার পরও।

রাজনীতির মতো গণিতের ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়!

গণিতের কলনশাস্ত্রের জন্মকাহিনির একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো। পরের অনুচ্ছেদে যাব সেই অস্বস্তিকর $0/0$_এর প্রসঙ্গে, যাকে নিউটন বা লিবনিজ কেউই সরাসরি মোকাবিলা করতে সাহস পাননি। কিন্তু তার আগে একটু পরচর্চা করা যাক, মানে উচ্চমানের গাণিতিক পরচর্চা।

একের কাম অন্যের নাম

১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের এক প্রতিপত্তিশালী অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ফ্রাঁসোয়া-আঁতোয়া দ্য লোপিতাল। (Guillaume-Francois-Antoine de l'Hopital)। আমাদের উপমহাদেশের বইপুস্তকে কখনো কখনো লেখা হয় L'Hospital, যার ফলে এর উচ্চারণটিও ল'হস্পিটাল হয়ে গেছে অধিকাংশ জায়গায় (আমরাও ছাত্র থাকাকালে এই উচ্চারণই শিখেছি)। ছোটবেলায় স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অঙ্কের প্রতি ভীষণ একটা আকর্ষণ জন্মায় লোপিতালের। সম্ভবত পারিবারিক কারণেই প্রাপ্ত বয়সে অঙ্কে না গিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল সেনাবিভাগে। অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন পর্যন্ত পদোন্নতি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু অচিরেই তাঁর মন ছুটে যায় সেই পুরনো প্রেম, অঙ্কের দিকে। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিনি মজে গেলেন অঙ্ক নিয়ে। কিন্তু দীর্ঘকাল চর্চা না থাকাতে সবকিছু নতুন করে শিখবার উদ্যোগ নিতে হলো।

সারা মুল্লুকের সবচেয়ে নামকরা শিক্ষক খুঁজে পেলেন একজন, নাম ইউহান বার্নলি (১৬৬৭-১৭৪৮)। আদিবাস বেলজিয়াম থেকে সুইজারল্যান্ডে চলে আসা বার্নলি-পরিবার ধনসম্পদে খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না, কিন্তু ধনী ছিলেন মেধাসম্পদে। তিনি এবং বড় ভাই জ্যাকব বার্নলি (১৬৫৪-১৭০৫), দুজনই ছিলেন সে যুগের শীর্ষস্থানীয় ইউরোপিয়ান গণিতজ্ঞ। ইউহান বার্নলির ছেলে ড্যানিয়েল বার্নলি (১৭০০-১৭৮২) ছিলেন আরেক মহিরুহ—'কিনেটিক থিওরি অব গ্যাসেস' নামক পদার্থবিদ্যার নতুন একটি শাখাই সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন তিনি। ড্যানিয়েলের বাপ-চাচা দুজনেরই নাম গণিতশাস্ত্রের সর্বত্র। সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory) থেকে পরিসাংখ্যিক গণিত (Probability Theory) সবকিছুতেই দুজনের কারো না কারো হাত ছিল। ইউহানের বিশেষ রকম ব্যুৎপত্তি ছিল লিবনিজের নতুন গণিত ক্যালকুলাসে। কিন্তু স্বাধীনভাবে গবেষণাকর্মে মগ্ন থেকে জীবন যাপন করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না তাঁর। তাই লোপিতাল যখন তাঁকে শিক্ষক নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন, তিনি সানন্দে সেটা গ্রহণ করে নেন। লোপিতাল কোনো গাধা ছাত্র ছিলেন, তা মোটেও নয়। চট করে সব শিখে ফেলতে পারতেন।

লোপিতাল ও ইউহান বার্নলি

প্রথম থেকেই তিনি বার্নলির শেখানো ক্যালকুলাসের প্রতি দারুণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বিষয়টির প্রতি এতই ঝোঁক হয়ে গেল তাঁর যে শিক্ষকের কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন যে ক্যালকুলাস-বিষয়ক যত কাজকর্ম আছে তাঁর সবগুলোই তিনি কিনে ফেলতে প্রস্তুত, যত টাকা চান তিনি ততই দেবেন। আর্থিক অনটনে পড়া ইউহান বার্নলি ভাবলেন, ক্ষতি কী, তাঁর মাথায় তো আরো নতুন আইডিয়া আসবে, কিন্তু এতগুলো টাকা তো আসবে না এত সহজে। তিনি রাজি হয়ে গেলেন ছাত্রের প্রস্তাবে। একটা শর্ত ছিল ছাত্রের, কাগজগুলো যদৃচ্ছ ব্যবহারের অধিকার থাকবে তাঁর, অর্থাৎ বার্নলির কাগজপত্রের যা কিছু ফলাফল তার ওপর সমস্ত স্বত্বাধিকার তিনি স্বেচ্ছায় সঁপে দিচ্ছেন লোপিতালকে। সেই কাগজগুলোতে যে সমস্ত ফলাফল ছিল, তার সঙ্গে নিজের কিছু চিন্তাভাবনা যোগ করে আঁতোয়া লোপিতাল রীতিমতো একটা বই লিখে ফেললেন ক্যালকুলাসের ওপর- *Analyse des infiniment petits* নাম দিয়ে। সে বই প্রকাশিত হয় ১৬৯৬ সালে —ক্যালকুলাস-শাস্ত্রের ওপর পৃথিবীর প্রথম পাঠ্যপুস্তক। সে বইতে বার্নলির একটি গুরুত্বপূর্ণ রেজাল্ট ছিল যার ওপর তাঁর স্বত্ব ছিল না বলে সেটি ‘লোপিতালস রুল’ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে দুনিয়াসুদ্ধ ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষক-অধ্যাপকদের কাছে। নিজের আবিষ্কৃত রেজাল্ট ব্যবহার করে নেহাত টাকার জোরে অন্য এক ব্যক্তি খ্যাতি অর্জন করছে সেটা দেখে বার্নলির যে খুব ভালো লাগছিল না সেটা তো সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ফলে মুখ ফুটে কিছু বলারও উপায় ছিল না বেচারার। তারপর যখন লোপিতাল মারা যান ১৭০৪ সালে, তখন আর চুপ করে থাকার প্রয়োজন বোধ করলেন না, ফাঁস করে দিলেন আসল ঘটনাটা। সে সময় লোপিতাল এতই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে বার্নলির কথায় কেউ কান দেয়নি। না দেবার আরেকটা কারণও ছিল। তিনি নিজেও এরকম একটি কুকর্ম করেছিলেন একবার, তা-ও নিজের আপন ভাইয়ের সঙ্গে। বড় ভাইয়ের একটা কাজকে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। বড় কথা, দিতে গিয়ে ধরাও পড়েছিলেন। তার ফলে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যায়। যা-ই হোক, তাঁর মৃত্যুর পর পুরনো চিঠিপত্র ঘেঁটে পরবর্তীকালের গবেষকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আসলেই কাজটা

ছিল ইউহান বার্নলির। কিন্তু তত দিনে লোপিতাল নামটিই আঠার মতো লেগে যায় সূত্রটির সঙ্গে।

এবার দেখা যাক কী সেই সূত্র। ধরা যাক ভগ্নাংশটি। x যদি ০ না হয় তাহলে এর একটা অর্থ আছে—ওপরে নিচে কাটাকুটি করে ফল পেয়ে যাই ১। কিন্তু x যদি 0 হয় তাহলে তো বিপদ—ভগাংশটি অর্থ হারিয়ে একটা অনির্ণেয় বর্জ্য দ্রব্য হয়ে দাঁড়ায়। কোন মানেই থাকে না তার। যুগ যুগ ধরে বড় বড় পণ্ডিতেরা যমের মতো এড়িয়ে গেছেন একে। দার্শনিকেরা তিরস্কার করেছেন যারা এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সাহস পায়। নিউটন আর লিবনিজের মতো নবযুগের দিগদিশারি গণিতবিদেরাও দূরত্ব বজায় রেখেছেন এর থেকে। কিন্তু লোপিতাল তাতে দমে যাননি (ঐতিহাসিক কারণে লোপিতালকেই কৃতিত্ব দিতে হচ্ছে যদিও সকলেরই জানা হয়ে গেছে এর মাঝে যে মূল আবিষ্কারক তিনি নন, ইউহান বার্নলি)। তিনি বরং উলটো বললেন যে ভগ্নাংশের মান হলে ক্ষতি নেই, যদি ওপর-নিচ দুটি ফাংশনই 'কলনযোগ্য' (differentiable) হয়, এবং অন্তরকলনের ফলে যদি নতুন ফাংশন দুটি একটা সুনির্দিষ্ট ফলাফল দেয়, বসাবার পর। অবশ্য যদি এমন হয় যে দ্বিতীয় পর্যায়েও সেই একই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, অর্থাৎ ভগ্নাংশ দিচ্ছে, তাহলে পূর্ববর্ণিত সেই একই প্রক্রিয়া দ্বিতীয়বার চালানো যাবে। এবং এভাবে যতবার দরকার ততবারই যাওয়া যাবে, যতক্ষণ না শেষমেশ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব, হয় কোনো সসীম সংখ্যায় যাবে, নয়তো অসীম সংখ্যাতে; কিংবা কোনো লিমিটেই যাবে না। সবগুলোরই পেছনে কতগুলো আইনকানুন আছে, যেমন লিমিট থাকা বা না থাকা, কলনযোগ্য হওয়া বা না হওয়া (না হলে সেখানেই থেমে যেতে হবে), ইত্যাদি।

ফিবোনাচি, না বিরহাঙ্ক?

ইংরেজিতে প্লেজিয়েরিজম (plagiarism) বলে একটা কথা আছে, যার বাংলা তরজমা, ভদ্র ভাষাতে, 'কুম্ভিলকতা', অনতিভদ্রতে সোজা

‘চৌর্যবৃত্তি’। তবে এটা সাধারণ পকেটমারা বা সিঁদকাটা চৌর্যবৃত্তি নয়, বুদ্ধিজগতের শিক্ষিত চৌর্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে এর মানে দাঁড়ায়: একজনের গবেষণালব্ধ মৌলিক কাজ আরেকজন তার নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া, এবং ফলত রীতিমতো নাম করে ফেলা। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটত আগেকার দিনে। ছাত্রের লেখা অভিসন্দর্ভের পুরো কৃতিত্বটাই হয়তো অবেক্ষক সাহেব আত্মসাৎ করে ছাপিয়ে দিলেন নামকরা জার্নালে, আর ছাত্র বেচারা ঘরে বসে রাগে-দুঃখে নিজের চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পেল না, এধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনাও যে ঘটেনি তা নয়। তবে বর্তমান যুগের ‘চৌর্যবৃত্তি’ একটু ভিন্নরকম। ইন্টারনেটের কল্যাণে যেহেতু কেউ কারো কাছ থেকে সহজে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না, সেহেতু ‘চুরি’টা হয় প্রধানত সেই ইন্টারনেটেরই কাছ থেকে। যেমন, গুগলের মারফতে ইন্টারনেট থেকে একটা তথ্য ‘ধার’ করার পর গবেষণাপত্রে সেই তথ্যসূত্রটি বেমালুম চেপে গিয়ে নিজের বলে দাবি করার চেষ্টা। মানবচরিত্রের এই ছোটখাটো হীনতাগুলো চিরকালই ছিল, চিরকাল থাকবেও। তবে উঁচুমানের গবেষক-সাধকদের মধ্যে এই দুর্বলতাগুলো খুব কমই দেখা গেছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা হলো একের কাজ সম্বন্ধে অন্যজন সম্পূর্ণ অনবহিত হয়েই তার নিজের কাজটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করে ফেলেছেন, যদিও সেই একই কাজ হয়তো অন্য লোকটি অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো পত্রিকায় তার আগেই প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। সেটা ‘চৌর্যবৃত্তি’ নয়, এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুলও নয়,সেটা স্বাধীন ও যুগপৎ গবেষণা। দুজনেরই সমান অধিকার গবেষণার কৃতিত্ব দাবি করার।

একদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অফিসের কফিরুমে বসে এক সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম কফি খেতে খেতে। কথা উঠল ফিবোনাচি সংখ্যা নিয়ে (বিজ্ঞ পাঠকদের মনে আছে নিশ্চয়, ফিবোনাচিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই বইয়ের চতুর্থ

অধ্যায়ে)। আমার (মী.র) বন্ধুটি গণিতের বীজগণিত শাখার একজন বিশ্বমাপের পণ্ডিত। হেসে বললেন, আরে কিসের ফিবোনাচি। তার বহু আগেই ভারতীয় গাণিতিকরা করে গেছেন সেটা। বন্ধুটি চেকোশ্লাভিয়ার অভিবাসী,আমারই মতো দীর্ঘকাল ক্যানাডায়। তিনি একজন ইউরোপিয়ানকে ইতিহাসের পাতা থেকে সরিয়ে ভারতের এক হিন্দু গাণিতিককে বসিয়ে দেবেন সেটা একটু আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে আমাদের কাছে, কিন্তু আসলে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে এই সততাটুকু কাম্যই কেবল নয়,সচরাচর তা-ই দেখা যায়। ওর কাছ থেকে এর সূত্র কোথায় তার খবর নিয়ে আমি (মী.র) ইন্টারনেট থেকে পেলাম পরমানন্দ সিংহ নামক এক গাণিতিকের লেখা নিবন্ধ, যার শিরোনাম: The so-called Fibonacci Numbers in Ancient and Medieval India[10]. লেখাটির ভূমিকাতে তিনি তার বক্তব্যের মূল বিষয়টি মোট পাঁচটি ভাষাতে ব্যক্ত করেছেন: ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি ও বাংলা। তার বাংলা অনুবাদটি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি-

> এল ফিবোনাচির (১২০২ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে বিরহাঙ্ক (খৃঃ ৫০০-খৃঃ ৬০০ এর মধ্যে), গোপাল (১১৩৫ খৃষ্টাব্দের আগে), এবং হেমচন্দ্রের (১১৫০ খৃষ্টাব্দের নিকট) সকলেই তথাকথিত ফিবোনাচি সংখ্যা এবং তার নির্মাণ বিধির বর্ণনা করে গেছেন। নারায়ণ পণ্ডিত (১৩৫৬ খৃষ্টাব্দ)সামাসিক পঙক্তি, যার এক বিশেষ রূপ হচ্ছে ফিবোনাচি সংখ্যা, এবং বহুপদী গুণকের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।

বিরহাঙ্ক বাবু ছিলেন সংস্কৃত কাব্যের ছন্দজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, যা আমরা নই। বরং খোলসা করে বলা যায়,সংস্কৃত বা যেকোনো ভাষার কাব্যরচনা বিধি বিষয়টিতে এ বইয়ের লেখকদ্বয় রীতিমতো গণ্ডমূর্খ।

---

[10] প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্যাবলীঃ Historia Mathematica, 12, pp 229-244, 1985

অতএব নিচে যে আলোচনাটুকু নিবেদন করছি পাঠকের সুবিধা হবে ভেবে,তাতে যদি সুবিধার পরিবর্তে আরো ধাঁধার ভেতরে পড়ে যান পাঠক তাহলে আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

পরমানন্দ মহাশয়ের ভূমিকা অনুযায়ী সংস্কৃত কাব্যে ছন্দের একমাত্রিক ধ্বনি বা স্বরকে (Syllable) বলা হয় 'লঘু',আর দ্বিমাত্রিক ধ্বনিকে বলা হয় 'গুরু' । ধরা হোক যে প্রথমটির ওজন ১,আর দ্বিতীয়টির ২। লেখক বলছেন যে, সংস্কৃত আর প্রাকৃত কাব্যে তিনপ্রকারের ছন্দরীতি: এক, বর্ণবৃত্ত, যাতে অক্ষর-সংখ্যা বদলাবে না,তবে ধ্বনি-সংখ্যা পারবে। দুই, মাত্রাবৃত্ত, যেখানে ধ্বনি-সংখ্যা অপরিবর্তিত, তবে অক্ষর-সংখ্যা বদলাতে পারবে। তিন,গণ বা গুচ্ছ-বৃত্ত, যেখানে একই গুচ্ছের ভেতর প্রথম বা দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে, তবে গুচ্ছে গুচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ থাকা সম্ভব। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য দ্বিতীয়টিরই গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এখানে তৃতীয়টি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন বলে এর আলোচনা স্থগিত রাখব—-এটা গণিতের বিষয় তত না, যতটা ছন্দ-বিন্যাসের।

প্রথমটির উদাহরণ:

১ অক্ষর — ল (লঘু) বা গ (গুরু) — মোট সংখ্যা ২ =২

২ অক্ষর — লল, লঘ, ঘঘ, ঘল — মোট সংখ্যা ৪ =২×২

৩ অক্ষর — ললল, লগল, ললগ, লগগ, গগগ, গগল, গলগ, গগগ– মোট সংখ্যা ৮=২×২×২

সজাগ পাঠকের কাছে ধারাটি বেশ পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে,তাই না? এখন যে কেউ বলে দিতে পারবে n অক্ষরবিশিষ্ট লাইনের মোট কটি সংখ্যা দাঁড়াবে: ২-কে n বার ২ দিয়েই গুণ করলে যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৪ অক্ষর হলে ১৬ বার, ৫ হলে ৩২ বার,—-এভাবে চলবে।

২, ৪, ৮, ১৬, —-এই সংখ্যামালাটি যে ফিবোনাচি রাশির সঙ্গে

একেবারেই সম্পর্কহীন সেটা স্পষ্ট। তবে এটা যে গণিতে অন্য কোনো শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাহীন তা কিন্তু মোটেও নয়। যেমন,একটা মুদ্রা একবার ছুড়লে হয় মাথা আসবে, নয় লেজ আসবে, অর্থাৎ ২টি সম্ভাব্য ফলাফল। ২ বার ছুড়লে ২×২ =৪টি, ৩ বার ছুড়লে ২×২×২=৮টি, —- অবিকল ওপরের উদাহরণটির মতো। এই মুদ্রা নিক্ষেপের উদাহরণটি কিন্তু কোনো ছেলেখেলা নয়, পরিসংখ্যান-শাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মডেল একটি। অতএব ছন্দ-ব্যাকরণের সঙ্গে গণিতের একাধিক শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যা-ই হোক, বর্তমান নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বর্ণ-বৃত্তের আলোচনাতে এখানেই যতি টানব।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ:

১ অক্ষর ল (গ সম্ভব নয়,কারণ গ'তে দুই মাত্রা), –মোট সংখ্যা ১

২ অক্ষর লল, গ– মোট সংখ্যা ২

৩ অক্ষর ললল, লগ, গল– মোট সংখ্যা ৩

৪ অক্ষর লললল, লগল, ললগ, গলল, গগ– মোট সংখ্যা ৫

৫ অক্ষর ললললল, লললগ, ললগল, লগলল, গললল, গলগ, গগল, লগগ– মোট সংখ্যা ৮

নিয়মটা নিশ্চয়ই বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে? এবং এটাও নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয়ে উঠছে যে ডান দিকের সংখ্যাগুলোকে পাশাপাশি দাঁড় করালে দেখা যাবে এরা সেই ফিবোনাচি রাশি—

১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩,...

তার অর্থ কবিতার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাথে গণিতের ফিবোনাচি রাশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং যেহেতু এই সম্পর্কটি অত্যন্ত সরাসরি, এবং বিরহাঙ্ক বাবু ফিবোনাচি থেকে অন্তত ৬ শ' বছর আগে এটি আবিষ্কার করেছিলেন, সেহেতু আমার মনে হয় ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের কথা ভেবে এই গুরুত্বপূর্ণ রাশিটিকে এখন থেকে বিরহাঙ্ক-ফিবোনাচি

রাশি বলে অভিহিত করা উচিত।

আশা করি পাঠকদের কেউই ভাববেন না যে ফিবোনাচি সাহেব জেনেশুনেই বিরহাঙ্কের নামটি চেপে গিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন। না, আমাদের মনে হয় না যে উনি ওরকম অসাধু ছিলেন। যদি হতেন তাহলে তিনি কেন গায়ে পড়ে ভারতীয় গণিত প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে রীতিমতো একটা বই লিখে ফেলবেন? শুধু তা-ই নয়, রাশিটি যে ফিবোনাচির নামে ভূষিত হয়ে গেছে সেটা কিন্তু তিনি নিজে করেননি, নামকরণটি করেছিলেন এডওয়ার্ড লুকাস (১৮৪২-৯১)নামক এক অনতিবিখ্যাত গাণিতিক ফিবোনাচির মৃত্যুর প্রায় সাড়ে ছ'শ বছর পর। না, এটা চোর্যবৃত্তির ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়, নেহাত অনবহিততার বিষয়।

আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক: x/x^2. ওপরে-নিচে দুজায়গাতেই শূন্য আসছে x যখন 0 হয়। সৌভাগ্যবশত x এবং x^2 দুটিরই ডেরিভেটিভ আমরা অনায়াসে বের করে ফেলতে পারি। x-এর ডেরিভেটিভ হলো 1, আর x^2এর $2x$- এটা আগের পর্বের একটি উদাহরণ থেকে নেওয়া। সুতরাং লোপিতালের দাওয়াই অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে: $1/2x$. মহা বিপদ! ওপরে 1, যা অপরিবর্তনীয়, আর নিচে $2x$, যা $x=0$-তে 0 ই থাকে। সুতরাং আমরা পাচ্ছি:

$\lim_{x\to 0}(1/2x) \to$ অসীম,

যার কোনো নির্দিষ্ট লিমিট নেই, ধনাত্মক অসীম হতে পারে, আবার ঋণাত্মক অসীমও হতে পারে, আগেকার সেই উদাহরণটির মতো। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দাঁড়াবে, এর কোনো লিমিট নেই, x যখন 0-এর দিকে যায়।

পুরো নিয়মটা হলো এরকম:

দুটি ফাংশন নিন: $f(x)$ আর $g(x)$, এবং $f(x)$ কে ভাগ করুন $g(x)$ দিয়ে। অর্থাৎ $f(x)/g(x)$, এই ভগ্নাংশটি আলোচনায় নিন। মনে করুন ফাংশনগুলোর

দুটোই 0 হয়ে যাচ্ছে, যখন x-কে 0 ধরা হয়। তার মানে $f(0)=g(0)=0.$ এবার মনে করুন উভয় ফাংশনকে অন্তরকলন করে পাওয়া গেল $h(x)$ আর $k(x)$,প্রথমটি ওপরে, দ্বিতীয়টি নিচে। এবার সেই একই কাজ করুন: $x=0$ ব্যবহার করুন। তাতে যদি কাজ হয়, তার অর্থ একটা নির্দিষ্ট কিছু পাওয়া যায়—কোনো সসীম সংখ্যা বা অসীম সংখ্যা বা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাই নয়, তাহলে তো সমস্যা চুকেই গেল। নইলে একই পদ্ধতি দ্বিতীয়বার চালিয়ে যান, যতবার লাগে ততবার।

এই করেই শেষ পর্যন্ত যুগযুগান্তরের সেই বিভীষিকাময় ঘৃণ্য বস্তুটির একটা সম্মানজনক আশ্রয় পাওয়া গেল। খেয়াল করুন যে লোপিতালের গাণিতিক দাওয়াইতে $0/0$ কে এড়ানো তো হচ্ছেই না, বরং এটিকে রীতিমতো কাজে লাগানো হচ্ছে, যদিও আড়ালে কিন্তু সেই একই জিনিস—লিমিট। ক্যালকুলাসের এমন কোনো অংশ নেই যেখানে লিমিট পাবেন না আপনি। সুতরাং এটিকে এড়ানোর চেষ্টা না করে বরং পরিশ্রম করে শিখে ফেলাই ভালো, কী বলেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিজ্ঞানে শূন্যের আভাস

'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'।
—**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

কলেজে আমি (মী.র) বিজ্ঞান নিয়েছিলাম, বড় বিজ্ঞানী হব সে আশায় নয়, ভালো চাকরি পাওয়া যাবে সে স্বপ্নে। ভুল করেছিলাম কিনা জানি না, কিন্তু ওটাতে ঢুকে বুঝতে পারলাম, আমি আর যা-ই হই, রসায়নবিদ হব না। সবচেয়ে অপছন্দ করতাম আমি রসায়নের ক্লাসটাকেই। বিশেষ করে ল্যাব। ল্যাবের ধারেকাছে গেলে আমার বমি উগড়ে আসত, যখন বড় বড় গ্যাসের ধামা থেকে উগ্র গন্ধ বেরিয়ে চারদিকের বাতাসকে অসহ্য করে তুলত। যে গ্যাসটিকে আমি সভ্যতার ওপর অহেতুক আক্রমণ বলে ভাবতাম সেটি হলো হাইড্রোজেন সালফাইড। ওই গন্ধ সহ্য করে যারা সারা জীবন কেমিস্ট্রি নিয়ে ডুবে থাকে তাদের প্রতি একটা অতিরিক্ত ভক্তি জন্মে গিয়েছিল আমার—তারা নিশ্চয়ই অতিমানব, না হলে এই পুঁতিগন্ধ নাকে নিয়ে কেমন করে পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়, এবং পরম আনন্দের সঙ্গে। সত্য কথা বলতে কি, বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে এই ল্যাবের ভয়ে আমি পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়েও ছেড়ে দিয়েছিলাম কেমিস্ট্রি পড়তে হতো বলে।

সৌভাগ্যবশত আমার মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত পিতপিতে স্বভাব নিয়ে সবাই জন্মগ্রহণ করে না। তাহলে রসায়নশাস্ত্র নামক অসাধারণ রসালো বিষয়টি বেশিদূর এগোতে

পারত না, ফলে আধুনিক বিজ্ঞানও অর্জন করতে পারত না তার সবটুকু আধুনিকতা। আমার ঠিক বিপরীত মানসিকতা নিয়ে জন্মেছিলেন ফ্রান্সের জ্যাঁক চার্লস (১৭৬৫-১৮২৩)। কেমিস্ট্রির ল্যাব থেকে আমি দূরে থাকতাম, উনি গ্যাস নিয়ে খেলা করতেন। গ্যাস, যত রকমের গ্যাসের কথা জানা ছিল সে সময়, সবকিছুতেই তাঁর ছিল একটা অস্বাভাবিক কৌতূহল। কোন্ গ্যাসের কী রঙ কী গন্ধ, কী তার দোষ, কীই বা তার গুণ, এই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। মজা পেতেন লক্ষ করে যে অম্লজান (oxygen) আগুন জ্বালায়, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডের কাজ হলো সে আগুন নেভানো। ক্লোরিন দেখতে ভারি সুন্দর, সবুজ-শ্যামল, কিন্তু মারাত্মক, আবার নাইট্রাস অক্সাইড একেবারেই নিরীহ নিরেট, বেরঙ, কিন্তু নাকে গেলে মানুষকে হাসাতে হাসাতে পেটে খিল ধরিয়ে দেয়। এরা সবই গ্যাস-পরিবারের সদস্য, অথচ কত ভিন্ন তাদের চরিত্র। শুধু একটা ব্যাপারে ওদের সবারই ব্যবহার অবিকল এক, লক্ষ্ করল চার্লসের কৌতূহলী চোখ, সেটা হলো, তাপ পেলে সবারই আয়তন বাড়ে, ঠাণ্ডায় সবাই কুঁচকায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ হলো উদজান (hydrogen) গ্যাসের আচার-ব্যবহার। যেই না তাপ দেওয়া অমনি সে ফুলতে শুরু করে, অতি অল্প সময়েই ফুলে ঢাউস হয়ে যায়। বড় ভদ্র আর কোমল প্রকৃতির এই নিরীহ গ্যাসটি। (যদিও গন্ধকের [sulphur] সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলেই দুজনে মিলে একটা বিশ্রী গন্ধ সৃষ্টি করে ফেলে।) হাইড্রোজেন গ্যাসের এই অল্প তাপে ফুলতে পারার গুণটি লক্ষ্ করেই চার্লসের মাথায় বুদ্ধি এল তাইতো, একে যদি একটা বেলুনের ভেতর ভরে কোনো রকমে চুলোর মতো কিছু একটা তৈরি করে তার নিচে বসানো যায় তাহলে সে তো ফুলতে ফুলতে পুরো বেলুনটাকেই মাটি থেকে তুলে ওপরে নিতে শুরু করবে। এবং যতই তাপ বাড়ানো হবে ততই ফুলবে গ্যাস, ফলে ততই ঊর্ধ্বমুখী ছুটবে বেলুন। মনে রাখতে হবে যে হাইড্রোজেন গ্যাসের এই সহজে উড়ে যাবার ক্ষমতা, এর মূলে আরো একটা বড় গুণ আছে তার, আপেক্ষিক ওজন। যত গ্যাস আছে সংসারে তাদের সবার চেয়ে হালকা হলো হাইড্রোজেন। মেন্ডেলেভ সাহেবের মানচিত্রে (periodic table) এর স্থানই সর্বপ্রথম।

এই গুণটাকেই মানুষ কাজে লাগিয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। আজকাল অবশ্য হাইড্রোজেনের চাইতে হিলিয়াম গ্যাসই বেশি পছন্দ করে বেলুন-প্রেমিকরা, যদিও হিলিয়ামের ওজন কিঞ্চিৎ বেশি, তার কারণ হাইড্রোজেন গ্যাসে সহজেই আগুন লেগে যাওয়ার ভয় বেলুনের ভেতর, হিলিয়াম গ্যাসে সে ভয়টা নেই। চার্লসের সময়কালে অতসব জানা ছিল না, এবং তাঁর আগে কেউ আকাশে উড়বার কল্পনা করেনি। তিনিই প্রথম সে দুঃসাহসী পদক্ষেপটি নিলেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উঠতে উঠতে প্রায় দুই মাইল উচ্চতায় আরোহণ করেছিলেন। জ্যাঁক চার্লসই ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম বেলুনারোহী।

বিজ্ঞানজগতে চার্লস সাহেবের খ্যাতির প্রধান ভিত্তি কিন্তু তাঁর বেলুন নয়, ভিত্তি হলো গ্যাসের গুণাগুণ নিয়ে তাঁর মৌলিক তত্ত্ব। তিনি দেখলেন যে তাপ যে পরিমাণ, গ্যাসের স্ফীতির পরিমাণও অনেকটা তা-ই, অর্থাৎ একের সঙ্গে আরেকটির আনুপাতিক সম্পর্ক। তাপ যদি কমতে কমতে শূন্যের কাছাকাছি পৌঁছায় তাহলে আয়তনও কমতে কমতে অস্তিত্বহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। এই তত্ত্বটি বিজ্ঞানে 'চার্লস ল' নামে পরিচিত।

কিন্তু একটি প্রশ্ন সব সময়ই আরেকটি প্রশ্নের ইঙ্গিত দেয়। আপাতদৃষ্টিতে চার্লস সূত্রে কোনো ভুলত্রুটি ছিল না, তবে প্রশ্ন উঠছিল, ঠিক আছে, বস্তু না হয় নিজের ভেতরে গুটোতে গুটোতে একেবারে শূন্য আয়তনে পৌঁছে গেল, তাই বলে তাপ কী করে শূন্য হয়ে যায়? তাপ, আয়তন সব শূন্য হয়ে গেলে তো কিছুই থাকে না পৃথিবীতে, বিশ্বজগৎ সব নিস্তব্ধ নিরাকার নিস্তাপ-গ্রহ-নক্ষত্র উদ্ভিদ প্রাণী বস্তু কোনোকিছুরই কোনো অস্তিত্ব থাকে না। চার্লস-তত্ত্বের এই বিড়ম্বনাটি বিশেষভাবে লক্ষ্ করলেন বিলেতের লর্ড কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭)।

লর্ড কেলভিন লর্ড হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। বেলফাস্টের এক সাধারণ আইরিশ পরিবারে তাঁর জন্ম, ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লসের মৃত্যুর ঠিক এক বছর পর, নাম ছিল

উইলিয়ম থমসন। বিজ্ঞানের নেশা ও নিয়তি এঁদের দুজনকে যুক্ত করে দেয় ইতিহাসের পাতায়। গ্লাসগো আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তিনি গ্লাসগোতেই অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন এবং ওখানেই ৫৩ বছরের দীর্ঘ পেশাজীবন অতিবাহিত করেন। নিযুক্তিকালে তাঁর বয়স ছিল ২২। তার দুবছর পর তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার—ধ্রুবমানক (absolute scale), যাতে চার্লস সূত্রের 'শূন্য' তাপ, যেখানে বস্তুর আয়তন লোপ পায়, চিহ্নিত হয়, যদিও প্রকৃত বিচারে সেটা ঠিক তাপ একেবারে মুছে যাওয়া বোঝায় না। আসলে লর্ড কেলভিনের 'ধ্রুবশূন্য' বা 'পরমশূন্য'(absolute zero)-এর মানে হলো সাধারণ সেলসিয়াস স্কেলে -২৭৩.১৬ ডিগ্রি, ফারেনহাইটে -৪৫৯.৬৯ ডিগ্রি।

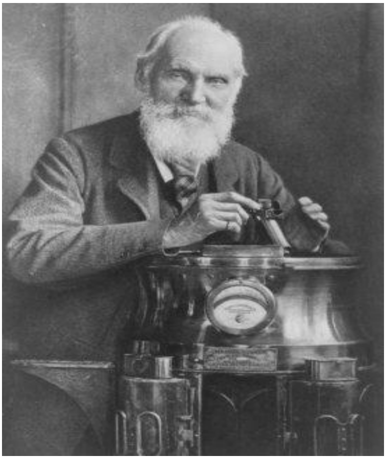

লর্ড কেলভিন

'ধ্রুবশূন্য' তাপের তাৎপর্য হলো যে এতে পৌঁছাতে পারলে (যা আসলে কখনোই সম্ভব নয় আক্ষরিকভাবে) পদার্থ, কঠিন তরল বায়বীয় যা'-ই হোক, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—বস্তু থাকবে কিন্তু তার অবয়ব থাকবে না, স্থূল থাকবে না, কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। দৈনন্দিন জীবনে কেলভিন স্কেলের দরকার হয় না, কারণ জনপ্রাণীর জীবনধারণের জন্য যেরকম তাপ আর বায়ুচাপের প্রয়োজন হয় তাতে ধ্রুবমাত্রার

ধারেকাছে যাবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের ক্যানাডার কোনো কোনো অঞ্চলে মাঝে মাঝে এমন ঠাণ্ডা হয় শীতকালে যে সকালবেলা বাইরে বেরোলে ঠোঁটে ঠোঁট জোড়া লেগে যায়, নিঃশ্বাস জমে যায়, গাড়ির তেল জমে যায়। তবু সেখানেও তাপমাত্রা কখনোই -৫০ কি বড়জোর -৬০-এর নিচে নামে না। -২৭৩ তা থেকে অনেক দূর। তবে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে অনেক সময় গ্যাসকে গলাতে হয় (লিকুইড হাইড্রোজেন, লিকুইড হিলিয়ামের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন) তাপ কমিয়ে, এত কম যে ধ্রুবশূন্যের কাছাকাছি চলে যায় কখনো কখনো। কেলভিনের শূন্য শুধু এই জানিয়ে দিচ্ছে যে এর নিচে যাওয়ার উপায় নেই। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার পথ খুলে দিয়েছিল, যাকে বলা হয় থারমোডায়নামিক্স, তাপবলবিদ্যা। এই বিদ্যার প্রথম সবক হল, প্রকৃতির একটা সহ্যসীমা আছে, যার বাইরে কোনো জনপ্রাণীরই যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে দণ্ডায়মান এক সর্বশক্তিমান সত্তা—সংসারের কঠোরতম দৌবারিক ধ্রুবশূন্য। শূন্য সেখানে সশরীরে উপস্থিত। মজার ব্যাপার যে কেলভিনের প্রায় দু'শ বছর আগে তাঁরই স্বদেশি সহবিজ্ঞানী, আইজ্যাক নিউটন, তিনি মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছিলেন মহাশূন্যের, যেখানে গ্রহ-নক্ষত্রদের মেলা, যেখানে মানুষ তার চিন্তার রথে করে ঘুরে বেড়াতে পারে যেখানে খুশি সেখানে, বাধাবন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গদের মতো ডানা মেলে উড্ডীন হতে পারে এক সীমানা থেকে আরেক সীমানায়। প্রকৃতির দুয়ার অবারিতভাবে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। লর্ড কেলভিন তার দু'শ বছর পর দেখালেন প্রকৃতির এক ভিন্ন মূর্তি। দেখালেন এক দুয়ার খুলে দিয়ে প্রকৃতি কেমন করে আরেকটি বন্ধ করে রেখেছে চিরকালের জন্য—চিরকালের জন্যই যার গায়ে লেখা: এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, এ দুয়ার বিদ্ধ করে প্রকৃতির গুপ্তপুরীর সন্ধান পাওয়া বস্তুজগতের সাধ্যের বাইরে।

'ধ্রুবশূন্য' এবং এ-জাতীয় আরো কিছু মৌলিক কাজের জন্য উইলিয়ম থমসন 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণখচিত।

উল্লেখ্য যে ধ্রুবশূন্য আইডিয়াটির সূত্র ধরে একটি প্রাচীন আইডিয়া নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে—গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০খ্রি.পূ.), এপিকিউরাস (৩৪২-২৭০খ্রি.পূ.), এঁদের সেই দৃঢ় বিশ্বাস বস্তুর আণবিকতার ওপর, যার সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা ছিলেন রোমান দার্শনিক লুক্রেসিয়াস (৯৮-৫৫খ্রি.পূ.)। অণু আবার বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করে।

প্রথম পর্যায়ে আসে তাপবলবিদ্যা, যা একটু আগেই উল্লেখ করলাম। নিউটনের বলবিদ্যার মতো এই বলবিদ্যাও তিনটে প্রধান স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান। এগুলোকে বলা হয় তাপবলবিদ্যার তিন সূত্র (Three laws of Thermodynamics)। প্রথম সূত্রের মূল বক্তব্য হলো পেশিশক্তি আর যান্ত্রিক শক্তি (mechanicalenergy) মূলত একই জিনিস, একটি আরেকটিতে রূপান্তরিত হতে পারে, এবং শক্তির উৎস ছাড়া কোনোকিছুই অনির্দিষ্টকাল চালু থাকতে পারে না। অর্থাৎ নিজে নিজেই শক্তি উৎপাদন, সেটা সম্ভব নয়। মোদ্দা কথা, এ সূত্রের মূলমন্ত্র হলো শক্তির নিত্যতা বা সংরক্ষণ (conservation of energy)।

ত্রিসূত্রের দ্বিতীয়টি, যা 'তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র' বলে খ্যাত, সেটাই হলো গোটা বিষয়টির প্রাণ। এ থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা গজিয়েছে, ছড়িয়েছে নানা দিকে। এর প্রয়োগ সর্বত্র। এতে বিজ্ঞান আছে, গণিত আছে, এমনকি দর্শনও। এর অনেক রহস্য। এর বক্তব্য হলো যে প্রকৃতির দৃষ্টি সব সময় এক দিকে। সংসারে যা কিছু ঘটে সবকিছুরই লক্ষ্য এক শান্ত অবস্থাতে, বা সাম্যাবস্থার (equilibrium) পরিস্থিতিতে পৌঁছানো। এ সড়ক একমুখী—উল্টো দিকে যাবার উপায় নেই। এটা one-way। একটা বায়বীয় পদার্থকে যদি নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, অন্য কারো সঙ্গে কোনোরকম সংস্পর্শের সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে বেচারির একটাই গতি—একটা স্থিতাবস্থাকে লক্ষ্য করে সেদিকেই চোখকান বন্ধ করে ছোটা। ধরুন ঘরের এক কোনাতে একটা কৌটার মুখ খুলে একটু রঙিন গ্যাস ছেড়ে দিলেন। তারপর চেয়ে দেখুন গ্যাসটির মতিগতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ঘরের বাতাসের

সঙ্গে মিশে নিজের রঙ তো হারাবেই, আলাদা কোনো অস্তিত্বই বোঝা যাবে না তার। অর্থাৎ এই তার স্থিতাবস্থা, এতেই তার শান্তি। শুধু তার নয়, তার পরিপার্শ্বেরও।

এই যে একমুখী গতি প্রকৃতির, একে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন entropy-এর ক্রমবর্ধমান চরিত্র। এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। আপাতত 'এন্ট্রপি' বলেই চালিয়ে দেব আমরা এ বইয়ে। একে দাড়িপাল্লা দিয়ে মাপজোক করা যাবে না, সেই শক্তিরই মতো। এর বৈশিষ্ট্য হলো যতক্ষণ না স্থিতাবস্থা স্থাপিত হচ্ছে ততক্ষণ ওটা বেড়েই যাবে, বেড়েই যাবে, নিরন্তর।

এই বেড়ে যাওয়াটা, প্রকৃতির একটি দৃষ্টিগোচর বৈশিষ্ট্য হলেও, প্রকৃতির অন্যান্য নিয়মকানুনের সঙ্গে যে পুরোপুরি খাপ খায় তা নয়। যেমন নিউটনের গতিবিষয়ক ত্রিসূত্রের যে চিত্রটি আমরা একটু আগেই দেখলাম, সে তত্ত্ব অনুযায়ী, একটা অণু যদি একসময় একটা বিশেষ দিকে ভ্রমণ করে কোনো কারণবশত, তাহলে তাত্ত্বিকভাবে, তার কোনো বাধা নেই একটু পরে ঠিক বিপরীত দিকে চলতে শুরু করা। এটাকে বলা হয় reversibility-বৈপরীত্য। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, আণবিক পর্যায়ে গতির কোনো বিশেষ দিক বিচারের পক্ষপাতিত্ব নেই। অথচ উল্লিখিত উদাহরণটি যেন বলতে চাইছে যে প্রকৃতির বাহ্যিক ব্যবহার কিন্তু তা নয়। শিশি থেকে ছাড়া পাওয়া সেই রঙিন বাতাসের গোলাটি ঘরের বাতাসের সঙ্গে মিশে যাবার পর কোনো অবস্থাতেই সে আর ঘরের কোনাটিতে ফিরে যাবে না, নিউটনের গতিতত্ত্ব যা-ই বলুক না কেন। দুই তত্ত্বে এই যে বিরোধ, বা আপাতবিরোধী, এর রহস্য উদ্ধার করবার ভাবনা নিয়েই জন্ম নেয় বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা—পারিসাংখ্যিক বলবিদ্যা (statistical mechanics)। এর প্রধান উদ্দেশ্য ধ্রুপদি অণুভিত্তিক বলবিদ্যা (classical mechanics) ও তাপবলবিদ্যা (thermodynamics), এদুয়ের মাঝে সেতু স্থাপন করে একটা বোঝাপড়া সৃষ্টি করা, দুয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করা। অর্থাৎ অণুর গতিবিজ্ঞান দিয়েই অণুপুঞ্জের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা আবিষ্কার করা। অন্যভাবে বলতে গেলে reversibilityর আইনকানুনের সঙ্গে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় দু-চারটে

আইডিয়া যোগ করে (probabilistic concepts) সামগ্রিক গতির irreversibility-কে যুক্তির আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করা। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়গুলো নিয়েই একটু সময় কাটাব। পাঠক হয়তো ভাবছেন এতে তো 'শূন্য' বা 'অসীমে'র কোনো ভূমিকা দেখছি না। একটু ধৈর্য ধরুন, 'শূন্য' যথাসময়ে দেখা দেবেই, অনাহূত অতিথির মতো সে যখন-তখন চলে আসে না বলে-কয়েই।

আর হ্যাঁ, তাপবলবিদ্যার তৃতীয় সূত্রটি নিয়ে টুঁ শব্দটি করলাম না, সেটাও হয়তো সজাগ পাঠকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এটি মূলত তাপমাপন যন্ত্র (যেমন নিত্যব্যবহৃত থার্মোমিটার) তৈরি করার কী নিয়ম সে বিষয়টির বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি নিয়ে সম্পৃক্ত। মজার ব্যাপার যে এ আইনটিকে মাঝে মাঝে 'zeroeth law of thermodynamics' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কৌতূহলী পাঠককে তার বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিজ্ঞানের বই ঘাঁটতে হবে।

তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়

পরিসংখ্যানিক বলবিদ্যা বিষয়টি একটি নিজস্ব রূপ নিতে শুরু করে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। কিন্তু এর মূল আইডিয়াগুলোর গোড়াপত্তন হয়েছিল অনেক আগেই, সেই গ্রিক আমল থেকেই বলা যায়, যার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। তারপর সেসব আইডিয়া বিবর্তিত হতে হতে ড্যানিয়েল বার্নলির হাতে বাষ্পীয় গতিতত্ত্ব (kinetic theory of gases) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো সেই আণবিক বিশ্বাস-সূক্ষ্ম, আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে পদার্থের মৌলিক রূপ হলো কণা, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, যা খালি চোখে দেখার কোনো উপায়ই নেই, যা চিরচঞ্চল, চির-অস্থির, যাদের সংখ্যা গুণিতব্যতার বাইরে, কোটি, অর্বুদ-নির্বুদ, এ-জাতীয় কোনো সংখ্যাই যাদের সঠিক পরিমাপ দিতে পারবে না। তবু অকাট্য এবং অখণ্ডনীয় বাস্তব হলো যে পদার্থ মাত্রই কণা—জল, বায়ু, পাথর, মানুষ, গাছ, ফুলের তোড়া, পাহাড়, নদী, যা কিছু দিয়ে রচিত হয়েছে এই বিশ্বভুবন। এই মৌলিক ধারণা

থেকেই উৎপত্তি তাপবলবিদ্যার বিবিধ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা শুধু নয়, তাদের যৌক্তিক শৃঙ্খলার মধ্যে সংজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়াস। যেমন বস্তুর ঘনত্ব বলতে কী বোঝায়? তাপই বা কী? চাপ? সান্দ্রতা (viscosity)? একটা জিনিস গরম বা ঠাণ্ডা হলে কী হয়? আবহাওয়ার খবরে বায়ুচাপ কমে গেলে বলা হয় 'লো প্রেসার' অর্থাৎ বৃষ্টিবাদলের সম্ভাবনা। চাপ বেড়ে যাওয়া মানে মেঘ কেটে সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া। এসবের পেছনে অণুপুঞ্জের কী ভূমিকা, সেটাই হলো বাষ্পীয় গতিবিদদের গবেষণার বস্তু। ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক একটি—'তাপ'-এর সংজ্ঞা কী? অণুরা চিরচলমান, এক মুহূর্তও থেমে নেই তারা। কিন্তু সংখ্যায় এত বিশাল তারা যে নড়তে গেলে একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে বাধ্য—একটি এক ঘনমিলিমিটার মাপের কৌটোর ভেতর আনুমানিক 2.75×10^{16}টি কণা বা মলিকিউল আছে বলে ধারণা করা হয়, স্বাভাবিক তাপ এবং বায়ুচাপের পরিবেশে। ষোলোটি শূন্য বসিয়ে সংখ্যাটি লেখার চেষ্টা করুন, আপনার ঘাম ছুটে যাবে (১০ভিত্তিক গণনাপদ্ধতির বিরাট সুবিধার মধ্যে এই একটি)। চিন্তা করুন, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কত কণা আছে! কথা হলো ধাক্কা লাগার পর কি হয় কণাগুলোর? তারা অন্যদিকে চলে যায়। অন্যদিকে আবার ধাক্কা খায়, ক্রমাগত ধাক্কা খেয়েই যাচ্ছে। যতই ধাক্কা খায় ততই তাদের উত্তেজনা বাড়ে, অর্থাৎ গতিবেগ বাড়ে। যতই গতি বাড়ে ততই বাড়ে ধাক্কার মাত্রা। এভাবে একটা হুলস্থূল বেধে যায় তাদের মধ্যে। তার ওপর বাইরে থেকে যদি আরো উস্কানি দেওয়া হয় (উত্তেজনা বাড়ানোর মতো কোনো বিশেষ তেজ প্রয়োগ, যেমন চুলায় আগুন ধরানো), তাহলে তো কথাই নেই। মহা উত্তেজিত হয়ে তারা চতুর্দিকে ছুটোছুটি করতে শুরু করবে। এই যে উত্তেজিত হয়ে ছোটা, সেটা যদি কোনোভাবে মাপার উপায় থাকত তাহলে দেখতেন কণাগুলোর গতির একটা গড় বিন্দু (centre of mass) আছে, সেই গড়ের চারপাশে যে এলোপাতাড়ি (random) ছুটোছুটি করা তার গড়কেই বলা হয় 'তাপ' (এই গড় নির্ধারণ করারও একটা নিয়ম আছে, নির্ভর করে কণাগুলোর কী বৈশিষ্ট্য, কোন পদার্থের কণা তারা, ইত্যাদি)। মোটকথা, তাপ হলো উত্তেজিত কণাসমূহের উত্তেজনা-মাত্রার একটা গড় পরিমাপ। উত্তেজনা কমে গেলে তাপ পড়ে যায়। সে কারণে

কোথাও আগুন লাগলে চারদিকের দালানকোঠা, বায়ু জল গাছ প্রাণী সব গরম হয়ে ওঠে, আবার জল ঢাললেই শান্ত হতে শুরু করে। সবই সেই উত্তেজনার ওঠানামার ব্যাপার।

পাঠক যেন ভেবে না বসেন যে অণুপুঞ্জের গতি দিয়ে তাপ ব্যাখ্যা করা যত সহজ অন্যগুলোকে হয়তো তত সহজে ব্যাখ্যা করা যায়না। অবশ্যই যায়। শুধু জানতে হয়, সেই 'গড়' নেওয়া ব্যাপারটা কী। সাধারণ কতগুলো গাণিতিক সংখ্যার গড় আর এই গড় ঠিক এক নয়, খানিক টেকনিক্যাল বিষয় আছে এতে। ওই পথ না হয় এড়িয়েই যাই আজকে। হাজার হলেও আমরা লিখছি 'শূন্য' নিয়ে, এখানে পরিসংখ্যানবিদ্যার খুঁটিনাটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলেও চলে।

বিশ্বসৃষ্টির মূল চারটে উপাদান—মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি। আদিম হিন্দুধর্মের মূল দর্শনের অন্যতম ভিত্তিই ছিল এটি। পরে অ্যারিস্টটলও ঠিক একই কথা বলে গিয়েছিলেন। এর সব কটিই জীবজগতের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয়—একটা গ্রহে যে জীবিত কিছু থাকা সম্ভব তার প্রধান পরীক্ষাই এ উপাদান-চতুষ্টয়ের উপস্থিতি কেবল নয়, প্রাচুর্যও। আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য প্রথম তিনটে উপাদানের মূল উপকরণের মধ্যে যে কণার প্রাধান্য আছে সেটা হয়তো খুব দুর্বোধ্য নয়, কে জানে হলে হতেও পারে। চামড়ার চোখে যখন দেখবার উপায় নেই, এমনকি অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা সহজ নয়, তখন বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মুখের কথা বিশ্বাস ছাড়া উপায়ই বা কী আমাদের। কিন্তু যেটা কিছুতেই বিশ্বাস হবার নয়, মনে হবে এর চেয়ে বড় ধাপ্পা আর হতে পারে না (আমরা কিছু বুঝিসুঝি না বলে মাথায় হাত বুলিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে), সেটা হলো আলো, যা আমরা সূর্য থেকে পাই, যা বাতাসের মতো কখনো শান্ত কখনো উথাল, যা পানির মতো নদীনালা ভরে রাখে না, যা মাটির মতো শক্ত নয়, তাতে আবার কণা থাকতে পারে কেমন করে। এবং অনেকটা সে কারণেই, অন্য তিনটি উপাদান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তার প্রকৃতি, তাই আলো ছিল চিন্তাবিদ, দার্শনিক আর বিজ্ঞানীদের চিররহস্যের বিষয়। একেক

যুগে একেক মনীষী আলোর একেকটি দিক নিয়ে তাঁদের ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আলো জিনিসটা আসলে কী সে রহস্যের মোড়ক উদ্ঘাটন হতে বেশ কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজ্ঞানজগৎকে। রেনেসাঁর ইউরোপেই সম্ভবত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে শুরু করে আলোর ওপর। আইজ্যাক নিউটনের অন্যতম নেশাই ছিল আলো নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কাচের ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করার পর কী হয় তা দেখতে। সাধারণ কাচে চমকদার কিছু ঘটে না বলে তিনি একটা ত্রিকোণী কাচ (prism) নিয়ে তাতে আলো ফেললেন। ও মা! আজব জিনিস ঘটতে শুরু হয়। সাদা আলো নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ে—একটি নয়, দুটি নয়, পাকা সাতটি রঙ, লাল থেকে শুরু করে নীল, বেগুনি পর্যন্ত।

হাইগেন্স

দারুণ মজার ব্যাপার। ঠিক যেমন করে বর্ষার পর কখনো কখনো আকাশজুড়ে রংধনু ছড়িয়ে পড়ে নানা রঙের পুচ্ছ ধারণ করে। আলো আর ত্রিকোণী কাচের এই মজার খেলা তাঁর আগে কারো চোখে পড়েনি, কিন্তু এটা ছিল আলোবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটির একটা ব্যাখ্যা

পাওয়া গিয়েছিল পরে, কিন্তু নিউটন নিজে যা ভেবেছিলেন তা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর ধারণা ছিল, অন্যান্য বস্তুর মতো আলোও অণু দিয়ে তৈরি। কাচের ভেতর দিয়ে যাবার সময় বিভিন্ন জাতের কণা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে যায় বলেই নানা বর্ণের শোভা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কিন্তু এই অণুতত্ত্ব মনঃপূত হয়নি ইউরোপের সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানী-জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্সের (১৬২৯-৯৫)। নেদারল্যাণ্ডসে জন্মলব্ধ এই অসাধারণ মানুষটিরও ছিল বহুমুখী প্রতিভা, যিনি ষোলো বছর বয়সেই সে সময়কার সবচেয়ে প্রভাবশালী ইউরোপিয়ান দার্শনিক-বিজ্ঞানী-গাণিতিক ডেকার্টের কিছু কাজকর্মের ভুলভ্রান্তি ধরতে পেরেছিলেন, যদিও সেটা প্রকাশ্যে প্রচার করার মতো সাহস তখনো হয়নি তাঁর। আলোর প্রকৃতি নিয়ে তাঁরও দারুণ কৌতূহল ছিল। বেশ কিছু মূল্যবান কাজও করে গেছেন তার ওপর। তাঁর মতে, আলোর বৈশিষ্ট্য অণু নয়, তরঙ্গ। ঠিক কিসের তরঙ্গ তা অবশ্য আবিষ্কার হয়নি তখনো, সেটা পুরোপুরি উদ্ঘাটন হতে আরো অনেক সময় লেগেছিল। যা-ই হোক- কণা না ঢেউ এ নিয়ে বিলেত আর ইউরোপে বড় রকমের কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়নি যেমনটি হয়েছিল ক্যালকুলাসের আবিষ্কার নিয়ে। তার প্রধান কারণ, আলোর প্রকৃতি নির্ভুলভাবে বুঝতে হলে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয় তার উপযোগী যথেষ্ট যন্ত্রপাতি তখনো আবিষ্কার হয়নি।

তবে আলোকরশ্মির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছিল টমাস ইয়াং (১৭৭৩-১৮২৯) নামক এক ব্রিটিশ পদার্থবিদের কাছে, যা থেকে তার তরঙ্গতার সপক্ষে একটি বড় যুক্তি দাঁড় হয়ে যায়। এই ভদ্রলোকও শুধু পদার্থবিজ্ঞান নিয়েই পড়ে থাকতেন না, আরো একটা বড় গুণ ছিল তাঁর। একদিকে এডিনবার্গ আর কেম্ব্রিজ থেকে ছিল বিজ্ঞানের ডিগ্রি, আবার জার্মানির গেটিঙ্গেন থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রি ১৭৯৬ সালে। উপরন্তু তিনি ছিলেন নামকরা মিসরবিশারদ পণ্ডিত। সেকালের মানুষ বর্তমান যুগের মতো অতি-বিশেষত্বের বাতিকে ভুগতেন না বলেই হয়তো তাঁদের বিশ্বদৃষ্টি ছিল বিশ্বব্যাপীই বিস্তৃত।

এখন বলি তরঙ্গের এই ‘পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-সংঘাত’ ব্যাপারটা কী। বৈজ্ঞানিক ভাষায় একে বলা হয় Interference (ব্যতিচার)। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। বস্তুজগতে যে তরঙ্গ আছে তা চামড়ার চোখে দেখবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কোনো জলাশয়ের সামনে দাঁড়ানো—খুদে খুদে খালবিলেতেও ঢেউ ওঠে, যত ছোটই হোক সে ঢেউ। শান্ত পুকুরে একটা ঢিল ছুড়ুন। কী হবে? ঢিলটি টুপ করে পড়ার সাথে সাথে পরিপার্শ্বের জল খানিক উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এবং সে উত্তেজনা (তেজ, energy) ঢেউয়ের আকারে ছুটবে চারদিকে, নিখুঁত বৃত্ত রচনা করে, যেন মা-প্রকৃতির কাছ থেকে এমনি করে সার বেঁধে চলারই শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তারা। এক মুহূর্ত পরে আরো একটা ঢিল ছুড়ুন প্রায় একই জায়গা তাক করে। এবার কী দেখা যাবে? দ্বিতীয় ঢিলটি দ্বিতীয় বৃত্তমালা সৃষ্টি করবে। দুটি ঢিলের দুটি বৃত্তস্রোত যখন একসাথে মেলে তখন কী চোখে পড়বে? ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে কোনো কোনো জায়গায় ছোট ছোট ঢেউগুলো একসাথে মিলে বেশ বড়সড় একটা ঢেউ বানিয়ে ফেলেছে, আবার কোথাও তারা পরস্পরের ‘পায়ে ল্যাং মেরে’ দুজনই কাত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ কোনো ঢেউই থাকছে না। দুটি পাশাপাশি মোটরবোটের পেছনে ফেলা ঢেউরাশির মাঝামাঝি একটা জায়গাতে লক্ষ করলে মনে হবে সব শান্ত, লঞ্চ বা নৌকা কোনোকিছুরই আনাগোনা ছিল না সে জায়গাটুকুতে বিগত সময়টুকুর মধ্যে। এই ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো এই যে, ব্যতিচার প্রণালিতে দুটি ঢেউ যখন একই কলাতে (phase) চলে তখন তাদের সম্মিলিত তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যাতে করে ঢেউয়ের উচ্চতাও বেড়ে যায়। কিন্তু যখন কলাবৈষম্য ঘটে তখনই তারা পরস্পরের গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়, এক হিসেবে, যার ফলে দুটি ঢেউয়ের কোনোটিরই নিজস্বতা বজায় থাকে না। এটা শুধু পানিতে নয় শব্দেও লক্ষ করা যাবে, কারণ শব্দও একপ্রকার ঢেউ। শব্দতরঙ্গের জারক ও বাহক হলো বায়ু। বায়ুতে চাপ দিলে কুঁচকায়, চাপ তুলে নিলে ফাঁপে (অনেকটা হাপরের মতো)। এই চাপা-ফাঁপা থেকেই সৃষ্টি হয় শব্দের শক্তি, যা সৃষ্টি করে বায়ু-কম্পন এবং যার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে শব্দরূপে। শব্দতরঙ্গের সবচেয়ে নাটকীয় প্রদর্শনী দেখতে

চাইলে একটা পশ্চিমা অর্কেস্ট্রাতে যান, দেখবেন কত বিচিত্র তরঙ্গের কত বিচিত্র ধ্বনি কেঁপে কেঁপে উঠছে হাজারটে বাদ্যযন্ত্র থেকে, কত সহস্র ব্যতিচার (out of phase) আর সমচার (in phase) তরঙ্গ মিলে রচনা করে যাচ্ছে এক সম্মোহনী সুরের জগৎ।

অনুরূপ ঘটনা ঘটে আলোর জগতেও—শুধু খালি চোখে সে ঢেউ দেখবার কোনো উপায় নেই। খালি চোখে যেটা দেখবার উপায় আছে সেটা হলো রঙের বাহার-সাদারঙ, লাল, কালো, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনি। একটাতে চোখধাঁধানো রক্তিম উজ্জ্বলতা, আরেকটাতে শীতল কোমলতা। আরেকটি হয়তো এরকম যে গায়ে লাগলে চামড়া পোড়ার উপক্রম হয়। এদের একেকটির একেক বৈশিষ্ট্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন 'দৈর্ঘ্যের' জন্য। আজকাল সবার বাড়িতেই নানা রকম ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যের ছড়াছড়ি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই বলতে গেলে হাজার রকম ওয়েভলেংথ আর ফ্রিকোয়েন্সির ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বাড়ির পেছনে ফুলের বাগান করে রঙের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার উপায় হয়তো আমাদের নেই আগের মতো, কিন্তু শব্দ ও আলোকরশ্মির তরঙ্গ-বৈচিত্র্য দিয়ে বাসগৃহের তরঙ্গকানন অবশ্যই আমরা কানায় কানায় পূর্ণ করে রাখতে পারছি।

আইজ্যাক নিউটন তাঁর ত্রিকোণী কাচের কুহরে ফেলা শুভ্র আলোর সপ্তবর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবার তাৎপর্য এই ছিল যে সাদা আলোর মাঝেই আছে নানা বর্ণের আলোকণার বীজ—যাদের একেকটির একেক দৈর্ঘ্য থাকার কারণে একেক রঙের পুচ্ছ ধারণ করে স্বচ্ছ কাচের ঘন মাধ্যম দিয়ে প্রবেশ করবার পর। এই রঙগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই এবং এরা আমাদের চোখের কোনো ক্ষতি করে না, কারণ এরা অপেক্ষাকৃত মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের ঢেউ, যাদের তেমন ক্ষতিকর উপকরণ নেই। সবচেয়ে বাড়া হলো লালের দৈর্ঘ্য, এবং দৃষ্টিসীমার সবচেয়ে হ্রস্ব হল বেগুনি। আলোকরশ্মির দৈর্ঘ্য মাপার বৈজ্ঞানিক একক হলো 'এংস্ট্রম' [সুইডিশ বিজ্ঞানী এ যে এংস্ট্রমের (১৮১৪-৭৪) নামানুসারে], অর্থাৎ 10^{-10} মিটার। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে

আজকাল 'ন্যানোমিটার'ও ব্যবহার করা হয়। ১ ন্যানোমিটার মানে ১/১,০০০,০০০,০০০ মিটার। সে হিসেবে লাল রঙের দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার, আর বেগুনির ৪০০। বেগুনিরও রকমফের আছে-৪০০-এর নিচে চলে গেলেই যাকে বলে short wave (হ্রস্ব তরঙ্গ)-এর এলাকায় চলে আসে। এগুলো খালি চোখে দেখবার উপায় নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে কটি নাম তার মধ্যে এক্স রে আর আল্ট্রাভায়োলেটের কথা আমরা নিত্যই শুনে থাকি। ওদিকে আবার লালের চেয়ে লম্বা ঢেউ হলেও বিপদ—সেগুলোও আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। Infrared, microwave—এগুলো হলো লম্বা তরঙ্গের উদাহরণ।

এবার আমরা মূল বিষয়টির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। লম্বা আর খাটো ঢেউ বলতে কী বোঝায়? পানির ঢেউ নাহয় খালি চোখেই দেখতে পারি, ঢেউগুলো কিভাবে ওঠানামা করছে তা পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু শব্দ আর আলোর ঢেউ চোখে দেখব কী করে? ওগুলোর দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝায়? তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা পেতে চাইলে মনে মনে একটা পাহাড়ি অঞ্চলের ছবি আঁকুন, যেখানে অনেকগুলো উঁচু-নিচু টিলা আছে। টিলাগুলো নড়ছে না বটে, কিন্তু দূর থেকে দেখতে তো ঢেউয়ের মতোই মনে হবে। এবার কল্পনা করুণ দুটি পাশাপাশি ঢেউয়ের মাঝের দূরত্বটুকু-পাহাড়ের ওপর এর কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাতাসেও ঠিক এমনি-রকম ঢেউ তৈরি হচ্ছে নিত্য-নিয়ত, শব্দ ও আলো উভয়ক্ষেত্রে। এই যে দুটি লাগালাগি 'টিলা', তাদের যে দূরত্ব তাকেই বলা হয় ওয়েভলেংথ। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই হলো যে ৪০০-এর নিচে আর ৭০০-এর ওপরে যে তরঙ্গ তার আলো দৃষ্টিগোচর নয়, এবং তা সাধারণ ব্যবহারের জন্যও খুব উপযোগী নয়।

ক্ষুদ্র জগতের ভিন্ন আইন: কোয়ান্টামের জন্ম

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই যে ছোট ঢেউ আর বড় ঢেউয়ের কথা বলছি, যা চোখে দেখা যাচ্ছে না, এদের দৈর্ঘ্য নাহয় মানা গেল, কিন্তু এই দৈর্ঘ্য-ভেদের তাৎপর্যটা কী? তাৎপর্য হলো দুটির দুরকম তেজ (energy)। দৈর্ঘ্য যত ছোট

হয় ততই বেশি তাদের কম্পনাঙ্ক (frequency), যার ফলে ততই তাদের তেজ-বিক্রম। তেজ না হলে কাঁপুনির মাত্রা বাড়বে কেমন করে। আল্ট্রাভায়োলেট, যা আমরা চোখে দেখি না, অথচ সারা দিন রোদে পুড়লে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি গায়ে লেগে চামড়ার সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মাত্রাতিরিক্ত রঞ্জনরশ্মি (X-ray) গায়ে লাগলে তার যে বিকিরণ-শক্তি সেটা একসময় ক্যান্সাররূপে দেখা দিতে পারে। যা-ই হোক, মাঝারি দৈর্ঘ্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য রশ্মিগুলো, লাল থেকে বেগুনি, সেগুলো সাধারণ সাদা আলোর উপকরণ হওয়াতে সাদা আলো যখন বর্ষণস্নাত আকাশে রংধনুর বর্ণালিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন কবির চোখে পড়ে আকাশজোড়া রঙের খেলা, আর বিজ্ঞানী দেখেন মেঘেরা কী অদ্ভুত উপায়ে সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল ত্রিকোণী কাচের আকার নিয়ে। সাদার মাঝে লুকিয়ে থাকা নানা দৈর্ঘ্যের নানা রঙ নিজ নিজ পথে নিজ নিজ গতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু সমদৈর্ঘ্য হলে কী হবে, তাদের সেই পরস্পরের পথ রুখে (interference) দাঁড়াবার স্বভাবটি দূর হবার নয়। সেটাই লক্ষ করেছিলেন ইয়াং সাহেব তাঁর ১৮০১ সালের পরীক্ষাতে। পুকুরের জলে কাছাকাছি দুটি ঢিল ছুড়লে ঢেউগুলোর যে দশা হয় আলোতেও অনেকটা একই রকম ঘটনা ঘটে। একটা মোমবাতি জ্বালুন ঘরে। অদূরে একটা পিচবোর্ডের বড়সড় পাত দাঁড় করিয়ে ছোট্ট একটা ছিদ্র করুন মাঝখানে। সেই ছিদ্রের অপর পাশে আরো একটা পাত দাঁড় করান, ছিদ্রমুক্ত। দেখবেন ওদিকের মোমবাতির আলো এসে এদিকের পর্দাটিকে আলোময় করে তুলল, এবং সে আলোতে কোনো ফাঁকফোকর নেই। এবার এক কাজ করুন, ওই ছিদ্রটির খুব কাছে আরো একটি ছিদ্র করুন, তারপর দেখুন, বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখুন, ওপাশে কী হচ্ছে। দেখবেন যে দুটি ছিদ্র দিয়ে ঢোকার পর আলোরেখাগুলো অনেক জায়গায় পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে উজ্জ্বলতর করে তুলছে জায়গাটা, আবার কোনো কোনো জায়গায় পরস্পরকে বাধা দিয়ে একেবারে অন্ধকার সৃষ্টি করে ফেলছে। এই হলো ইন্টারফেরেন্সের লক্ষণ। এতে কী প্রমাণিত হয়? আলো যদি ইট-পাথরের মতো কণাজাত হতো তাহলে কি এরকম আচরণ হতো তাদের? মনে হয় না। সুতরাং এ পরীক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর

পদার্থবিদ্যা-জগতে বদ্ধমূল বিশ্বাস এনে দেয় যে আলো আসলেই একপ্রকার ঢেউ। যার অর্থ দাঁড়ায় যে হাইগেন্সের ধারণাই ঠিক, নিউটনেরটি নয়। ঠিক কী ধরনের ঢেউ সেটা আবিষ্কার হয় আরো খানিক বাদে— এ হলো তড়িৎ-চৌম্বক-তরঙ্গ, যার প্রকৃতি শব্দতরঙ্গ থেকে আলাদা। শব্দ চলে সোজাসুজি, একেবারে নাক বরাবর (longitudinal), আর আলো যায় আড়াআড়ি (transverse), তেরচা পথে । অর্থাৎ তেজ ছোটে একদিকে, আর ঢেউ চলে তার সমকোণে। এই তরঙ্গতত্ত্বটি বিজ্ঞান-জগতের অকাট্য বেদবাক্যের রূপ ধারণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। শুধু তা-ই নয়, পদার্থের অণুতত্ত্বে বিশ্বাসী, এবং অণুবিশ্বাস দিয়ে প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যাদানের যে প্রচেষ্টা পরিসংখ্যান-তাত্ত্বিকদের, সেই বিশ্বাসের সঙ্গেও এর সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অণুতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী বস্তুর দ্রুতচারী কণাগুলো চলার বেগে তেজের তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে কোনো-না-কোনোভাবে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আলোর বিকিরণে। কণা যত গতিশীল তত তাদের তাপ, তত তাদের তেজোশক্তি, এবং ততই তাদের আলোবিকিরণ। এ-দুয়ের মাঝে সেতু বেঁধে দেন লুডভিগ বলজম্যান (১৮৪৪-১৯০৬) ও জোসেফ স্টেফান (১৮৩৫-৯৩) নামক দুই অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ। তাঁদের তত্ত্বটি স্টেফান-বলজম্যান সূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুযায়ী একটা 'আদর্শ বস্তু' (ideal body) যাকে কৃষ্ণদেহী (black body) বলে আখ্যায়িত করা হয় বিজ্ঞানে, তার বিকিরণের পরিমাণ হল ওটির যে তাপমাত্রা তার চারঘাতী অনুপাতে (fourth degree)। উদাহরণস্বরূপ, তাপ যদি হয় 2 ডিগ্রি, বিকিরণ হবে 2^4 । তদানীন্তন বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এ ছিল আলোর তরঙ্গতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান-তত্ত্বের পরম মিলনসূত্র। এতে শুধু কতখানি আলো বিকীর্ণ হচ্ছে তা-ই নয়, সাথে সাথে কতটা তাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেটাও প্রকাশ পাচ্ছে। কথিত আছে যে এ সূত্রের সাহায্যে কোনো এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অঙ্ক কষে বের করেছিলেন যে স্বর্গের আনুমানিক তাপমাত্রা হলো ৫০০ ডিগ্রি (ধ্রুবস্কেলে)!

কিন্তু কণাবিজ্ঞান আর আলোবিজ্ঞানের এই মধুর মিলন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ব্রিটেনের লর্ড রেলে আর স্যার জেমস জিন্সের একটি পরীক্ষায় পূর্ববর্তী তত্ত্বের আংশিক সমর্থন ছিল বটে, সাথে সাথে কতিপয় প্রশ্নও দাঁড় হয়ে যায়। তাঁরা মাঝারি মাপের ঢেউ নিয়ে কাজ করেছিলেন বলে তাঁদের প্রদত্ত সূত্রটি ঢেউ ছোট হলে যে তাপ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা পুরোপুরি ধরা পড়েনি। তবে যেটা ছিল সুস্পষ্টভাবেই সেটা হলো বিপদের আভাস। সত্যি তো, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি কমতে কমতে শূন্যের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তাপমাত্রাও বাড়তে বাড়তে সীমার বাইরে চলে যাবে। তাহলে তো সর্বনাশ। যেন কেয়ামতই এসে যাবে, বিশ্বজগৎ সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

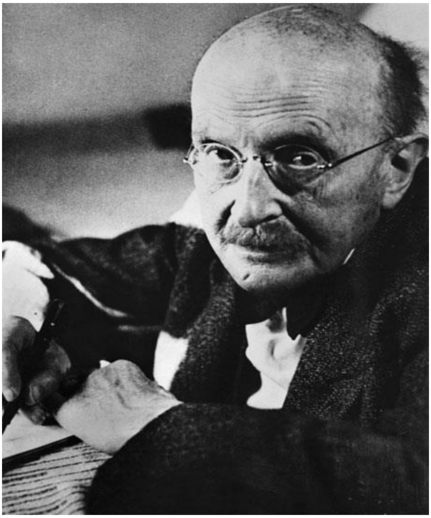

ম্যাক্স প্লাঙ্ক

এখানে আবার সেই 'শূন্য' আর 'অসীম' এসে উঁকি মেরে জানান দেয় তাদের উপস্থিতি। এই ভয়াবহ সম্ভাবনাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'রঙ্গোত্তরের বিপর্যয়' (ultraviolet catastrophe)।

আশু মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা কোনো সত্যিকার বিজ্ঞানমনা মানুষের চিন্তায় গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। সুতরাং গণ্ডগোলটা নিশ্চয়ই প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতেই পদার্থবিদেরা আবিষ্কার করলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নামক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিষয়, যা সাধারণ বুদ্ধিকে হার মানায়, আদিকালের সমস্ত অভ্যস্ত, চিরাচরিত বিশ্বাসকে প্রতিহত করে, বিজ্ঞানবহির্ভূত জগৎকে হতভম্ব করে দেয়। এই তত্ত্বের আদিজনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) নামক এক তীক্ষ্ণধী পদার্থবিজ্ঞানীকে, যদিও জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে তার একক জনক হিসেবে চিহ্নিত করা খুব বিচক্ষণ বলে গণ্য করা হয় না, যার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে একবার।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক গোড়া থেকে নিশ্চিত ধারণায় ছিলেন যে রেলে-জিন্সের সহজ সমীকরণ হয়তো একটু অতিরিক্ত সহজ, যা সব ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য সম্ভবত নয়। এটা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শূন্যতে পৌঁছানোর অবস্থা দাঁড়াবার সাথে সাথে তার তেজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আকাশ ছোঁবার অবস্থায় এসে যাবে। রেলে-জিন্সের সূত্র ব্যবহার করতে গিয়ে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তো মুশকিল। সুতরাং কিছু একটা করা দরকার। একটা নতুন কিছু, একটা মৌলিক কিছু। আপাতদৃষ্টিতে রেলে-জিন্সের সূত্রে বিজ্ঞান অনুযায়ী কোনো ফাঁকফোকর দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান দিয়ে এর সমাধান খোঁজা অর্থহীন। তিনি ঠিক করলেন, রেলে-জিন্স যে বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বিজ্ঞানই ভুল। পারমাণবিক জগতে হয়তো সে বিজ্ঞান অচল। বড় আকারের পদার্থবিষয়ক জগৎ যেসব নিয়মকানুন মেনে চলে, ছোট কণাদের জগতে সে নিয়ম অকেজো। ম্যাক্স প্লাঙ্ক এক দুঃসাহসী চিন্তা নিয়ে খেলা করতে লাগলেন মনে মনে—ছোট কণারা বড়দের মতো একটানা রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলে না, তারা চলে অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে, ব্যাং যেমন করে চলে। সাধারণ বুদ্ধিতে এটা কল্পনা করা কঠিন, কারণ আমরা থাকি

বড়দের পৃথিবীতে, সুতরাং আমরা বড়দের আইনকানুনেই অভ্যস্ত। আমাদের পক্ষে কল্পনা করা শক্ত যে, মনে করুন, একটা গাড়ির গতিবেগ শূন্য থেকে এক লাফে দশ মাইল বেগে উঠে যাবে, তারপর যত চেষ্টাই করুন, দশ থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে উঠতে এগারো বারো ইত্যাদিতে না গিয়ে চলে যাবে কুড়িতে, তারপর চুপচাপ, পরে হঠাৎ করে ত্রিশ। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ শুনেছে কোনো দিন? না, আমাদের বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষের কেউ শোনেনি। শোনেনি কারণ এরকম ঘটনা ছোটদের রূপকথার বই ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু জার্মানির সেই দুঃসাহসী যুবক ঠিক সেই প্রস্তাবই পেশ করলেন বিজ্ঞানজগতে এবং তাঁর সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে যে এই ধারণার ভিত্তিতে যে ফলাফল তিনি পেয়েছেন সেটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রেলে-জিন্সের সীমাহীন তেজ বৃদ্ধির পরিবর্তে একটা পর্যায়ে গিয়ে তেজ আসলে বাড়ার পরিবর্তে কমতে শুরু করে। এই ব্যাপারটিকে নামকরণ করা হলো 'কোয়ান্টাম' (quantum)। পারমাণবিক পর্যায়ে বস্তুজগতের বাস্তবতা ভিন্ন আইনের বশবর্তী হয়, সেখানে অণুকণার গতিবিধি, তাদের তেজ-শক্তি, নিরবচ্ছিন্নতার চরিত্র হারিয়ে খণ্ডীভূত, কাটাকাটা চিত্র ধারণ করে। সেখানে পৃথিবী খোপে খোপে ভাগ করা, এক খোপ থেকে আরেক খোপের মাঝে একটা ফাঁক আছে। তেজের বেলায় এই 'খোপ'গুলোকে বলা হয় এনার্জি লেভেল। গ্যাস প্যাডেলে যত চাপই দিন না কেন গাড়ির গতিবেগ শূন্য থেকে এক লাফেই হয়ত দশে উঠে যাবে, ক্রমে ক্রমে প্রতিটি অঙ্ক পার হয়ে উঠবে তা নয়।

অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানজগতে এধরনের আজগুবি চিন্তার কোনো প্রশ্রয় ছিল না। তাঁরা ম্যাক্স প্লাঙ্কের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি, কারণ তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী রেলে-জিন্স সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান তো ছিলই, কিন্তু তাঁরা প্লাঙ্কের গাঁজাখুরি তত্ত্ব বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন, এ এক তরুণ উচ্চাভিলাষী বিজ্ঞানীর কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট চিন্তা, যার একমাত্র উদ্দেশ্য বাস্তবতাকে জোর করে তাঁর পরীক্ষার

সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা জোড়াতালির ব্যবস্থা করা। একটা সাময়িক সমস্যার সাময়িক সমাধান মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এটা যে সাময়িক কিছু নয়, আসলেই একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার যাতে করে প্রকৃতির একটি গভীর রহস্য উদ্ঘাটন হয়ে গেছে, সম্ভবত ম্যাক্স প্লাঙ্কের নিজেরই অজান্তে, সেটা পরিষ্কার হলো আরেকটি যুগান্তকারী গবেষণায়, যার নায়ক ছিলেন আরো এক জার্মান যুবক, তখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা, এবং এখন যার নাম বাংলাদেশের রিকশাওয়ালাদেরও মুখে মুখে ঘোরে—আলবার্ট আইনস্টাইন।

আইনস্টাইনের বয়স তখন ছাব্বিশ, পদার্থবিদ্যায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি করা সত্ত্বেও বলতে গেলে একরকম বেকার, সামান্য এক পেটেন্ট অফিসে ছোটখাটো একটা চাকরি নিয়ে কোনোরকমে সংসারের খরচ চালাচ্ছিলেন সদ্যবিবাহিত যুবক। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার চাকরি, সেটা পাননি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (প্রফেসর ওয়েবার) তাঁকে চাকরির প্রশংসাপত্র (recommendation letter) দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন (কারণ আইনস্টাইন তাঁকে হের প্রফেসর ওয়েবার না বলে শুধু হের ওয়েবার বলে সম্বোধন করতেন, অনেকটা স্বৈচ্ছিক অবজ্ঞাবশতই, এ নিয়ে আমরা সামনে আরো কথা বলব)। যা-ই হোক, পেটেন্ট অফিসের চাকরিটা নেহাত খারাপ হয়নি তাঁর জন্য। ১৯০৫ সালের কথা সেটা। চাকরির কাজে খুব কম সময়ই ব্যয় করতে হতো তাঁকে, ফলে দিনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি নিজের গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। ইতিহাস এর সাক্ষী যে ১৯০৫ সালটিই ছিল আইনস্টাইনের গবেষণা-জীবনের সবচেয়ে গৌরবময়, সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময়। এ বছর তিনি একটি নয়, তিনটে বড় বড় কাজ করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় মনীষীদের শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছেন। তাঁর প্রথম কাজটি ছিল বস্তুর আপাতদুর্বোধ্য আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার (photoelectric effect) একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দানের ওপর। আলোক-তড়িৎ বিষয়টি প্রথম চোখে পড়েছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, জার্মানিরই আরেক প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্তসের (Hertz)

(১৮৫৭-৯৪)। তিনি লক্ষ করেন যে, একটা ধাতব পাতের ওপর রঙ্গোত্তর দৈর্ঘ্যের (ultraviolet) রশ্মি নিক্ষেপ করলে কী এক অদ্ভুত কারণে সেই পাতের এটম থেকে ধপাধপ ইলেকট্রন নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, অনেকটা ঢিল মেরে দেয়ালের বালিকণা খসিয়ে ফেলার মতো। সনাতন অণুবিজ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না।

আইনস্টাইন বললেন, ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না তার কারণ সনাতন বিজ্ঞানে আলো যে 'ফোটন' নামক একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি যা অনেকটা সেই ঢিলের মতোই কাজ করে যখন ওটাকে পাতের দিকে ছোড়া হয়, সেটা জানা ছিল না। হ্যাঁ, আলো তরঙ্গ ঠিকই, আবার কণাও, বিশেষ রকম কণা, যাকে আইনস্টাইন বলতেন ওয়েভপ্যাকেট (কণার মতো করে দলাপাকানো ঢেউ)। সে প্যাকেট বিশেষ বিশেষ তেজে পাতের ওপর ঘা খেলে তার এটম থেকে ইলেকট্রনগুলো একে একে খসিয়ে আনবে। তা'ও একটা তেজ-সীমার কমে চলে গেলে সেই খসানোটা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যাবে। আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের এই আশ্চর্য গুণ বিজ্ঞানজগতের এক দারুণ আবিষ্কার। এর যে কত ব্যবহারিক এবং বাণিজ্যিক প্রয়োগযোগ্যতা তা বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কারোর অজানা নয়। সংগত কারণেই এই যুগান্তকারী কাজটির জন্য আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁর এই আবিষ্কার নানাভাবে পরীক্ষিত-নিরীক্ষিত হয়েছে শত শত বিজ্ঞানী ও গবেষক দ্বারা, এবং প্রতিবারই তাঁর তত্ত্ব নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ তত্ত্ব আরেকটি বড় কাজ সিদ্ধ করেছে—ম্যাক্স প্লাঙ্কের সেই 'কোয়ান্টাম তত্ত্বকে' যুক্তিযুক্ত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

আলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী, অথচ এই বস্তুটিকেই আমরা কত কম জানি। শুধু আমরা কেন, গোটা বিজ্ঞানজগৎকেই চরম ধাঁধায় ভুগিয়েছে যুগে যুগে। নিউটন বললেন, আলো ইট-পাথরের মতোই একরকম পাথর, খুব ছোট পাথর যদিও। হাইগেন্স বললেন, পাথর নয়, ঢেউ। এদিকে আইনস্টাইন যা বলছেন তাতে তো মনে হয় কণাও হতে পারে, আবার ঢেউও হতে পারে। ধাঁধা যেন আরো বেড়ে

গেল। একই জিনিস ঢেউ আর কণা একই সঙ্গে কী করে হয়। পরে লুই ডিব্রগলি নামক আরেক বিজ্ঞানী এসে প্রমাণ করলেন যে হ্যাঁ, হয়, পদার্থের এই দ্বৈত চরিত্র, যত অবিশ্বাস্যই হোক, এটাই প্রকৃতির প্রকৃত রূপ। এ রূপের পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে বিংশ শতাব্দীর কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাঝে।

পাঠক নিশ্চয়ই ভাবছেন, কিন্তু মশাই, এখানে শূন্যের জায়গাটি কোথায়। আছে, ভাই, আছে। ভুলে যাবেন না যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোচনাটি শুরুই হয়েছিল সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য শূন্যে চলে গেলে তেজ অসীমে পৌঁছুবে কি পৌঁছুবে না, সে প্রশ্নের মোকাবিলা করতে গিয়ে। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে তার আংশিক জবাব পাওয়া গেল-না, অসীমে যায় না, কারণ তা হবার আগেই বিজ্ঞানের আইনকানুন বদলে যায়, তেজ সেখানে ধাপে ধাপে উঠে যাবে বা নামবে, হুট করে ওপরে উঠে যায় না বা নিচে নামে না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্য মানেই শেষ নয়, শূন্য তেজেরও একটা অর্থ আছে। বরং বলা যায়, শূন্য লেভেলে যে সঞ্চিত শক্তি সে শক্তি মহাবিশ্বের জানা-অজানা সকল শক্তিকে একত্র করলেও তার সমান শক্তি তৈরি করতে পারবে না কোনো মরপ্রাণী। এটাই আইনস্টাইনের সুবিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$-এর অন্তর্নিহিত বাণী। একটা স্থির বস্তু, m ভরসম্পন্ন সামান্য একটি কণা, যার গতির তেজ শূন্যতে নেমে গেছে, তারও ভরজাত সঞ্চিত তেজ হলো এই সমীকরণের ডানপাশের বিপুল সংখ্যাটি (এখানে c-এর মান হলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০,০০০ কিলোমিটার)। এ সংখ্যাটি যে কী বিশাল আকার ধারণ করতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। পারমাণবিক বিজ্ঞানে এটা জানা আছে যে একটি হাইড্রোজেন অণু চরম উত্তেজিত অবস্থাতে হিলিয়াম অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তবে এই রূপান্তর প্রক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ ভরের হ্রাস ঘটে। যেমন ফিউশন প্রক্রিয়াতে ১ কিলো হাইড্রোজেন ০.৯৯৩-তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাহলে বাকি ভরটুকু গেল কোথায়? সেটা হারিয়ে যায়নি, তেজে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র ০.০০৭ কিলো হাইড্রোজেন কতটুকুই বা তেজ উদ্‌গীরণ করতে পারে? শুনুন তাহলে। চোখ ছানাবড়া

হয়ে যাবে। উত্তাপের এককে সেটা দাঁড়ায় 6.3×10^{14} জুল, যার অর্থ এই যে এক কিলো হাইড্রোজেন দিয়ে আপনি এতটা জ্বালানি তেজ সৃষ্টি করতে পারবেন যা হবে ১ লক্ষ টন কয়লার আগুনের সমান! এতে একটা ধারণা জন্মাতে পারে হাইড্রোজেন বোমার কী অসাধারণ বিস্ফোরণ-শক্তি।

আইনস্টাইন বুঝিয়ে দিলেন যে ক্ষুদ্র বস্তুকে তার ক্ষুদ্রতার জন্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। এই ক্ষুদ্র বস্তুটিকেই যদি তার ভরসম তেজে রূপান্তরিত করা যেত তাহলে সে পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারত। শূন্যেরও অসীম ক্ষমতা!

অনিশ্চয়তাই যেখানে একমাত্র নিশ্চিত

কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক অভিনব সংযোজন আধুনিক বিজ্ঞানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান দিয়ে ফেলছে, অথচ ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ধাঁধার ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। এ আবার কেমনতর কথা যে বস্তুজগতের ছোট বড় সব জিনিসই আণবিক দৃষ্টিতে একই সাথে ভরযুক্ত কণা, এবং ভরমুক্ত তরঙ্গ? কণা নয় তরঙ্গ নয়, আবার দুটিই, এ কী রকমের রসিকতা রে বাবা। পুরাকালের গাঁজাখোর ভাঁড়দের আষাঢ়ে গল্পের মতো মনে হয় না কি? প্রকৃতি কি একটা পর্যায়ে গিয়ে মদ্যপ মাতালের মতো আবোলতাবোল আচরণ করতে শুরু করে? ম্যাক্স প্লাঙ্ক একটা শক্ত জট ভাঙতে গিয়ে অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো করে একটা বুদ্ধি দিয়ে গেলেন বিজ্ঞানীদের, তার সাথে সুর মিলিয়ে স্বয়ং আইনস্টাইন সাহেব দাঁড় করালেন এক জলজ্যান্ত বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, ব্যস, হয়ে গেল সেটা মূল্যবান নতুন তত্ত্ব। অথচ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি বারবার কাত হয়ে যায় এর কাছে, কিছুতেই ঢুকতে চায় না মাথায়। সাধে কি নিলস বোরের (১৮৮৫-১৯৬২) মতো জাঁদরেল নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ বলেছিলেন: ‘কেউ যদি বলে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান তাকে ধাঁধায় ফেলেনি তাহলে আমি বলব সে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি’। অর্থাৎ একটা প্রশ্নের সমাধান হতে না হতেই আরো অনেক প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

আশু প্রশ্ন যেটা দাঁড়াল, সেটা হলো, এই দ্বৈত রূপ বিশ্বজগতের, বস্তু একই সাথে ভরযুক্ত এবং ভরমুক্ত, এটা যদি সত্যি সত্যি বাস্তব প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রকৃতি তা কিভাবে প্রকাশ করছে আমাদের কাছে? এর ভাষা কী?

পাঠক হয়তো এরই মাঝে ধরে ফেলেছেন কি হবে তার জবাব। সেই যে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে, আর গ্যালিলিও বলেছিলেন তার দু'শ বছর পর যে প্রকৃতির ভাষা হলো গণিত-বাইবেলের ভাষা যেমন ছিল ল্যাটিন, কোরানের আরবি, গোটা প্রকৃতির ভাষা হলো গণিত। সেটা আইজ্যাক নিউটন প্রমাণ করেছিলেন তাঁর বলবিদ্যায়, ম্যাক্সওয়েল তাঁর তাড়িত-চৌম্বক তত্ত্বে, আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে, তেমনি করে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের সেই অসম্ভব হেঁয়ালিতে ভরা শাস্ত্রেও গণিত এল বন্ধুর হাত বাড়িয়ে। এবং এই কাজটি সমাধা হলো অস্ট্রিয়ার এক তীক্ষ্ণধী পদার্থবিদ আরুইন শ্রেডিঙ্গার (১৮৮৭-১৯৬১) দ্বারা। তবে তাঁর কাজটিই ছিল সবচেয়ে দুরূহ, কারণ নিউটনের মতো তাঁর হাতে বস্তুজগতের স্থূল পদার্থ ছিল না, ম্যাক্সওয়েলের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঢেউ ছিল না বিদ্যুতের, ছিল না আইনস্টাইনের মতো মহাবিশ্বের বিচিত্র সমাহার।

শ্রেডিঙ্গার

তাঁর মস্ত সমস্যা ছিল বস্তু আর কণাকে একই কামরায় ভরে একটা যুগ্ম ভাষা তৈরি করা। সৌভাগ্যবশত গণিত তখন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে, কোয়ান্টাম বিজ্ঞানও ধাপে ধাপে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে। তাঁর হাতে ছিল উন্নততর অন্তরকলন (differential calculus) তত্ত্ব, ছিল সম্ভাবনা শাস্ত্রের বিবিধ টুকিটাকি খবর। এ সবকিছুকে একসাথে জড়ো করে তিনি তৈরি করলেন এক অভিনব জিনিস, একটি দ্বিঘাতী অন্তরকলনী সমীকরণ (second order differential equation), অনেকটা নিউটনের মতোই, তবে তার চেয়ে অনেক জটিল ও অনেক গভীর, যাতে নির্ভার সংখ্যা (independent variable) এক বা একাধিক, বড় কথা, সাশ্রিত রাশি (dependent variable) দৈর্ঘ্য বা গতির মতো কোনো পরিমেয় বস্তু নয়, যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, এমনকি পরীক্ষাগারে নিয়ে মাপারও উপায় নেই। এই অদ্ভুত জিনিসটির নাম wave function.অথচ ঠিক ঢেউও নয় এটা। এর কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ নেই, নেই কোনো কম্পাঙ্ক। এ সত্ত্বেও শ্রেডিঙ্গারের সমীকরণ আধুনিক পারমাণবিক বিজ্ঞানের মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে। গোটা কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিসমিল্লাতেই এই জিনিসটা দিয়ে পাঠ শুরু করা সম্ভব, এমনই এর শক্তি। এ হলো আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল স্তম্ভ।

কী এই রহস্যময় জিনিস, এই ওয়েভ ফাংশন, যা ১৯২৬ সালের কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিল শ্রেডিঙ্গার সাহেবের কল্পনাতে, যা সাধারণ বুদ্ধিকে হার মানায়, প্রচলিত ধ্যানধারণাকে করে বিমূঢ়। বাস্তব জীবনের কোনো সাধারণ অভিজ্ঞতার আলোতে বিছিয়ে একে বোঝানোর সাধ্য অন্তত আমার (মী.র) নেই। তবু চেষ্টা করব একটা পরিচিত দৃশ্য টেনে আবছা ধারণা দিতে। ধরুন আপনার বসার ঘরের টেবিল ফ্যানটি—গরমের দিনের বড় বন্ধু। অচল অবস্থায় ফ্যানের ফলাটি ঠিক কী জ্যামিতিক অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা খুবই সহজ। এবার আঙুল দিয়ে একটু ঘোরান ফলাটিকে। কী দেখতে পাবেন? ফলাটির জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেল, কিন্তু তখনো আপনি এর অবস্থান বুঝতে পারছেন। এবার

ফ্যানের সুইচ টিপে দিন। ফলার গতি বেড়ে গেল। তুমুল বেগে ঘুরছে ফলাটি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। খালি চোখে ওটার কোন মুহূর্তে কী অবস্থান তা বোঝা একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না আপনার। তবে অতি আধুনিক সূক্ষ্ম বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে তার অবস্থান মাপা সম্ভব হলে হতেও পারে। কিন্তু মনে করুন, পাখার গতি এতটাই বাড়িয়ে দেওয়া হলো যে সে গতি সাধারণ সীমারেখা ডিঙিয়ে একেবারে মাত্রাহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। তখন আপনার চামড়ার চোখে কী মনে হবে ফলাটিকে? মনে হবে ছোট একটুকরো মেঘ আপনার পাখার ভেতর আটকা পড়ে গেছে। পাখার ফলাটি আলাদা করে দেখবার কোনো উপায়ই থাকছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে কুয়াশার মতো কিছু একটা। অর্থাৎ একটা বস্তু তার অবস্থানের পরিমেয়তা হারিয়ে অপরিমেয়তার কুজ্ঝটিকাতে পরিণত হয়ে গেল।

ওয়েভ ফাংশন ব্যাপারটিও অনেকটা তা-ই।

সব পদার্থেরই অণু-পরমাণু আছে, যার মধ্যে ঋণাত্মক তড়িৎকণা (electron) অন্যতম। এমনই প্রচণ্ড এর গতি যে কোন মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে সে তা বলার সাধ্য মানুষ কেন, কোনো যন্ত্রেরও নেই। তার চলার পথ (trajectory) বলে নির্দিষ্ট কিছু নেই। তার চলার পথ সেই পাখার ফলার মতোই কেবল দলা দলা মেঘ সৃষ্টি করে চলে। শুধু বলা যায়, ওই জায়গাটুকুর কোনো এক বিন্দুতে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে তার থাকবার সম্ভাবনা আছে। শ্রেডিঙ্গারের ওয়েভ ফাংশন সেই সম্ভাবনারই একটা সংখ্যা দাঁড় করায় আমাদের সুবিধার জন্য। ধরুন জায়গাটুকুর 'আয়তন' dq, এবং তার কোনো এক বিন্দুতে ওয়েভ ফাংশন হলো $f(dq$ ঠিক আমাদের পরিচিত ত্রিমাত্রিক বিশ্বের সাধারণ 'আয়তন' নয়, তবে তার সঙ্গে তুলনীয়)। তাহলে f^2dq রাশিটি সেই সম্ভাবনার পরিমাপ দেয়। (f অবশ্য বাস্তব না হয়ে জটিল সংখ্যাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে f^2 এর স্থলে $|f|^2$ ব্যবহার করতে হবে, যেখানে $|f|$ এর মানে f এর ধ্রুবমান) ওই সম্ভাবনা পর্যন্তই মানুষের দৌড়—এর বেশি কিছু জানবার সব

দরজাই বন্ধ করে রেখেছে প্রকৃতি। অণুরাজ্যের রহস্যপুরী যে কত হাজার রকমের পাহারা দিয়ে সুরক্ষিত তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। প্রকৃতি সেখানে দারুণ পর্দানশিন!

সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞানের জন্য এই 'সম্ভাবনা'র বাইরে বেশি কিছু জানবার প্রয়োজনও হয় না আমাদের। আগেকার সেই পারিসাংখ্যিক বলবিদ্যার মতোই—একটা দু'শ ফুট উঁচু দালানের একটি ক্ষুদ্র ইটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর নিরন্তর গতিপথের কোন জায়গায় কোন অণুটি রয়েছে ঠিক কোন মুহূর্তে সেটা জানবার যদি কোনো উপায়ও থাকত, তাহলে সেই তথ্য সংগ্রহ করে কি অসাধ্য সাধন করে ফেলতেন বলে মনে হয় আপনার? জানি, প্রশ্নটাই হাস্যকর এবং অবান্তর। তবে 'বৃহৎ' বস্তুর জগতে গতি তেমন বেয়াড়ারকম নয় (শব্দের গতি অতিক্রান্ত দ্রুততম জেটের গতিও আলোর গতির ধারেকাছে নয়) বলে আমাদের নিউটন সাহেবের বলবিদ্যা দিয়েই বেশ সুখ শান্তিতে জীবন কেটে যায়। কিন্তু অণু-জগতের কণারা আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে, সেখানে নিউটন মশাই একেবারে অসহায়। সেখানে শ্রেডিঙ্গার প্রদত্ত 'সম্ভাবনা' দিয়েই কাজ চালাতে হয়। সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যের কথা আগেও একবার উল্লেখ করেছি—এটি কোনো স্বাপ্নিক কবির অলস কল্পনা নয়, প্রকৃতিরই একটি সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গ।

হাইজেনবার্গ

‘সম্ভাবনা’, ‘অনিশ্চয়তা’, ‘অনির্দিষ্টতা’, এইসব আপাত-নেতিবাচক শব্দগুলো অণু-জগতের কোয়ান্টাম শাস্ত্রে প্রায় ডালভাতের মত, প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে আসে ওগুলো। কোয়ান্টামতত্ত্বের একটি চমক লাগানো আবিষ্কার হলো হাইজেনবার্গের ‘অনিশ্চয়তা’ সূত্র। অনিশ্চয়তা সাধারণত মরণশীল মানুষের মৌলিক অপারগতাকেই বোঝায়। কিন্তু জার্মানির ভার্নার হাইজেনবার্গ (১৯০১-৭৬) এক অকাট্য যুক্তি দাঁড় করালেন যার সারমর্ম হলো যে এই অপারগতা শুধু মানুষের নয়, যন্ত্রেরও, এবং বলতে গেলে এই অপারগতার উৎস প্রকৃতি নিজেই। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘অনিশ্চয়তাসূত্র’ (uncertainty principle)। এর বক্তব্য হলো যে দুটি যুগ্ম জিনিস, যেমন অণুর আয়তনিক অবস্থান ও তার গতিবেগ, বা কাল (অর্থাৎ কতখানি সময় ব্যয়িত হয়েছে) ও তেজ, ওরকম দুটি জিনিস একই সাথে নিখুঁতভাবে মেপে নেওয়া (যা নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানে সম্ভব) একেবারেই অসম্ভব, অসাধ্য, যত অত্যাধুনিক আর উন্নতমানের যন্ত্রই আপনি ব্যবহার করুন না কেন। এই যুগ্ম যুগলের একটিকে সূক্ষ্মভাবে মাপতে গেলে আরেকটি আপনা থেকেই ঝাপসা হয়ে যাবে। যেমন ধরুন, একটা চলমান জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপতে চাচ্ছেন আপনি, এবং একেবারে নির্ভুলভাবে। সেজন্য আপনার যন্ত্রটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে ওই একটি দিক ছাড়া আর সবদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখবে যন্ত্রটি। কিন্তু এই একনিষ্ঠ মনোযোগের অপরিহার্য পরিণাম হলো যে অলক্ষ্যে সেই পরীক্ষমান বস্তুটির চলনাবস্থাতে সৃষ্টি হয়ে গেল কিঞ্চিৎ বিঘ্নতা। যার ফলে অবস্থানের সাথে গতিকেও নিখুঁতভাবে নিরূপণ করবার আশা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেল। যতই সূক্ষ্ম হতে চাইবেন একটিতে ততই বিঘ্নিত হবে আরেকটি। স্থূল বস্তুর জগতে এটা মোটেই লক্ষণীয় নয়, কিন্তু অণু-পরমাণুদের জগতে, যেখানে চলমান হওয়া মানে আলোর কাছাকাছি গতিবেগে চলমান হওয়া বোঝায়, সেখানে সামান্য বিঘ্নতা মানেই অনেক। এটা যন্ত্রের দোষ নয়, প্রকৃতিরই নিজস্ব ধর্ম। সেই যে বললাম একটু আগে, ক্ষুদ্র-কণার জগতে প্রকৃতি বড্ড বদমেজাজি, বাইরের কেউ সেখানে উঁকিঝুঁকি মারুক সেটা ওর মোটেও পছন্দ নয়। হাইজেনবার্গ সাহেব শুধু খারাপ খবর দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সেই অনিশ্চয়তার

পরিমাণ কতখানি সেটাও অঙ্ক কষে বের করে গেছেন। দুটি বীক্ষিত বস্তুর নিরূপিত পরিমাণের গুণফলের অনিবার্য অনিশ্চয়তা অন্ততপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা, কিংবা তারও বেশি। সেই সংখ্যাটি পদার্থবিজ্ঞানে প্লাঙ্কের পরমাঙ্ক নামে পরিচিত (Planck's constant), এবং একটি নিত্য-ব্যবহৃত সংখ্যা, $h = 6.626 \times 10^{-34}$ জুল-সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রকৃতি ওখানেই পাহারা বসিয়ে রেখেছে। এই ব্যূহ ভাঙতে যাওয়ার পরিণতি খুব ভালো নয়। অথবা অবিশ্বাস্য রকম ভালো, নির্ভর করে আপনি কোন দিক থেকে দেখছেন। পরিণতির অকুস্থানে আবির্ভূত হয় আমাদের সেই অতিপরিচিত বন্ধু, বা শত্রু (যে যেভাবে দেখে সেটাকে)—শূন্য। সেখানে অবাস্তব বাস্তবের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, অবিশ্বাস্য আসে বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে। শূন্য খামার থেকে সীমাহীন সম্ভার আহরণ বা হরণ করার মতো। বিজ্ঞানে একে বলা হয় Zero-point energy, যার ভাবার্থ হলো উৎসবিহীন জ্বালানি উৎপাদন!

পাঠক সম্ভবত সন্দিহান হয়ে উঠতে শুরু করেছেন, লোকটার মাথা ঠিক আছে তো? গাঁজা-টাজা টেনে আসেনি তো? না ভাই, গাঁজা টানিনি। একেবারে কেতাবের কথা,ঐশী কেতাব নয়, বৈজ্ঞানিক কেতাব। অণুবিজ্ঞানীরা তাড়িতকণার ভর কিন্তু দাড়িপাল্লার মাপ অনুযায়ী কত আউন্স কত মিলিগ্রাম সে হিসেবে বিচার করেন না, তারা মাপেন ভরসম শক্তির এককে। যেমন একটি তাড়িতকণার ভরকে বলা হয় 0.511 million electron volts. যেন এটা কোনো বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের (power station) সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এর মূলে আছে আইনস্টাইনের সেই সূত্রটি: $E = mc^2$ । কণা যদি ঠায় দাঁড়িয়েও থাকে তাহলেও তার ভরজাত শক্তি লোপ পায় না, একটা সুপ্ত সম্ভাবনা থেকেই যায় তাকে ওই পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

কল্পনা করুন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট একটি আধার যার পরিবর্তনীয় আয়তন কমাতে কমাতে এতটাই কমিয়ে ফেললেন যে তাতে একটা কি দুটোর বেশি ইলেকট্রন থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কার্যত শূন্য আয়তন। সেখানে যে ইলেকট্রনটি

আটকা পড়ে আছে তার ত্রিমাত্রিক অবস্থান অতি সূক্ষ্মভাবেই জানা হয়ে গেল আপনার। কিন্তু হাইজেনবার্গের সূত্র অনুযায়ী ওটির তেজ বা শক্তিটি চলে গেল একেবারে আসমানে। একটাকে নিখুঁত করতে গিয়ে আরেকটির অনিশ্চয়তা সীমানার বাইরে। অনিশ্চয়তা নীতির পরিণামই এই যে এমন একটা শূন্যাবস্থা দাঁড়ায় একসময় যে কণা সেখানে থাক বা না থাক তেজ থেকে যায়, এবং একরকম গায়েবি কণা সৃষ্টি হয় (virtual particles), যারা অস্তিত্বের ভেতরে-বাইরে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে থাকে, অনেকটা আঁধার বনের জোনাকিরা যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলা-নেভা করে। এ থেকে উৎপন্ন শক্তি, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে উৎপন্ন শক্তি, সেটা মোটেও গায়েবি নয়, সে শক্তি যে পদার্থের মধ্যেই গুদামজাত হয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো, যাকে বলে মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন, এ শক্তিকে বাস্তবে কাজে লাগানোর কোনো উপায় আছে কি না। বর্তমান যুগের তেল-সংকটে এ এক জরুরি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজব এই অণু-জগৎ—যেন হাওয়া (হাওয়া বলতে এখানে বায়ু বোঝানো হচ্ছে না) থেকে জ্বালানি-পাওয়া! আমাদের অভাগা দেশটির বড় উপকার হতে পারত।

তবে, কানে কানে একটা কথা বলা দরকার। ‘শূন্যের মধ্যে শক্তি’ লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হলেও এটাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটা এখনো ‘অপবিজ্ঞান’ বা ‘সুডোসায়েন্স’ই বলতে হবে। এখন পর্যন্ত কেউ এই শক্তি আহরণ করে কাজে লাগাতে পেরেছেন, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। শূন্য শক্তির ব্যবহারটা আকাশকুসুম কিছু মনে হলেও, শূন্য শক্তির ধারণাটা সেরকমের কিছু নয়। বরং ধারণাটা আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেখানে যাবার আগে আমাদের আইনস্টাইনের পৃথিবীটা আরেকটু ভালো করে বোঝা দরকার।

সপ্তম অধ্যায়

আইনস্টাইনের বিশ্ব

‘আমি ব্যক্তি-ঈশ্বরের কল্পনা করতে চাই না; আমরা আমাদের অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যে মহাবিশ্বের গড়ন এখন পর্যন্ত সম্যক বুঝতে পেরেছি এতেই শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ে আমরা আপ্লুত।’

—আলবার্ট আইনস্টাইন

১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসের এক মায়াবী শরৎ-সন্ধ্যা। লন্ডনের বিখ্যাত স্যাভয় হোটেলের বলরুমে চলছে পানাহারের হুল্লোড়। ব্যারন রোথস্‌চাইল্ডের আতিথেয়তায় আয়োজিত এ দাতব্য অনুষ্ঠানে স্পটলাইট মূলত দুই জীবন্ত কিংবদন্তির ওপর। এর একজন হচ্ছেন জর্জ বার্নার্ড শ, ১৯২৫ সালের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক – শেক্সপিয়ারের পরে যাকে ব্রিটেনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ অবশ্য ‘সম্মানিত অতিথি’র স্পট লাইট নিজের ওপরে নিতে রাজি নন; বললেন, সম্মানিত অতিথি যদি এ সভায় কেউ থেকে থাকেন তো সেটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রমসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মন্ত্রী সাহেব সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। যথারীতি কারিশমা দেখানোর ভারটুকু ঘুরেফিরে বার্নাড শ’র ওপরই পড়ল। শ অবশ্য হতাশ করেননি। তাঁর জীবনের অন্যতম ছোট্ট কিন্তু আকর্ষণীয় বক্তৃতায় শ সেদিন বললেন,

‘টলেমি এমন একখানা বিশ্বজগৎ আমাদের জন্য তৈরি করেছিলেন যা দুই হাজার বছর টিকে ছিল। তারপর নিউটন আরেকখানা জগৎ বানালেন যা

তিন শ বছর টিকতে পেরেছিল, আর আইনস্টাইন সম্প্রতি একটি বিশ্বজগৎ বানিয়েছেন, আমার ধারণা, আপনারা চাইছেন আমি বলি এটি কখনোই ফুরোবে না; কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই জানি না কতদিন এ আইনস্টাইনীয় জগৎ টিকবে।

দর্শকের সারিতে আইনস্টাইনও ছিলেন, আর শ'র কথা শুনে দর্শকদের সাথে সাথে তিনিও হো হো করে হেসে উঠলেন। শ'র বাকচাতুর্য আর রঙ্গরস এমনিতেই জগদ্বিখ্যাত ছিল। সেদিনকার সভায় যেন ওটি আরো নতুন মাত্রা পেল। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের অবদানকে তুলে ধরতে গিয়ে শ আইনস্টাইনের জীবনের নানা মজার মজার কাহিনি টেনে এনে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন এ বলে, 'আইনস্টাইন হচ্ছেন আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা'।

আইনস্টাইনও তো এ দিক দিয়ে কম যান না। বক্তৃতা দিতে উঠে শ-কে মৃদু তিরস্কার করলেন 'আইনস্টাইন নামের অতীন্দ্রিয় মিথ্‌টির' ভূয়সী প্রশংসা করবার জন্য, যার কারণে নাকি তাঁর জীবন ইতিমধ্যেই ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে! তাঁর মতে, মানুষ তাঁর সম্পর্কে যা কল্পনা করে আর বাস্তবে উনি নিজে যা – এর মধ্যে নাকি বিস্তর ফারাক!

তবে আইনস্টাইন নিজে তখন যা-ই বলুন না কেন, এখন কিন্তু প্রমাণিত হয়েই গেছে যে, শ'র কথা মোটেও অত্যুক্তি ছিল না। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রায় একশ বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে – এখনো আমরা সেই আইনস্টাইনীয় বিশ্বেই বাস করছি। ভবিষ্যতের কোনো প্রতিভাধর বিজ্ঞানী যে রঙ্গমঞ্চে এসে আইনস্টাইনের এই বিশ্বজগৎকে হটিয়ে দিতে পারবেন না, তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না। তবে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, আইনস্টাইন স্বীয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে নিজেকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেছেন যে, তাঁকে পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে মনে রাখতেই হবে, তা তাঁর তৈরি বিশ্বজগৎ শেষ পর্যন্ত টিকুক

আর না-ই টিকুক।

আইনস্টাইনের ছেলেবেলা

তবে 'জিনিয়াস' বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ছেলেবেলায় কখনোই ছিলেন না তিনি। 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'- প্রবাদ বাক্যটি আইনস্টাইনের জীবনে নিদারুণভাবে ব্যর্থই বলতে হবে। ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন না আইনস্টাইন। বরং স্কুল-কলেজের রেকর্ড যদি বিবেচনা করা হয়, নিতান্তই মাঝারি গোছের তাঁর সমস্ত রেকর্ড। আইনস্টাইন এমনিতেই ছিলেন একটু ঢিলেঢালা; এমনকি শৈশবে কথা বলাও শিখেছিলেন একটু দেরি করে। দু বছরের বেশি লেগে গিয়েছিল। সাত বছর পর্যন্ত বাড়িতেই পড়াশোনা চলে তাঁর। একসময় স্কুলেও ভর্তি করা হয় তাকে—ক্যাথোলিক স্কুলে। তবে ভর্তি করাই সার হলো; স্কুলের পড়াশোনায় মোটেও মনোযোগী ছিলেন না আইনস্টাইন। একা একা ঘুরতেন, আপন মনে কী যেন ভাবতেন। স্বাভাবিকভাবেই রেজাল্ট আহামরি গোছের কিছু হচ্ছিল না। রেজাল্টের চেয়েও গুরুতর কিছু সমস্যা নিয়ে বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিক্ষকেরা অভিযোগ করতেন, আইনস্টাইন অন্য ছেলেদের সাথে একেবারেই মেশে না, পড়া মুখস্থ বলতে পারে না, আর প্রশ্ন করলে অনেকক্ষণ লেগে যায় জবাব দিতে। আবার প্রায়ই জবাব দেওয়ার আগে কী যেন বিড়বিড় করে। প্রথম দুটো লক্ষণ না হয় তাও মানা গেল, কিন্তু তৃতীয়টা? ওটির কারণ আর কিছুই নয়, বেতের বাড়ির ভয়। ছোট্ট আইনস্টাইন ভাবতেন, ভুলভাল উত্তর দিয়ে স্যারের হাতে বেতের বাড়ি খাওয়ার চেয়ে বরং সতর্ক থাকাই তো ভালো!কাজেই ক্লাসে সবার সামনে উত্তর দেওয়ার আগে স্বগতোক্তি করে নিজের কাছেই উত্তরটা পরিষ্কার করে নেওয়া, এই আরকি!

ছেলেবেলায় বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশতে না পারলে কী হবে- একটা কিন্তু খুব ভালো গুণ ছিল তাঁর। ওই যে চিরন্তন একগুঁয়ে স্বভাব। কোনো একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকে গেলে সেটার শেষ না দেখে তিনি ছাড়তেন না। এর নিদর্শন আমরা পাই

আইনস্টাইনের ছোট বোন মায়া উইন্টারের লেখা 'আলবার্ট আইনস্টাইন—আ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ' গ্রন্থে। মায়া আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন', কোনো কিছুতে একবার আকৃষ্ট হলে যেন রোখ চেপে বসত আইনস্টাইনের মাথায়। একবার মায়ার কিছু খেলার সঙ্গী বাড়িতে এসেছিল। সবাই মিলে তারা মেতে উঠল তাসের ঘর বানানোর খেলায়। চারতলার চেয়ে বেশি আর কেউই বানাতে পারছিল না। ঠিক এ সময় খেলায় যোগ দেন আইনস্টাইন। প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবারই ভেঙে পড়ে তাঁর তাসের ঘর। ব্যস, রোখ চেপে গেল তাঁর। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে করে যে ঘরটি বানালেন আইনস্টাইন – তা ছিল চোদ্দ তলার!

কিন্তু চোদ্দ তলার তাসের ঘর বানানো এক কথা, আর পড়াশোনায় ভালো হওয়া আরেক। আইনস্টাইনের রিপোর্ট কার্ডের ছিরি দেখে বাবা বাধ্য হলেন হেডমাস্টারের সাথে দেখা করতে। বাবা হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুঝলাম না হয় আলবার্ট পড়ালেখায় খারাপ করছে, কিন্তু এর মধ্যেও কি কোনো পছন্দের বিষয় আছে, যা আলবার্টকে আকর্ষণ করে? মানে কোনো বিশেষ সাবজেক্টে সে কি আগ্রহটাগ্রহ দেখায়?' ভবিষ্যতে তাঁর আগ্রহের বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করলে যদি কোনো ধরনের উন্নতি হয়—চিন্তাক্লিষ্ট বাবার মাথায় তখন হরেক রকম চিন্তা! হেডমাস্টার মশাই আইনস্টাইনের বাবার এ ধরনের আশাবাদে যারপরনাই বিরক্ত হলেন। সরাসরিই বলে দিলেন, 'দেখুন বাপু, আপনার ছেলে একটু হাবলু টাইপ। ওকে নিয়ে এত আশাবাদী হয়ে লাভ নেই। মনে হয় না জীবনে কোনো কিছুতেই সফল হবে আপনার ছেলে'! কালের কী নির্মম পরিহাস, সেই 'হাবলু টাইপ' আইনস্টাইনকেই আজ কিন্তু মানুষ মনে রেখেছে, আর কালস্রোতে হারিয়ে গেছে ওই অর্বাচীন 'জ্ঞানী' হেডমাস্টার।

দশ বছর বয়সে আলবার্টকে ভর্তি করা হয় মিউনিখ শহরের লুটপোল্ড জিমনেসিয়াম স্কুলে। এখানেও ক্লাসের গৎবাঁধা পড়াশোনা তাঁর জীবনকে নিরানন্দ করে তুলল। বিশেষত গ্রিক ভাষা শেখার ক্লাসটি তো আইনস্টাইনের জন্য এক 'মূর্তিমান বিভীষিকা'। ভাষার ব্যাকরণগুলো কিছুতেই মাথায় ঢুকতে চায় না তাঁর।

কাজেই ব্যাকবেঞ্চার হয়ে হাসি হাসি মুখ করে শূন্যদৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকাই সার হলো। মাস্টার মশাই হের জোসেফ ডেগেনহার্ট একই ঘটনা প্রতিদিন দেখতে দেখতে একসময় মহা বিরক্ত বোধ করলেন। সরাসরি বলে দিলেন এর পর থেকে আইনস্টাইন যেন আর ক্লাসে না আসে। কিন্তু এভাবে তো কাউকে ক্লাসে আসতে মানা করা যায় না, বিশেষত আইনস্টাইন যখন ক্লাসে কোনো দুষ্টুমি করেননি, কারো সাথে গোলমাল বাধাননি। তাহলে? বিরক্ত মাস্টার মশাই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু ওরকম হাবার মতো হাসি হাসি মুখ করে ক্লাসে বসে থাকলে শিক্ষক মশাই যে সন্মানটুকু শ্রেণীকক্ষে একটি ছাত্রের কাছ থেকে আশা করেন, তা ক্ষুণ্ন হয়।'

বোঝাই যাচ্ছে স্কুল জীবনটা ছিল আইনস্টাইনের জন্য বিভীষিকাময় পীড়ন-কেন্দ্রের মতো। স্কুলের ওই ভয়ার্ত অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর পরবর্তী জীবনে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিল। বুড়ো বয়সে এক সাক্ষাৎকারে আইনস্টাইন তাই বলেছিলেন,'আমার কাছে প্রাথমিক স্কুলের স্যারদের মনে হতো যেন মিলিটারি সার্জেন্ট, আর জিমনেসিয়াম স্কুলের শিক্ষকদের মনে হতো যেন লেফটেন্যান্ট'। এধরনের কথা কিন্তু বলেছিলেন বার্নার্ড শ-ও। স্কুল-জীবন সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় এই ব্রিটিশ সাহিত্যিকের। শ তাঁর একটি লেখায় বলেন, 'স্কুল জেলখানার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর জায়গা। জেলখানায় অন্তত কয়েদিদের বাধ্য করা হয় না ওয়ার্ডেনদের লেখা বই পড়তে, অথবা বেত মারা হয় না শুকনো পাঠ্যবই মুখস্থ না বলতে পারলে'। শৈশবের স্কুলজীবনের বিভীষিকাময় পরিবেশের বাইরে সে সময় আইনস্টাইনের জীবনে সম্ভবত একটিমাত্র আনন্দের বিষয় ছিল, তা হলো তাঁর চাচা জ্যাকবের সাহচর্য। তাঁর এই চাচাই শৈশবে আইনস্টাইনকে পরিচয় করিয়ে দেন অঙ্কের প্রধানতম শাখা বীজগণিতের সাথে অনেকটা এভাবে—'আলবার্ট,বীজগণিত হচ্ছে মজার এক বিজ্ঞান, বুঝলে? ধরো, একটা পশুকে শিকারের জন্য আমরা খুঁজছি, কিন্তু এখনো ধরতে পারিনি। সাময়িকভাবে আমরা তার নাম দেই X, আর ওটাকে ধরতে না পারা পর্যন্ত আমরা তার খোঁজ চালিয়ে যেতে থাকি।'

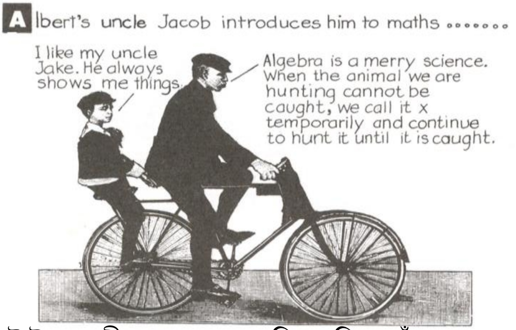

শৈশবে আইনস্টাইনের জীবনে আনন্দের বিষয় ছিল তাঁর চাচা জ্যাকবের সাহচর্য

জ্যাকব চাচা ছাড়া আরো কজনের প্রভাব আইনস্টাইনের ওপর পড়েছিল। এর মধ্যে একজন হলেন ম্যাক্স ট্যাল্‌মি নামের এক গরিব মেডিকেলের ছাত্র। এ ছাত্রটি ছিল আইনস্টাইনদের বাসার ডিনারের ‘নিয়মিত অতিথি’। আসলে সে সময় দক্ষিণ জার্মানির ইহুদিদের মধ্যে প্রতি বৃহস্পতিবার বাসায় কোনো গরিব ইহুদিকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। সে সূত্রেই ম্যাক্স ট্যাল্‌মির আইনস্টাইনদের বাসায় আসা। ফলাফল অবশ্য মন্দ হয়নি, এর কাছ থেকেই কিশোর আইনস্টাইন জ্যামিতি আর ক্যালকুলাস শেখার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

আর ছিলেন আইনস্টাইনের মা। তিনি অবশ্য জ্যামিতি বা ক্যালকুলাস শেখায় কোনো সাহায্য করেননি, করেছিলেন বেহালা শেখায়। এই বেহালা এবং সর্বপোরি সংগীতপ্রীতি আইনস্টাইনের শেষ দিন পর্যন্ত বহাল ছিল। তাঁর জীবনীকার ডেনিশ ব্রায়ান ‘আইনস্টাইন—আ লাইফ’ (১৯৯৬) গ্রন্থে আইনস্টাইনের সংগীত-প্রিয়তার একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন—‘একবার আইনস্টাইন তাঁর মধ্যবয়সে যথারীতি হেলতেদুলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল তাঁর প্রিয় বেহালাখানা। হঠাৎ শুনলেন রাস্তার ওপারের এক বাসা থেকে পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। আইনস্টাইন দৌড়ে বাসার কাছে চলে আসতে আসতে মহিলাকে বললেন, থেমো না, থেমো না, বাজাতে থাকো!বলতে বলতেই বাক্স থেকে নিজের বেহালাটি বের করে ফেললেন, আর মহিলার সাথে তালে তাল মিলিয়ে বাজাতে লাগলেন। আইনস্টাইনের এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল সত্যই বিস্ময়কর।’ আইনস্টাইনের সংগীতপ্রিয়তার

আরেকটি বড় উদাহরণ আমরা পরবর্তীতে পাই রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় (১৯৩০)। রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের বাসায় বেড়াতে এলে তাঁরা দুজনেই প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের সংগীত নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারটির অনুলিখন পড়লে বোঝা যায় যে, পদার্থবিজ্ঞানের কাঠখোট্টা জগতের বাইরেও তাঁর ছিল সংগীতপ্রিয় সরস এক শিল্পী মন।

আইনস্টাইনের মা আইনস্টাইনকে দিয়েছিলেন বেহালা শেখার প্রেরণা

তবে আসল উপকারটি যিনি করেছিলেন তিনি তাঁর জ্যাকব চাচাও নন, ম্যাক্স ট্যাল্মিও নন, এমনকি তাঁর মা-ও হয়তো নন, উপকারটি করেছিলেন তাঁর বাবা—সেই ছোট্টবেলায় আইনস্টাইনকে একটি সামান্য কম্পাস কিনে দিয়ে। আইনস্টাইনের বয়স তখন কতই বা হবে—চার/পাঁচ! কম্পাসের কাঁটা যে সব সময় উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে—এ ব্যাপারটা আইনস্টাইনকে যারপরনাই বিস্মিত করেছিল। ছোট্ট আইনস্টাইন ঘুমানোর সময়ও শুয়ে শুয়ে ভাবতেন যে, কম্পাসের কাঁটা কেন শুধু উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকবে! নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এর পেছনে। মাঝরাতে বাবা এসে দেখেন আইনস্টাইন তখনো ঘুমায়নি। বাবাকে দেখেই আইনস্টাইনের প্রশ্ন—'আচ্ছা বাবা, কম্পাসের কাঁটা কেন কেবলই এক দিকে মুখ করে থাকে?' বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ম্যাগনেটিজম্'। তার পরই বলতেন 'আলবার্ট, অনেক রাত হয়েছে, এখন ঘুমানোর চেষ্টা করো তো।' ঘুমিয়ে যেতে যেতেই আইনস্টাইন ভাবতেন, হুমম্ ম্যাগনেটিজম – বড় হয়ে ব্যাপারটা আরো ভালো করে বুঝতে হবে।

বিস্ময় বছর

আইনস্টাইন বড় হয়ে ভালোই বুঝেছিলেন সেটা। বুঝেছিলেন বলেই তিনি ‘বড় হয়ে’ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব নির্মাণ করতে তাঁর আবার নিউটন, ফ্যারাডে, কুলম্ব, গ্যালভানি, অ্যাম্পিয়ার, ম্যাক্সয়েল, হেলমোলজেদের ক্রমিক অবদানে গড়ে ওঠা তড়িচ্চুম্বকীয় মূল নীতিগুলোর সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল।

সংগত কারণেই ১৯০৫ সালটিকে আইনস্টাইনের জীবনের ‘বিস্ময় বছর’ বলা হয়, করণ ও বছরটিতেই আইনস্টাইন মৌলিক আবিষ্কারগুলো করেছিলেন। তার আগ পর্যন্ত আইনস্টাইনের পরিচিতি ছিল অনেকটা যেন ‘অ্যামেচার পদার্থবিদ’ হিসেবে। জুরিখের পলিটেকনিক ইষ্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় তো এক্কেবারে ফেলই করে বসলেন। পরে অবশ্য তাঁর সাধের এই পলিটেকনিকে একটু অন্যভাবে ভর্তি হতে পেরেছিলেন (ভর্তি পরীক্ষায় আর দ্বিতীয়বার না বসেই)। ভর্তি হলে কী হবে,ফলাফল কিন্তু যেই কি সেই।

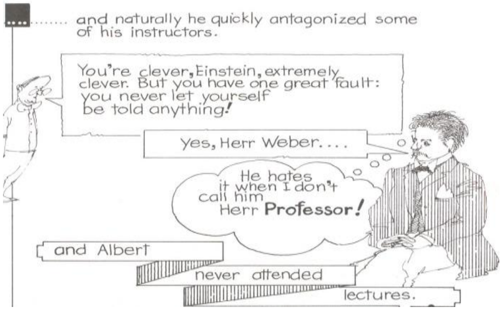

প্রফেসর ওয়েবার চাইতেন ছাত্ররা তাকে সব সময় ‘হের প্রফেসর’ বলে ডাকুক

ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষায় বসেন চারজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী। প্রথম হন লুই কলরস (স্কোর ৬০), দ্বিতীয় মার্সেল গ্রসম্যান (স্কোর ৫৭.৫), জ্যাকব এহরাট (৫৬.৫), এর পর আইনস্টাইন (৫৪), শেষ স্থান মিলেভা মারিকের (৪৪, ফেল্) যিনি

পরবর্তীতে আইনস্টাইনের স্ত্রী হন। তার মানে ফেলের হাত থেকে বাঁচলেও পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে আইনস্টাইনের স্থান হয় সবার শেষে। রেজাল্ট খারাপই কেবল একমাত্র বিষয় নয়, এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধানকেও দিলেন চটিয়ে। প্রফেসর ওয়েবার নামের অধ্যাপক মশাইটি চাইতেন ছাত্ররা তাকে সব সময় ‘হের প্রফেসর’ বলে ডাকুক (আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক যেমন সারা দিনই ‘স্যার স্যার’ করা পছন্দ করেন, অনেকটা ওরকম আরকি!)। আইনস্টাইন ব্যাপারটি বুঝলেও তাকে সব সময় নাম ধরে ‘হের ওয়েবার’ নামে সম্বোধন করে যেতেন। এর ফলে প্রফেসর সাহেব এমনই ক্ষ্যাপা খ্যাপেন যে, পরীক্ষার আগে তিনি আইনস্টাইনকে একটি স্টাডি পেপার দু-দুবার লিখতে বাধ্য করেছিলেন।

সে যা-ই হোক, পরীক্ষার লবডঙ্কা ফলাফলের খেসারত ভালোই দিলেন আইনস্টাইন। সহপাঠীদের মধ্যে চাকরি হলো না কেবল তাঁরই। নানা কলেজে দরখাস্ত করলেন, কিন্তু কোথা থেকেও কোনো উত্তর এল না। নিজ প্রতিষ্ঠানেও কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না আইনস্টাইন।

সেই ওয়েবার মশাই, যিনি এমনিতেই আইনস্টাইনের ওপর ‘ক্ষেপচুরিয়াস’ ছিলেন, তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে এ বছর তিনি কোন পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রকে তাঁর অধীনে কাজ করার জন্য নেবেন না, নেবেন একজন পুরোদস্তুর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বোঝাই যায়, পাছে আইনস্টাইন আবেদন করে বসেন এই ভয়েই তড়িঘড়ি করে অমন ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। যাহোক, বেকার আইনস্টাইনকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছিলেন তাঁর পলিটেকনিকের সহপাঠী গ্রসম্যান। গ্রসম্যান তাঁর বাবাকে অনুরোধ করে কোনো রকমে আইনস্টাইনের জন্য একটা চাকরী জুটিয়ে দিলেন সুইস পেটেন্ট অফিসে। পদ – প্রবেশনারি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, থার্ড ক্লাস। হ্যাঁ – ওখানেই চাকরি শুরু করলেন আইনস্টাইন, ধীরে ধীরে সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভাজনও হতে শুরু করলেন, কিন্তু এর বেশি কিছু আইনস্টাইনকে দেখে তখন বোঝা যায়নি।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই পরিস্থিতি গেল বদলে। ওই ‘অজ্ঞাতকুলশীল’ সাধারণ পেটেন্ট ক্লার্কের চিন্তার ঝড়ে আক্ষরিকভাবেই লন্ডভন্ড হয়ে গেল পৃথিবী। এমনই লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে গেল যে, পদার্থবিদদের এত দিনকার চিরচেনা বিশ্বজগতের ছবিটাই গেল আমূল বদলে। পুরো পদার্থবিজ্ঞানের চেনা জগৎটাকেই ঢেলে সাজাতে হলো, পাঠ্যপুস্তকগুলোও লিখতে হলো একেবারে নতুন করে!তা পেটেন্ট অফিসে বসে কী করলেন আইনস্টাইন? তিনি তাঁর ওই ‘বিস্ময় বছরের’ প্রথমভাগে প্রকাশ করলেন ব্রাউনীয় গতির ওপর একটা পেপার- যেটি আমাদের দিয়েছিল পরমাণুর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ, তারপর বানালেন আলোর কণিকা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আর প্রকাশ করলেন সবচাইতে জনপ্রিয় আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বটি। তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ বাজারে এল একটি অতিরিক্ত (সংযোজনী) তিন পৃষ্ঠার পেপার হিসেবে। একটি পেপারের জন্য আবার পরবর্তীতে পেলেন নোবেল। আইনস্টাইন আর ‘অ্যামেচার পদার্থবিদ’ রইলেন না, থাকলেন না আর পৃথিবীবাসীর কাছে ‘অজ্ঞাত’ ব্যক্তি হিসেবে। ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রমাণ মিলল, তখন আইনস্টাইন রীতিমতো তারকা। সে বছর নিউ ইয়র্ক টাইমস ব্যানার হেডলাইন করে ফিচার করল –

‘আইনস্টাইনের তত্ত্বের বিশ্বজয়।’

‘লন্ডন টাইমস’ লিখল,

‘বিজ্ঞানে বিপ্লব … নিউটনীয় ধারণা গদিচ্যুত।’

আইনস্টাইনের আসন সেদিন থেকে পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে রীতিমতো স্থায়ী হয়ে গেল। তাঁর জীবনীকার ডেনিশ ব্রায়ান Einstein: A Life গ্রন্থে লিখেছেন,

> ‘He was regarded by many as an almost supernatural being, his name symbolizing then – as it does now- the highest reaches of the human mind’.

সত্যিই তা-ই। 'আইনস্টাইন' শব্দটি উচ্চারণ করলেই মনে যে হিমালয়সম তুঙ্গস্পর্শী মানবপ্রতিভার অবয়ব চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল সে সময়ই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের রুজ বল প্রফেসর রজার পেনরোজের মতে,

'আমাদের পরম সুবিধা এই যে, এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা দু-দুটো বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছি। প্রথমটিকে আমরা বলি আপেক্ষিকতা, আর দ্বিতীয়টি চিহ্নিত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে। অবাক ব্যাপার যে, একজন মাত্র বিজ্ঞানী—আলবার্ট আইনস্টাইন—তাঁর অসাধারণ মনন আর অনুসন্ধিৎসা বলে ১৯০৫ সালে মাত্র এক বছরের ভেতর রচনা করেছিলেন ওই দু-দুটো বিপ্লবেরই।'

মানস পরীক্ষা

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উদ্ভাবনের পেছনে রয়েছে আইনস্টাইনের অসাধারণ কিছু মানস পরীক্ষা (Thought Experiment)[11]। 'অসাধারণ' শব্দটি লিখলাম বটে, কিন্তু বর্ণনা শুনলে মনে হবে এ তো খুবই সাধারণ। এতই সাধারণ, যে কারো মাথায়ই হয়তো আসবে না যে, এগুলো কোনো চিন্তার বিষয় হতে পারে।

আমি যদি একটা আয়না নিয়ে আলোর গতিতে শাঁ শাঁ করে ছুটতে থাকি,
তবে কি আয়নায় আমার কোনো ছায়া পড়বে?

---

[11] বি. দ্র. মানস পরীক্ষাগুলো (Thought Experiment) কোনো বাস্তব পরীক্ষা নয়, বরং কল্পিত পরীক্ষা। পরীক্ষাগুলো ঘটে আসলে পদার্থবিদদের মাথার ভেতরে, কোনো ল্যাবরেটরিতে নয়। মুলত যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য কারণে এ ধরনের পরীক্ষাকে বাস্তবে রূপ না দেওয়া গেলেও পদার্থবিদদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া এ পরীক্ষাগুলোর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম।

আইনস্টাইনের অসাধারণত্ব ওখানেই। সাধারণ আর হাল্কা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে অসাধারণ সমস্ত জটিল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতেন। সেই সতেরো বছর বয়সে হঠাৎ করেই একদিন আইনস্টাইনের মাথায় এসেছিল একটি অদ্ভুতুড়ে প্রশ্ন: 'আচ্ছা, আমি যদি একটা আয়না নিয়ে আলোর গতিতে শাঁ শাঁ করে ছুটতে থাকি, তবে কি আয়নায় আমার কোনো ছায়া পড়বে?'

প্রশ্নটা শুনতে সাধারণ মনে হলেও এর আবেদন কিন্তু সুদূরপ্রসারী। এই প্রশ্নটি সমাধানের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে ছিল আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব (Special Theory of Relativity) সমাধানের বীজ। আলোর গতিতে চললে আয়নায় কি ছায়া পড়ার কথা? আমাদের প্রাত্যহিক যে অভিজ্ঞতা, তার নিরিখে বলতে গেলে বলতে হয় 'পড়বে না'। কেন?

কারণটা সোজা। গ্যালিলিও-নিউটনেরা বস্তুর মধ্যকার আপেক্ষিক গতির যে নিয়মকানুন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা থেকে বোঝা যায়, আলোর সমান সমান বেগে পাল্লা দিয়ে চলতে থাকলে আইনস্টাইনের সাপেক্ষে আলোকে তো একেবারে গতিহীন মনে হবার কথা। ফলে আলোর তো আইনস্টাইনকে ডিঙিয়ে আয়নায় ঠিকরে পড়ে আবার আইনস্টাইনের চোখে পড়বার কথা নয়। তাহলে ওই পরিস্থিতিতে আইনস্টাইন কিন্তু নিজের ছায়া আয়নায় দেখতে পাবেন না। আরো সোজাসুজি বললে বলা যায়, আয়না মুখের সামনে ধরে আলোর বেগের সমান বেগে দৌড়ুতে থাকলে আইনস্টাইন দেখবেন যে আয়না থেকে আইনস্টাইনের প্রতিবিম্ব রীতিমতো 'ভ্যানিশ' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাই যদি হয় এই ব্যাপারটা জন্ম দেবে আরেক সমস্যার। এত দিন ধরে গ্যালিলিও যে 'প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি' নামের সর্বজনীন এক নিয়ম আমাদের শিখিয়েছিলেন, সেটা তো আর কাজ করবে না। গ্যালিলিওর এই আপেক্ষিকতার নিয়মটা আগে একটু একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। এই যে আমরা পৃথিবী নামের গ্রহের কাঁধে সওয়ার হয়ে সূর্যের চারদিকে সেকেন্ডে ১৬ মাইল বেগে অবিরাম ঘুরে চলেছি, তা আমরা কখনো টের পাই না কেন? কারণ আমাদের অবস্থান তো পৃথিবীর

বাইরে নয়। পৃথিবী আমাদের সাথে নিয়েই প্রতিনিয়ত লাট্টুর মতো ঘুরে চলেছে। কাজেই আমাদের সাপেক্ষে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি তো সব সময়ই স্রেফ শূন্যই থাকে। সেজন্যই আমরা পৃথিবীর গতিকে কখনো উপলব্ধি করি না। ঠিক একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয় আমাদের যখন আমরা স্টিমারে, লঞ্চে কিংবা জাহাজে করে নদী কিংবা সমুদ্র পাড়ি দিই। অনেক সময় আমরা ডেকের ভেতরে থেকে বুঝতেই পারি না লঞ্চ বা জাহাজটা চলছে কি না। কেবল বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি তীরের গাছপালা-বাড়িঘরগুলো সব পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে,তখনই কেবল বুঝি যে আমাদের জাহাজটা আসলে সামনের দিকে এগোচ্ছে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা যখন সুয্যি মামাকে পুব থেকে পশ্চিমে চলে যেতে দেখি, তখনই আমরা কেবল বুঝি যে আমাদের পৃথিবীটা হয়তো আমাদের সাথে নিয়ে পশ্চিম থেকে পুবে পাক খেয়ে চলেছে। এই বিভ্রান্তিটাই কিন্তু গ্যালিলিওর 'প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি'র মূলকথা। গ্যালিলিও বলেছিলেন যে,কেউ যদি সমবেগে ভ্রমণ করতে থাকে (ধরুন জাহাজে করে)তবে তার (জাহাজের ডেকের ভেতরে বসে) কোনোভাবেই বুঝবার বা বলবার উপায় নেই যে সে এগোচ্ছে, পেছাচ্ছে নাকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে জাহাজটি যদি আলোর বেগে চলে তবে তো এই সর্বজনীন ব্যাপারটি খাটবে না। জাহাজের ডেকে বসে স্রেফ আয়নার দিকে তাকিয়েই কিন্তু জাহাজযাত্রী বুঝে যাবেন যে তাঁর জাহাজটি চলছে, কারণ তিনি তাঁর প্রতিবিম্বকে আয়না থেকে 'ভ্যানিশ' হয়ে যেতে দেখবেন।

তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়—আইনস্টাইন বুঝলেন, হয় গ্যালিলিওর প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি ভুল, আর নয়তো আইনস্টাইনের মানস পরীক্ষার মধ্যেই কোথাও গলদ রয়ে গেছে। অবশ্যই সতেরো বছর বয়সে এই ধাঁধার কোনো সমাধান পাননি আইনস্টাইন, কিন্তু এ নিয়ে অনবরত চিন্তা করেই গেছেন।

সমাধান পেয়েছেন শেষ পর্যন্ত সুইস পেটেন্ট অফিসে চাকরি শুরু করার মাস খানেকের মধ্যে। আইনস্টাইন বুঝলেন যে, গ্যালিলিওর প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটির

মধ্যে কোনো ভুল নেই। আয়না থেকে ছায়া ভ্যানিশ হওয়া ঠেকাতে হলে আলোর গতির ব্যাপারটিকে একটু ভিন্নরকমভাবে ভাবতে হবে; আর দশটা সাধারণ বস্তুকণার বেগের মতো করে ভাবলে চলবে না। আইনস্টাইন বললেন, 'আলোর বেগ তার উৎস বা পর্যবেক্ষকের গতির ওপর কখনোই নির্ভর করে না; এটি সব সময়ই ধ্রুবক।' ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। মন মানতে চায় না; কারণ এই ব্যাপারটি বস্তুর বেগসংক্রান্ত আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণের একেবারেই বিরোধী। যেমন: ধরা যাক, আপনি একটি রাস্তায় ৪০ কিমি বেগে গাড়ি চালাচ্ছেন।

আপনার বন্ধু ঠিক বিপরীত দিক থেকে আরেকটি গাড়ি নিয়ে ৪০ কিমি বেগে আপনার দিকে ধেয়ে এল। আপনার কাছে কিন্তু মনে হবে আপনার বন্ধু আপনার দিকে ছুটে আসছে দ্বিগুণ (৪০ + ৪০ = ৮০ কিমি)বেগে। আলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ধরা যাক, একজন পর্যবেক্ষক সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার বেগে আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। আর উৎস থেকে আলো ছড়াচ্ছে তার নিজস্ব বেগে—অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটারে। এখন কথা হচ্ছে পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর বেগ কত বলে মনে হওয়া উচিত? আগের উদাহরণ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা বলে—সেকেন্ডে (১ লক্ষ ৫০ হাজার + ৩ লক্ষ =) ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোমিটার। আসলে কিন্তু তা হবে না। পর্যবেক্ষক আলোকে সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগেই তাঁর দিকে আসতে দেখবে। ব্যাপারটা ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই,কিন্তু এ ব্যাপারটা না মানলে গ্যালিলিওর 'প্রিন্সিপাল অব রিলেটিভিটি'র কোনো অর্থ থাকে না। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে আরো দেখালেন, যদি কোনো বস্তুকণার বেগ বাড়তে বাড়তে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চলে আসে, বস্তুটির 'আপেক্ষিক ভর' বেড়ে যাবে (mass increase) নাটকীয়ভাবে[12], দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে

---

[12] একটা বিষয় একটু পরিস্কার করা দরকার। যদিও বেইজারসহ আগেকার কিছু বইপত্রে আলোর গতির সাথে সাথে বস্তুর ভর বেড়ে যাওয়ার কথা বলা থাকে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা ব্যাপারটিকে আর সেরকমভাবে ব্যাখ্যা করেন না। আসলে 'রিলেটিভিস্টিক ম্যাস' বা আপেক্ষিক ভর একটি পুরনো ধারণা। ১৯৩০ সালের আগে পদার্থবিজ্ঞানীরা এটা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন অধিকাংশ পদার্থবিদেরাই যেটা ব্যবহার করেন তা হলো 'ইনভ্যারিয়েন্ট ম্যাস' বা অপরিবর্ত ভর। অপরিবর্ত ভর

যাবে (length contraction) এবং সময় ধীরে চলবে (time dialation)। সময়ের ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী-নির্বিশেষে সবাই সময় ব্যাপারটিকে এতদিন একটা 'পরম' (absolute) কোনো ধারণা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন; সময় ব্যাপারটা রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবার জন্যই ছিল সমান, যেন মহাবিশ্বের কোথাও লুকিয়ে থাকা একটি পরম ঘড়ি অবিরাম মহাজাগতিক হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হয়ে চলছে, টিক, টিক, টিক, টিক... যার সাথে তুলনা করে পার্থিব ঘড়িগুলোর সময় নির্ধারণ করা হয়। কাজেই সময়ের ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থেই ছিল পরম, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আইনস্টাইন রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়ে বললেন,সময় ব্যাপারটা কোনোভাবেই 'পরম' নয়, বরং আপেক্ষিক। আর সময়ের দৈর্ঘ্য মাপার আইনস্টাইনীয় স্কেলটা লোহার নয়, যেন রাবারের – ইচ্ছে করলেই টেনে লম্বা কিংবা খাটো করে ফেলা যায়! রামের কাছে সময়ের যে দৈর্ঘ্য তা রহিমের কাছে সমান মনে নাও হতে পারে। বিশেষত রাম যদি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, রহিমের তুলনায় রামের ঘড়ি কিন্তু আস্তে চলবে!আরেকটা জিনিস বেরিয়ে এল আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে। শূন্য পথে আলোর যা গতিবেগ, কোনো বস্তুর গতিবেগ যদি তার সমান বা বেশি হয়, তবে সমীকরণগুলো নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা হয় – কোনো পদার্থই আলোর সমান গতিবেগ অর্জন করতে পারবে না। সেই থেকে মহাবিশ্বের গতির সীমা নির্ধারিত হয় আলোর বেগ দিয়ে।

আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার এই বিশেষ তত্ত্ব দিয়েই কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। ১৯০৫ সালে তাঁর গবেষণাপত্রটি জার্নালে প্রকাশের

আলোর বেগের ওপর নির্ভর করে না, এটি মূলত একটি অপরিবর্ত স্কেলার রাশি। কেন আলোর গতিবেগের সাথে সাথে বস্তুর দৈর্ঘ্য কমলেও (length contraction) কিংবা সময় শ্লথ হয়ে গেলেও (time dilation) বস্তুর ভর অপরিবর্তিত থাকে। তাহলে কেন কোনো বস্তুকণা আলোর সমান গতিতে ধাবমান হতে পারবে না? সেটাকে ব্যাখ্যা করা উচিত আসলে ভরের মাধ্যমে নয়,বরং শক্তির মাধ্যমে। যত বস্তুর বেগ বাড়তে থাকে তার জড়তা বা ইনারশিয়া বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে বস্তুকণা আলোর বেগের সমান হতে পারবে না, কারণ এর জন্য অসীম শক্তির দরকার হবে।

পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে,সুইস পেটেন্ট অফিসের এক অখ্যাত কেরানি অচিরেই পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক তখনই উচ্চকিত হয়ে উঠেছিলেন এই বলে: 'যদি (আপেক্ষিক তত্ত্ব)সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে আইনস্টাইন বিংশ শতাব্দীর কোপার্নিকাস হিসেবে বিবেচিত হবেন।'

কিন্তু আইনস্টাইন কেবল বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকার মানুষ নন। আবিষ্কারের নেশা তখন যেন তাকে পেয়ে বসেছে। তিনি মন দিলেন আরো উচ্চাভিলাষী গবেষণায়। এর ফলাফল হিসেবেই ক'বছরের মধ্যে উঠে এল সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। এই গবেষণা মানে আর গুণে এমনই অনন্য যে, আইনস্টাইন নিজেই একসময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই গবেষণার কাছে তাঁর আগের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব তো স্রেফ 'ছেলেখেলা'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আইনস্টাইনের এই সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের পেছনেও কিন্তু রয়েছে আরেকটি সার্থক মানস পরীক্ষা। হঠাৎ একদিন আইনস্টাইনের মাথায় এল একটা লোক উঁচু একটা বাড়ির ছাদের ওপর থেকে পড়ে গেলে কী হবে? কী আবার হবে! ধপ্পাস করে মাটিতে, তারপর দুম ফট! আমাদের মতো ছা-পোষা মানুষেরা তো বটেই, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই ওভাবে চিন্তা করতেন। কিন্তু আইনস্টাইন ওভাবে ভাবলেন না। সাধারণ একটা ঘটনার মধ্যেও অসাধারণত্বের ছোঁয়া খুঁজে পেলেন। তিনি দুর্ভাগ্যবান মানুষটির মাটিতে ভূপাতিত হবার ঠিক আগের মুহূর্তটির 'সৌভাগ্যের' কথা ভাবলেন, যেটিকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন 'হ্যাপিয়েস্ট থট অব মাই লাইফ'।

কী পেলেন আইনস্টাইন ওই পতনশীল মানুষটির মাটিতে আঘাত করার আগ মুহূর্তের মধ্যে? পেলেন এই যে, ওই পতনশীল মানুষটি নিজের ওজন অনুভব করবে না। আইনস্টাইনের কাছে এ ব্যাপারটির মানে দাঁড়াল, মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তপতনশীলতার অভিজ্ঞতা আর মহাকর্ষ-বিহীন শূন্যাবস্থায় ভেসে থাকার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। সেখান থেকেই তিনি বের করে আনলেন 'ইকুইভ্যালেন্ট

প্রিন্সিপাল'—যা হয়ে দাঁড়াল সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি।

মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তপতনশীলতার অভিজ্ঞতা আর মহাকর্ষ-বিহীন শূন্যাবস্থায় ভেসে থাকার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই

আইনস্টাইন পরবর্তীতে তাঁর এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের সাহায্যে মহাকর্ষের সাথে আপেক্ষিকতাকে সন্নিবদ্ধ করে দেখালেন যে, মহাকর্ষকে শুধু শূন্যস্থানে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল (নিউটন যেভাবে চিন্তা করেছিলেন) হিসেবে ভাবলে চলবে না,ভাবতে হবে আপাত বল (aparent force)হিসেবে, যার উদ্ভব হয় আসলে মহাশূন্যের (space) নিজস্ব বক্রতার কারণে। তাঁর এ তত্ত্ব থেকেই আমরা বুঝতে পেরেছি,কোনো আকর্ষণ বল-টল নয়, বরং বিশাল ভরের কারণে মহাশূন্যে সৃষ্টি হয় বক্রতা যা বস্তুকণাদের তো বটেই —এমনকি আলোর গতিপথকেও বাঁকিয়ে দেয়। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য থাকার কারণেও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে বক্রতা, যার কারণে পৃথিবীসহ অন্য গ্রহগুলোকে একটি বক্রতলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে দেখা

যায়। প্রফেসর আর্চিবালড হুইলারের ভাষায় —'পদার্থ স্পেসকে বলছে কিভাবে বাঁকতে হবে,আর স্পেস পদার্থকে বলছে কিভাবে চলতে হবে'! এটাই আসলে নিউটনের মহাকর্ষকে আইনস্টাইনের চোখ দিয়ে দেখা।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে সংশয়

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়েও আইনস্টাইন বিভিন্ন ধরনের মানস পরীক্ষা করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ তিন দশকে। এর অনেকগুলোই তৈরি করেছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস্ বোরের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে। যদিও আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ওপরেই; কিন্তু এই আইনস্টাইনই আবার পরবর্তীতে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সম্ভাবনার জগতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে পারেননি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনিশ্চয়তাকে খণ্ডন করতে গিয়ে তাঁর 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' উক্তিটি তো সর্বজনবিদিত।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করতে তিনি অনেকগুলো মানস পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করেন; এর মধ্যে বিখ্যাতটি হলো 'ই.পি.আর' পরীক্ষণ, যেটি তিনি তৈরি করেন ন্যাথান রোজেন আর বরিস পোডলস্কির সাথে মিলে। ১৯৩৫ সালে তাঁর সেই মানস পরীক্ষার গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ফিজিক্যাল রিভিউ জার্নালে Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be considered Complete? শিরোনামে।

আইনস্টাইনের সবগুলো মানস পরীক্ষাই ছিল খুবই সহজ-সরল, যা পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনস্টাইনের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি ওই সব সহজ-সরল সাধারণ বিষয়গুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে জটিল তত্ত্বে উপনীত হতেন। আবার অনেক সময় জটিল জিনিসকে নিয়ে আসতেন জনমানুষের সাধারণ বোধগম্যতার স্তরে। একবার বিজ্ঞানের

এক ‘ক অক্ষর গোমাংস’ সাংবাদিক ‘আপেক্ষিকতার মূল বিষয়টি কী’ জিজ্ঞাসা করলে, আইনস্টাইন উত্তরে বললেন,

> ‘আপনি চুলার আগুনে আপনার হাতটি এক মিনিটের জন্য ধরে রাখুন, সেই এক মিনিটকে মনে হবে এক ঘণ্টা। কিন্তু এক সুন্দরী তরুণীর সাথে এক ঘণ্টা ধরে কথা বলুন, সেই এক ঘণ্টাকে মনে হবে এক মিনিট। এটাই আপেক্ষিকতা।’

আইনস্টাইনের আস্থা ছিল পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ ভৌত বাস্তবতায়। তিনি বিশ্বাস করতেন না মানুষের পর্যবেক্ষণের ওপর কখনো ভৌত-বাস্তবতার সত্যতা নির্ভরশীল হতে পারে। বোর প্রদত্ত কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোপেনহেগেনীয় ব্যাখ্যার সাথে তার বিরোধ ছিল মূলত এখানেই। বোর বলতেন, ‘পদার্থবিজ্ঞানে কাজ প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা নয়, প্রকতি সম্পর্কে আমরা কী বলতে পারি আর কিভাবে বলতে পারি,এটা বের করাই বিজ্ঞানের কাজ।’ এই ধারণাকে পাকাপোক্ত করতে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আরেক দিকপাল হাইজেনবার্গ দেখিয়েছিলেন যে,একটি কণার অবস্থান এবং বেগ যুগপৎ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। অবস্থান সুচারুভাবে মাপতে গেলে কণাটির বেগের তথ্য হারিয়ে যাবে, আবার বেগ খুব সঠিকভাবে মাপতে গেলে অবস্থান নির্ণয়ে গন্ডগোল দেখা দেবে। নীলস বোরের মতে,যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি কণাকে পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কণাটি কোথায় রয়েছে—এটা বলার কোনো অর্থ হয় না। কারণ এটি বিরাজ করে সম্ভাবনার এক অস্পষ্ট বলয়ে। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী ভৌত-বাস্তবতা মানব-পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ নয় (১৯৮২ সালে অ্যালেইন অ্যাস্পেক্ট আইনস্টাইনের ই.পি.আর মানস পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করেন একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে, যা বোরের যুক্তিকেই সমর্থন করে)। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইন এ ধরনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একবার বোরের যুক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এক বন্ধু তাঁকে রাস্তায় মানব-পর্যবেক্ষণের সাথে কোয়ান্টামীয় ভৌত-বাস্তবতার সম্পর্ক বোঝাতে চাইছিলেন। বিরক্ত আইনস্টাইন

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন –

‘তুমি বলতে চাইছ, ওই যে চাঁদটা ওখানে আছে, আমরা না দেখলে চাঁদটার অস্তিত্ব থাকবে না?’

এই হচ্ছেন আইনস্টাইন। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কিছু উপমা আর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিশ্বজগতের জটিল রহস্যের সমাধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্যাভিয়ার রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো একসময়কার ‘ভাবুক’ বালক বড় হয়ে স্রেফ কতকগুলো মানস পরীক্ষার মাধ্যমে চিরচেনা জগতের ছবিটাই আমূল পাল্টে দিয়েছিলেন,আর জীবনের শেষ বছরগুলো নিষ্ফলভাবে কাটিয়েছিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ‘আজগুবি’ সিদ্ধান্তগুলোকে হটাতে; মানবিকতার সাধনায় আর প্রকৃতির মৌলিক বলগুলোকে একীভূত করবার উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন নিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন অনেক দূর – একাকী, নিঃসঙ্গভাবে!

অষ্টম অধ্যায়

শূন্যতার শক্তি

আমিও তোমার মতো বুড়ো হব—বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেব
কালীদহে বেনো জলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।
—জীবনানন্দ দাশ, বোধ

১৯২০ সালের দিকে আলবার্ট আইনস্টাইন এক গভীর সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। সমস্যাটি মহাবিশ্বের প্রকৃতি এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে। তাঁর মতো বিজ্ঞানীর অবশ্য এসব সমস্যা নিয়ে খুব বেশি হাবুডুবু খাওয়ার কথা নয়। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ বা ব্যাপক তত্ত্ব দুইটিই বিজ্ঞানের জগতে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে স্থান-কালের বক্রতা যে আলোর গতিকেও বাঁকিয়ে দিতে পারে, তা এডিংটনের পরীক্ষায় হাতে-কলমে প্রমাণিত হয়ে গেছে ১৯১৯ সালের জুনের দুই তারিখে। যে বুধ গ্রহের বিচলন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম দিয়ে কোনোভাবেই মেলানো যাচ্ছিল না, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বসংক্রান্ত গণনার ছাঁচে ফেলে খাপে খাপ মিলিয়ে দেওয়া গেছে। আইনস্টাইন তখন নিজেই রীতিমতো এক তারকা।

আইনস্টাইন চাইলে এ সময় একটু সাহসী হতে পারতেন। তাঁর তত্ত্ব থেকেই কিন্তু বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল যে আমাদের মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে,

মানে আকাশের যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা, গ্যালাক্সিরা সব একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিজেই সেটা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন না বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। বলা উচিত মানতে চাইলেন না। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্যালাক্সিগুলোর একে অন্যের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর গাণিতিক সমীকরণে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এতে মহাবিশ্ব চুপসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারসাম্য বা স্থিতাবস্থাপ্রাপ্ত হবে। এটাই সেই বিখ্যাত 'মহাজাগতিক ধ্রুবক'; গ্রিক অক্ষর ল্যামডা দিয়ে নামাঙ্কিত করে স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছিলেন আইনস্টাইন। এই ধরনের মহাবিশ্ব সংকুচিতও হয় না, প্রসারিতও হয় না। সে সময় অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানীই মহাবিশ্বকে এভাবে দেখতেন। কিন্তু সবাই দেখলেই আইনস্টাইনকে দেখতে হবে কেন? চিন্তা-চেতনার জগতে বহু ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন বিপ্লবী। নিউটনের চিরচেনা পরম মহাবিশ্বের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বানিয়েছিলেন আপেক্ষিকতার এক নতুন জগৎ। অথচ মহাবিশ্বের প্রসারণের বেলায় তিনি 'ঝাঁকের কই' হয়েই রইলেন কেন যেন।

এর প্রায় বারো বছর পর আমেরিকান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী এডউইন হাবল যখন টেলিস্কোপের সাহায্যে চাক্ষুষ প্রমাণ হাজির করলেন,দেখিয়ে দিলেন যে, মহাবিশ্ব স্থিতিশীল মোটেই নয়, বরং সত্যই প্রসারিত হচ্ছে, তখন আইনস্টাইন মুখ কাঁচুমাচু করে স্বীকার করে নিলেন যে, সমীকরণের মধ্যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বসানোটা 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল' ছিল[13]।

যে আইনস্টাইন সব সময়ই স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন সারা জীবন ধরে, সেখানে তিনি কেন স্থবির মহাবিশ্বকে সত্য বলে ভেবে নিয়েছিলেন, তা আমাদের

[13] রুশ-আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামোর আত্মজীবনীতে এই স্বীকারোক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্যামো বলেছেন, 'when I was discussing cosmological problems with Einstein, he remarked that the introduction of the cosmological term was the biggest blunder of his life.' [*My World Line* (1970)]

রীতিমতো বিস্মিত করে। বিস্মিত করেছিল প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক জেমস পিবলসকেও। তিনি বলেন, 'স্ট্যাটিক মহাবিশ্ব তো কাঠামোগতভাবেই স্বসংগতিপূর্ণ নয়। সূর্য তো সারা জীবন ধরে জ্বলে থাকতে পারে না। এ ব্যাপারটা আইনস্টাইন বুঝতে পারেননি, এটা আমাকে অবাক করে দেয়, এখনো'।

অবশ্য কে তখন জানত আইনস্টাইনের ভুল তো আর যে সে ভুল নয়! তাঁর সমীকরণে যে মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের আমদানিকে 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তিনি নিজে, সেই ভুলই আবার সিন্দাবাদের ভূতের মতো কাঁধে সওয়ার হয়ে ফিরে এসেছে নতুন উদ্যমে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে।

একটি ধ্রুবকের জন্মকথা

আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন, মহাকর্ষ এবং সমত্বরণে গতিশীল বস্তু সমতুল্য। g শক্তির অভিকর্ষ ক্ষেত্র বিশিষ্ট একটি লিফটের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকার সাথে g সমত্বরণে চলমান একটি রকেটে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে চলার মধ্যে আসলে কোনোই পার্থক্য নেই।

আইনস্টাইন আরো একটি ব্যাপার ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারলেন। নিউটন আমাদের স্থান-কালের জন্য যে পরম কাঠামোর একটা দৃষ্টিনন্দন ছবি বানিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়। অবশ্য আইনস্টাইনের এ চিন্তাটা একেবারে মৌলিক ছিল কি না তা হলফ করে বলা যায় না। অনেকে বলেন, এর পেছনে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ও দার্শনিক মাখ (Ernst Mach)-এর একটা প্রভাব আছে। মাখ আইনস্টাইনের আগেই স্থান-কালের ক্ষেত্রে নিউটনীয় পরম কাঠামোর ধারণা পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং এর সমালোচনাও করেছিলেন। 'বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে আর গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরল পথে চলতে থাকবে'—নিউটনের এই সূত্রটার সাথে আমরা সবাই আমাদের স্কুলজীবনে পরিচিত

হয়েছি। প্রাত্যহিক জীবনেও এর ব্যবহার আমরা দেখি অহরহ। টেবিলের ওপর কোনো কিছু ফেলে রাখলে সেটা সেভাবেই থাকে। আপনার টেবিলে রাখা রসালো খাবারগুলো হঠাৎ আমার ঘরের টেবিলে এসে উপস্থিত হয় না। এটা হলে কী মজাটাই না হতো! ঠিক একইভাবে একটা বস্তু যখন সমবেগে গতিশীল থাকে তখন সেটা সেভাবেই থাকতে চায়। সেজন্য একটা চলমান বাসের ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক চাপলে আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কিন্তু এই যে গতি-জড়তা বা স্থিতি-জড়তার ব্যাপারগুলো ঘটছে, সেটা কার সাপেক্ষে? এটা ব্যাখ্যার জন্য নিউটনকে তৈরি করতে হয়েছিল পরম স্থানের ধারণার, যে অনড় কাঠামো সংজ্ঞায়িত করবে সমস্ত স্থানীয় জাড্য কাঠামোকে (local inertial frames) । মাখ অবশ্য প্রস্তাব করেছিলেন, পদার্থের এই বণ্টন সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে জাড্য কাঠামোর সাপেক্ষে, এবং সেটা কোনো পরম স্থান-কালের ধারণা আরোপ না করেই। পরবর্তীতে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ভিত্তিও কিন্তু গড়ে উঠেছিল অনেকটা এই ধারণার ওপরই।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বই প্রথমবারের মতো মহাবিশ্বের সার্বিক রূপরেখার একটি আশাব্যঞ্জক ছবি আমাদের জন্য আঁকতে সমর্থ হয়েছিল। তাঁর তত্ত্ব থেকেই আমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারলাম, স্থানের মধ্য দিয়ে পদার্থ কিভাবে চলবে;শুধু তা-ই নয়, কিভাবে স্থান-কালের উদ্ভব হতে পারে তারও অভিনব একটা ছবি পেয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু পেলে কী হবে, আইনস্টাইনের মাথায় ছিল তখন মাখ সাহেবের ভূত। মাখ সাহেব নিউটনের পরম কাঠামো ত্যাগ করতে সমর্থ হলেও তিনি সুস্থিত মহাবিশ্বের ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন, 'মাখের প্রিন্সিপাল' বলে একটা নিয়মও তিনি বানিয়েছিলেন নিজের ধারণার সমর্থনে। আইনস্টাইনও একই ভুলের ফাঁদে পা দিলেন। তিনি এমন একটা মহাবিশ্ব মনে মনে কল্পনা করে ফেললেন, যে মহাবিশ্ব সময়ের সাথে সাথে আকারে বাড়েও না, কমেও না। একেবারে অনড়,

অবিচল ও সুস্থিত মহাবিশ্ব। আর তা করতে গিয়ে তাঁর সমীকরণের বাঁ দিকে আমদানি করলেন সেই হতচ্ছাড়া ধ্রুবকের, যাকে আমরা 'ল্যামডা' বলে চিনি।

আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে পাওয়া আইনস্টাইনের মূল সমীকরণটি ছিল খুব সোজা, অনেকটা এরকমের –

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

যেখানে $G_{\mu\nu}$ স্থানের বক্রতার নির্দেশক, $T_{\mu\nu}$-স্ট্রেস এনার্জি টেনসর এবং G হচ্ছে নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুবক।

ল্যামডা বসানোর পর সমীকরণটার চেহারা বদলে গিয়ে দাঁড়াল এরকমের –

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

সমীকরণের বাঁ দিকে এভাবে এই ল্যামডা বসিয়ে দিয়ে আইনস্টাইন ভাবলেন—খুব যাহোক, মহাবিশ্বটাকে অযথা টানাটানির হাত থেকে রক্ষা করা গেছে।

কিন্তু আইনস্টাইনের উৎসাহের বেলুন ক্রমেই চুপসে যেতে শুরু করল। বেলুনে প্রথম সুইটা ফোটালেন উইলিয়াম ডি সিটার নামে এক ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। ১৯১৭ সালে ডি সিটার দেখালেন যে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ধ্রুবক গোনায় ধরেই তাঁর সমীকরণের এমন একটা সমাধান পাওয়া যায়, যেটা তাঁর উপসংহারের সাথে বেমানান। সিটারের সমাধান থেকে বেরিয়ে এল—মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল হয়ে বসে থাকতে হবে এমন দিব্যি কেউ দিয়ে দেয়নি, এটি প্রসারিত হতে পারে, এমনকি পদার্থের অনুপস্থিতিতেও। তবে ডি সিটারের গণিত মেনে নিলেও এই ধরনের মহাবিশ্বের বাস্তবতাকে আইনস্টাইন কখনোই পাত্তা দেননি। ফলে এই মডেলটি কেবল একাডেমিক আঁতেলদের চিন্তায় খোরাক জোগান ছাড়া আর বাড়তি কিছু করে উঠতে পারেনি।

কিন্তু ১৯২২ সালে আইনস্টাইনের বেলুনে যে খোঁচাটা লাগল তা বেশ বড়সড়। রুশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান প্রসারণশীল এবং সংকোচনশীল মহাবিশ্বের মডেল তৈরি করলেন কোনো রকম মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ছাড়াই। ফ্রিডম্যান দেখালেন,

মহাবিশ্বের গড় ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে মহাবিশ্ব আজীবন প্রসারিত হতে পারে (উন্মুক্ত মহাবিশ্বের মডেল) কিংবা একটা সময় পর সংকুচিত হতে পারে (বদ্ধ মহাবিশ্বের মডেল), কিংবা হতে পারে দুয়ের মাঝামাঝি কিছু (সামতলিক মহাবিশ্ব); এবং এর জন্য মহাজাগতিক ধ্রুবক-টুবক গোনায় ধরার দরকার নেই।

আইনস্টাইনের সমীকরণের সমাধান ফ্রিডম্যান হাজির করলেন মহাজাগতিক ধ্রুবক ছাড়াই। মহাবিশ্বের গড় ঘনত্বের ওপর ভিত্তি করে এর প্রকৃতি হতে পারে বদ্ধ (Closed), উন্মুক্ত (Open) কিংবা সামতলিক (Flat)—এই তিনটির যেকোনো একটি

১৯৩০ সালে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন একটা গবেষণাপত্রে দেখালেন, আইনস্টাইন যে মহাবিশ্বকে স্থিতিশীল ধরে নিচ্ছেন, সেটা আসলে স্থিতিশীল নয়। আসলে অভিকর্ষ এবং মহাজাগতিক পদটি এত নিখুঁতভাবে সাম্যাবস্থায় আছে, যে এ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই মহাবিশ্ব হুড় হুড় করে প্রসারিত হতে থাকবে, নয়তো নিজের মধ্যেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

১৯৩১ সালে আইনস্টাইনের ‘সুস্থিত মহাবিশ্ব’ নামের সাধের বেলুনটা ফাটিয়েই দিলেন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারিত হচ্ছে। আইনস্টাইনও তৎক্ষণাৎ তাঁর মহাজাগতিক ধ্রুবককে ‘তাত্ত্বিকভাবে অসংগতিপূর্ণ’ অভিধায় অভিহিত করে বাতিল করে দিলেন। অভিহিত করলেন জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে। কিন্তু কে জানত আইনস্টাইনের সেই ‘মহাভুলের’ও ভুল ধরিয়ে দিয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে ‘কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট’ আবার নতুন উদ্যমে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে ফিরে আসবে?

শূন্যতার শক্তি

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণ থেকে মহাজাগতিক ধ্রুবক বা ল্যামডাকে ‘ত্যাজ্য’ করে দেওয়ার পর থেকে অন্তত ছয় দশক পদার্থবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে টুঁ শব্দ করেননি। তবে আজ আমরা জানি, আইনস্টাইন যদি তাঁর সমীকরণে তাড়াহুড়ো করে এই মহাজাগতিক ধ্রুবক যোগ না-ও করতেন, আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এর সংযোজন অপরিহার্যই ছিল। কিন্তু এই নতুন দিনের মহাজাগতিক ধ্রুবক আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা থেকে উঠে আসেনি, এসেছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ‘রহস্যময়’ দুনিয়া থেকে।

মজার ব্যাপার হলো, নতুনভাবে ফিরে পাওয়া এই মহাজাগতিক পদটির ধারণা আইনস্টাইনের পুরনো মহাজাগতিক ধ্রুবকের চেয়ে ভিন্ন। আইনস্টাইনের মূল ক্ষেত্র সমীকরণটি ($G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$) মোটা দাগে স্থানের বক্রতার ($G_{\mu\nu}$) সাথে ভর-শক্তির বিন্যাসের ($T_{\mu\nu}$) একটা সম্পর্ক নির্দেশ করে। যখন আইনস্টাইন তাঁর ‘কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট’টি যোগ করেছিলেন, তিনি সেটা করেছিলেন সমীকরণের বাম দিকে ($G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$)। তিনি এটাকে স্পেস বা স্থানের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু আজ যখন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের নতুন

মহাজাগতিক ধ্রুবক নিয়ে ঘষামাজা করছেন, তাঁদের সেটা বসাতে হচ্ছে সমীকরণের ডান দিকে ($G_{\mu\nu} = 8\pi G[T_{\mu\nu} + \rho_{vac} g_{\mu\nu}]$)। আর ডান দিকে বসানোর ফলে এর অর্থই গেছে রাতারাতি বদলে[14]। অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক এই অর্থ। এখন এই নতুন পদের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের একধরনের শক্তি-ঘনত্বকে (energy density) তুলে ধরেন, মহাবিশ্ব প্রসারিত হলেও এর মান অপরিবর্তিত থাকে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সাধারণ পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে, পদার্থ যত প্রসারিত হয়, তত এর ঘনত্ব কমতে থাকে। চিন্তা করে দেখুন, একটা ঘরে কোথাও বোটকা গন্ধ থাকলে আমরা দরজা-জানালা খুলে দিই। ফলে বদ্ধ বাতাস প্রসারিত হয়ে (মানে ঘনত্ব কমে গিয়ে) চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়, গন্ধের তীব্রতাও কমে আসে। কিন্তু মহাবিশ্বের শুরুতে ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। তখন যে অদ্ভুতুড়ে পদার্থটা রাজত্ব করত, সেটা প্রসারিত করা হলেও এর ঘনত্ব থাকত অপরিবর্তিত। ফলে এর ভর আর অধিকৃত আয়তনের সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমানুপাতিক। এর আয়তন যত বেড়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তার ভর। আর তার চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, যে মহাকর্ষ শক্তির হিসাবটা উঠে আসছে গণনা থেকে সেটা আকর্ষণমূলক নয়, বরং বিকর্ষণমূলক। বিকর্ষণমূলক অভিকর্ষ বল? নিউটন বেঁচে থাকলে দুঃখে অক্কাই পেতেন হয়তো। এত কষ্ট করে পৃথিবীর বুকে আপেলের পতনকে আকর্ষণ বল দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই ছবিটাই যাচ্ছে একেবারে উল্টে। বাংলা ব্লগে সুকুমার রায়ের আদলে লেখা 'উল্টো রাজার দেশ' নামের কবিতাটার মতো [15]–

উল্টো রাজার দেশে রে ভাই
উল্টোভাবে বাঁচা
ঘরের মেঝে উপর দিকে
মেঝের দিকে মাচা।

[14] আসলে আইনস্টাইনের মূল সমীকরণে এর মান ছিল ঋণাত্মক। সেটাই নতুন সমীকরণের অপর পাশে এসে ধনাত্মক মান ধারণ করেছে।

[15] স্বপ্নবাজ মামুন, উল্টো রাজার দেশ-১, নাগরিকব্লগ, ১৮ জুলাই, ২০১১

মহাজাগতিক ধ্রুবক : অর্থের পরিবর্তন

The heart of Einstein's general theory of relativity is the field equation, which states that the geometry of spacetime ($G_{\mu\nu}$, Einstein's curvature tensor) is determined by the distribution of matter and energy ($T_{\mu\nu}$, the stress-energy tensor), where G is Newton's constant characterizing the strength of gravity. (A tensor is a geometric or physical quantity that can be represented by an array of numbers.) In other words, matter and energy tell space how to curve.

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

To create a model of a static universe, Einstein introduced the cosmological term Λ to counterbalance gravity's attraction on cosmic scales. He added the term (multiplied by $g_{\mu\nu}$, the spacetime metric tensor, which defines distances) to the left side of the field equation, suggesting that it was a property of space itself. But he abandoned the term once it became clear that the universe was expanding.

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

The new cosmological term now being studied by physicists is necessitated by quantum theory, which holds that empty space may possess a small energy density. This term—ρ_{VAC}, the energy density of the vacuum, multiplied by $g_{\mu\nu}$—must go on the right side of the field equation with the other forms of energy.

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu} + \rho_{VAC}\, g_{\mu\nu}\right)$$

Although Einstein's cosmological term and the quantum vacuum energy are mathematically equivalent, conceptually they could not be more different: the former is a property of space, the latter a form of energy that arises from virtual particle-antiparticle pairs. Quantum theory holds that these virtual particles constantly pop out of the vacuum, exist for a very brief time and then disappear (*below*).

যখন আইনস্টাইন তাঁর 'কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট'টি যোগ করেছিলেন, তিনি সেটা করেছিলেন সমীকরণের বাম দিকে। তিনি এটাকে স্পেস বা স্থানের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু আজ যখন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের নতুন মহাজাগতিক ধ্রুবক নিয়ে ঘষামাজা করছেন, তাঁদের সেটা বসাতে হচ্ছে সমীকরণের ডান দিকে। আর ডান দিকে বসানোর ফলে এর অর্থই গেছে রাতারাতি বদলে (ছবির মূল উৎস: সায়েন্টিফিক আমেরিকান, সেপ্টেম্বর ২০০৪)

এই উল্টো রাজার দেশের মতো ব্যাপারটাই ঘটেছিল মহাবিশ্বের শুরুতে, আর সেজন্যই প্রায় ভরহীন একেবারে শূন্যাবস্থা থেকে এই বিপুল বিশাল মহাবিশ্বের উদ্ভব হতে পেরেছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা এ প্রসারণকে বলেন 'ইনফ্লেশন' বা স্ফীতি। এই স্ফীতি তত্ত্বের কথা আমাদের এই বইয়ে বারেবারেই ঘুরে ফিরে আসবে। কারণ শূন্য

থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির ভিত্তিভূমিই হচ্ছে স্ফীতি তত্ত্ব যা মূল ধারার পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জোরালো তত্ত্ব। স্ফীতি তত্ত্বের জনক এমআইটির অধ্যাপক বিজ্ঞানী অ্যালেন গুথ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, শুরুতে এই স্ফীতির প্রসারণ এমনকি আলোর গতিকেও হার মানিয়েছিল। স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো তাঁদের বিখ্যাত 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়ে সেটাকে রসিয়ে রসিয়ে লিখেছেন এভাবে[16] –

> আপনি যদি জিম্বাবুয়ের অধিবাসী না হন,যেখানে সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি ২০০,০০০,০০০ শতাংশকেও ছাড়িয়ে গেছে, তাহলে হয়তো স্ফীতি শব্দটা তেমন বিস্ফোরক শোনাবে না। কিন্তু একদম রয়েসয়ে করা অনুমান অনুযায়ীও মহাজাগতিক স্ফীতির সময় মহাবিশ্ব ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুণে স্ফীত হয়েছিল মাত্র .০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ সেকেন্ডে। এ যেন একটা ১ সেন্টিমিটার ব্যাসের মুদ্রা হঠাৎ ফুলে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির দশ মিলিয়ন গুণ বড় হয়ে গেল। শুনে মনে হতে পারে, এতে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে, কারণ আমরা জানি, কোনো কিছুই আলোর গতির চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না, কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ গতির এই সীমা স্থান-কালের নিজস্ব প্রসারণের ওপর খাটে না।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই শক্তি-ঘনত্ব কেবল থাকতে পারে 'এম্পটি স্পেস' বা শূন্যস্থানে। কাজেই, শূন্যতাকে আমরা সাধারণভাবে যেরকম শূন্য মনে করি, সেরকম সাদামাঠা সে নয়। এ এক রহস্যময় শক্তির আধার যেন। নামে 'শূন্য' হলেও এর সূক্ষ্ম স্তরে সবসময়ই নানান ধরনের প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন সেখানে পদার্থ-কণা এবং প্রতিপদার্থ-কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হচ্ছে, আবার তারা

[16] Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010 (অনুবাদ, তানভীরুল ইসলাম, মুক্তমনা)

নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। এই কণাগুলোকে আমরা বলি অসদ কণা বা ভার্চুয়াল পার্টিকেল। আর অসদ কণা তৈরির এই চলমান প্রক্রিয়াটিকে আমরা চলতি কথায় বলি ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’। এই ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ব্যাপারটা আমরা খালি চোখে না দেখলেও নানা ধরনের সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে এর অস্তিত্ব শনাক্ত করা গিয়েছে। সেই ১৯৪৭ সালের দিকেই বিজ্ঞানী উইলিস ল্যাম্ব পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, অসদ কণার প্রভাব গোনায় না ধরলে হাইড্রোজেন পরমাণুর শক্তিস্তরের গণনাগুলো কখনোই সঠিক ফলাফল দেবে না[17]। সত্যিই তা-ই। তাঁর এই পরীক্ষণকে বিজ্ঞানের জগতে সবচেয়ে সফল পরীক্ষাগুলোর একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়[18]। ল্যাম্ব তাঁর অসদ কণিকা নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৫৫ সালে। আর তখন থেকেই কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন অসদ কণিকাগুলোর অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই আছে[19]।

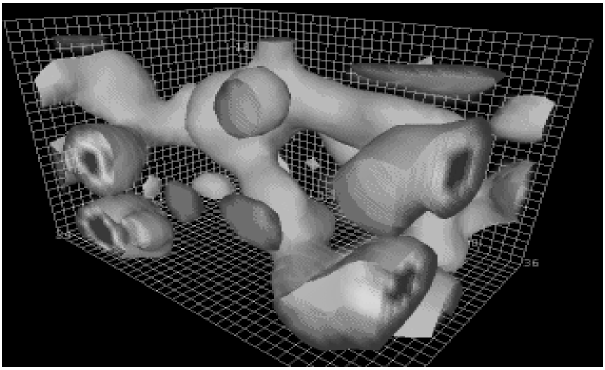

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে শূন্যস্থানে অনবরত নানান ধরনের প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে, তৈরি হচ্ছে ভার্চুয়াল পার্টিকেল বা অসদ কণিকা (ছবির উৎস – লরেন্স ক্রাউস, ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং)

---

[17] এই গণনা করা হয় বিখ্যাত ডিরাক সমীকরণের মাধ্যমে।

[18] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012.

[19] Gordon Kane, Are virtual particles really constantly popping in and out of existence? Or are they merely a mathematical bookkeeping device for quantum mechanics? Scientific American, 2006

আমরা যদি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে পাওয়া নতুন বাস্তবতাকে মেনে নিই, তবে নতুন চোখে শূন্যতাকে দেখতে হবে আমাদের। কারণ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চোখে শূন্যতা বলে সেভাবে কিছু নেই। সেখানে প্রতিমুহূর্তেই অসদ কণিকাগুলো একেবারে যেন ভূতের মতো হুস করে নাকের ডগায় উদ্ভূত হচ্ছে আবার সেখানেই তিরোহিত হচ্ছে। এভাবেই তারা শূন্যস্থানে শক্তি সরবরাহ করে চলেছে অনবরত। কাজেই শূন্যস্থানের মধ্যে শক্তি আসলে লুকিয়ে আছে। এই লুকিয়ে থাকা শক্তিটাই ইদানীং আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতির পেছনে বিজ্ঞানীদের গবেষণার মূল নিয়ামক হয়ে উঠেছে যেন। ব্যাপারটি নজরে পড়েছিল সদ্য প্রয়াত বাঙালি বিজ্ঞানী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের চোখেও (প্রথিতযশা এই বিজ্ঞানীর অবদানের কথা আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব),সেই আশির দশকেই। তিনি তাঁর ১৯৮৩ সালে লেখা বিখ্যাত 'মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি' (The Ultimate Fate of the Universe) বইয়ের 'কৃষ্ণবিবর চিরকালের জন্য নয়' (A Black hole is not forever) অধ্যায়ে লিখেছিলেন[20]—

> কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী, 'শূন্য'স্থান আসলে সম্পূর্ণভাবে শূন্য নয়, বরং কণা এবং প্রতিকণাদের অসদ যুগলে (virtual pairs) পরিপূর্ণ, যা অব্যাহতভাবে শূন্যস্থানে তৈরি হচ্ছে আবার সেখানেই বিলুপ্ত হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে কোনো কণার বিপরীতে প্রকৃতিতে 'প্রতিকণিকা' থাকে—যার চার্জ মূল কণার বিপরীত, কিন্তু ভর সমান; আর এরা যুগল আকারে একেবারেই পরিশুদ্ধ শক্তি কিংবা বিকিরণ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এই কণা আর প্রতিকণার যুগলকে 'ভার্চুয়াল' বা অসদ বলা হচ্ছে, কারণ, প্রকৃত কণাদের মতো এদের কণা ত্বরকের (particle detector) মাধ্যমে সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। তাদের পরোক্ষ প্রভাব অবশ্য পরিমাপ করা যায়, এবং তাদের অস্তিত্ব শনাক্ত করা হয়েছে আহিত হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালি থেকে প্রাপ্ত ল্যাম্বের অপবর্তন (Lamb shift) থেকে। এই অসদ কণা তৈরি

[20] Jamal N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe, Cambridge University Press; 1983, page 91.

করার জন্য শক্তির জোগানটা আসে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে।... দেখে মনে হয় অসদ কণিকাগুলো যেন অনিশ্চয়তা নীতি দিয়ে পরিচালিত কোনো ব্যাংক থেকে স্বল্পকালীন ঋণ নিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাস্তব করে তুলছে। এই ব্যাপারটিকে বলে 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন'।

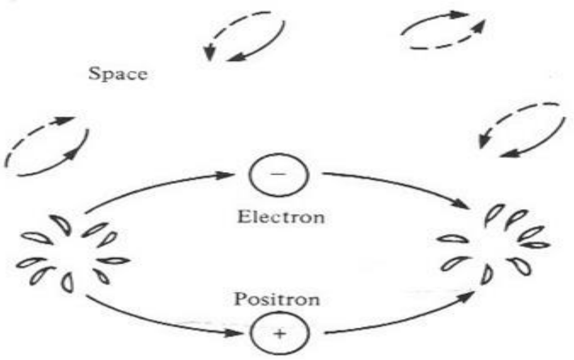

Fig. 9.1. According to the Uncertainty Principle in quantum mechanics, elementary particles like electrons can spontaneously appear in empty space with their antiparticles. (The antiparticle of an electron is an electron with positive charge, a positron.) These pairs of *virtual* particles, however, only exist on borrowed energy, and immediately merge and annihilate each other, leaving empty space again.

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের 'মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি' (The Ultimate Fate of the Universe) বইয়ে ব্যবহৃত অসদ যুগলের (virtual pairs) ছবি

গুপ্ত শক্তি

অবশ্য শূন্যতার মধ্যে শক্তি লুকিয়ে আছে, এটা জানা গেলেও ঠিক কতটুকু শক্তি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি; ব্যাপারটি এখনো তাঁদের কাছে মূল্যবান গবেষণার বিষয়। মহাবিশ্বের ত্বরণ ও প্রসারণের জন্য দায়ী যে গুপ্ত শক্তির (Dark energy) কথা আমরা ইদানীং হরহামেশা শুনি, তার পেছনে এই 'শূন্য শক্তির' ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। নব্বইয়ের দশকে

অনেকটা সৌভাগ্যক্রমেই সল পার্লমুটার আর ব্রায়ান স্মিট নামক দুজন পদার্থবিদের নেতৃত্বে দুটি আলাদা আলাদা দলের সুপারনোভা নিয়ে ঐতিহাসিক পরীক্ষায় ব্যাপারটা বেরিয়ে আসে।

সে সময় বিজ্ঞানীদের সবাই ধারণা করতেন, ১৩০০ কোটি বছর আগে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার পর থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করেছে এবং সেই প্রসারণের হার নিশ্চয় সময়ের সাথে সাথে কমতে শুরু করবে। একটা টেনিস বল ওপরে ছুড়ে দিলে যেমন ওপরে ওঠার সময় বলটার বেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, তারপর মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার আপনার হাতে ফেরত চলে আসে - ঠিক তেমনি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরাও ভাবতেন মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে একটা সময় থেমে যাবে, আর তারপর তা আবার ধীরে ধীরে 'ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন'। তো মহাবিশ্বের প্রসারণটা ঠিক কী হারে কমছে সেটা বের করতেই ১৯৯৮ সালে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সল পার্লমুটার আর ব্রায়ান স্মিটের দলবলের টাইপ ১এ সুপারনোভা-সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে যে ফলাফল পাওয়া গেল তা অবিশ্বাস্য! বিজ্ঞানীরা দেখলেন, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার আসলে কমছে না, বরং বেড়ে চলেছে। মানে মহাবিশ্বের মন্দন হচ্ছে না, হচ্ছে ত্বরণ। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ এই আবিষ্কারটাই আইনস্টাইনের সমীকরণের বাতিল করে দেওয়া সেই 'মহাজাগতিক ধ্রুবক'-কে বিজ্ঞানের জগতে নতুনভাবে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

মহাজাগতিক ধ্রুবক সমস্যা

বিজ্ঞানীরা জানেন, শূন্যতার মধ্যে শক্তির পরিমাণ মহাবিশ্বের সামগ্রিক গুপ্ত শক্তির চেয়ে বেশি হতে পারে না। বড়জোর প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে $১০^{-৮}$ আর্গ। অথচ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সমীকরণগুলো সমাধান করে শূন্যতার শক্তির যে মান পাওয়া যায়, তা জলহস্তীর মতো বিশালকায়—প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে $১০^{১১২}$ আর্গ। অর্থাৎ

বাস্তব মানের চেয়ে কাগজে-কলমে গণনা ১০^১২০ গুণ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এটা একটা সমস্যা। ছোটখাটো নয়, খুব বড়সড় সমস্যাই। সমস্যাটিকে পদার্থবিজ্ঞানে চিহ্নিত করা হয় 'কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট প্রবলেম' বা 'মহাজাগতিক ধ্রুবক সমস্যা' হিসেবে। সমস্যাটির দিকে প্রথম নজর দিয়েছিলেন রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াকভ জেলডোভিচ ১৯৬৭ সালে, যখন তিনি প্রথমবারের মতো শূন্যস্থানের শক্তি-ঘনত্ব নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার পর থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করছে বিজ্ঞানের জগতে। স্টিফেন ওয়েইনবার্গের ১৯৮৯ সালের গবেষণা প্রবন্ধে সমস্যাটির ভালো সারমর্ম পাওয়া যায়[21]। তবে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা কিছুটা হলেও হদিস করতে পেরেছেন কেন তাদের গণনা আর বাস্তবতায় এত ফারাক হচ্ছিল। একটি গণনা থেকে দেখা গেছে, ফার্মিয়নের মধ্যে যে ঋণাত্মক শূন্য শক্তি লুকিয়েছিল, সেটা তারা গোনায় ধরেননি। সেটা গোনায় ধরলে গণনা আর বাস্তবতার ফারাক অনেক কমে আসে[22]। আরেকটি আভাস পাওয়া গেছে বিখ্যাত 'হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল'-এর সঠিক ব্যবহারের মধ্যে। মহাবিশ্বের শূন্য শক্তি-ঘনত্ব (vacuum energy density) নির্ণয় করা হয়েছে মহাবিশ্বের সকল শূন্য-বিন্দু শক্তি স্তরের যোগফল থেকে (sum over all the zero-point energy states)। এই যোগফল বের করার সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল সেই স্তরগুলোর সংখ্যা এর আয়তনের সমানুপাতিক। কিন্তু সাম্প্রতিক 'হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল' থেকে জানা গেছে, ব্যাপারটা আয়তনের সমানুপাতিক না হয়ে ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক হওয়াটাই যৌক্তিক, যেটা ঘটে কৃষ্ণবিবরের ক্ষেত্রে। আমাদের মহাবিশ্বের স্তরের সংখ্যা একই আয়তনের কৃষ্ণবিবরের চেয়ে বেশি হতে পারে না। এই অনুজ্ঞার ভিত্তিতে গণনা করে দেখা গেছে, এর মান বাস্তব মানের খুব কাছাকাছি চলে আসে[23]। তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় আসেনি, জুরির রায় এখনো বিভক্ত। তবে, মহাজাগতিক

---

21 Steven Weinberg, The cosmological constant problem, Reviews of Modern Physics, Volume 61, Issue 1, pp.1-23, January 1989

22 Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us, Prometheus Books , 2011

23 Victor J. Stenger, The Problem with the Cosmological Constant, CSI, Volume 21.1, Spring 2011.

ধ্রুবকের মান গণনা নিয়ে সমস্যা থাকলেও মহাবিশ্বের সার্বিক ছবিটা আঁকতে সেটা কিন্তু কোন সমস্যা তৈরি করছে না। লরেন্স ক্রাউস, টার্নারসহ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কিছু অজানা প্রক্রিয়া থাকতে পারে, যেটা এখনো বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করতে পারেননি। এর খোঁজ পাওয়া গেলে দেখা যাবে, সমীকরণের পদগুলো কাটাকাটি করে একে সেই বাস্তবতার কাছাকাছি স্বল্প মানে নামিয়ে এনেছে[24]।

কাজেই সারমর্ম দাঁড়াল—যে মহাজাগতিক পদটিকে আইনস্টাইন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে বাতিল করেছিলেন, সেটাকেই আমরা আবার আশির দশকে পূর্ণোদ্যমে ফিরে আসতে দেখলাম ইনফ্লেশন বা স্ফীতিতত্ত্বের মাধ্যমে। কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হবার পর যে বিকর্ষণশক্তি মহাবিশ্বকে প্রসারিত করে দ্রুত স্ফীতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল, আজ সেটা এই মহাজাগতিক ধ্রুবকের সাথেই সম্পর্কিত বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। আর ১৯৯৮ সালে যে রহস্যময় 'ডার্ক এনার্জি' বা গুপ্ত শক্তির খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা, তার অস্তিত্বের পেছনেও সম্ভবত রয়েছে এই ধ্রুবকেরই জটিল মারপ্যাঁচ। এগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এর সাথে আধুনিক 'কোয়ান্টাম শূন্যতা'র একটা গভীর সম্পর্ক আছে। আর তাছাড়া, এই বিকর্ষণশক্তি আর গুপ্ত শক্তির প্রভাব পড়েছে বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে ইদানীংকার ভাবনাতেও। তবে সেটা আর এখন নয়, এ নিয়ে কিছু কথা বলা যাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। আপাতত আমরা মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত যে ধারণা সেই 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণের গল্প শুনব।

---

[24] Lawrence M. Krauss and Michael S. Turner, A Cosmic Conundrum, Scientific American 15, 66 - 73 , 2006

নবম অধ্যায়

মহাবিস্ফোরণের কথা

সুচেতনা,
এই পথে আলো জ্বেলে —এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
—জীবনানন্দ দাশ

মহাবিশ্বসংক্রান্ত যে কোনো বিজ্ঞানের বই খুললেই আমরা দেখি সেটা অবধারিতভাবে শুরু হয় 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণ দিয়ে। সেই যে ১৯২৯ সালে এডউইন হাবল তাঁর বিখ্যাত টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, গ্যালাক্সিগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—তা দেখেই কিন্তু একধরনের ধারনা পাওয়া যায়, দূর অতীতে নিশ্চয় তারা খুব কাছাকাছি ছিল, খুব ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায় গাঁটবন্দী হয়ে। আর সেই গাঁট-পাকানো অবস্থা থেকেই সবকিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আকস্মিক এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এটাই সেই বিখ্যাত 'বিগ ব্যাং'-এর ধারণা। এ ধারণা অনুযায়ী, প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে অতি উত্তপ্ত এবং প্রায় অসীম ঘনত্বের এক পুঞ্জীভূত অবস্থা থেকে এক বিশাল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উদ্ভব ঘটেছে আমাদের এই মহাবিশ্বের।

অবশ্য আজকে আমরা মহাবিশ্বকে যেভাবে দেখি, মহাবিশ্বের উষালগ্নে এর প্রকৃতি কিন্তু একদমই এরকম ছিল না, ছিল অনেকটাই আলাদা। আজকে আমরা যে

চারটি মৌলিক বলের কথা শুনতে পাই —সবল নিউক্লীয় বল,দুর্বল নিউক্লীয় বল,তাড়িতচৌম্বক বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বল—বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই চারটি বল 'সুপার ফোর্স' বা অতিবল হিসেবে একসাথে মিশে ছিল। ওরকমভাবেই ছিল তারা মহাবিস্ফোরণের উষালগ্ন থেকে শুরু করে $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর্যন্ত। প্রথম এক সেকেন্ড পর্যন্ত মহাবিশ্ব ছিল যেন জ্বলন্ত এক নিউক্লীয় চুল্লি। তাপমাত্রা ছিল একশ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়েও বেশি। মহাবিশ্ব প্রথমে ছিল কোয়ার্ক-গ্লুয়োন প্লাজমায় ভর্তি, আর এক সেকেন্ডের মধ্যেই তৈরি হয়েছিল ইলেকট্রন, নিউট্রিনো ও কোয়ার্কের সম্মিলনে প্রোটন ও নিউট্রন। এর তিন মিনিট পর তাপমাত্রা একশো কোটি ডিগ্রির নিচে নামলে প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরি হল ডিউটেরিয়াম, হিলিয়াম ও লিথিয়াম। তবু এই সময় থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর পদার্থ নয়, ফোটন বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যেই মহাবিশ্বের বেশির ভাগ শক্তি সন্নিহিত ছিল।

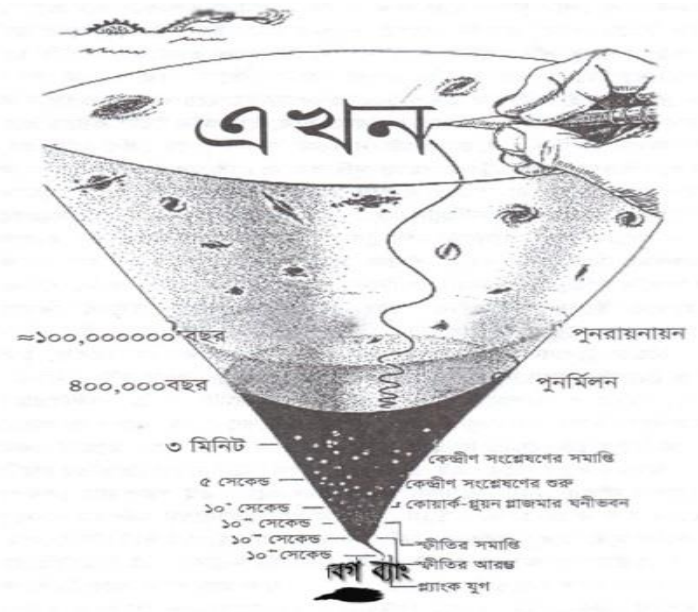

মহাবিস্ফোরণের কালপঞ্জি (ছবির কৃতজ্ঞতা ,অপূর্ব এই মহাবিশ্ব,
এ এম হারুন-অর-রশীদ এবং ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী)

প্রায় চার লক্ষ বছর পর তাপমাত্রা খানিকটা কমে তিন হাজার ডিগ্রি কেলভিনে নেমে এলো। তারপরই কেবল প্লাজমা থেকে স্থায়ী পরমাণু গঠিত হবার মতো পরিবেশ তৈরি হতে পেরেছে। মহাবিশ্বের প্লাজমার কুয়াশার চাদর এ সময় ধীরে ধীরে সরে গিয়ে ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে, পথ তৈরি হয় ফোটন কণা চলাচলের। আর তার পরই কেবল ফোটন বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ওপর জড় পদার্থের আধিপত্য শুরু হয়েছে। এর পর আরও অন্তত পঞ্চাশ কোটি বছর লেগেছে গ্যালাক্সি-জাতীয় কিছু তৈরি হতে। আমাদের গ্যালাক্সি, যাকে আমরা আকাশগঙ্গা নামে ডাকি,সেখানে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে। আর সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণ্যমান গ্যাসের চাকতি থেকে প্রায় ৪৫০-৪৬০ কোটি বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল পৃথিবীসহ অন্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো।

আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান

বিগ ব্যাং-এর ইতিহাস পাঠের এই জায়গায় এসে একটি মজার তথ্য উল্লেখ করব, আর তথ্যের অভিব্যক্তিটি এতই শক্তিশালী যে, এটা আমাদের মতো কাঠখোট্টা বিজ্ঞান লেখকদেরও কাব্যিক করে তোলে প্রায়শই। বিষয়টা হলো, বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু বলে আমরা জানি। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের পর মুহূর্তে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম কিংবা লিথিয়ামের মতো মৌল তৈরি হলেও আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মৌলগুলো – কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও লৌহ—এগুলো কিন্তু সে সময় তৈরি হয়নি। এগুলো তৈরি হয়েছে অনেক অনেক পরে কোনো-না-কোনো নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ থেকে, যাদের আমরা মহাকাশে সুপারনোভা বলে জানি। ‘অনেক অনেক পরে’ বলছি কারণ, বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন,প্রথম নক্ষত্র তৈরি হয়েছিল বিগ ব্যাং ঘটার অন্তত ১০ থেকে ২০ কোটি বছর পর। আর বড় তারকার বিস্ফোরণ, মানে সুপারনোভার মতো ব্যাপার-স্যাপার ঘটতে হয়তো সময় লেগেছিল আরো কয়েক কোটি বছর। তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো - আমাদের এই দেহ কার্বন দিয়ে, কিংবা দেহের ভেতরকার হাড়গুলো

ক্যালসিয়াম দিয়ে তৈরি হতে পেরেছে হয়তো এ জন্যই। কেননা সুদূর অতীতে কোনো-না-কোনো নক্ষত্র নিজেদের বিস্ফোরিত করে তার বহির্জগতের খোলস থেকে এই জীবনোপযোগী মৌলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল মহাশূন্যে। অনেক পরে সেই মৌলগুলো শূন্যে ভাসতে ভাসতে জড়ো হয়েছে সূর্য নামক এক সাদামাটা নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণনরত এক সুনীল গ্রহে, এবং শেষ পর্যন্ত তৈরি করেছে প্রাণের বিবর্তনীয় উপাদান।

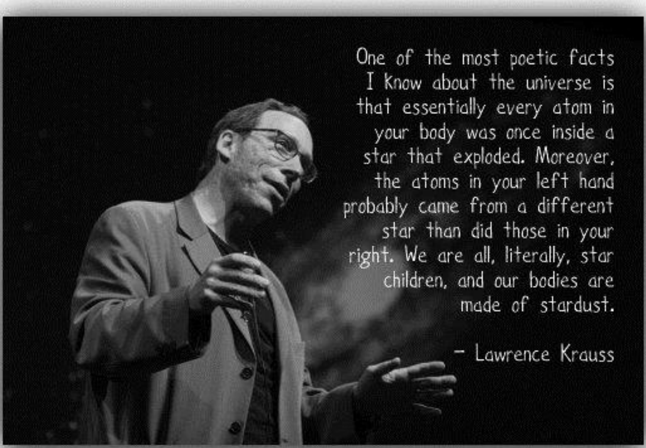

আমরা আক্ষরিকভাবেই সবাই নক্ষত্রের সন্তান, আমাদের সবার দেহ তৈরি হয়েছে কেবল নাক্ষত্রিক ধূলিকণা দিয়ে।

আমাদের ছায়াপথের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অন্তত ২০ কোটি নক্ষত্র এভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, হয়তো আমার আপনার ভবিষ্যৎ জন্মকে সার্থক করে তুলবে বলে। আমরা সবাই আসলে নক্ষত্রের ধূলি—স্টারডাস্ট[25]। এর চেয়ে কাব্যিক

[25] Physicist Finds Out Why ‘We Are Stardust...’, Science News, June 25, 1999; কার্ল স্যাগ্যান তার কসমস বইয়ে বলেছেন, ‘স্টারস্টাফ’। “We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.” — Carl Sagan, Cosmos

অনুরণন আর কীই বা হতে পারে? সেজন্যই বোধ হয় লরেন্স ক্রাউস তাঁর 'ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং' গ্রন্থে বলেছেন[26],

> আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে সবচেয়ে কাব্যিক যে সত্যটা আমি জানি তা হলো, আপনার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু একসময় লুকিয়ে ছিল একটি বিস্ফোরিত নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। অধিকন্তু, আপনার বাম হাতের পরমাণুগুলো হয়তো এসেছে এক নক্ষত্র থেকে, আর ডান হাতের গুলো এসেছে ভিন্ন আরেকটি নক্ষত্র থেকে। আমরা আক্ষরিকভাবেই সবাই নক্ষত্রের সন্তান, আমাদের সবার দেহ তৈরি হয়েছে কেবল নাক্ষত্রিক ধূলিকণা দিয়ে।

রসিকরাজ গ্যামো

ছোটবেলায় আমরা গোপাল ভাঁড়ের অনেক গল্প পড়তাম। গোপাল ভাঁড়ের একেকটা গল্প পড়তাম আর হাসির চোটে আমাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেত একেবারে। কিন্তু তখন কি কস্মিন কালেও জানতাম, গোপাল ভাঁড়ের চেয়েও রসিক এক বিজ্ঞানী আছেন, তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বিগ ব্যাং-এর ইতিহাসটা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে!

তিনি জর্জ গ্যামো। আমরা যে বিগ ব্যাং-এর কথা বলি সেই বৈজ্ঞানিক ধারণাটি বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রাথমিক কৃতিত্ব অবশ্যই এই কৃতী পদার্থবিজ্ঞানীর; তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্পর্শ কেবল পদার্থবিদ্যা নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তেজস্ক্রিয়তা থেকে শুরু করে এমনকি জীববিজ্ঞানেরও নানা শাখায় ছড়িয়ে রয়েছে। রুশদেশের এই রসিক আর খেয়ালী বিজ্ঞানী, যিনি আবার শখের যাদুকরও ছিলেন, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে একক চেষ্টাতেই 'বিগ-ব্যাং-এর ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা

---

[26] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012, p 17.

করেছেন বলা যায়। সেজন্য অনেকে আজ তাকে অভিহিত করেন 'বিগ ব্যাং-এর পিতা' হিসেবেও।

গ্যামোর আদি নিবাস ছিল রাশিয়ায়। আমরা যে অষ্টম অধ্যায়ে বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যানের কথা জেনেছি, যিনি একসময় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের গাণিতিক সমাধান হাজির করেছিলেন মহাবিশ্বের প্রসারণ তুলে ধরতে, সেই আলেকজান্ডার ফ্রিডম্যান ছিলেন গ্যামোর শিক্ষক, পড়াতেন পেট্রোগ্রাডে ১৯২৩-২৪ সালের দিকে[27]। বোঝাই যায়, গুরু মারা বিদ্যা ভালোই রপ্ত করেছিলেন গ্যামো।

গ্যামোর প্রতিভার বর্ণিল আলোকচ্ছটার সাথে রাশিয়ার বাইরের পৃথিবী পরিচিত হয়েছিল সেই ১৯২৮ সালেই। গ্যামো তখন জার্মানির গোটিংগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার সাথে পরিচিত হতে। গিয়েছিলেন অনেকটা তাঁর শিক্ষক অরেস্ট কোভলসনের জোরাজুরিতেই। গ্রীষ্মকালীন অবকাশটাতে কৃতী ছাত্রকে যেন উপোস করে কাটাতে না হয় সেজন্য একটা শিক্ষাভাতাও যোগাড় করে দিয়েছিলেন শিক্ষক মশাই। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের নানামুখী গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। গ্যামো সেখানে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেললেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়কে ব্যাখ্যার জন্য সুড়ঙ্গ প্রভাব ('টানেলিং এফেক্ট')ব্যবহার করলেন, যা এত দিন কেবল কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জগতেই ব্যবহৃত হতো। তাঁর এই নতুন ব্যাখ্যা সরাসরি পরীক্ষণ থেকে পাওয়া উপাত্তের সাথে মিলেও গেল অবিকল।

গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শেষে রাশিয়া ফেরার পথে ভ্রমণপ্রিয় গ্যামো ভাবলেন, ফিরে যখন যাচ্ছিই, একটু না হয় ডেনমার্ক ঘুরে যাওয়া যাক। সেখানে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের দিকপাল নিলস বোর কী করে যেন গ্যামোর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কাজের (সেটা তখনো কোথাও প্রকাশিত হয়নি) খোঁজ পেয়েছিলেন। ডেনমার্কে গ্যামোর সাথে সাক্ষাৎ করে আর তাঁর কাজ সামনাসামনি দেখেশুনে বোর এতটাই

[27] George Gamow, My World Line : An Informal Autobiography, Viking Adult; 1970

মুগ্ধ হন যে, কোপেনহেগেনে নিজের ইন্সটিটিউটে গ্যামোকে ফেলোশিপের প্রস্তাব দিয়ে দিলেন। গ্যামো মহা উৎসাহে কাজ শুরু করে দিলেন তখনই। কিন্তু গ্যামো চাইলে কি হবে, বাধা আসলো খোদ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেই। বোরের ইনস্টিটিউটে কাজ করতে করতে গ্যামো তখন (১৯৩০) রোমে নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের এক সেমিনারে যোগদানের পাঁয়তারা করছিলেন। সোভিয়েত অ্যাম্বেসি থেকে বলা হলো তাঁর পাসপোর্টের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না, এত জায়গায় ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে তাঁকে 'ঘরের ছেলে ঘরে' মানে সোজা সোভিয়েত ইউনিয়নে ফেরত যেতে হবে।

গ্যামো অগত্যা ফিরলেন রুশদেশে। স্ট্যালিনের জামানা চলছে তখন। গ্যামো নিজ দেশে ফিরে এমন এক জন্মভূমিকে দেখতে পেলেন যেখানে মহামতি স্ট্যালিন এবং তাঁর স্তাবকেরা শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান সবকিছুকেই মার্ক্সিজমের নাগপাশে বন্দী করে রেখেছেন। ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের মতো সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টির গৎবাঁধা ছক বাতলে দেওয়া হয়েছিল, এর অন্যথা হলে তাদের 'কমিউনিস্ট-ধর্মানুভূতিতে' আঘাত লাগত। বাংলা ব্লগের ব্লগারদের লেখায় ধর্মের সমালোচনা, কিংবা কোন কার্টুনিস্টের কার্টুন আঁকা কিংবা 'বিড়াল' নিয়ে নির্দোষ কৌতুকেও যেমন ধর্মের অনুসারীদের পিত্তি জ্বলে যায়, তেমনি স্ট্যালিনকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কমিউনিস্ট অনুসারীদের গায়ে লাল লাল ফোস্কা পড়ত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য কমিউনিস্ট জামানায় দুই লেখক — আন্দ্রেই সিনায়েভস্কি ও ইউলি দানিয়েলের বিচারের প্রহসনে। জেলখানায় সাত বছর বন্দী রাখা হয়েছিলো সিনায়েভস্কিকে, দানিয়েলের কপালে জুটেছিলো পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সলঝনিৎসনের উপন্যাস 'ফার্স্ট সার্কেল' (First Circle)-এ দেখানো হয়েছিল কিভাবে উপন্যাসের নায়ক শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের শ্রমশিবিরে নিজেকে খুঁজে পায়। সলঝনিৎসনকে সে সময় দেশ ত্যাগ করতে কিংবা নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আঁদ্রে শাখারভকে গোর্কিতে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই উদাহরণগুলো

উল্লেখ করে একসময় আমি (অ.রা) একটা লেখা লিখেছিলাম ‘মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?’ (২০০৮) শিরোনামে যা বাংলা ব্লগস্ফিয়ারে পক্ষে-বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল[28]। কেবল সাহিত্য নয়,স্ট্যালিন ও তাঁর আদর্শবাদী সৈনিকেরা ভাবতেন, বিজ্ঞানকেও মার্ক্সীয় মতবাদের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, নইলে চলবে না। মার্ক্সীয় মতবাদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সময় সময় বিজ্ঞানের শাখাগুলোকে বিকৃত করতেও পিছপা হননি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শাখাটি ছিল জেনেটিকস বা বংশগতিবিদ্যা। রাশিয়া একসময় সারা পৃথিবীতেই জেনেটিকসের গবেষণায় শীর্ষস্থানে ছিল, অথচ স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় জেনেটিকসের ওপর গবেষণার লালবাতি জ্বলে গিয়েছিল। তা হবে নাই বা কেন, মার্ক্সবাদকে বাঁচাতে বংশানুবিদ্যাকেও বিকৃত করতে পিছপা হননি শাসকেরা। এই উদ্দেশ্যে সে সময় লাইসেঙ্কো নামক এক ঠগ বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করা হয়[29]। যখন নিকোলাই ভাভিলভসহ অন্য বিজ্ঞানীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন, তখন স্ট্যালিন তাঁদের সব কটাকে ধরে গুলাগে পাঠিয়ে দেন। ভাবিলভকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়[30]। শুধু ভাভিলভ নয়, স্ট্যালিনের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে সে সময় আরো প্রাণ হারিয়েছিলেন কার্পেচেঙ্কো,সালমোন লেভিট, ম্যাক্স লেভিন, ইস্রায়েল আগলের মতো বিজ্ঞানীরা। লাইসেঙ্কোর পাশাপাশি স্ট্যালিন জামানায় ওলগা লেপেশিনস্কায়া নামের আরেক প্রতারক বিজ্ঞানীকে প্রমোট করা হয়েছিল—উদ্দেশ্য সেই ‘পুঁজিবাদী জেনেটিকস’ সরানো। বিজ্ঞানকে অবশ্যই শ্রমজীবী বা প্রলেতারিয়েতের কাছে

---

[28] অভিজিৎ রায়, মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?, মুক্তমনা, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০০৮ দ্র। মুক্তমনা ও সচলায়তন ব্লগে সে সময় (২০০৮) প্রকাশিত এ লেখায় স্ট্যালিনীয় জামানায় সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ওপর লাগাতার অত্যাচারের নমুনা পেশ করে বাম ঘরণার দেশীয় সৈনিকদের ভয়ংকর তোপের মুখে পড়েছিলাম। যথারীতি ‘পুঁজিবাদের দালাল’, ‘শোধনবাদী’ থেকে শুরু করে ‘ছাগল’-‘পাগল’সহ নানা উপাধি হজম করতে হয়েছিল। আমি (অ.রা) দিন কয়েক পর একটি প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম ‘মার্ক্সবাদ কি বিজ্ঞান?’ প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তরে’ শিরোনামে। অবশ্য তাতে খুব একটা লাভ হয়েছিল বলা যাবে না। এ লেখাটি এখনো অনেকের কাছে বাংলা ব্লগে মার্ক্সবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের আদি-অকৃত্রিম উৎস।

[29] অভিজিৎ রায়, লাইসেঙ্কোইজম, মুক্তমনা, নভেম্বর ০১, ২০০৮।

[30] নিকোলাই ভাভিলভকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও সেটাকে শেষ পর্যন্ত ২০ বছর কারাদণ্ডে নামিয়ে আনা হয়, যদিও এর দুবছরের মধ্যে, ১৯৪৩ সনে, ভাভিলভ কারাগারেই মারা যান।

গ্রহণযোগ্য হতে হবে, তা নইলে চলবে না—এটাই বিজ্ঞান সম্পর্কে স্ট্যালিনীয় ঘরানার মানুষদের 'বৈজ্ঞানিক থিওরি'[31]।

বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো (১৯০৪ – ১৯৬৮)

কেবল জীববিজ্ঞানী কিংবা বংশগতিবিদেরা নয়, সোভিয়েত পদার্থবিদেরাও সে সময় আগ্রাসন থেকে রেহাই পাননি[32]। আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করার

[31] স্টালিনীয় আমলে বিজ্ঞানীদের ওপর লাগাতার অত্যাচার এবং বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান প্রচারের সাথে পাঠকেরা আরো বিস্তৃতভাবে পরিচিত হতে চাইলে অনন্ত বিজয় দাশের লেখা *'সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও বিপ্লব : লিসেঙ্কো অধ্যায়'* (শুদ্ধস্বর) বইটি পঠিতব্য।

[32] জেনেটিকসকে যেমন 'পুঁজিবাদী বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করে হটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি আবার একটা সময় বিগ ব্যাং-এরও বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল কমিউনিস্ট রাশিয়ায়। বলা হয়েছিল, বিগ ব্যাং-এর ধারণা মার্ক্সিস্ট ভাবধারার সাথে একেবারেই সংগতিপূর্ণ নয়, ওটা 'বুর্জোয়া বিজ্ঞান'। যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে কথা বলতেন তাদের ওপর নেমে এসেছিল রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। যেমন, ১৯৩৭ সালে নিকোলাই কোজারভ নামের এক বিজ্ঞানী ছাত্রদের মাঝে বিগ ব্যাং মডেল নিয়ে আলোচনা করায় তাঁকে ধরে শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচার করা হয়েছিল ভসেভলদ ফ্রেডরিকস এবং মাতভেই ব্রনস্টেইননের মতো বিজ্ঞানীদের ওপরেও, করণ তাঁরা বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। গ্যামো রাশিয়া ছেড়ে পালানোর পর তাঁকে বিশ্বাসঘাতক 'আমেরিকান মুরতাদ' (Americanized apostate) হিসেবে চিহ্নিত করে বিচারের প্রহসনও করা হয়েছিল।

পর,ব্যাপারটা মার্ক্সিজমের সাথে 'সংগতিপূর্ণ' মনে না করায় 'সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রকাশ করা হয় রিলেটিভিটিকে 'নস্যাৎ' করে। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত মার্ক্সবাদী দার্শনিক তাঁর তখনকার লেখায় বলেছিলেন –

'আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটা প্রলেতারিয়েতদের কাছে গ্রহণীয় নয়'।

এই নির্বোধ মন-মানসিকতা জর্জ গ্যামোর সহ্য হয়নি। তা হবেই বা কেন। কিছুদিন আগেই নিলস বোরের গবেষণাগারে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ওপর হাতে-কলমে কাজ করে এসেছেন। অথচ দেশে এসে দেখলেন, সেখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্বকে দেখা হচ্ছে 'অপবিজ্ঞান' আর 'মার্ক্সিজম-লেনিনিজম'-এর সাথে অসংগতিপূর্ণ বিষয় হিসেবে[33]। এই সব কূপমণ্ডূকতার প্রতিবাদ করায় জর্জ গ্যামো স্ট্যালিনীয় বাহিনীর কোপানলে পড়লেন। হয়তো মারাই পড়তেন ভাভিলভের মতো, কিংবা বছরের পর বছর থাকতে হতো শ্রম-শিবিরে, কিন্তু তার আগেই তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে সস্ত্রীক পালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিভাবে পালাতে চেয়েছিলেন সে-ও এক ইতিহাস। শুনলে মনে হবে যেন কোনো হিন্দি মুভির প্লট। তিনি কয়েকটা ডিম, চকলেট, স্ট্রবেরি এবং দুই বোতল ব্র্যান্ডি বগলদাবা করে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে একটা ছোট নৌকায় (এ নৌকাগুলো 'কায়াক' নামে পরিচিত) উঠে পড়লেন। উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সাগরে ১৭০ মাইল পাড়ি দিয়ে তুরস্ক পৌঁছবেন। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা প্যাডেল করে সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত নাকানিচুবানি খেয়ে মাঝপথে তীরে এসে আছড়ে পড়লেন। হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল দিন কয়েক।

---

33 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007

এ ধরনের একটি কায়াকে করেই স্ত্রীকে নিয়ে কৃষ্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে রাশিয়া থেকে পালাতে মনস্থ করেছিলেন গ্যামো

সে যাত্রা দেশ ছেড়ে পালাতে না পারলেও একসময় ঠিকই সুযোগ বুঝে ব্রাসেলস হয়ে আমেরিকা চলে এলেন গ্যামো। যোগ দিলেন জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষক হিসেবে।

সেখানেই রালফ আলফারের সাথে তাঁর পরিচয়। আলফার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন পিএইচডি করার জন্য। আলফারের সাথে মিলে 'বিগ-ব্যাং'-এর ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন গ্যামো। মহাবিশ্ব যে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, সেটা ততোদিনে হাবলের আবিষ্কারের কল্যাণে জানা ছিল গ্যামোর। গ্যামো ভাবলেন, সেই প্রসারণের ভিডিও টেপটিকে যদি পেছনের দিকে চালানো যায়,তবে সেটা নিশ্চয় একটা আদিম অবস্থায় এসে থামবে। তিনি এর নাম দিলেন 'ইয়েল্‌ম'। গ্যামো আর আলফার মিলে এই ইয়েল্‌ম নামের সেই আদিম অবস্থা তথা বিগ ব্যাং-এর গাণিতিক সিমুলেশন করবেন বলে ঠিক করলেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে গ্যামো বা আলফার কেউ নিজে থেকে 'বিগ ব্যাং' শব্দটি চয়ন করেননি। গ্যামোর ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে আর এক প্রখ্যাত তাত্ত্বিক

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক হয়েল সর্বপ্রথম এই ‘বিগ ব্যাং’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। হয়েল ছিলেন বিগ-ব্যাং তত্ত্বের বিপরীতে স্থিতিশীল অবস্থা (Steady State) নামে মহাবিশ্বের অন্য একটি জনপ্রিয় মডেলের প্রবক্তা। হয়েলের তত্ত্বের সাথে প্রথম দিকে যুক্ত ছিলেন কেম্ব্রিজ কলেজের হারমান বন্ডি, থমাস গোল্ড আর পরবর্তীকালে একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তাঁর নাম জয়ন্ত নারলিকর। ১৯৪০ সালে একটি রেডিও প্রোগ্রামে গ্যামো আর তাঁর অনুসারীদের ধারণাকে খণ্ডন করতে গিয়ে বেশ বাঁকা সুরেই অধ্যাপক হয়েল বললেন, ‘হা সেই উত্তপ্ত বিগ ব্যাং এই বিস্ফোরণের ধারণা যদি সঠিকই হবে,তবে তো এর ছাই-ভস্ম এখনও কিছুটা থেকে যাওয়ার কথা। আমাকে ‘বিগ ব্যাং’-এর সেই ফসিল এনে দেখাও, তারপর অন্য কথা।’ এর পর থেকেই বিগ-ব্যাং শব্দটি ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের জগতে স্থায়ী আসন করে নেয়। সে যা-ই হোক, আলফারের পিএচডির শেষ পর্যায়ে আলফার ও গ্যামো যুক্তভাবে ‘Physical Review’ জার্নালের জন্য ‘Origin of the Chemical Elements’ শিরোনামে একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। আর এখানেই রসিকরাজ গ্যামো বিজ্ঞানজগতের সবচাইতে বড় রসিকতাটি করে বসলেন। জার্নালে ছাপানোর আগে তিনি তাঁর বন্ধু আর এক স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ হ্যানস বিথের (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক) নাম তাঁকে না জানিয়েই প্রবন্ধটির লেখক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরে কারণ হিসেবে বলেছিলেন, “‘আলফার’ আর ’গ্যামো’ এই দুই গ্রিক ধরনের নামের মাঝে ‘বিটা’-জাতীয় কিছু থাকবে না, এ হয় নাকি? তাই বিথেকে দলে নেওয়া!” সত্য সত্যই ১৯৪৮ সালের ১ এপ্রিলে এই তিন বিজ্ঞানীর নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, আর গ্যামোর রসিকতাকে সত্যি প্রমাণিত করে পেপারটি এখন ‘আলফা-বিটা-গামা পেপার’ (α, β, γ paper) নামেই বৈজ্ঞানিক মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সেই প্রবন্ধটিতে কী বলেছিলেন গ্যামো? তিনি ধারণা করেছিলেন যে, একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যদি মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সেই ভয়ংকর বিকিরণের কিছুটা স্বাক্ষর, মানে বিকিরণ-রেশের কিছুটা এখনো বজায় থাকার কথা।

গ্যামো হিসাব কষে দেখালেন যে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজময় বিকিরণের উদ্ভব হয়েছিল, মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে তার বর্ণালি তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে সেটা এখন পরম শূন্য তাপমাত্রার ওপরে ৫ ডিগ্রি কেলভিনের মতো হওয়া উচিত। এই তেজময় বিকিরণের অবশেষকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'মহাজাগতিক পশ্চাদপট বিকিরণ' বা 'cosmic background radiation'। মহাশূন্যে এই বিকিরণের প্রকৃতি হবে মাইক্রোওয়েভ বা ক্ষুদ্র তরঙ্গ। সহজ কথায় বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যাক। সৃষ্টির আদিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল যেন একটি উত্তপ্ত মাইক্রোওয়েভ চুল্লি, যা এখন ঠান্ডা হয়ে ৫ ডিগ্রি কেলভিনে এসে পৌঁছেছে। এই ব্যাপারটিই ধরা পড়ল ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস আর রবার্ট উইলসনের পরীক্ষায়, গ্যামোর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হবার ১৬ বছর পর। গ্যামোর সেই গবেষণাপত্রটির কথা তত দিনে ভুলেই গিয়েছিল সবাই। কিন্তু সেখানে যাবার আগে আমাদের আরেকজন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীর কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

জর্জ লেমিত্রি ও তাঁর 'আদিমতম কণা'

বিগ ব্যাং-এর কথা বললে এর পেছনে আরেকজন ব্যক্তির অবদানের কথা উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে। তিনি হলেন জর্জ হেনরি লেমিত্রি (Georges Lemaître), বিগ ব্যাং তত্ত্বের আর একজন প্রবক্তা, যিনি ছিলেন একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী এবং সেই সাথে ধর্মযাজক। নাস্তিক গ্যামোর মতো ধর্মযাজক লেমিত্রিও কিন্তু বিগ ব্যাং-এর পিতা খেতাব পাবার যোগ্য দাবিদার, এবং অনেকে সেটা তাকে ডাকেনও।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা থেকে প্রাপ্ত ক্ষেত্র সমীকরণের একটা সমাধান হাজির করেছিলেন লেমিত্রি, বিজ্ঞানী ফ্রিডম্যানের মতোই। গ্যামোর মতো তিনিও ছিলেন মহাজাগতিক কালপঞ্জির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন প্রকৌশলী (পুরকৌশলী) হিসেবে, বেলজিয়ামের ক্যাথলিক লুভেন

বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়াম আক্রমণ করলে তাঁর পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ পড়ে। তিনি 'আর্টিলারি অফিসার' হিসেবে বেলজীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন আর সেখানে কাজ করেন চার বছরের জন্য। বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সিভিল ইঞ্জিয়ারিং-এ আর না ফিরে গিয়ে পদার্থবিদ্যা এবং গণিত নিয়ে উৎসাহী হয়ে পড়েন তিনি। ১৯২০ সালে অর্জন করেন পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি। পাশাপাশি ধর্মযাজকের পেশায়ও উৎসাহী হয়ে পড়েন তিনি। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সত্যে পৌঁছানোর দুইটি পথ। আমি দুটোই অনুসরণ করতে মনস্থ হলাম'।

পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি সে সময়কার বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের সাহচর্য লাভ করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এডিংটন তাঁর গাণিতিক দক্ষতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এডিংটন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তুখোড় এক ছাত্র—করিৎকর্মা, স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং গণিতে দক্ষ'। লেমেত্রি একসময় কেম্ব্রিজের পাঠ চুকিয়ে চলে গেলেন আমেরিকায়। এমআইটিতে করলেন পদার্থবিজ্ঞানে দ্বিতীয়বারের মতো পিএচডি।

১৯২৫ সালে তিনি বেলজিয়ামে ফিরে গিয়ে তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে যোগ দিলেন। সেখানেই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সমীকরণের সমাধানের ওপর ভিত্তি করে নিজের মহাজাগতিক মডেল তৈরি করে ফেললেন। এই সমাধান ছিল অনেকটা পূর্বসূরি ফ্রিডম্যানের মতোই। এ সমাধানে মহাজাগতিক ধ্রুবক গোনায় ধরার দরকার পড়েনি তাঁর। তাঁর সমাধান থেকে বেরিয়ে এল মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, সময়ের ঘড়িকে পেছনের দিকে চালিয়ে তিনি একদম শুরুর মানে ব্রাহ্ম-মুহূর্তের একটা ছবিও আঁকলেন তাঁর গণিত আর বিজ্ঞানের কল্পনায়, কাব্যিকভাবে সে সময়টাকে অভিহিত করলেন 'A Day without yesterday' হিসেবে। তিনি এই মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাকে চেপে ঠেসে ঘন

সন্নিবদ্ধ এক ছোট্ট মহাবিশ্বে পরিণত করলেন, আর তাকে ডাকলেন 'প্রাইমিভাল এটম' বা আদিম কণা নামে।

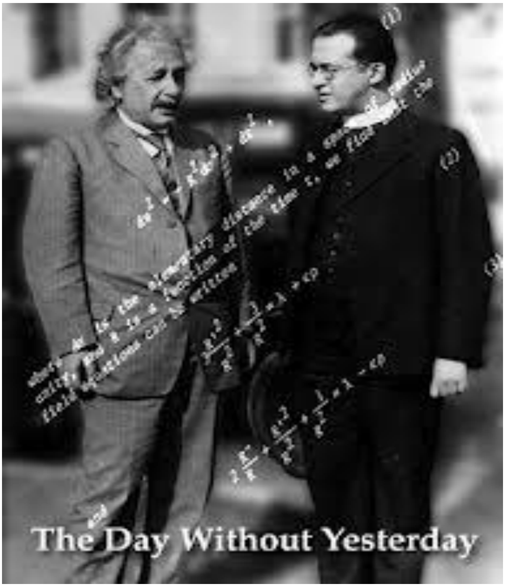

আইনস্টাইন এবং লেমিত্রি

লেমেত্রির কাছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারটা ছিল সেই আদিম কণা নামের শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় কণাটির অবক্ষয়, যা থেকেই তৈরি তৈরি হয়েছে এই বিশ্বজগৎ[34]। লেমেত্রি তাঁর আদিম কণা তত্ত্ব আর মহাবিশ্বের প্রসারণের মহা উৎসাহী হয়ে উঠলেও তাঁর উৎসাহের বেলুন কিন্তু রাতারাতি চুপসে গেল। আর চুপসে দিয়েছিলেন আইনস্টাইন স্বয়ং।

আইনস্টাইনের মাথায় তখন 'স্থিতিশীল মহাবিশ্বের' ভূত। তাঁর নিজের সমীকরণেই মহাবিশ্বের প্রসারণের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকলেও মহাজাগতিক ধ্রুবক

[34] Lemaître later summarized his theory as thus: "The primeval atom hypothesis is a cosmogenic hypothesis which pictures the present universe as the result of the radioactive disintegration of an atom".

ঢুকিয়ে সেটাকে স্থিতিশীল রূপ দিয়ে রেখেছেন তিনি। ফ্রিডম্যান কিংবা লেমেত্রি, যাঁরাই মহাজাগতিক ধ্রুবকের বাইরে গিয়ে সমাধান হাজির করছেন, তাঁদেরকে কান মলে দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাই ১৯২৭ সালে ব্রাসেলসের একটা সেমিনারে লেমিত্রি যখন তাঁর মহাজাগতিক মডেল আইনস্টাইনের সামনে তুলে ধরলেন, আইনস্টাইন বিনা বাক্য ব্যয়ে বাতিল করে দিলেন এই বলে, 'তোমার ক্যালকুলেশন ঠিকি আছে, কিন্তু তোমার ফিজিকসটা তো বাপু জঘন্য'।

কিন্তু আইনস্টাইনের ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। ১৯২৯ সালে হাবল যখন মাউন্ট উইলসন মানমন্দির থেকে সে সময়কার ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপের (হুকার প্রতিফলক) সাহায্যে প্রমাণ হাজির করলেন যে মহাবিশ্ব আসলে প্রসারিত হচ্ছে, তখন কিন্তু আইনস্টাইনই ভুল প্রমাণিত হলেন, আর লেমেত্রি হলেন সঠিক।

লেমেত্রি নিঃসন্দেহে খুশি হয়েছিলেন। নিজের তত্ত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ পেলে কার না খুশি লাগে। কিন্তু লেমেত্রি যত না খুশি হলেন, ধর্মের চিরন্তন ধ্বজাধারীরা মনে হয় খুশি হলেন তার চেয়েও ঢের বেশি। তাঁরা বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ের সাথে এর মিল খুঁজতে শুরু করলেন, আর 'বিগ ব্যাং' কিংবা আদি কণাকে হাজির করলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে। যেমন ১৯৫১ সালে পোপ (Pope Pius XII) বলেছিলেন,

> আজকে বিজ্ঞান শতাব্দী পাড়ি দিয়ে একটি জায়গায় পৌঁছেছে যখন সেই আদিম ফিয়াট লাক্স (লেট দেয়ার বি লাইট)-কে অবলোকন করার মতো পরিস্থিতি এসেছে—যে আদিম অবস্থা থেকে আলো ও শক্তির বিকিরণ ঘটেছে, আর উৎক্ষিপ্ত কণাগুলো দ্বিখণ্ডিত আর চূর্ণ হয়ে লক্ষ-কোটি ছায়াপথে পরিণত হয়েছে। কাজেই সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক কাঠামো থেকে পাওয়া ফলাফলের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত যে, এই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার হাতে।

যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে,আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।

লেমেত্রি যেহেতু ধর্মযাজক ছিলেন, ছিলেন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী একজন বিজ্ঞানী, সেহেতু কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে পোপের এই উক্তিতে লেমেত্রি যারপরনাই খুশি হয়ে বগল বাজাবেন। তা হয়নি। লেমেত্রি ধার্মিক হলেও তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনিষ্ঠ এক মানুষ। আদিম কণার ধারণা যেটাকে আধুনিক বিগ ব্যাং-এর সার্থক প্রতিভাস বলে মনে করা হয়, সেটা তিনি পেয়েছিলেন নিগূঢ় গণিত আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে, কোনো ধর্মীয় ঐশী মন্ত্রে নয়। তিনি সেটা সোজাসুজি বলতেনও, 'কোনো ধর্মীয় চেতনা আমাকে মহাজাগতিক মডেল নির্মাণে কখনোই অনুপ্রাণিত করেনি'। তিনি কূপমণ্ডূক ধর্মবাদীদের মতো বাইবেলের আয়াতে বিজ্ঞান খোঁজা কিংবা বিজ্ঞান আর ধর্মের গোঁজামিল দেওয়াকে সবসময়ই অপছন্দ করতেন। তাই পোপ যখন বাইবেলকে ঐশী-গ্রন্থ বানাতে বিগ ব্যাং-কে সাক্ষীগোপাল হিসেবে হাজির করলেন, তখন তিনি এর জবাবে বললেন, 'আমি যত দূর দেখছি, এই তত্ত্ব অধিপদার্থবিদ্যা আর ধর্মের চৌহদ্দির বাইরের জিনিস'। শুধু তা-ই নয়, পোপ যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের 'ছেলেমানুষি' আর না করেন, সেজন্য তিনি ভ্যাটিকান মানমন্দিরের পরিচালক ড্যানিয়েল ও'কনেলের সাথে দেখা করলেন। ভবিষ্যতে পোপ যেন মহাজাগতিক ব্যাপারে তাঁর লম্বা নাকটা আর না গলান—ব্যাপারটা দেখতে পরিচালক মশাইকে অনুরোধ করে আসেন লেমিত্রি।

পরবর্তী ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সে সময়কার পোপ কিন্তু লেমেত্রির অনুরোধ ঠিকই রেখেছিলেন। বিগ ব্যাং-এর ব্যাপারে তিনি আর কখনোই কোন অভিমত দেননি, করেননি 'আম গাছে নিমের সন্ধান'[35]। আজকের দিনে জাকির নায়েক আর

[35] ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান অনুসন্ধানের অপচেষ্টা নিয়ে আমি (অ.রা) বহু আগে একটা লেখা লিখেছিলাম 'বিজ্ঞানময় কিতাব' নামে। লেখাটি আরেকটু বিবর্ধিত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয় রায়হান আবীরের সাথে যুগপৎভাবে লিখিত 'অবিশ্বাসের দর্শন' (শুদ্ধস্বর, ফেব্রুয়ারি, ২০১১) বইয়ে। সহব্লগার নাস্তিকের ধর্মকথাও এই বিষয় নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন ব্লগে। ধর্মে বিজ্ঞান খোঁজার

হারুন ইয়াহিয়ার অনুসারীরা, যাঁরা সুযোগ পেলেই তাদের শতাব্দী-প্রাচীন 'বিজ্ঞানময় ধর্মগ্রন্থ'গুলোর মধ্যকার নানা আয়াতের সাথে বিগ ব্যাং-এর মিল খুঁজে পান, তাঁরা ধর্মযাজক লেমেত্রির এই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারেন[36]।

প্রমাণ মিলল বিগ ব্যাং-এর

গ্যামোর সেই বিখ্যাত আলফা-বিটা-গামা পেপারের কাহিনিতে আরেকবার ফিরে যাওয়া যাক। গ্যামো আর আলফার বুঝেছিলেন, মহাবিস্ফোরণের পর থেকে শুরু করে তিন লক্ষ আশি হাজার বছর পর্যন্ত মহাবিশ্ব অস্বচ্ছ গোলকের মতো ছিল অনেকটা। প্লাজমা অবস্থায় পরমাণুরা জোড় বাঁধতে পারেনি। প্রায় চার লক্ষ বছর পর তাপমাত্রা খানিকটা কমে তিন হাজার ডিগ্রি কেলভিনে নেমে এল। ঐ সময়টার পরই কেবল স্থায়ী পরমাণু গঠিত হবার মতো পরিবেশ তৈরি হতে পেরেছে। এই সময়টাকে বলে রিকম্বিনেশন বা পুনর্মিলনের যুগ। এ সময়ই মহাবিশ্ব ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আর আলোক কণা প্লাজমার খাঁচায় আটকে না থেকে পাড়ি দিতে শুরু করে অন্তবিহীন পথ। গ্যামো, আলফার আর আলফারের আরেক সঙ্গী হারমান তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, বিগ ব্যাং যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে সেই আলোর অপভ্রংশ আমাদের এখন খুঁজে পাবার কথা। সেটাই হবে বিগ ব্যাং-এর ফসিল, যেটার জন্য হয়েল আর গোল্ডেরা উৎসুক ছিলেন, আর ওটার অনুপস্থিতির সুযোগে মহাবিস্ফোরণের সমর্থকদের দেদারসে ব্যঙ্গ করেছেন। গ্যামোরা জানতেন, রিকম্বিনেশন যুগের পর থেকে মহাবিশ্ব হাজার গুণ প্রসারিত হয়েছে। তাই যে আলোক তরঙ্গ দেখবার প্রয়াস নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটা আজকের দিনে হবে

প্রয়াসকে তিনি অভিহিত করেছেন 'আম গাছে নিমের সন্ধান' হিসেবে। লেখাটি মুক্তমনার সংকলনগ্রন্থ 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান' (চারদিক, ২০১২)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

36 এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালামও লেমিত্রির মতোই বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরআনের আয়াতের সাথে মেশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন,

> 'বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোনো ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?'

মোটামুটি ১ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি কোনো তরঙ্গ। অর্থাৎ, তড়িচ্চুম্বকীয় পরিসীমায় যাকে শনাক্ত করা যাবে বেতার তরঙ্গ হিসেবে। আর এই বিকিরণের তাপমাত্রা হবে পাঁচ ডিগ্রি কেলভিনের মতো।

মুশকিলটা হলো পেপারটা প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা ভুলে গিয়েছিল সবাই। আসলে গ্যামোর সময়ে মহাবিশ্বের প্রান্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণাগুলোকে পদার্থবিজ্ঞানের মূল ধারা হিসেবে না দেখে দেখা হতো পাগলাটে বিজ্ঞানীদের কল্পনাবিলাস হিসেবে। আরেকটা মূল কারণ অনেকে মনে করেন জর্জ গ্যামোর স্বভাবসিদ্ধ ভাঁড়ামি আর রঙ্গপ্রিয়তা[37]। আলফা-বিটা-গামা নামের পেপার বানানোর জন্য বিথের নাম তাঁকে না জানিয়েই লেখক তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন গ্যামো, আমরা সেটা আগেই জেনেছি। এ ধরনের অনেক কিছুই গ্যামো করতেন, যার কারণে গ্যামোকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন না তাঁর সহকর্মীরা কিংবা অন্যান্য রাশভারী গবেষকেরা। গ্যামো একবার গণনা করে দেখালেন, ঈশ্বর মশাই নাকি পৃথিবী থেকে ৯.৫ আলোকবর্ষ দূরে থাকেন। গণনার হিসাবটা এসেছিল ১৯০৪ সালে জাপান-রাশিয়া যুদ্ধের সময়, রাশিয়ার কিছু চার্চ নাকি যুদ্ধের ভয়াবহতা কমানোর জন্য বিশেষ গণপ্রার্থনার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সে প্রার্থনায় তাৎক্ষণিক কোনো ফল না হলেও বেশ ক'বছর পর ১৯২৩ সালের দিকে ক্যান্টো ভূমিকম্পে জাপানের বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ থেকে রসিকরাজ গ্যামো সিদ্ধান্তে আসেন, ঈশ্বরের অভিশাপ আলোর বেগে এসে পৌঁছাতে যে সময় লেগেছে তাতে বোঝা যায় ঈশ্বর থাকেন পৃথিবী থেকে ৯.৫ আলোকবর্ষ দূরে! তিনি একটা সময় বিজ্ঞানী হয়েলকে নিয়ে বাইবেলের জেনেসিসের আদলে নিজস্ব এক নতুন জেনেসিসও লিখেছিলেন। এর পাশাপাশি ছিল তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা মজাদার 'মিস্টার টম্পকিন্স' সিরিজ। বিজ্ঞানের ফ্যান্টাসি মিশিয়ে নানা ধরনের গালগপ্প বানাতেন গ্যামো। এমনি একটা বইয়ে (মিস্টার টম্পকিন্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড)

---

[37] Simon Singh, Big Bang: The Origin of the Universe, HarperCollins; 2005

তিনি এমন একটা রাজ্যের কল্পনা করলেন যেখানে আলোর গতি প্রতি ঘণ্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার। ফলে সেই রাজ্যের সাইকেল আরোহীরা সাইকেল চালাতে চালাতেই সময়ের শ্লথতা কিংবা দৈর্ঘ্যের সংকোচনের মতো আপেক্ষিকতার প্রভাবগুলো চোখের সামনে দেখতে আর অনুভব করতে পারেন। বিজ্ঞানের গল্পপ্রিয় শিশু-কিশোর আর কল্পনাবিলাসী পাঠকেরা এগুলোতে নির্মল আনন্দ পেলেও গ্যামোর প্রতিপক্ষদের কাছে এগুলো ছিল স্রেফ ছেলেমানুষি, আর তুচ্ছ। তাঁর ছাত্র আলফারের সমস্যা হয়েছিল আরো বেশি। গ্যামোর তদারকিতে পিএইচডি করায় অনেকেই আড়ালে-আবডালে বলতেন, 'জোকারের আন্ডারে' পিএইচডি করছেন আলফার। যদিও মহাজাগতিক বিকিরণের মূল গণনাগুলো করেছিলেন আলফারই।

অবশ্য তাঁদের গবেষণাকে ভুলে যাবার পেছনে গ্যামোর স্বভাবজাত তারল্যই একমাত্র কারণ ছিল না। গ্যামো নিজেও একটা সময় পদার্থবিজ্ঞানের, বিশেষত মহাবিশ্বের প্রান্তিক গবেষণা বাদ দিয়ে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে পড়েন, এবং ডিএনএর রহস্যভেদ করা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেন। আলফারও একাডেমিয়া ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি জেনেরাল ইলেকট্রিকে (GE) গবেষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, আর আলফারের সঙ্গী হারমান যোগ দিলেন জেনেরাল মোটরসে। এভাবেই ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল বিগ ব্যাং নিয়ে গ্যামোর গবেষণা, একসময় পড়ল বিস্মৃতির ধুলোর পুরু স্তর। 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড' বলে কথা!

এর পরের দশ বছর এভাবেই চলেছিল। এর মধ্যে ১৯৬০ সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ রবার্ট ডিকি ও জিম পিবলস স্বাধীনভাবে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসেন যে বিগ ব্যাং-এর প্রমাণ যদি কিছু থেকে থাকে তা থাকবে সেই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের মধ্যেই। তাঁরাও গ্যামোর কাছাকাছিই ফলাফল পেয়েছিলেন। তাঁদের হিসাব ছিল, বিকিরণের তাপমাত্রা হবে ১০ ডিগ্রি কেলভিন বা তার নিচে, আর বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার। তাঁরা গ্যামো

আর তাঁর দলের মতোই একটা গবেষণাপত্র প্রকাশ করার চিন্তা করছিলেন এ নিয়ে। কিন্তু গবেষকদের গবেষণাপত্রে যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তবে এর খোঁজ তখনো পাওয়া যায়নি।

আসলে মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের খোঁজ পাওয়াটা একটা সৌভাগ্যপ্রসূত ঘটনাই বলতে হবে। ১৯৬৫ সালের দিকে আমেরিকার নিউ জার্সির বিখ্যাত বেল ল্যাবে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন বেতার যোগাযোগের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে কাজ করছিলেন। এমন নয় যে, কোনো তরঙ্গ-ফরঙ্গ খোঁজার মতো কোনো কিছু তাঁদের মাথায় ছিল। তাঁদের লক্ষ্য আসলে ছিল উপগ্রহ যোগাযোগব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ করা। বেল ল্যাবের অনতিদূরে ক্রেফর্ড হিল বলে একটা জায়গায় ৬ মিটার (প্রায় ২০ ফুট) লম্বা একটা 'হর্ন এন্টেনা' পড়ে ছিল। এই একসময় বেল ল্যাবের 'ইকো প্রজেক্ট' বলে একটা প্রকল্পে এটা ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য নানা কারণে সেই প্রকল্প থেকে যন্ত্রটাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওটা ওভাবেই পড়ে ছিল। পরিত্যক্ত এই এন্টেনাকে রেডিও টেলিস্কোপের মতো কোনো কিছুতে স্থানান্তরিত করা যায় কি না, এ নিয়ে কাজ করতেই মূলত উদ্যোগী হন পেনজিয়াস আর উইলসন। তাঁরা বেল ল্যাব থেকে অনুমতি নিয়ে এলেন যাতে এই এন্টেনা ব্যবহার করে তাঁরা অন্তত কিছুদিন আকাশের দিকে তাক করে বেতার তরঙ্গ অনুসন্ধান করতে পারেন।

কিন্তু অনুসন্ধান করতে চাইলে কী হবে, আকাশের যেদিকেই এন্টেনা তাক করেন না কেন, তাঁরা দেখেন এক অপ্রীতিকর আওয়াজ বা নয়েজ এসে সব ভজকট লাগিয়ে দিচ্ছে। এই নয়েজের মাত্রা এমনিতে খুবই কম, কিন্তু এ থেকে কোনোভাবেই মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না যে! এমন নয় যে এই আওয়াজ তাঁদের কাজে খুব বেশি সমস্যা করছিল। সাধারণত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ ধরনের নয়েজকে সিস্টেমের ভ্রান্তি ধরে নিয়ে মূল কাজে এগিয়ে যান, কিন্তু পেনজিয়াস আর উইলসন নাছোড়বান্দা হয়ে পড়েই রইলেন—তাঁরা এই আওয়াজের উৎস খুঁজে বের করবেন বলে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে নয়েজের উৎস হয়ে থাকে দুই ধরনের। এই নয়েজ আসতে পারে কোনো বহির্জাগতিক উৎস থেকে, কিংবা হতে পারে কোনো যন্ত্রের নিজস্ব ক্রুটির কারণে। প্রথমে বহির্জাগতিক কোনো উৎস ঝামেলা পাকাচ্ছে কি না সেটা সন্ধান করলেন এই দুই বিজ্ঞানী। হর্ন এন্টেনার কাছাকাছি অবস্থিত কোনো বৃহৎ তড়িৎ-আবিষ্ট ল্যান্ডমার্ক কিংবা কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারণে এই বৈদ্যুতিক সংকেত তাঁদের এই হর্ন এন্টেনায় ধরা পড়ছে কি না তার খোঁজ করলেন। ফলাফল সেই শূন্য। এমনকি একসময় আকাশ পর্যবেক্ষণ বাদ দিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকেও তাঁদের টেলিস্কোপ তাক করলেন। সংকেতের কোনো তারতম্য হলো না। যেদিকেই যন্ত্র তাক করেন সেদিকেই তাঁরা শুনতে পান সেই একই মৃদু 'হিস্ হিস্' শব্দ।

ঝামেলাটা যন্ত্রের নিজস্ব ক্রুটির কারণে হচ্ছে কি না সেটাও অনুসন্ধান করলেন তাঁরা। তাঁরা যন্ত্রের এমপ্লিফায়ার, স্পিকারগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন, আর সবচেয়ে বেশি দেখলেন বৈদ্যুতিক বর্তনী এবং বর্তনীর সংযোগস্থানগুলো। কোনো শিথিল বা নড়বড়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ সমস্যা সৃষ্টি করছে নাকি, সেটাও আগাপাশতলা পরীক্ষা করলেন বহুবার। এমনকি যে সংযোগগুলো প্রথম দৃষ্টিতে ভালোই মনে হচ্ছিল, সেগুলোকেও তাঁরা অ্যালুমিনিয়ামের টেপ দিয়ে মুড়লেন পুনর্বার। সাবধানের তো মার নেই।

কিন্তু কোনো কিছু করেই এই 'গায়েবি আওয়াজ' সরানো যাচ্ছিল না। এমন সময় তাঁদের নজরে পড়ল তাঁদের সাধের এন্টেনায় কোত্থেকে একজোড়া কবুতর এসে বাসা বেঁধেছে। কে জানে অনেকদিন ধরেই হয়তো তারা সেখানে ঘাপটি মেরে ছিল। পেনজিয়াস আর উইলসন ভাবলেন, যাক, এইবার হতচ্ছাড়া সংকেতের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। ২০ ফুট এন্টেনা বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে কবুতরের বর্জ্য পরিষ্কার করলেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, এন্টেনায় জমা হওয়া এই 'White dielectric material' গুলোই যত নষ্টের গোড়া। কিন্তু সেগুলো সাফসুতরো করেও লাভ হলো না, এমনকি দুই দফা কবুতর তাড়িয়েও না।

প্রায় হাল ছেড়ে দেয়া অবস্থা যখন, তখনই পেনজিয়াস এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্নার্ড ব্রুকের কাছ থেকে একটা টেলিফোন কল পান। ব্রুক তাঁকে বলেন যে তিনি প্রিন্সটনের দুই গবেষক — ডিকি আর পিবলসের একটা গবেষণাপত্রের ড্রাফট কপি পেয়েছেন, যেখানে তাঁরা বিগ ব্যাং-এর মডেলের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ-পরবর্তী অণুতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা মাপজোখ করেছেন। ব্রুকের কেন যেন মনে হচ্ছে, ডিকি-পিবলসের গবেষণার সাথে পেনজিয়াস-উইলসনের এন্টেনায় ধরা পড়া আওয়াজের কোথাও একটা সম্পর্ক আছে। ব্রুক বললেন, 'ইউ শুড প্রোবাবলি কল ডিকি অ্যাট প্রিন্সটন'[38]।

এর পরদিনই প্রিন্সটনে ফোন করলেন পেনজিয়াস, আর ফোন ধরলেন ডিকি। ডিকির সাথে ফোনে কথা বলতে বলতেই প্রথমবারের মতো পেনজিয়াস বুঝতে পারলেন কী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন তাঁরা নিজেদের অজান্তেই। এন্টেনায় ধরা আওয়াজের সাথে নিউ ইয়র্কের দিকে এন্টেনা তাক করা, বর্তনীর শিথিল সংযোগ কিংবা কবুতরের বিষ্ঠা—কোনো কিছুরই কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা আসলে খুঁজে পেয়েছেন মহাবিস্ফোরণের প্রাচীনতম ফসিল। মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যাকে বলে। পশ্চাদপট বিকিরণের তীব্রতা মেপে ডিকি-পিবলসদের গণনার কাছাকাছি ফলাফল পেয়েছেন তাঁরা। পরম শূন্যের ওপর ৩ ডিগ্রি। আর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাচ্ছেন দুই মিলিমিটারের সামান্য কম। পেনজিয়াসের এই সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ডিকি । ফোন রেখে তাঁর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বয়েস, উই হ্যাভ বিন স্কুপড'।

---

[38] Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 1ST edition , January 10, 2011

পেনজিয়াস ও উইলসন বেল ল্যাবের বিখ্যাত সেই হর্ন এন্টেনার সামনে

এর পরদিনই ডিকি তাঁর সাথে আরো দুজন পদার্থবিদকে নিয়ে প্রিন্সটন থেকে ৩০ মাইল গাড়ি চালিয়ে নিউ জার্সির হোলম্যান টাউনশিপে পৌঁছালেন। সেখানেই বেল ল্যাবের রিসার্চ সেন্টার। সেখানে পেনজিয়াস আর উইলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলগুলো হাতে-কলমে দেখে নিশ্চিত হলেন, হ্যাঁ, যে সিগনাল তাঁরা অ্যান্টেনায় পাচ্ছেন, সেটা মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণই বটে। তখনই দুই দল মিলে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নালে। তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পর পেনজিয়াস আর উইলসনের এই আবিষ্কারটিকে বিজ্ঞানের জগতে অন্যতম সেরা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃত হয় প্রায় সর্বত্রই। নাসার নভোচারী রবার্ট জ্যাস্ট্রো বলেছিলেন, 'পেনজিয়াস আর উইলসন আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিগত পাঁচশ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা আবিষ্কারটি করছেন'। হার্ভার্ডের পদার্থবিদ এডওয়ার্ড পার্সেল আরো এককাঠি বাড়া। তিনি বলেছিলেন, 'যে কোনো কারো দেখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটি'।

এই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বা সিএমবি আবিষ্কারের জন্য পেনজিয়াস ও উইলসন নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৮ সালে, গ্যামোর মৃত্যুর দশ বছর পর। লেমিত্রিও মারা গিয়েছেন ততদিনে। মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার প্রদানের কোনো

রীতি নেই,থাকলে গ্যামোকে চোখ বন্ধ করে বোধ হয় তখন নির্বাচিত করা হতো,যিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় বিগ ব্যাং'-এর ধারণাকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বোধ হয় কিছু বৈজ্ঞানিক অবদান সব সময় থেকে যাবে যা নোবেল প্রাইজের চেয়েও বেশি দামি আর গুরুত্বপূর্ণ।

বিগ ব্যাং-এর ফসিল আনলো কোবে

পেনজিয়াস আর উইলসন মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের হদিস দিলেও সেটা খুব নিখুঁত ছিল না। কারণ বিজ্ঞানীরা জানতেন, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বড় স্কেলে সুষম মনে হলেও ছোট স্কেলে কিছুটা হলেও 'ফ্লাকচুয়েশন' বা অস্থিতি বজায় থাকতে হবে। এই অস্থিতিটুকুই কাজ করবে ভবিষ্যৎ গ্যালাক্সি তৈরির বীজ হিসেবে।

কিন্তু এই অস্থিতি ধরে ফেলা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির দরকার। সত্তরের দশকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে একশ ভাগের এক ভাগ মাত্রায় ফ্লাকচুয়েশন পরিমাপ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এতে কোনো অস্থিতি ধরা পড়েনি। আবহমণ্ডলের মধ্যকার রশ্মিগুলো ঝামেলা করছে ভেবে বেলুন-ফেলুন ওপরে পাঠিয়ে নানা পরীক্ষা করা হলো, তাতেও কোনো ভালো ফলাফল এল না।

সাফল্য এল অবশেষে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। বহু খরচাপাতি করে নাসা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বানিয়েছিল *কোবে* (COBE) নামে, ১৯৮৯ সালে। এই মহাজাগতিক বিকিরণ কব্জা করার লক্ষ্যেই বানানো হয়েছিল সেটা। সেই কোবে আদিম সদ্যজাত মহাবিশ্বের এক দুর্লভ ছবি আমাদের কাছে এনে দিল, যার মধ্যে পাওয়া গেল অস্থিতির সুস্পষ্ট চিহ্ন। ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের বয়স ১৪শ কোটি বছরের বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আর এই কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন বা সিএমবির যে ছবিটা আমরা দেখি সেটা মহাবিশ্ব জন্মানোর মাত্র চার লক্ষ বছরের। মানবিক স্কেলে চিন্তা করলে অনেকটা এরকমের

শোনাবে – আমাদের মহাবিশ্বকে যদি সত্তর বছরের বৃদ্ধ হিসেবে আমরা কল্পনা করি, তবে কোবের সংগৃহীত এই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ বা সিএমবির ছবিটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার সদ্যোজাত শিশুর। আর সেই শিশুবেলাকার ছবির মধ্যেই পাওয়া গেল পরবর্তীকালে নক্ষত্র তৈরি হবার সম্ভাবনাময় বীজ।

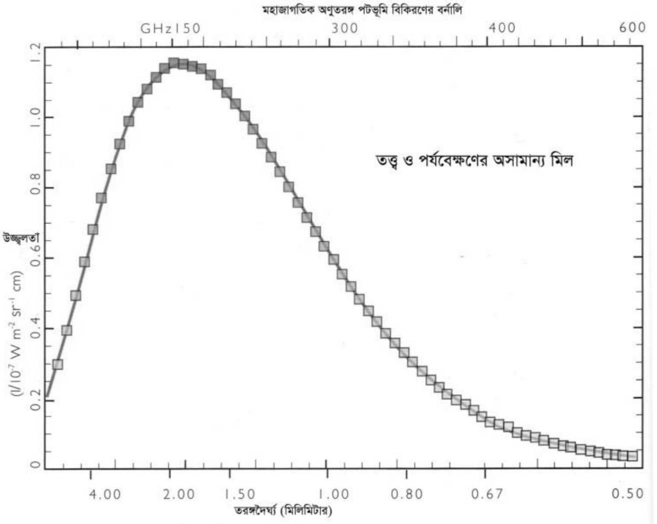

কোবের পাঠানো মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ২ দশমিক ৭৩ ডিগ্রি কেলভিনের কৃষ্ণকায়া বিকিরণের তত্ত্বীয় রেখার সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে গিয়েছিল (ছবির উৎস: স্টিফেন হকিং, ইউনিভার্স ইন এ নাটশেল)

১৯৯২ সালে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সেমিনারে যখন এই ফলাফল প্রকাশ করা হলো, আর সে সভায় উপস্থিত ১৫০০ জন বিজ্ঞানীর সবাই যখন হতবাক হয়ে দেখলেন কোবের মাইক্রোতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের উপাত্ত ২ দশমিক ৭৩ ডিগ্রি কেলভিনের কৃষ্ণকায়া বিকিরণের তত্ত্বীয় রেখার সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে গেল, তখন মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ল পুরো সভাঘর।

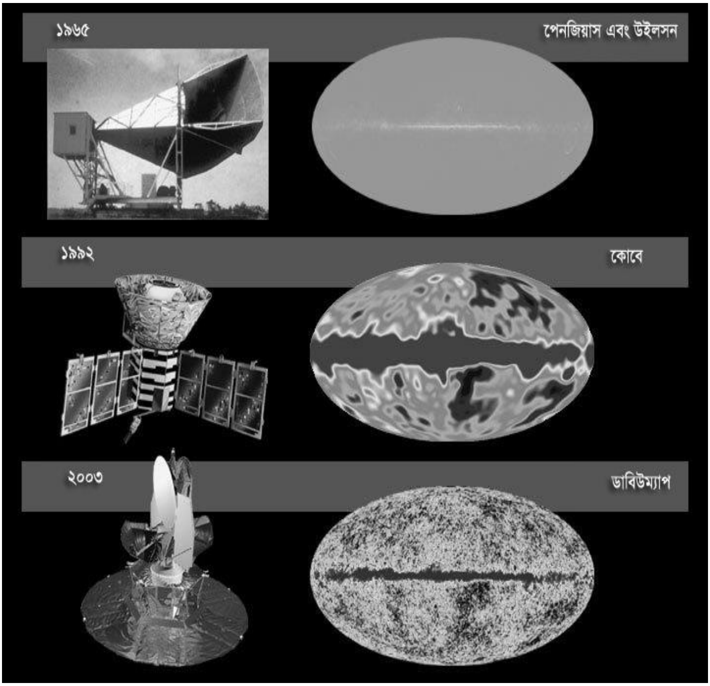

–উইলসন, কোবে ও ডব্লিউ ম্যাপ থেকে পাওয়া মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ।

প্রিন্সটনের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী অস্ট্রিকার মন্তব্য করলেন, 'যখন পাথরের খাঁজে ফসিল পাওয়া যায় তখন আমাদের চোখে প্রজাতির উদ্ভবের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোবে আমাদের জন্য মহাবিশ্বের ফসিল নিয়ে এসেছে'।

কথাটা মিথ্যে নয়। এই সিএমবি সদ্যজাত মহাবিশ্বের ফসিলই তো। কিন্তু তার পরও একটা ব্যাপার হলো, কোবের পাঠানো ছবি খানিকটা হলেও ঝাপসা ছিল। আর কোবের সংবেদনশীলতা ছিল কেবল ৭ ডিগ্রি কোণের চেয়ে বড় ফ্লাকচুয়েশনগুলো কব্জা করার মতো পর্যায়ের। কিন্তু এর চেয়েও সূক্ষ্ম অস্থিতি ধরার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০০৩ সালে ডব্লিউ-ম্যাপ (WMAP) উপগ্রহের পাঠানো উপাত্তের জন্য।

কোবে ও ডব্লিউ ম্যাপের পাঠানো মহাজাগতিক বিকিরণের ফসিলই শেষ পর্যন্ত বিগ ব্যাং বনাম স্থিতি তত্ত্বের দ্বন্দ্বের যবনিকা ফেলে দেয়। মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে তত্ত্বের দ্বন্দ্বে বিগ ব্যাং বেরিয়ে আসে একমাত্র 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে।

অতঃপর...

'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের গৌরবময় সাফল্য বিজ্ঞানীদের একেবারে সম্মোহিত করে রেখেছিল বেশ অনেক দিন। সবকিছুই সেই উত্তপ্ত মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে একসাথে সৃষ্টি হয়েছে, আর তার আগে কিছুই ছিল না, এমন ভাবনা যেন বিজ্ঞানীরা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন কয়েক দশক ধরে। মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে অনেকে আবার বিগ ব্যাং তথা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মধ্যে একেবারে 'ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি' পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলেন। এমনকি নিউজ উইকের মতো ম্যাগাজিন ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর সম্পাদকীয় ছেপেছিল এই বলে বিজ্ঞান নাকি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে!

তারপর যত দিন গেছে উত্তেজনা আর 'সম্মোহনের ভাব' ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসেছে। একটা সময় পরে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই দেখেছেন বিগ ব্যাং-এর প্রমিত মডেল আসলে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। এরও অনেক সমস্যা আছে। বিজ্ঞান লেখক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী প্রায়ই তাঁর লেখায় বলেন, 'স্বর্গোদ্যানে ঘাসের নিচে সাপের অবস্থান যেমন রসভঙ্গ করে, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং তত্ত্বও একইভাবে সর্বৈব সুন্দর নয়। এরও সমস্যা আছে।[39]' যেমন, বিজ্ঞানীরা আজকের মহাবিশ্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে দেখেছেন প্রায় ১৪শ কোটি বছর আগে ঘটা মহাবিস্ফোরণ অনেক বড় স্কেলেও প্রচণ্ড সমসত্ব ছিল। কিন্তু কেন যে ছিল এর কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি।

---

[39] এ এম হারুন-অর-রশীদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, অপূর্ব এই মহাবিশ্ব, প্রথমা, ২০১১। অথবা, সৈয়দা লাম্‌মীম আহাদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, সবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা, তাম্রলিপি, ২০১২ দ্রষ্টব্য।

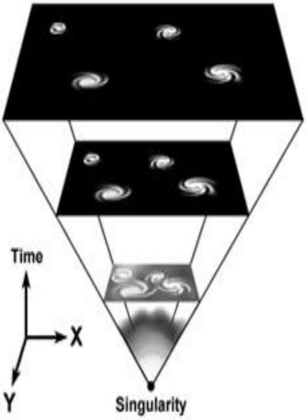

ক) স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং মডেল :যেটি মনে করে, অতি ঘন, উত্তপ্ত এক অদ্বৈতবিন্দুর মধ্য দিয়ে আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে। (খ)‘বিজ্ঞান ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে’ দাবি করে নিউজ-উইকের একটি কুখ্যাত প্রচারণা।

বিগ ব্যাং বলতে পারেনি এত বিশালকায় এই মহাবিশ্বের দুই প্রান্তের দুই অঞ্চলের তাপমাত্রা কীভাবে সমান হয়? এ সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীদের মাঝে পরিচিত ছিল ‘দিগন্ত সমস্যা’ হিসেবে। দিগন্ত সমস্যার পাশাপাশি ছিল মহাবিশ্বের ‘সামতলিক সমস্যা’। ‘প্রমিত বিগ ব্যাং-এর মডেল কখনোই বলতে পারেনি কেন আমাদের মহাবিশ্ব অতিমাত্রায় ফ্ল্যাট বা সমতল (১০^{২৮} সেন্টিমিটার স্কেলে)। এরকম সমতল মহাবিশ্ব তৈরি করতে গেলে মহাবিশ্বের মোট ঘনত্ব আর সন্ধি ঘনত্বের অনুপাত হতে হবে টায়ে টায়ে ১। মহাবিশ্বের উষালগ্নে কীভাবে এই ‘সূক্ষ্ম সমন্বয়ের’ মতো ব্যাপার ঘটেছিল? জবাব পাওয়া যায়নি। এর ওপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল ‘ম্যাগনেটিক মনোপোল’ সমস্যা। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রমিত মডেল বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় আধানযুক্ত অতি ভারী একক মেরুবিশিষ্ট কিছু কণিকার প্রাচুর্য থাকবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিল,যা আমরা কখনোই দেখতে পাই না। এমনকি আমাদের মহাবিশ্ব বাড়তে বাড়তে কেন এত বড় হলো—এ সমস্যারও

কোনো সমাধান হাজির করতে পারেনি এ তত্ত্ব। স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী অতি ঘন,উত্তপ্ত এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যদি আমাদের মহাবিশ্বের জন্ম হয়ে থাকে,তবে গণনা করে দেখা গেছে খুব বেশি হলে মাত্র দশটি প্রাথমিক কণিকা তৈরি করার মতো ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। আর তা দিয়ে এই বইয়ের একজন পাঠকেরও মাথা গুঁজবার ঠাঁই হবে না,তাদের একেক জনের দেহেই যে রয়েছে প্রায় $১০^{২৯}$টি অমনতর প্রাথমিক কণিকা!তার চেয়েও বড় কথা হলো,বিগব্যাংকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির 'আলাদিনের চেরাগ' হিসেবে অনেকে দেখাতে চাইলে কী হবে, এটিকে আসলে উৎপত্তির সর্বশেষ তত্ত্ব বলা যায় না। আদপে এটা বিস্ফোরণ-বিষয়ক তত্ত্বই নয়। এর মাধ্যমে একটি বিস্ফোরণের বেশ কিছু ফলাফল ব্যাখ্যা করা যায় বটে কিন্তু বিস্ফোরণের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে সে কিছুই বলতে পারে না। কী এই বিস্ফোরণ, এই বিস্ফোরণের আগে কী ছিল, কিংবা কেনই বা এই মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল, এ বিষয়ে এই মডেল একেবারেই নীরব।

আসলে এই নিঃসীম নীরবতা ভেঙে উত্তর হাজির হওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আশির দশকে অ্যালেন গুথ নামে এক বিজ্ঞানীর আগমনের জন্য; 'স্ফীতিতত্ত্বের জনক' হিসেবে পরিচিত এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর কাজের মাধ্যমেই এইসব কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর ক্রমশ আমরা জানতে পেরেছি।

দশম অধ্যায়

বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?

'- ফাদার, এই মহাবিশ্ব তৈরি করার আগে ঈশ্বর কী করছিলেন?'
'—তোদের মতো লোক, যারা এ ধরনের প্রশ্ন করে, তাদের জন্য জাহান্নাম বানাচ্ছিলেন ঈশ্বর' ।

— সেন্ট অগাস্টিন, এক আগন্তুকের প্রশ্নের জবাবে।

স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাব

এই যে আমাদের চিরচেনা মহাবিশ্ব, এই যে আমাদের চারদিকের প্রকৃতি—চাঁদ, তারা সূর্য, পৃথিবী, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন – এই সব কিছু এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন কেউ করলে কিছুদিন আগেও আমরা চোখ বুজে বলে দিতাম — কোত্থেকে আবার, 'বিগ ব্যাং' থেকে—বাংলায় আমরা যাকে 'মহাবিস্ফোরণ' নামে ডাকি! কিন্তু আশির দশকে 'ইনফ্লেশন' বা স্ফীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের কথা জানার পর থেকে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এরকম উত্তর আর পছন্দ করছেন না। আসলে কোনো কিছু 'বিগ ব্যাং থেকে এসেছে' বলা মানে একটা শিশু হাসপাতালের 'মাতৃসদন' বা মেটারনিটিটি ওয়ার্ড থেকে এসেছে—বলার মতো শোনায় এখন[40]। উত্তরটা হয়তো ভুল নয়, মাতৃসদন থেকেই শিশুদের কোলে করে বাসায় নিয়ে আসি আমরা, কিন্তু এই ধরনের উত্তর শিশুর জন্মের সত্যিকার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কিন্তু কোনো ধারণাই দিতে পারে না।

40 Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April 01, 2002

বিগ ব্যাং-এর ব্যাপারটিও তেমনি। মহাবিশ্বের উদ্ভব বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ থেকে হয়েছে—এভাবে বললে হয়তো বলাই যায়, কিন্তু বিস্ফোরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কোনো ধারণাই পাই না এ থেকে। অ্যালেন গুথের ভাষায়, 'কী এই বিস্ফোরণ, কীভাবে এই বিস্ফোরণ, আর কেনই বা এই বিস্ফোরণ—এই প্রশ্নগুলোর কোনো সন্তোষজনক উত্তর বিগ ব্যাং তত্ত্ব দিতে পারে না'[41]।

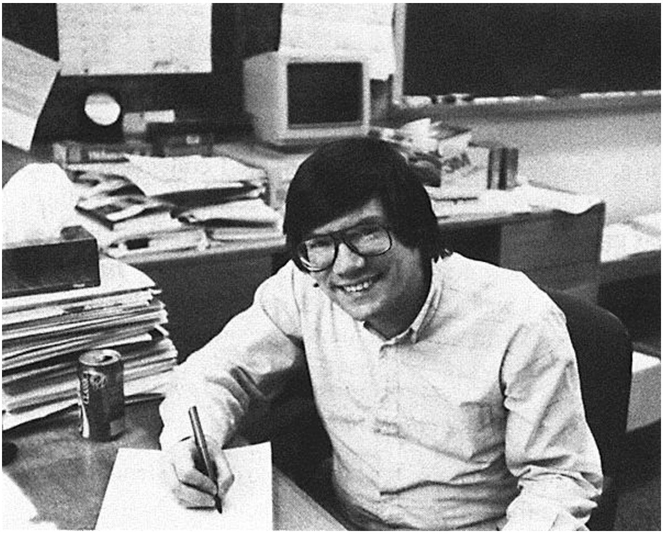

অ্যালেন গুথ: স্ফীতি তত্ত্বের জনক

আর বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল – এই প্রশ্ন করলে তো কথাই নেই। এ ধরনের প্রশ্ন কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানে দেখা হতো 'ব্লাসফেমি' হিসেবে। কেউ এ ধরনের প্রশ্ন করলেই বিজ্ঞানীরা বলতেন, আরে, এ ধরণের প্রশ্ন অনেকটা 'উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে?' বলার মতো শোনায়। এভাবে ভাবার কারণ যে নেই তা নয়। আমরা আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বে যে স্থান-কালের ধারণার সাথে পরিচিত, সেই স্থান ও কালের ধারণাও আসলে এসেছে এই মহাবিস্ফোরণ ঘটবার পর-মুহূর্ত

[41] Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback Edition, 1998

থেকেই। কাজেই মহাবিস্ফোরণ ঘটার মুহূর্তে কিংবা পূর্বে কী ছিল—এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন।

কিন্তু অর্থহীন বলে সবাই এড়িয়ে গেলেও 'ক্যারা মাথা'র কেউ কেউ থাকেন দুনিয়ায়, যাঁরা 'মান্য করে ধন্য' হবার নন। তাঁরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন না। নাফরমানি চিন্তা করতেই থাকেন অনবরত। এমনি একজন নাফরমান বিজ্ঞানী অ্যালেন গুথ।

গুথের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। না, হয়েল, গ্যামো, ওয়েইনবার্গ, হকিংদের মতো প্রথম থেকেই একাডেমিয়ার সাথে যুক্ত কোনো বিজ্ঞানী ছিলেন না গুথ। তাঁর পরিচিতি বলার মতো কিছু ছিল না, অন্তত আশির দশকের আগ পর্যন্ত তো বটেই। ১৯৭৯ সালে ৩২ বছরের এই বিজ্ঞানমনস্ক তরুণ কাজ করছিলেন স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার এক্সিলেটরে, একজন ছাপোষা বিজ্ঞানের কর্মী হিসেবেই। চাকরি থাকা আর না থাকার মাঝামাঝি জায়গাতেও চলে গিয়েছিলেন কিছুদিন। হয়তো বা বিস্তৃতির আড়ালেই হারিয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু সে অবস্থা থেকেই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন, যে গোটা মহাবিশ্বের ছবিটাই গেল পালটে। মহাবিশ্বের পাশাপাশি অবশ্য তাঁর জীবনও পাল্টাল বলাই বাহুল্য। অভূতপূর্ব এই আবিষ্কার মূলধারার বিজ্ঞানীদের মধ্যে এতটাই সাড়া ফেলে দিল যে, এক মাসের মধ্যে তিনি আমেরিকার সাত-সাতটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব পেলেন। এর মধ্য থেকে তিনি গ্রহণ করলেন তাঁর প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটির অফার, এবং এখনো সেখানেই অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটিকে এখন ইনফ্লেশন বা স্ফীতি-তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়। মহাবিশ্বের উদ্ভববিষয়ক আধুনিক যেকোনো বইয়ে কিংবা যেকোনো পেপারে গুথের কাজের উল্লেখ থাকতেই হয়। প্রমিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে এর সাথে জুড়ে দিয়ে তত্ত্বটিকে এখন 'ইনফ্লেশনারি বিগ ব্যাং মডেল' হিসেবেও ডাকা হয় ।

মহাকর্ষের বিকর্ষণ

গুথের আবিষ্কারের মূল বিষয়টি তাহলে ঠিক কী ছিল? মুল ধারণাটা আসলে খুব একটা কঠিন কিছু নয়। মহাকর্ষ ব্যাপারটিকে যে আমরা এত দিন আকর্ষণমূলক বল বলে ভেবে এসেছি, গুথ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই মহাকর্ষ আসলে সুযোগ আর পরিস্থিতি বিচারে কখনো কখনো বিকর্ষণমূলক হয়ে উঠতে পারে। এবং সেটা হয়ও। আইনস্টাইনের ঝানু মাথাতেও একসময় এটা এসেছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি তাঁর আপেক্ষিকতা থেকে পাওয়া ক্ষেত্র-সমীকরণে একটা ‘মহাজাগতিক ধ্রুবক’ যোগ করেছিলেন, পরে আবার তা ‘জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’ ভেবে বাদও দিয়েছিলেন। আইনস্টাইনের ভুলটাকেই যেন সঠিক প্রমাণিত করে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনলেন অ্যালেন গুথ, তবে একটু অন্যভাবে।

দেখা যাক কিভাবে। আমরা বস্তু কণাদের মধ্যে আকর্ষণের কথা বলি হরহামেশাই। ছোটবেলায় শেখা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে আমরা জানি, এই আকর্ষণ বল বস্তুকণাদের ভরের ওপর এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বাজারে আসার পর থেকে আমরা বুঝলাম, ব্যাপারটা আসলে পুরোপুরি ঠিক নয়। মাধ্যাকর্ষণ বল কেবল বস্তুর ভরের ওপরেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বস্তুকণার মধ্যে লুকিয়ে থাকা শক্তির ওপরও। বস্তুর মধ্যস্থিত অণু-পরমাণুগুলো কী হারে ছুটোছুটি করছে সেটা আমাদের কাছে শক্তির একটা পরিমাপ হাজির করে। এই ছুটোছুটি আবার নির্ভর করে বস্তুর তাপমাত্রার ওপর। তাপমাত্রা বাড়লে অণুদের ছুটোছুটি বাড়ে, সেই সাথে বাড়ে ওজন। তাই, টেবিলে পড়ে থাকা একদিনের বাসি ডালপুরি আর তাওয়ায় ভাজা গরম গরম ডালপুরির ওজন এক হবে না। গরম ডালপুরির ওজন কিছুটা হলেও বেশি পাওয়া যাবে, এবং পাওয়া যায়ও, কারণ, গরম ডালপুরিতে বাড়তি তাপমাত্রার কারণে এর ভেতরকার অণুগুলো বেশি হারে ছুটাছুটি করে, ঠান্ডা ডালপুরির তুলনায়। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বললে আমরা বলব, গরম ডালপুরিতে গতিশক্তি বেশি থাকে।

ব্যাপারটা ডালপুরির জন্য বললেও যেকোনো পদার্থের জন্যই সত্য। পদার্থের এই গতিশক্তি যে বস্তুর ওজন বাড়াতে পারে, আর সর্বোপরি আকর্ষণ বলের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিউটনের সময় জানা ছিল না। আরেকটি ব্যাপারও বোধ হয় নিউটন জানতেন না। বস্তুকণার মধ্যস্থিত চাপও বস্তুকণাদের শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারে, আর সেটা ফেলতে পারে আকর্ষণ বলের ওপর নানামুখী প্রভাব। একটা স্প্রিং-ওয়ালা খেলনা এমনিতে পাল্লায় রেখে ওজন করলে, আর তারপর স্প্রিং-এর চাবি জোরসে পেঁচিয়ে ওজন করলে ওজনে সামান্য হেরফের পাওয়া যাবেই। এর কারণ হচ্ছে 'খোলা স্প্রিং'-এর চেয়ে 'প্যাঁচানো স্প্রিং'-এ শক্তি বেশি লুকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা স্প্রিং-এর জন্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য চিপসের ঠোঙা কিংবা কোকাকোলার বোতলের ক্ষেত্রেও। কোকের বোতলে বাতাসকে উঁচু চাপে আটকে রাখা হয় । সেরকম একটা বন্ধ বোতল ওজন করলে আর বোতলের ছিপি খুলে ওজন করলে দেখা যাবে ওজন খানিকটা কম পাওয়া যাচ্ছে।

গুথ ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, চাপ যেমন ওজন বাড়িয়ে বস্তুকে টেনে ধরতে পারে, ঠিক তেমনি সেটা কখনো কখনো বস্তুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলেও দিতে পারে দূরে। কখন? যখন চাপটা ধনাত্মক না হয়ে হয়ে ওঠে ঋণাত্মক। এই ঋণাত্মক চাপের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ঋণাত্মক চাপের উদ্ভব ঠিক কিভাবে হয় এটা বোঝা জরুরি। তবে এই ব্যাপারটিকে পরিচিত জাগতিক উপমা দিয়ে বোঝানো একটু কষ্টকর। একটা দুর্বল চেষ্টা আমি (অ. রা) করেছিলাম আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটিতে গিটারের উপমা হাজির করে[42]। এখানেও সেটা দেওয়া যাক। যাঁরা গিটার বাজান তাঁরা জানেন, গিটার বাজানো শেষ হলে গিটারটা ঝুলিয়ে রাখার সময় তারগুলোকে খুলে ঢিলে করে দিতে হয়। নয়তো তারগুলো সারা রাত ধরে টান টান হয়ে থেকে গিটারের বাহুকে ভেতরের দিকে বাঁকিয়ে দেবে। এখানে গিটারের সাপেক্ষে তারের চাপ ঋণাত্মক বলে চিন্তা করা যেতে পারে। ঠিক একভাবে

---

[42] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পুনর্মূদ্রন ২০০৬)

মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে - ঋণাত্মক চাপযুক্ত কোনো বস্তু বাইরের দিকে চাপ দেবে না, ভেতরের দিকে কুঁকড়ে যেতে চাইবে, অর্থাৎ এটি অনুভব করবে অন্তর্চাপ। আর এই চাপের ফলে বস্তুটির মহাকর্ষীয় শক্তি হবে ঋণাত্মক, অর্থাৎ বিকর্ষণধর্মী। বিজ্ঞানী ব্রায়ান গ্রিন তাঁর ‘দ্য ফেব্রিক অব কসমস’ বইয়ের ‘Deconstructing the Bang’ অধ্যায়ে লিখেছেন[43],

> ধনাত্মক চাপ স্বাভাবিকভাবেই মহাকর্ষের ওপর ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে চাপ হয়ে উঠতে পারে ঋণাত্মক, ফলে সেই অংশে বহির্চাপের বদলে অনুভূত হবে অন্তর্চাপ। যদিও ব্যাপারটা মোটেই অদ্ভুতুড়ে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাপেক্ষে ব্যাপারটা হয়ে ওঠে রীতিমতো অসাধারণ। যেখানে ধনাত্মক চাপ বস্তুকণার ওপর সাধারণ এবং পরিচিত আকর্ষণমূলক মহাকর্ষের সৃষ্টি করে, ঋণাত্মক চাপ সেখানে তৈরি করে বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষের।

আর বলা বাহুল্য, এই বিকর্ষণধর্মী শক্তিটাই মহাবিশ্বকে এমন তীব্রভাবে প্রসারিত হবার পথ তৈরি করে দিয়েছিল। কতটা তীব্র বোধ হয় কল্পনাতেও আসবে না। গুথ গণনা করে দেখলেন, চোখের পলক ফেলতে আমাদের যে সময় লাগে তার চেয়েও ঢের কম সময়ে—খুব সঠিকভাবে বললে মাত্র ১০$^{-৩৫}$ সেকেন্ডের মধ্যে মহাবিশ্ব বেড়ে গিয়েছিল অন্তত ১০^{২৬} গুণিতক হারে[44]। আর এই ব্যাপারটাই সমাধান করে দিয়েছিল যাবতীয় সমস্যার, যেগুলো সমাধান করতে বিগ ব্যাং তত্ত্বের অনুসারীরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিলেন এত দিন ধরে।

কিন্তু কথা হচ্ছে কোথায় আর কীভাবে তৈরি হয় এই অদ্ভুতুড়ে বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষের? মহাবিশ্বের শুরুতে তো আর গিটারের তার (ওপরের উদাহরণ দ্র.) হাজির

---

43 Brian Greene, The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality [Paperback], Vintage, 2005.

44 Ken Olum (Institute of Cosmology, Tufts University), What powered the Universe’s early growth spurt?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

ছিল না মহাবিশ্বের বাহুকে বাঁকানোর জন্য। তাহলে? আসলে এর জন্য গুথকে চিন্তা করতে হয়েছিল একধরনের অস্থায়ী ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতার, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি ‘ফল্‌স্‌ ভ্যাকুয়াম’ ।

ফল্‌স্‌ ভ্যাকুয়াম

গুথের দেওয়া ফলস ভ্যাকুয়ামের ব্যাপারটা সাধারণ পাঠকদের কাছে একটু জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা একটু সহজ উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব, সেটা আমাদের চেনাজানা নদীর গতিপথ থেকে। নদীগুলো সাধারণত পাহাড়-পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, এ আমরা সবাই জানি। আমাদের পদ্মা নদীর কথাই ধরি। এই নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যায়। তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় এর নাম হয় গঙ্গা। এই গঙ্গা নামে ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েটয়ে একসময় নবাবগঞ্জ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। তারপর সেটা চাঁদপুরের কাছে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। দেশের অন্যান্য নদীগুলোও তাই। যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র–এসেছে কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর থেকে,মেঘনা এসেছে আসামের লুসাই পাহাড় থেকে, তারপর নানা পথ পেরিয়ে কোনো-না-কোনো সাগরে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেন নদীরা শেষ পর্যন্ত সাগরের বুকে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে? কারণ, বিজ্ঞানীরা বলেন, যে যা-ই করুক না কেন, দিন শেষে সবাই আসলে ‘লোয়ার এনার্জি স্টেটে’ থাকতে চায়। এই যে আমরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনি করে এসে রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দিই—এই জন্যেই। কারণ শুয়ে থাকার মাধ্যমেই আমরা আমাদের দেহের সবচেয়ে নিচু শক্তিস্তরে আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করি। নদীরাও তাই চায়। পাহাড়-পর্বত বেয়ে সারা জীবন চলতে চাওয়ার চেয়ে সাগরের বুকে থাকাই তার কাছে পছন্দের, কেননা সেখানে সে সবচেয়ে কম শক্তিস্তরের জায়গাটা খুঁজে নিতে পারে। ধরা যাক, এই সাগরের এই সবচেয়ে কম শক্তিস্তরের

জায়গাটাকে আমরা নাম দিলাম প্রকৃত শূন্যতা বা 'ট্রু ভ্যাকুয়াম'। এখন কথা হচ্ছে, সব সময়ই যে নদীরা সাগরে তথা প্রকৃত ভ্যাকুয়ামের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে তা কিন্তু নয়। ধরা যাক, ফারাক্কা বাঁধের মতো কোনো বাঁধ কোনো একটা নদীর বুকে আছে। ফলে নদীর পানি সাগর পর্যন্ত না পৌঁছে বাঁধেই আটকে থাকবে। বাঁধের উদাহরণের মতোই আমাদের বিছানায় ঘুমানোর উদাহরণেও এ ধরনের অস্থায়ী অবস্থা তৈরি করতে পারি। পুরোপুরি বিছানায় গা এলিয়ে দেবার বদলে চেয়ারে কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে নিতে পারি। আমাদের এই বিছানার বদলে চেয়ারে মানে খানিকটা উঁচু শক্তিস্তরে বসে ঝিমানো, কিংবা নদী একদম নিচে সাগরে না এসে একটু উঁচুতে বাঁধ পর্যন্ত গিয়ে আটকে থাকা—এই ধরনের অবস্থাকে বলা যেতে পারে 'ফল্‌স ভ্যাকুয়াম'।

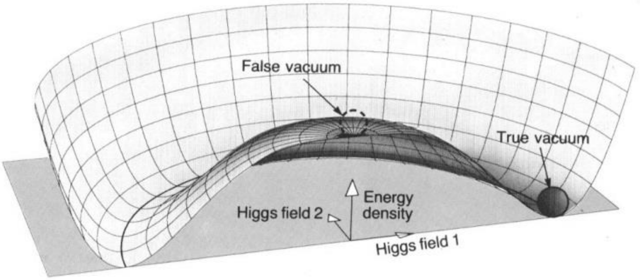

হিগস ক্ষেত্র এবং শক্তি-ঘনত্বের সম্পর্কসূচক ত্রিমাত্রিক গ্রাফ।

এই ফলস ভ্যাকুয়াম আসলে বস্তুর অস্থায়ী দশা। গুথ তাঁর বইয়ে লিখেছেন[45], 'ফলস ভ্যাকুয়াম আসলে অস্থায়ী ভ্যাকুয়াম হিসেবে কাজ করে। কাজেই ফলস মানে এখানে আসলে সাময়িক বা অস্থায়ী'।

নদীতে বাঁধ দিয়ে মানে সাময়িক সময়ের জন্য পানি আটকে দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি একধরনের ফলস ভ্যাকুয়ামের মতো ক্ষেত্র। বাঁধ যত শক্ত পোক্তই হোক

[45] Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback Edition, 1998

না কেন, একে কেউ সাগরের মতো প্রকৃত ভ্যাকুয়াম ভেবে নেবেন না যেন! বাঁধের ওপরে পড়ছে পানির অবিরত চাপ। বাঁধের মুখ খুলে দিলেই কিংবা বাঁধে সামান্য চিড় ধরলেই সেই বাঁধ ছত্রখান হয়ে ভেঙেচুরে পানিকে বয়ে নিয়ে যাবে সাগরের বুকে।

নদীর উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো হলেও এখানে বলা দরকার যে, মহাবিশ্বের ফলস ভ্যাকুয়ামের কাজের সাথে ওপরের নদীর উপমার পার্থক্য আছে। ফলস ভ্যাকুয়ামের মধ্যে তৈরি হয় বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষের, যা আক্ষরিক অর্থেই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। গুথ তাঁর বইয়ে এই মেকি ভ্যাকুয়ামকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–

> এই মেকি ভ্যাকুয়ামের রয়েছে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, যা অন্য সকল পদার্থ থেকে আলাদা। সাধারণ পদার্থের (সেটা কঠিন, তরল, বায়বীয় বা প্লাজমা—যা-ই হোক না কেন), শক্তি-ঘনত্ব নিয়ন্ত্রিত হয় কণাদের ভর দিয়ে, যেটা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী আবার শক্তির সমানুপাতিক ($E = mc^2$)। সাধারণ পদার্থের ক্ষেত্রে আয়তন বাড়লে পদার্থের ঘনত্ব কমে যায়, সেই সাথে কমে শক্তি-ঘনত্ব। কিন্তু মেকি ঘনত্বের ক্ষেত্রে এটা কণার ওপর প্রযুক্ত হয় না, হয় হিগস ক্ষেত্রের ওপর। কাজেই মহাবিশ্ব প্রসারিত হলেও ফল্‌স ভ্যাকুয়ামের শক্তি-ঘনত্ব অপরিবর্তিত থাকে, যদি না আমরা দীর্ঘ সময় ধরে মেকি ভ্যাকুয়ামের অবক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা করি।

এই মেকি ভ্যাকুয়ামের থাকে তীব্র বিকর্ষণমূলক শক্তি। গুথ গণনা করে দেখিয়েছেন, ভ্যাকুয়ামের ক্ষেত্রে বিকর্ষণ শক্তির মান আকর্ষণ শক্তির অন্তত তিন গুণ বেশি পাওয়া যায়[46]। ইনফ্লেশনের গণিতটা খুব সহজভাবে লিখলে দাঁড়াবে অনেকটা এরকমের [47]–

$$\text{INFLATION} \gg \rho + 3P < 0$$

যেহেতু ρ-এর মান সব সময়ই ধনাত্মক, কাজেই সমীকরণের শর্তকে সিদ্ধ করতে হলে P-এর মান ঋণাত্মক হতে হবে, এবং এটা অবশ্যম্ভাবী।

---

[46] Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang; 2006

[47] Andrew R. Liddle and David H. Lyth, Cosmological Inflation and Large-Scale Structure, Cambridge University Press, 2000

আসলে মহাবিশ্বের শুরুতে 'ফলস ভ্যাকুয়াম' বা মেকি শূন্যতা নামের অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা ছিল বলেই কিন্তু ঋণাত্মক চাপ এসে মহাবিশ্বকে এত দ্রুত প্রসারিত করে দিতে পেরেছে। কিন্তু কীভাবে তৈরি হয়েছিল এই মেকি শূন্যতা? এটা বোঝার জন্য আমাদের হিগস ফিল্ডের মতো স্কেলার ক্ষেত্রের দ্বারস্থ হতে হবে।

স্কেলার ক্ষেত্র: হিগস ফিল্ড

কান টানলে যেমন মাথা আসে, ফলস ভ্যাকুয়ামের কথা বলতে গেলে স্কেলার ক্ষেত্রের কথা চলে আসবে আমাদের আলোচনায়। স্কেলার ক্ষেত্র বলতে আমরা বুঝি এমন সাংখ্যিক মান, যা সুষমভাবে আমাদের চারপাশের স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্ষেত্রটিকে 'স্কেলার' বলা হয় কারণ, এর সাংখ্যিক মান আছে, কিন্তু কোনো দিক নেই। এই সাংখ্যিক মান এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে ভিন্ন হতে পারে, কিংবা হতে পারে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত । এ ধরনের স্কেলার ক্ষেত্রের একটি খুব সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে তাপমাত্রা। আমরা পৃথিবীর কিংবা মহাবিশ্বের যেখানেই যাওয়ার কথা কল্পনা করি না কেন, সেটা বান্দরবানের কোনো গাছের মগডালেই হোক, বা বরফাচ্ছাদিত শ্বেতশুভ্র উত্তরে মেরুতেই হোক, কিংবা হোক না সে সূর্যের কেন্দ্রে —তাপমাত্রার কোনো-না-কোনো মান আমরা পাব।

গুথ সে সময় এমনি একটি স্কেলার ফিল্ড নিয়ে কাজ করছিলেন, নাম হিগস ফিল্ড। এই হিগস ক্ষেত্রটি আবার নিজেকে প্রকাশ করে থাকে এক রহস্যময় কণার মাধ্যমে। কণাটির নাম মিডিয়ার সাম্প্রতিক তোলপাড়ের কারণে সবার জানা হয়ে গেছে। এই সেই হিগস বোসন মিডিয়াতে সমাদৃত হয়েছে 'ঈশ্বর কণা' নামে[48]। আশির দশকে গুথ যখন কাজ করছিলেন, তখন সেটা 'হাইপোথিটিকাল' বা উপপ্রমেয়মূলক একটি ধারণা হিসেবেই কেবল বজায় ছিল। কিন্তু গুথের দৃঢ় ধারণা

---

48 হিগস সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ছিল যে, হিগস কণা পাওয়া যাবে। ১৯৯৭ সালে লেখা 'ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স' বইয়ের ১৩৬ পৃষ্ঠায় গুথ বলেছিলেন–

> যদিও হিগস কণা এখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু তত্ত্বের প্রতি বিজ্ঞানীদের আস্থা রয়েছে পুরোমাত্রায়। আমরা জানি W এবং Z কণাগুলোকে ১৯৮৩ সালের আগ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, 'তাড়িত দুর্বল' তত্ত্ব আসার পর ১৬ বছর লেগেছে এর পেছনের কণার বাস্তব অস্তিত্ব খুঁজে পেতে। কণাগুলোর ভর এবং মিথস্ক্রিয়া আগেকার দেওয়া তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। তাই আশা করা অমূলক নয় যে, যখন একবিংশ শতকে সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার বানানো শেষ হবে, প্রমিত মডেলের আরাধ্য হিগস কণাও খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমরা আজ জানি, ১৯৯৭ সালে বলা গুথের প্রতিটি বাক্য সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। ২০১২ সালের ৪ জুলাই তারিখে সার্নের বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে হিগস কণার অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছেন[49]। অনেকেই মনে করেন, হিগস ক্ষেত্রের এহেন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ গুথের স্ফীতি তত্ত্ব তথা প্রমিত বিগ ব্যাং মডেলেরও একটা জোরালো স্বীকৃতি (যদিও এ নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি)[50]। এ নিয়ে আরেকটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (দ্বাদশ অধ্যায় দ্র.) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। এখানে কেবল স্ফীতির সাথে হিগসের সম্পর্ক নিয়ে প্রাসঙ্গিক দু-চার কথা জানার চেষ্টা করব।

---

[49] ২০১২ সালের জুলাই মাসের চার তারিখে যখন হিগস প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়, তার ক'দিন পরই আমি (অ.রা) মুক্তমনায় একটা লেখা লিখেছিলাম 'সার্ন থেকে হিগ্‌স বোসন – প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে!' শিরোনামে। সেখানে হিগস কণার বৈশিষ্ট, এবং এর আবিষ্কারের, প্রক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেই সাথে যোগ করেছিলাম আমার সার্ন ভ্রমণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও। লেখাটি সে সময় বাংলা ব্লগে বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল।

[50] ইনফ্লেশনের জন্য দায়ী ফিল্ডটি হিগস কি না এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো একমত নন। সার্বিকভাবে একে 'ইনফ্লেটন' বলে অভিহিত করা হয়।

হিগসের পেছনের ইতিহাসটা বেশ পুরনো। হিগস ক্ষেত্রের ধারণাটা প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীদের মাথায় এসেছিল ষাটের দশকে কণা পদার্থবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে। প্রকৃতির মৌলিক বলগুলোর (দুর্বল নিউক্লীয়, সবল নিউক্লীয়, তাড়িত-চৌম্বক ও মহাকর্ষ) একত্রীকরণে হিগসের বড় সড় একটা ভূমিকা আছে। প্রকৃতির এই বলগুলোকে, বিশেষত মহাকর্ষ ও তাড়িত চৌম্বক বল দুটোকে একীভূত করার লক্ষ্যে আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলোতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ করতে গিয়ে সে সময় পদার্থবিজ্ঞানের মূলধারার গবেষণা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। খুবই উচ্চাভিলাষী ছিল তাঁর স্বপ্ন। বহুবার আইনস্টাইন ভেবেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের জাদুর কাঠি বুঝি হাতে পেয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন-সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। তবে, আইনস্টাইনের মৃত্যুর (১৯৫৫) দুই দশকের মধ্যে পদার্থবিদেরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেন।

ষাটের দশকের শেষ দিকে তত্ত্বীয় পদার্থবিদেরা সফলভাবে ‘তাড়িত-চৌম্বক’ বল এবং ‘দুর্বল নিউক্লীয়’ বলকে একই সুতায় গাঁথতে সমর্থ হলেন। একে এখন অভিহিত করা হয় ‘তাড়িত দুর্বল’ বল নামে। সত্তরের দশকে এসে তাড়িত দুর্বল তত্ত্বের পরীক্ষালব্ধ সত্যতা নির্ণীত হয়। শুরুটা হয়েছিল শেল্ডন গ্ল্যাসোর হাতেই। ১৯৬৭ সালের দিকে গ্ল্যাসো ‘গেজ গুচ্ছ’ নামের একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে দুর্বল ও তাড়িত-চৌম্বক মিথস্ক্রিয়ার একত্রীকরণের একটা প্রয়াস নিয়েছিলেন। কিন্তু এ পদ্ধতিতে সমস্যা ছিল যে, গ্ল্যাসোর সমীকরণ থেকে পাওয়া ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ভরসূচক পদটি প্রতিসাম্যতাকে সংরক্ষণ করত না।

এর সাত বছর পর এই বোসনের ভরসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হাজির করলেন আব্দুস সালাম ও স্টিভেন ওয়েনবার্গ; এবং যে প্রক্রিয়ায় তারা এর সমাধান বের করেছিলেন তাকে বলা হয় ‘হিগস প্রক্রিয়া’। প্রক্রিয়ার নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তাদের সমাধানে ‘হিগস অনুকল্পের’ একটা বড় ভূমিকা ছিল। আসলে ঠিক কীভাবে W বোসন, Z বোসনের (এরা দুর্বল নিউক্লীয় বলের পরিবাহী কণা, ঠিক যেমন আমরা

জানি যে ফোটন হচ্ছে আলোর পরিবাহী কণা) মতো গেজ বোসনগুলো ভরপ্রাপ্ত হয়, আর ফোটনের মতো কণিকারা থেকে যায় ভরশূন্য—এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে স্কটল্যান্ড নিবাসী বিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে এক নতুন 'বল ক্ষেত্র' (Force Field)-এর কল্পনা করেছিলেন, যেটাকেই আমরা আজ 'হিগস ক্ষেত্র' বলে ডাকি। সালাম আর ওয়েনবার্গেরা দেখালেন, যখনই হিগস বলক্ষেত্র নিজেকে প্রকাশ করে, সেই মুহূর্তেই তাড়িত-চৌম্বক আর দুর্বল নিউক্লীয় বল পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি 'প্রতিসাম্যের ভাঙন'। যখন থেকে হিগস প্রক্রিয়া গ্ল্যাসো-সালাম-ওয়েনবার্গ মডেলের সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত হলো, তখন থেকেই তাড়িত দুর্বল তত্ত্ব চমৎকারভাবে কাজ করতে শুরু করল। আর এ তত্ত্বটির পুনর্নমায়ন (renormalization) সংক্রান্ত প্রমাণ দিয়ে তত্ত্বটিকে আরো পাকাপোক্ত করে তুললেন বিজ্ঞানী 'টি হুফট ১৯৭১ সালে। 'টি হুফটের প্রমাণে উদ্বেলিত হয়ে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডনি কোলম্যান মন্তব্য করেছিলেন, 'টি হুফটের কাজ ওয়াইনবার্গ-সালামের রূপকথার ব্যাঙ-কে যেন জাদুমন্ত্রে সুদর্শন রাজকুমারে পরিণত করল'[51]। এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আবদুস সালাম, স্টিফেন ওয়েইনবার্গ এবং শেলডন গ্ল্যাসো ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

হিগসসংক্রান্ত পেছনের এ ইতিহাসগুলো গুথের জানা ছিলই। তিনি আরো জানতেন যে, হিগস নামের এই স্কেলার ক্ষেত্রটা W এবং Z কণার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায়, আর তাদের গায়ে-গতরে তাদের ভারী করে তোলে। কিন্তু ফোটন কণা এই স্কেলার ক্ষেত্রের সাথে কোন ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় না, তাই তারা চলতে পারে আলোর বেগে হু হু করে। এই হিগস ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আরো কিছু নতুন ব্যাপার জানলেন গুথ। তিনি দেখলেন, এর বৈশিষ্ট্য অন্য সব চেনাজানা স্কেলার ক্ষেত্রের চেয়ে আলাদা। অন্য সবার জন্য, বল ক্ষেত্রের মান শূন্য থাকলেই শক্তি-ঘনত্ব সবচেয়ে কম পাওয়া যায়। কিন্তু হিগসের ক্ষেত্রে শক্তি-ঘনত্ব আমরা সবচেয়ে কম

[51] Sidney Coleman, The 1979 Nobel Prize In Physics, Science, December 1979: 1290-1292.

পাই—যখন হিগসের একটি ‘নন জিরো ভ্যালু’ বা অশূন্য মান থাকে। এর মানে হচ্ছে শূন্য স্থানে, যেটাকে আমরা প্রচলিতভাবে ভ্যাকুয়াম বলে অভিহিত করি, সেখানেও হিগসের একটা মান সব সময়ই পাওয়া যাবে। আমাদের মহাবিশ্বের মেকি শূন্যতার পথ পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকৃত শূন্যতায় এসে পৌঁছানোর ব্যাপারটা যদি সঠিক হয়, তবে সেই প্রকৃত শূন্যতার অবস্থানে হিগসের একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে, যেখানে মহাবিশ্বের শক্তি-ঘনত্ব হবে সর্বনিম্ন। নিচের ছবিটার দিকে তাকানো যাক। এ ছবিটা ওপরে ফলস এবং ট্রু ভ্যাকুয়াম-সংক্রান্ত ত্রিমাত্রিক ছবিটির দ্বিমাত্রিকরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

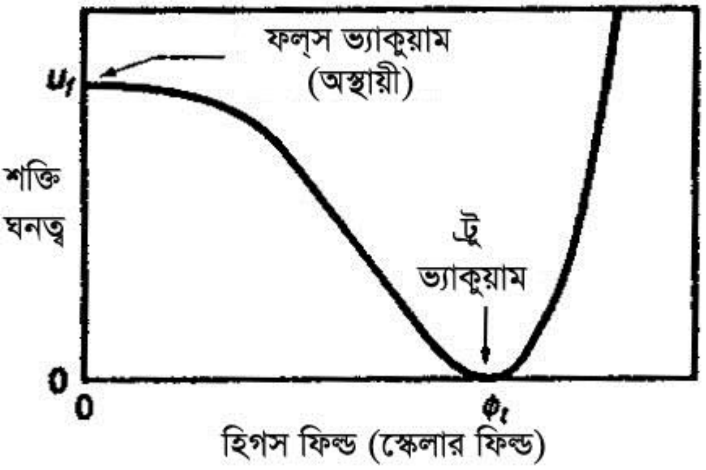

হিগস ক্ষেত্র এবং শক্তি ঘনত্বের সম্পর্কসূচক দ্বিমাত্রিক গ্রাফ। মহাবিশ্ব ‘ফলস ভ্যাকুয়াম’ থেকে যাত্রা শুরু করে মালভূমির গা বেয়ে নেমে ‘ট্রু ভ্যাকুয়ামে’ এসে স্থিত হয়।

ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে,শক্তি-ঘনত্ব u-এর মান ধীরে ধীরে কমতে কমতে একটা জায়গায় এসে শূন্য হলেও সেখানে স্কেলার ক্ষেত্র Φ-এর মান শূন্য নয় বরং $\Phi = \Phi_t$। এটাই প্রকৃত ভ্যাকুয়াম। আমাদের মহাবিশ্ব আজ এই জায়গাতেই আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কিন্তু অতীতে যখন স্কেলার ক্ষেত্রের মান শূন্য ছিল ($\Phi = 0$) তখন তার ঘনত্বের মান ছিল u_f। এই সসীম ঘনত্বের দশাকেই বলা হয়

মেকি ভ্যাকুয়াম। ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে, হিগস ক্ষেত্রের মান যত বাড়তে থাকে শক্তি-ঘনত্ব একটি মালভূমির ঢাল বেয়ে ততই নিচে নামতে থাকে। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে সাথে স্কেলার ক্ষেত্র তার ঘনত্ব কমাতে চায়। কিন্তু মালভূমিটি যদি যথেষ্ট সমতল হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে সেই ঘনত্ব কমাতে (অর্থাৎ, মালভূমির চূড়া থেকে পর্বতের ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে আসতে) যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। এই স্বল্প সময়ের জন্য মেকি ভ্যাকুয়াম একধরনের আপাতশূন্যতা হিসেবে কাজ করে,অর্থাৎ তার ঘনত্ব সেভাবে কমানো যায় না। আর এই ব্যাপারটাই যেন হাজির হয়েছিল সব রহস্যের সমাধান হিসেবে। গুথ তাঁর সে সময়কার সহকর্মী হেনরি তাই এর সাথে মিলে হিগস ফিল্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে গুথ ভাবলেন, হিগস ফিল্ডের মানের সাথে হয়তো মহাবিশ্বের প্রসারণের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। ব্যাপারটা একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে।

নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে যা পেলেন তা এককথায় অভিনব। হিগস ক্ষেত্র একধরনের অতিশীতীভূত (supercool) অবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে তার দশার পরিবর্তন ঘটায়, ফলে সে সময়টায় প্রতিসাম্যের ভাঙন সাময়িক সময়ের জন্য হলেও যেন চেপেচুপে রাখা যায়। ‘অতিশীতীভূত অবস্থা’, ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’ এই কঠিন কঠিন শব্দ শুনে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটাকে সহজ উপমা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। একে অনেকটা পানির দশা পরিবর্তনের সাথে তুলনা করা যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি তরল অবস্থায় থাকে। যেদিক থেকেই তাকাই না কেন, পানিকে একই রকম লাগে আমাদের। বিজ্ঞানের ভাষায় বললে বলা যায়, তরল অবস্থায় পানি সবদিক থেকেই থাকে প্রতিসম। পানিকে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঠান্ডা করলে তা বরফে পরিণত হয়, এ আমরা জানি, আর হরহামেশাই দেখি। কিন্তু যেটা অনেকেই জানি না তা হলো, বরফে পরিণত হওয়া মানেই কিন্তু এর প্রতিসাম্যতা ভেঙে পড়া। যেকোন বরফের চাই নিয়ে পরীক্ষা করলেই দেখা যায়, এর বিভিন্ন অক্ষ

বরাবর অণুর সাজসজ্জা ভিন্ন হয়। তাই বলা যায়—তরল অবস্থায় পানির যে প্রতিসমতা বজায় ছিল তা ভেঙে পড়ে পানি বরফে পরিণত হয়ে গেলেই। তবে, একটু সতর্ক হলে আমরা কিন্তু পানির এই সহজাতভাবে বরফে পরিণত হওয়া ঠেকাতে পারি। এ জন্য অবশ্য দরকার অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি জোগাড় করে একে অতিদ্রুত বরফ গলনের তাপমাত্রার নীচে নিয়ে যাওয়া। এভাবে খুব তাড়াতাড়ি পানিকে ঠান্ডা করলে অনেক সময় দেখা যায়, পানি শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচেও বরফে পরিণত না হয়ে আগের মতোই তরল অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। তরলের এই দশাকে 'অধিতরল' অবস্থা বলতে পারি আমরা। গুথ ভাবলেন, মহাবিশ্বও নিশ্চয় এভাবেই কাজ করেছিল শুরুতে। তাপমাত্রা ক্রান্তিমানের চেয়ে নিচে নেমে গেলেও প্রতিসাম্যতা বজায় ছিল, আর মহাবিশ্ব ছিল সাময়িক সময়ের জন্য অস্থায়ী দশায় মানে মেকি শূন্যতায় বন্দী হয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারটা ঘটার জন্য সুপ্ততাপের মাধ্যমে অতিরিক্ত শক্তির যে জোগানটা এসেছিল, সেটাই দিয়েছিল বিকর্ষণমূলক ধাক্কা, অনেকটা আইনস্টাইনের সেই মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতোই। মহাজাগতিক ধ্রুবকের মতো আচরণ বললেও, আসলে মাত্রাগতভাবে এর সাথে আইনস্টাইনের ধ্রুবকের পার্থক্য অনেক। গুথ ও হেনরির গণনা থেকে যেটা বেরোল সেটার মান আইনস্টাইন যা অনুমান করেছিলেন তার চেয়ে ১০০
০০ গুণ (অর্থাৎ $১০^{১০০}$ গুণ) বেশি। এই তীব্র বিকর্ষণ শক্তি তৈরি হয়েছিল বলেই মহাবিশ্ব এইভাবে এতটা দ্রুত বিবর্ধিত হতে পেরেছিল। 'এতটা দ্রুত' বলছি বটে, কিন্তু ঠিক কতটা দ্রুত? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই মহাবিশ্বের আকার বেড়ে গিয়েছিল মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ (১ এর পরে ৩০টা শূন্য)। আর এই দানবীয় স্ফীতিটাই সমাধান করে দিয়েছিল নিচের সমস্যাগুলোর, যেগুলো স্ফীতিতত্ত্ব আসার আগে কোনোভাবেই সমাধান করা যাচ্ছিল না।

মহাবিশ্বের আকার

প্রথম সমাধানটা মহাবিশ্বের আকার সংক্রান্ত। আমাদের মহাবিশ্ব যে বড় তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু ঠিক কতটা বড়? আমাদের জানাশোনা বস্তুকণার মধ্যে আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি। সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। কিন্তু মহাবিশ্বের পুরোটুকু দেখতে চাইলে এই দানবীয় গতিবেগও নেহাত তুচ্ছ মনে হবে। আমাদের ছায়াপথ থেকে সবচেয়ে কাছের যে গ্যালাক্সি—অ্যান্ড্রোমিডা—সে রয়েছে ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে। সবচেয়ে দূরবর্তী যে গ্যালাক্সিগুলো টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় সেগুলোর আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ১৩ বিলিয়ন অর্থাৎ ১৩০০ কোটি বছর আগে। স্ফীতি-টিতি নিয়ে যদি আমরা মাথা না ঘামাতাম, তবে ঐ ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষের দূরত্বকেই আমরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তসীমা বলে ভাবতাম। আফটার অল বিগ ব্যাং তো হয়েছিল প্রায় ১৩০০ কোটি বছরের কাছাকাছি সময়েই। তাই ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষের চেয়ে বেশি দূরের জিনিস দেখা যাবেই বা কিভাবে?

কিন্তু মজাটা হলো, দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রান্তসীমা ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ নয়, বরং অন্তত ৪৬০০ কোটি আলোকবর্ষ[52]। মানে, ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষের ঢের বেশি দূরের জিনিস বিজ্ঞানীরা ‘দেখতে’ পান। কিভাবে এটা হলো? এটা হলো, কারণ স্ফীতি তত্ত্বের কল্যাণে বিজ্ঞানীরা জানেন ১৩০০ কোটি বছর আগে যে গ্যালাক্সিগুলো থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো আমাদের কাছ থেকে আলোর গতির দ্বিগুণ গতিতে দূরে চলে গেছে। ফলে মধ্যবর্তী স্থানের ঘটেছে বিস্তর প্রসারণ । আর দৃশ্যমান মহাবিশ্বের দেয়ালটা সরে গিয়ে ৪৬০০ কোটি আলোকবর্ষের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দুই পাশ হিসাব করলে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের ব্যাস হবে ৯২০০ কোটি আলোকবর্ষ।

---

[52] Chris Impey (University of Arizona, Tucson), How Big is the Universe, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

এ তো গেল ‘দৃশ্যমান’ মহাবিশ্বের কথা। প্রকৃত মহাবিশ্ব যে কত বড় কেউ তা জানে না। আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের দেয়ালও তার কাছে ক্ষুদ্র। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা বলছে মহাবিশ্বের ব্যাস অন্তত ১৫ হাজার কোটি আলোকবর্ষের কম হবে না।

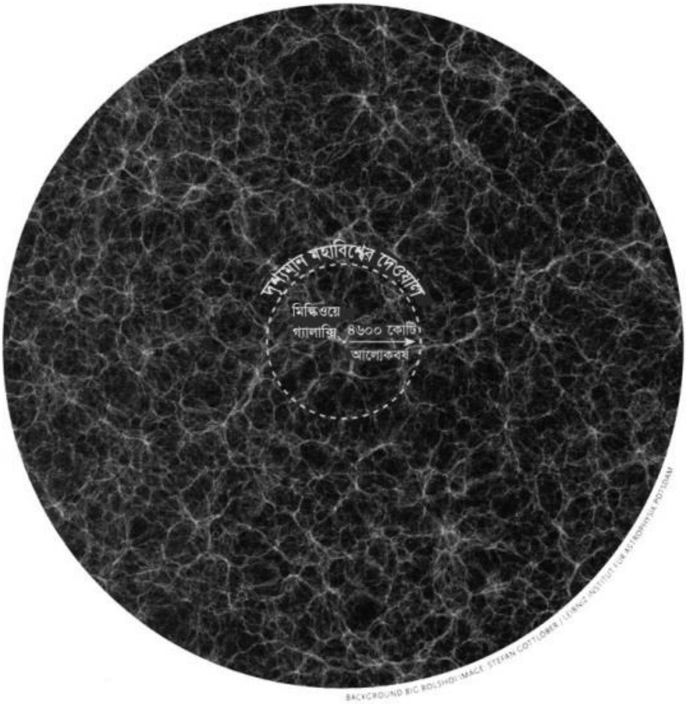

আমাদের মহাবিশ্ব এত বড় হলো কিভাবে বিগ ব্যাং মডেলের জন্য সব সময়ই একটা সমস্যা। দৃশ্যমান মহাবিশ্ব প্রকৃত মহাবিশ্বের তুলনায় অনেক ছোট, আর আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি তো তার তুলনায় বিন্দুসম। কিভাবে তাহলে তৈরি হলো এত বিশাল আকারের মহাবিশ্ব?

এত কম সময়ের মধ্যে কীভাবে তৈরি হয়েছে এই বিপুলাকৃতি মহাবিশ্ব? বিগ ব্যাং তত্ত্ব এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু স্ফীতি তত্ত্বের জন্য এর উত্তর দেওয়া কোনো সমস্যা নয়। কারণ স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী শুরুতে মহাবিশ্বের প্রসারণ

ঘটেছিল সূচকীয় হারে। কোনো কিছু সূচকীয় হারে বাড়লে সেটা কী রকম ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায় তার নমুনা পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীন এক উপাখ্যানে। গল্পটা রসিকরাজ গ্যামো তাঁর ‘ওয়ান, টু, থ্রি ... ইনফিনিটি’ বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন[53]। গুথের ‘ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স’ বইয়েও এর উল্লেখ আছে। ঘটনাটা এরকমের:

এক জ্ঞানী দরবেশ দাবা খেলা আবিষ্কার করলে, সে রাজ্যের সুলতান তাঁর ওপর খুব খুশি হন। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সুলতান দরবেশকে পুরস্কার দিতে চাইলে দরবেশ সুলতানকে এক অভিনব প্রস্তাব দিয়ে বসেন । বললেন,

—মহারাজ, আমি যৎসামান্য ভিক্ষে চাই। প্রথম দিন দাবার প্রথম ছকে কেবল একটি গমের দানা।

—কী? মাত্র একটা গমের দানা? তুমি কি আমার জৌলুশের প্রতি অবজ্ঞা করছ?

দরবেশ উত্তরে বললেন,

— না হুজুর, ঠিক একটা গমের দানা নয়। প্রথম দিন একটা গমের দানা। এর পর দিন এর পরের ছকে থাকবে এর দ্বিগুণ দানা—অর্থাৎ দুটি। তৃতীয় দিন তৃতীয় ছকে থাকবে এর দ্বিগুণ—অর্থাৎ চারটি, এর পরদিন আটটি... এভাবে আমাকে প্রতিদিন ভিক্ষে দিতে হবে যত দিন না দাবার ছক পূর্ণ হয়।

সুলতানের ঠোঁটে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। বললেন,

—তোমাকে অনেক জ্ঞানী আর চালাক ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার প্রস্তাব দেখে বুঝলাম তুমি তা নও। দাবার ৬৪টা ঘর পূর্ণ হতে মাত্র ৬৪ দিন লাগবে। একটা গমের দানা দিয়ে যাত্রা শুরু করে ৬৪ দিনে আর কয়টা গমের দানা তুমি কব্জা করবে? এখনো সময় আছে, অন্য কিছু যদি চাও তো চাইতে পারো।

— না হুজুর, এই সামান্য ভিক্ষেই আমার সই।

‘তথাস্তু’ বলে সুলতান দরবেশের প্রার্থনা মঞ্জুর করে দিলেন।

---

[53] George Gamow, One Two Three . . . Infinity: Facts and Speculations of Science, Dover Publications, 1988

গমের দানা সূচকীয় হারে বাড়লে কোথায় যাবে – সেই গণিতটা সুলতান আসলে বুঝতে পারেননি। প্রথম কয়েক দিনে অবশ্য সুলতানের আসলেই কোনো চিন্তা ছিল না। কারণ প্রথম দিন একটি দানা, দ্বিতীয় দিন দুটি দানা, তৃতীয় দিনে চারটি দানা করে দরবেশ এগোচ্ছিলেন। সুলতান দরবেশের বোকামির জন্য আড়ালে-আবডালে তামাশাও করছিলেন সভাসদদের সাথে মিলে।

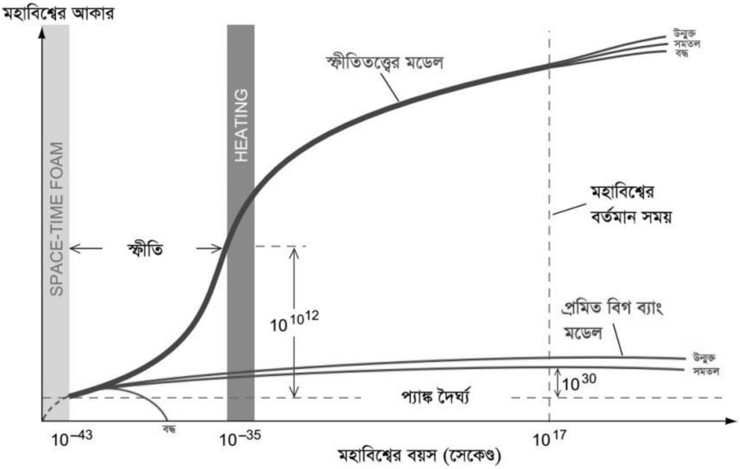

আমাদের মহাবিশ্ব এত বড় হলো কিভাবে
তা স্থিতি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে।

ষষ্ঠ দিনে দরবেশ ৩২টি দানা পেলেন। অষ্টম দিনে ১২৮টি গমের দানা পেলেন। কিন্তু এর পর যত দিন যেতে লাগল সম্রাটের কপালে রীতিমতো ভাঁজ পড়তে শুরু করল। ষোলোতম দিনে ৩২,৭৬৮টি দানার হিসাবে দেখা গেল দরবেশ বাবাজি সবমিলিয়ে ৬৫ হাজারের বেশি দানা কবজা করে ফেলেছেন। ২০ দিনে তা বেড়ে দাঁড়াল ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার দানার ওপরে। সম্রাটের চোয়াল তখন রীতিমতো ঝুলে পড়েছে। তিনি খানিকটা হলেও বুঝতে শুরু করেছেন, দরবেশের পাওনা মেটানো

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ দাবার সর্বশেষ ছক মানে ৬৪ নম্বর ঘরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তাকে ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন গমের জোগান দিতে হবে, যেটা ভারত বর্ষ তো কোন ছাড় — হাজার বছর ধরে সারা পৃথিবীর সকল গমের দানা জোগাড় করলেও পোষাবে না। ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন গমের হিসাবটা যেন কেউ কোনো আকাশকুসুম কল্পনা ভেবে না বসেন, চৌষট্টিতম দিনে এসে সত্য সত্যই দরবেশের হস্তগত হবে ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫ টা দানা[54], যা দিয়ে আসলে সারা পৃথিবীকে কয়েক ইঞ্চি পুরু গমে ঢেকে ফেলা যাবে। এত গমের জোগান দেবার সাধ্য আর সুলতানের ছিল কোথায়?

মহাবিশ্বের স্ফীতিও কাজ করেছিল অনেকটা দরবেশের দাবার ছকে দেওয়া গমের মতোই। তবে পার্থক্য ছিল যে, স্ফীতির ঘরের সংখ্যা দাবার বোর্ডের ৬৪টি ঘরে সীমাবদ্ধ না থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল একশ কিংবা তার চেয়েও বেশিসংখ্যক ঘরে। ফলে মাত্র $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ডের মধ্যেই মহাবিশ্বের আকার বেড়ে প্রাথমিক আকারের $১০^{৩০}$ গুণ হয়ে গিয়েছিল।

যার ফল আমরা পেয়েছি আজকের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের (অর্থাৎ, $১০^{২৮}$ সেন্টিমিটারের) মতো এত বড় একটা মহাবিশ্ব[55]।

---

54 পুরো গণনা পাওয়া যাবে এই সাইটে - http://britton.disted.camosun.bc.ca/ jbchessgrain.htm

55 অবশ্য পদার্থবিদ ও বিজ্ঞান লেখক ড. দীপেন ভট্টাচার্য আমাদের উল্লিখিত এ ধারণাটির সাথে একমত নন। তাঁর মতে (ব্যক্তিগত ম্যাসেজে আলোচনাক্রমে সঠিকভাবেই বলেছেন), এখানে "মধ্যবর্তী স্থানের প্রাসারনটাই" সঠিক উত্তর। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রতিটি স্থানের প্রসারণ ঘটছে, শুধু গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে না, সেই জন্যই ১৩০০ কোটির জায়গায় ৪৬০০ কোটি পাচ্ছি। একটা সহজ ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম এই হিসাবটা করতে পারে, ইনফ্লেশনের প্রস্তাবনা ছাড়াই। তবে এই বিপুল আকারের সাথে স্ফীতির সম্পর্কের ব্যাপারটা লিন্ডের প্রস্তাবিত ইনফ্লেশনের মডেলে রয়েছে (এ প্রসঙ্গে দেখুন, A. D. LindeParticle Physics and Inflationary Cosmology (Contemporary Concepts in Physics), CRC Press;1990)

দিগন্ত সমস্যা

কোনো এক রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যায় এদিকে-ওদিকে ছোটখাটো কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটাদাগে আমাদের আকাশের দৃশ্যপটটা মোটামুটি সুষম। তেমনিভাবে কেবল আকাশ নয় আমাদের চারদিকে তাকালেও দেখা যায়, চারপাশের প্রকৃতি বিন্যস্ত হয়েছে সুষমভাবে। সেটা ভাল করে বোঝা যায় খোলা মাঠে গিয়ে দাঁড়ালে কিংবা এমনকি সুন্দরবনের মতো গহিন বনে গিয়ে হাঁটলেও। সুন্দরবনে জঙ্গলের একটু ভেতরে প্রবেশ করলেই আপনি দেখতে পাবেন, বনের গাছগুলো আপনাকে ঘিরে তৈরি করেছে এক সুষম জগৎ। আপনি আরেকটু এগিয়ে সামনে যান, কিংবা দুই কদম পিছিয়ে দাঁড়ান, একই ছবি পাবেন। আপনার অবস্থান পরিবর্তনের সাথে ডান, বাম, সামনে কিংবা পেছনের গাছগুলো হয়তো বদলাবে, কিন্তু মোটাদাগে সুষম জঙ্গলের ছবিটা প্রায় একই রকমের। অর্থাৎ গড় হিসাবে (স্থানিক বিচ্যুতি বাদ দিলে) পুরো জগৎটাই মোটের ওপর সমসত্ত্ব আর দিকনিরপেক্ষ[56]। একই কথা বিজ্ঞানীরা বলেন মহাজাগতিক বিকিরণের তাপমাত্রা মেপেও। বিকিরণের তাপমাত্রা গড়পড়তা একইরকম পাওয়া যাবে। এবং সেটা যায়ও।

কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমরা জানি, মহাবিশ্বে আলোর গতিই সর্বোচ্চ। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে আলোর গতিকে টেক্কা দিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মহাবিশ্বের যা বয়স তাতে করে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আলো, তাপমাত্রা কিংবা তথ্য এত সহজে পৌঁছে যেতে পারে না। বিগ ব্যাং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বে সেটা ঘটা তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব নয় কোনোভাবেই।

[56] এ এম হারুন-অর-রশীদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, অপূর্ব এই মহাবিশ্ব, প্রথমা, ২০১১। অথবা, সৈয়দা লাম্‌মীম আহাদ ও ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, সবার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা, তাম্রলিপি, ২০১২

পরিস্থিতিটা আরো জটিল হয়ে যায় যখন আমরা বিগ ব্যাং-এর ৩৮০,০০০ বছর পরের আকাশের কোনো ছবি দেখি। এই সময়ের ছবিটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এই সময় মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের মায়াবী প্রতিচ্ছবিটা প্রথমবারের মতো এক ধরনের অবয়ব নিতে করেছিল। খুব ক্ষুদ্র স্কেলে ফ্লাকচুয়েশন থাকলেও মোটাদাগে এই বিকিরণের প্রতিচ্ছবির প্রকৃতি সুষম বলেই বিজ্ঞানীরা জানেন। বিগ ব্যাং-এর ৩৮০,০০০ বছর পরে মহাবিশ্বের ব্যাস এখন থেকে অনেক কম ছিল, হয়তো ৮ কোটি আলোকবর্ষ থেকে একটু বেশি। এর মানে হচ্ছে,এই মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণকে অন্তত ৮ কোটি আলোকবর্ষ পাড়ি দিতে হবে আজকের দিনের এই সমস্বত্ব অবস্থায় পৌঁছুতে। কিন্তু এটা এক কথায় অসম্ভব ব্যাপার, এমনকি আলোর বেগে তথ্য গেলেও ৩৮০,০০০ বছরের মধ্যে দুই পাশের সবকিছু এভাবে সমান করে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা হলো কী করে? আলোর বেগে তথ্য গেলেও যে দূরত্ব অতিক্রম করা যাচ্ছে না, সেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পেরিয়ে কিভাবে দুই প্রান্তকে একই জায়গায় নিয়ে আসা গেল? এটা বহুদিন ধরেই বিগ ব্যাং মডেলের জন্য একটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ রবার্ট ডিকি (হ্যাঁ, যার নাম আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি, তাঁর বিখ্যাত 'বয়েস, উই হ্যাভ বিন স্কুপড' উক্তির মাধ্যমে) এর নাম দিয়েছিলেন 'দিগন্ত সমস্যা'।

সমস্যার কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু সমাধানটা কী? কিভাবে অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণের এবড়োখেবড়ো জমিকে এত তাড়াতাড়ি পিটিয়ে সমান করে দেওয়া গেল? কে চালাল অমানুষিক বেগে এই 'থরের হাতুড়ি'? হ্যাঁ, উত্তর হচ্ছে আমাদের 'ইনফ্লেশন'। গুথ চিন্তা করলেন, স্ফীতি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই স্থানের প্রসারণ হয়েছিল $১০^{৩০}$ গুণ, ফলে নিমেষের মধ্যেই মহাবিশ্বের দুই প্রান্ত তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়ে যেতে পেরেছিল, ঠিক যেমনিভাবে চুলায় রান্নাবান্না করার পর আমাদের রান্নাঘর আর বসার ঘরের তাপমাত্রাকে সামান্য

সময়ের মধ্যেই আমরা সমান হয়ে হয়ে যেতে দেখি। কিংবা কাপের গরম চা বাইরে রেখে দিলে সামান্য সময় পরই দেখি ঘরের তাপমাত্রায় নেমে আসতে।

মনোপোল সমস্যা

বিগ ব্যাং তত্ত্বের একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আমাদের মহাবিশ্বে বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় আধানযুক্ত অতি ভারী একক মেরুবিশিষ্ট কিছু কণিকার প্রাচুর্য থাকবে[57]। এই একক কণাগুলোকে বলা হয় মনোপোল। সহজ কথায় মনোপোল হচ্ছে সেরকম চুম্বক, যার কেবল উত্তর মেরু আছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু নেই; কিংবা হয়তো দক্ষিণ মেরু আছে, উত্তর মেরু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধরনের কোনো কণার অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না।

একটা চুম্বক হাতে নিয়ে একে মাঝামাঝি জায়গায় দ্বিখণ্ডিত করুন। যে ছোট টুকরো দুটো পাওয়া যাবে, তাতে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু থাকবে। সেগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করলেও উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুবিশিষ্ট খণ্ড পাওয়া যাবে। যত ছোট টুকরাই আমরা করি না কেন, দেখব সব সময়ই উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুকে যুগল আকারেই পাওয়া যাচ্ছে। একক কোনো উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু আমরা পাই না।

অথচ, 'গ্র্যান্ড ইউনিফাইড' তত্ত্বের জোরালো পূর্বাভাস ছিল যে এ ধরনের কণা থাকতেই হবে। তাহলে কেন আমরা সেগুলো দেখতে পাই না? এই ব্যাপারটারও সমাধান হিসেবে হাজির হলো স্ফীতি তত্ত্ব। গুথের গণনা থেকে জানা গেল, মেকি ভ্যাকুয়ামের দশায় মহাবিশ্ব এত বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে যে, মনোপোলগুলোর ঘনত্ব লঘু থেকে লঘুতর হয়ে গেছে, আর মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে তা চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিংবা একেবারেই নগণ্য স্তরে। বিজ্ঞানী শন ক্যারল তাঁর 'ফ্রম ইটারনিটি টু হেয়ার' গ্রন্থে একে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে[58] –

---

[57] In one paper published in 1979, J. P. Preskill calculated that magnetic monopoles would be produced so copiously that they would outweigh everything else in the universe by a factor of about 10^{12}. (Ref. Preskill, J. P. 1979, Phys. Rev. Lett., 43, 1365)

[58] Sean Carroll, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, Dutton Adult, 2010

মনোপোল সমস্যার কথাই ধরুন। আদি মহাবিশ্বে এই মনোপোল প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়েছিল। এখন চিন্তা করুন, মনোপোল তৈরির আগেই ইনফ্লেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এর ফলে ইনফ্লেশন যতক্ষণ টিকে থাকবে, আনুষঙ্গিক স্থান প্রসারিত হবে এত দ্রুতগতিতে যে, মনোপোলগুলো লঘুকৃত হতে হতে শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ডার্ক সুপার এনার্জি (ইনফ্লেটন) অবক্ষয়িত হয়ে পদার্থে পরিণত হবে, এবং তেজস্ক্রিয়তা আর কোনো মনোপোল তৈরি করবে না—আর তারপর—হিং টিং ছট - মনোপোল সমস্যা উধাও হয়ে যাবে।

সামতলিক সমস্যা

স্ফীতি তত্ত্ব সবচেয়ে আকর্ষণীয়ভাবে যে সমস্যাটির সমাধান করেছিল সেটা হলো সামতলিক সমস্যা। অন্যগুলো যদি বাদও দিই, এই একটি সমস্যা সার্থকভাবে সমাধানের কারণেই স্ফীতি তত্ত্বকে এত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে শুরু করলেন মূলধারার জ্যোতিঃপদার্থবিদরা।

মজাটা হল, সামতলিক সমস্যা বলে যে কিছু একটা আসলে ছিল সেটাই গুথ প্রথমে জানতেন না। তখন তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কণা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পোস্ট-ডক্টরাল রিসার্চ করছিলেন। সেটা সেই ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আইনস্টাইন দিবস' উপলক্ষে একটা আলোচনা সভায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ রবার্ট ডিকির বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। সে সময় গুথ জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানকে দেখতেন একধরনের অস্পষ্ট ঘোলাটে বিষয় হিসেবে, যার কোনো সঠিক গন্তব্য নেই, নেই কোনো দিকনির্দেশনা। এর চেয়ে কণা-পদার্থবিজ্ঞানের সাজানোগোছানো কাঠামোটাই ছিল তার কাছে ঢের উপাদেয়! গুথ তাঁর বইয়ে বলেছেন, 'যদি সপ্তাহটাতে আরেকটু বেশি ঝামেলা থাকত, তাহলে হয়তো ডিকির লেকচার শুনতে যাওয়া হতো না'।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে সপ্তাহে ঝামেলাটামেলা তেমন কিছু ছিল না, আর গুথও যথারীতি লেকচার শুনতে যেতে পারলেন। সেখানে গিয়ে গুথ দেখলেন, ডিকির বক্তৃতার মূল বিষয় হচ্ছে ফ্ল্যাটনেস প্রবলেম বা 'সামতলিক সমস্যা'; এটি নাকি মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের জন্য সবচেয়ে বড় একটা ধাঁধা। ডিকি তাঁর বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করলেন, আমাদের মহাবিশ্বকে 'দেখলে' মনে হয় তা যেন অতিমাত্রায় 'ফ্ল্যাট'। এর মানে, আমাদের মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে 'বদ্ধ' আর 'উন্মুক্ত' মহাবিশ্বের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে খুব কায়দা করে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। সেটা কীভাবে হচ্ছে বলার আগে বদ্ধ আর উন্মুক্ত মহাবিশ্ব নিয়ে দুচার কথা বলে নেওয়া যাক। বদ্ধ মহাবিশ্ব হচ্ছে সেই মহাবিশ্ব যা প্রসারিত হতে হতে একসময় মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার চুপসে যেতে শুরু করবে। অন্য দিকে উন্মুক্ত মহাবিশ্ব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবল প্রসারিতই হতে থাকবে ক্রমাগত। আর ডিকির আলোচিত ফ্ল্যাট বা সামতলিক মহাবিশ্ব থাকবে এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এই সামতলিক মহাবিশ্ব প্রসারিত হবে বটে, তবে কোনো রকমে পাস-মার্ক পেয়ে পাস করে যাওয়া ছাত্রের মতো টায়ে টায়ে। ফেল করার হাত থেকে খুব কায়দা করে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে। এখন মহাবিশ্ব উন্মুক্ত হবে না বদ্ধ হবে নাকি সামতলিক হবে, তা নির্ভর করে মহাবিশ্বের ভর তথা গড় ঘনত্বের ওপর। মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব আর সন্ধি ঘনত্ব (অর্থাৎ যে ঘনত্ব মহাবিশ্বকে চুপসে দেবার জন্য যথেষ্ট) –এর অনুপাতকে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেন গ্রিক অক্ষর ওমেগা (Ω) দিয়ে। মহাবিশ্বকে সামতলিক বা ফ্ল্যাট হতে হলে এর মান হতে হবে ১-এর কাছাকাছি।

ডিকির লেকচার শেষে নিজের বাসায় গিয়ে খাতাকলম নিয়ে বসলেন গুথ। দেখলেন প্রমিত বিগ ব্যাং মডেলে সামতলিক মহাবিশ্ব পেতে হলে মহাবিশ্বের শুরুতে ওমেগার মান শুধু ১-এর কাছাকাছি নয়, এক্কেবারে সমান হতে হবে। একটু কমবেশি হলেই ভ্যারাচ্যারা লেগে যাবে। যেমন, ১-এর চেয়ে একটু কম মান নিয়ে যাত্রা শুরু করলেই দেখা যাবে কিছুদিন পর তা কমতে কমতে ১-এর এত নিচে চলে যাবে যে

সেই মহাবিশ্বে গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা তৈরি হবার মতো কোনো পরিবেশই গঠিত হবে না। আবার ১-এর চেয়ে সামান্য বেশি মান নিয়ে যাত্রা শুরু করলে হবে আরেক বিপদ। কিছুদিনের মধ্যেই এই মান বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়ে যাবে যে, এই মহাবিশ্ব আর প্রসারিত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়বে নিজের ঘাড়েই।

কারণটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। আজকের যে মহাবিশ্বের ছবি আমরা দেখি, সেটা আদি (রিকম্বিনেশনের সময়ের) মহাবিশ্বের অন্তত এক লক্ষ কোটি গুণ আকারে বেড়েছে। তাই, মহাবিশ্ব যদি শুরুতে ক্রান্তি ঘনত্বের চেয়ে শতকরা দশ ভাগ কম বা বেশি মান নিয়ে যাত্রা শুরু করত, তবে আজকে আমাদের মহাবিশ্বের ঘনত্বের মান অন্তত এক লক্ষ কোটি গুণ পার্থক্য পাওয়া যেত।

এই পুরো ব্যাপারটাকে নিচের সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায় এভাবে–

$$\Omega - 1 \propto \begin{cases} t & \text{(during the radiation-dominated era)} \\ t^{2/3} & \text{(during the matter-dominated era) .} \end{cases}$$

গুথ গণনা করে দেখলেন, মহাবিস্ফোরণের ১ সেকেন্ড পরে ভর ঘনত্বের মান ক্রান্তীয় ঘনত্বের ০.৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ গুণ থেকে ১.০০০০০০০০০০০০০০১-এর মধ্যে থাকতে হবে, নইলে আজকের এই সামতলিক মহাবিশ্ব পাওয়া যাবে না।

এবার স্ফীতিকে গোনায় ধরে আবারো ক্যালকুলেশন করলেন গুথ। এবারে যে সমীকরণ পেলেন তা ওপরেরটা থেকে একেবারেই ভিন্ন। তার প্রকৃতি হলো এরকমের –

$$\Omega - 1 \propto e^{-2H_{inf}t}$$

যেখানে H_{inf} হচ্ছে স্ফীতি চলাকালীন সময়ে হাবলের প্যারামিটার। সমীকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাম পাশে যে মান নিয়েই ওমেগা যাত্রা শুরু করুক না কেন, t-এর মান যত বাড়বে, ডান পাশের চলকটি ($e^{-2H_{inf}t}$) তত ০-এর কাছাকাছি চলে যাবে। ডান পাশের চলক শূন্য হয়ে যাবার অর্থ হলো, ওমেগা (Ω)-এর মান ১ এর কাছাকাছি চলে যাওয়া।

$\Omega - 1 \quad \rightarrow 0$

$$\boxed{\Omega \quad \rightarrow 1}$$

গণিত থেকে পাওয়া এই ফলাফল সত্যই দুর্দান্ত। প্রমিত বিগ ব্যাং থেকে পাওয়া আগের উপসংহার ছিল—ওমেগার মান ১-এর সমান হতে হবে খাপে খাপ (কিছু বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখেছিলেন সেটা হতে হবে ১০^{১৫} ভাগের ১ ভাগ সূক্ষ্মতায়[59])। গুথ তাঁর গণনায় দেখালেন — না, ওমেগাকে যাত্রা শুরুর সময় এত সূক্ষ্মভাবে সমন্বিত (Fine tuned) হবার দরকার নেই। প্রমিত বিগ ব্যাং মডেলে যেখানে সামান্য হেরফের হলেই ওমেগার মান ১-এর থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, সেখানে স্ফীতি তত্ত্ব একেবারে বিপরীত উপসংহার নিয়ে আসল। দেখা গেল ১, ১০০০, ১,০০০,০০০, .০০০১ অথবা .০০০০০১ কিংবা এ ধরনের যেকোনো মান দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্ফীতির কারণে ওমেগার মান ১ থেকে দূরে সরে না গিয়ে বরং সব সময়ই ১-এর দিকে চলে আসে, আর মহাবিশ্বকে করে তোলে পুরোপুরি সামতলিক।

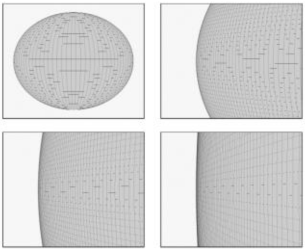

সামতলিক সমস্যার সমাধান—যে কোনো মান দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্ফীতির কারণে ওমেগার মান ১ থেকে দূরে সরে না গিয়ে বরং সব সময়ই ১-এর দিকে চলে আসে, আর মহাবিশ্বকে করে তোলে সামতলিক

ঠিক তখনই গুথ বুঝতে পারলেন তিনি মহাবিশ্বের অন্তিম রহস্যটা এক ধাক্কায় সমাধান করে ফেলেছেন, তিনি তাঁর ডায়েরির পাতায় শিরোনাম দিলেন 'স্পেক্টেকুলার

[59] R. H Dicke, & Peebles, P. J. E., in General Relativity: An Einstein Centenary Survey, ed. S. W. Hawking & W. Israel (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1979

রিয়েলাইজেশন' বা 'অভাবনীয় অনুভব'; তারপর ওটার চারদিকে ডবল মার্জিন দেওয়া বক্স করে লিখলেন –

অভাবনীয় অনুভব:

এ ধরনের অতিশীতীভূতকরণ ব্যাখ্যা করতে পারে কেন আমাদের মহাবিশ্ব আজকে এত প্রত্যয়াতীতভাবে সমতল, এবং সেই সঙ্গে এটি রবার্ট ডিকি আইনস্টাইন দিবসের দিনের লেকচারে যে সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ধাঁধা উপস্থাপন করেছিলেন, সেটারও সমাধান দিয়ে দেয়।

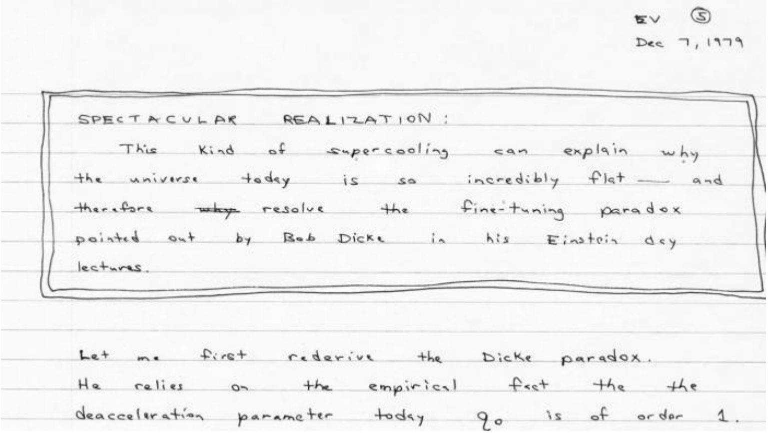
EV (5)
Dec 7, 1979

SPECTACULAR REALIZATION:
This kind of supercooling can explain why the universe today is so incredibly flat — and therefore ~~why~~ resolve the fine-tuning paradox pointed out by Bob Dicke in his Einstein day lectures.

Let me first rederive the Dicke paradox. He relies on the empirical fact the the deacceleration parameter today q_0 is of order 1.

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখে লেখা 'অভাবনীয় অনুভব'
নোটসংবলিত অ্যালেন গুথের ডায়েরি

গুথ তাঁর গণনার ফলাফলগুলো ফিজিক্যাল রিভিউ লেটারস জার্নালে প্রকাশের জন্য পাঠালেন সে বছরই ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে। সহকর্মী হেনরি তাই-এর সাথে যৌথভাবে লেখা সেই গবেষণাপত্রটি জার্নালে আলোর মুখ দেখেছিল ১৯৮০ সালে[60]। এর পরের বছর প্রকাশিত হয় গুথের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার। ১৯৮১ সালে

60 A. H. Guth and S.-H. H. Tye, "Phase Transitions and Magnetic Monopole Production in the Very Early Universe," Phys. Rev. Lett. 44, 631, 1980.

ফিজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত এ গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল ‘স্ফীতিময় মহাবিশ্ব: দিগন্ত এবং সামতলিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান’[61]।

সাফল্য ও প্রতিক্রিয়া

গুথের গবেষণার ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রকাশিত হলেও প্রাথমিকভাবে গুথ একটু ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, হয়তো তাঁর গণনায় কোথাও ভুলত্রুটি আছে। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা এর মধ্যেই তত্ত্বের ভুল বের করে ফেলবেন, এবং তিনি তাঁর সহকর্মীদের মাঝে ঠাট্টাতামাশার পাত্র হয়ে উঠবেন।

তা অবশ্য হলো না। আশির দশকে গুথ যখন তাঁর নতুন তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী মারে গেল-ম্যান উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ‘আপনি মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছেন’। এম আইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালেন পি লাইটম্যান তাঁর ধারণাটিকে অভিহিত করেছেন, ‘বিগ ব্যাং-এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক ধারণার উন্নয়ন’ হিসেবে। আরেক নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী শেল্ডন গ্ল্যাসো একদিন গুথের কাছে এসে বললেন, ‘গুথ, স্টিভেন ওয়েনবার্গ কিন্তু ইনফ্লেশনের কথা শুনে খুব রেগে গেছেন’।

—‘তাই নাকি? স্টিভ কি কোনো সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন?’ – উদ্বিগ্ন গুথ প্রশ্ন করলেন গ্ল্যাসোকে। গ্ল্যাসোর সাথেই পদার্থবিজ্ঞানে ভাগাভাগি করে নোবেল পেয়েছিলেন ওয়েনবার্গ। তাই স্টিভেন ওয়েনবার্গ কোনো সমস্যা খুঁজে পেলে তা নির্ঘাত বিপদের কথা, জানতেন গুথ।

—‘ নাহ!’ আশ্বস্ত করলেন গ্ল্যাসো— ‘এই স্ফীতির ব্যাপারটা তাঁর নিজের মাথায় আসেনি কেন, এ নিয়ে ক্ষুব্ধ স্টিভ!’

---

[61] Alan H. Guth, The Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems., Physical Review D, Volume 23, Issue 2, 1981

না, স্ফীতি তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি করল না, বরং বড় ধরনের আলোড়নই ফেলে দিল বিজ্ঞানীদের মাঝে। মূলধারার বিজ্ঞানীরা স্ফীতি তত্ত্বকে সাদরেই গ্রহণ করলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কয়েক বছর ধরে স্ফীতি নিয়ে গবেষণাপত্রের লাগাতার প্রকাশে। একটা সময় গুথ হিসাব করতে বসেছিলেন কয়টা পেপারে স্ফীতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে। প্রথম বছরই অন্তত ৪০টি পেপারে গুথের কাজের উল্লেখ থাকল। তারপর থেকে যেন এটা বাড়তে লাগল প্রায় গুণোত্তর হারেই। ১৯৯৭ সালে তাঁর বিখ্যাত 'দ্য ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স' বইটি লেখার আগ পর্যন্ত হিসাব করে দেখেছিলেন, অন্তত ৩০০০টা পেপারে ইনফ্লেশন নিয়ে গবেষণার হদিস আছে; তারপর গোনাগুনি ছেড়ে দিয়েছিলেন গুথ। সেসব নিত্যনতুন গবেষণাপত্রে পুরাতন স্ফীতি, নতুন স্ফীতি, কেওটিক স্ফীতি, হাইব্রিড স্ফীতি, হাইপারটেক্সট স্ফীতি থেকে শুরু করে 'ওয়ার্ম', 'সফট', 'টেপিড', 'ন্যাচারাল'সহ বিভিন্ন ধরনের স্ফীতির ভাষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়[62]। তবে স্ফীতির যে নতুন ভাষ্যই তৈরি হোক না কেন, তাকে যাত্রা শুরু করতে হয় গুথ বর্ণিত উচ্চ শক্তি ঘনত্ববিশিষ্ট সেই 'ফলস ভ্যাকুয়াম' ধরনের স্তর থেকে, আর করতে হয় কোনো-না-কোনোভাবে বিকর্ষণমূলক মহাকর্ষের প্রয়োগ[63]। শুধু পেপারেই নয়, সাফল্য এল তাঁর নিজের কর্মজীবনেও। এক অখ্যাত অচেনা পোস্ট ডক্টরেট ফেলো থেকে রাতারাতি পরিণত হলেন এমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকে; পরিণত হলেন মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একজন শীর্ষস্থানীয় কান্ডারিতে।

এরপর যত দিন গেছে স্ফীতি তত্ত্ব কেবল জোরালো থেকে জোরালোই হয়ে উঠেছে কেবল। স্ফীতি তত্ত্বে পক্ষে প্রমাণের পাহাড় কেবল বাড়ছেই। স্ফীতি তত্ত্ব কেবল বিগ ব্যাং-এর মনোপোল, দিগন্ত বা সামতলিক সমস্যাজাতীয় সমস্যাগুলোই

---

[62] Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April 01, 2002.

[63] A. D. Linde, Particle Physics and Inflationary Cosmology (Contemporary Concepts in Physics), vol 5, CRC Press, 1990

সমাধান করেনি, দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। একটি হলো, মহাবিশ্বের জ্যামিতি হতে হবে সামতলিক, অর্থাৎ ওমেগা (Ω)-র মান হবে ১-এর একদম কাছাকাছি। আর দ্বিতীয়টি হলো, আদি মহাবিশ্বের সঠিক ছবি কেউ তুলতে পারলে সেখানে কিছু বিশেষ প্যাটার্নে ঘনত্বের পার্থক্য বা ফ্লাকচুয়েশন পাওয়া যাবে। দুটোই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৩ সালে 'স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ' ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী অ্যান্থনি অ্যাগুরি বলেন[64],

> দুটো ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই নির্ণীত হয়েছে নাসার উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রপি প্রোব স্যাটেলাইটের পাঠানো উপাত্তের মাধ্যমে। স্ফীতি তত্ত্ব উত্তীর্ণ হয়েছে সময় সময় এ ধরনের বিভিন্ন পর্যবেক্ষিত পরীক্ষার মাধ্যমে খুব দুরন্তভাবেই। স্ফীতির যে প্রসারণের কথা আমরা বলি সেটা বোধ হয় সত্যই ঘটেছিল।

তবে পরিস্থিতি প্রথম থেকেই এরকম কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ওমেগার সঠিক মান নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক ছিল অনেক দিন ধরেই। যদিও গুথের গণনা ইঙ্গিত করছিল স্ফীতি তত্ত্ব সঠিক হলে, ওমেগার মান ১-এর কাছাকাছি হতেই হবে, কিন্তু সত্যই সেটা ১ কি না বহুদিন পর্যন্ত আমরা জনতে পারিনি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মাইকেল টার্নার অবশ্য লরেন্স ক্রাউসের সাথে মিলে মাঝখানে (১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালে) দুটো পেপার লিখেছিলেন। সেখানে তাঁরা দাবি করেছিলেন যে মহাবিশ্বের জ্যামিতি হতে হবে সামতলিক[65], কিন্তু তার পরও সেটা সঠিক কিনা কেউ নিশ্চিত ছিলেন না। ওমেগার মান পর্যবেক্ষণ থেকে আসছিল সর্বসাকল্যে মাত্র ০.২-এর মতো। অর্থাৎ মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব পাওয়া যাচ্ছিল সন্ধি

---

[64] Anthony Aguirre (University of California, Santa Cruz), How did Our Universe Come to be?, Astronomy's 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

[65] Michael S. Turner, Gary Steigman and Lawrence M. Krauss, Flatness of the Universe: Reconciling Theoretical Prejudices with Observational Data, Phys. Rev. Lett. 52, 2090–2093 , 1984 Also see, Lawrence M. Krauss and Michael S. Turner, The Cosmological Constant Is Back., General Relativity and Gravitation, Vol. 27, No. 11, page 1135; 1995.

ঘনত্বের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ[66]। আর সেটা তৈরি করেছিল স্ফীতি তত্ত্বের জন্যও অস্বস্তিকর একটা ক্ষেত্র। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ক্রিশনার বলেছিলেন, 'দিস ইনফ্লেশন আইডিয়া সাউন্ডস ক্রেজি'। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার পেনরোজ বলেছিলেন, 'হাই এনার্জি ফিজিসিস্ট-দের জ্যোতির্বিজ্ঞানে এসে নাক গলানোটা মনে হচ্ছে একধরনের ফ্যাশন হয়ে গেছে। ... এমনকি কুৎসিত আর্ডভার্করাও ভাবে তার সন্তান খুব সুন্দর'। এর মধ্যে ১৯৮২ সালে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং নাফিল্ড ওয়ার্কশপ নামে একটা ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলেন, যার অফিশিয়াল শিরোনাম ছিল 'দ্য ভেরি আর্লি ইউনিভার্স'[67]। মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণারত ত্রিশ জন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীকে আহবান জানানো হয়েছিল সেই ওয়ার্কশপে। অ্যালেন গুথ, পল স্টেইনহার্ট, মাইকেল টার্নারসহ অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীই উপস্থিত ছিলেন সেই ওয়ার্কশপে। সেই ওয়ার্কশপ শেষে সারসংকলন করতে গিয়ে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী উইলজেক খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, 'ওমেগার মান ১-এর কাছাকাছি পাওয়া না গেলে স্ফীতি তত্ত্বের কোনো ভাত নেই'[68]।

কিন্তু সবকিছুই বদলে গেল যখন গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter) গুপ্ত শক্তি (Dark Energy)র খোঁজ পেলেন বিজ্ঞানীরা। গুপ্ত পদার্থের খোঁজ অবশ্য বিজ্ঞানীরা বেশ আগেই পেয়েছিলেন—ফ্রিৎস জুইকি এবং পরে ভেরা রুবিনের পর্যবেক্ষণের কল্যাণে সেই সত্তরের দশকেই। কিন্তু তার পরও ওমেগার মান ১-এর কাছাকাছি আসছিল না; মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব পাওয়া যাচ্ছিল ক্রান্তি ঘনত্বের কেবল এক-তৃতীয়াংশ। সোজা কথায়, আমাদের চেনাজানা পদার্থ আর গুপ্ত পদার্থ মিলিয়ে শতকরা ৩০ ভাগ পদার্থের সন্ধান আমরা পাচ্ছিলাম তখন। কিন্তু মহাবিশ্বকে সমতল প্রমাণ করার জন্য

---

66 Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 2011

67 G. W. Gibbons (Editor), S. W. Hawking (Editor), S. T. C. Siklos, The Very Early Universe: Proceedings of the Nuffield Workshop, Cambridge 21 June to 9 July, 1982

68 Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 2011

দরকার ছিল আরো ৭০ ভাগ শক্তির যা মহাবিশ্বের সামগ্রিক কাঠামোর ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু সন্ধি ঘনত্বে পৌঁছানোর জন্য বাদবাকি শক্তির জোগান দেবে।

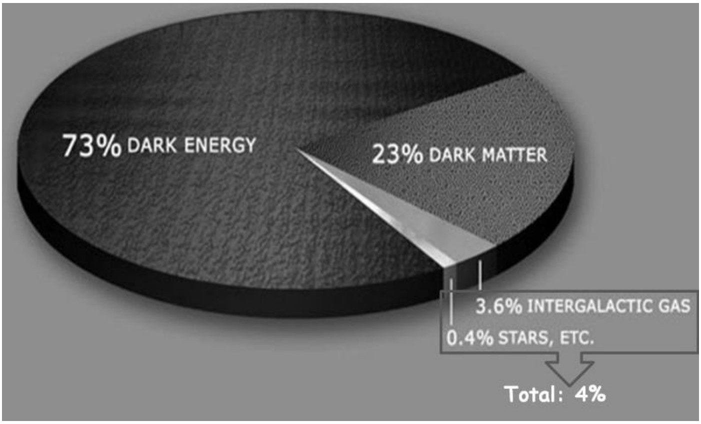

মহাবিশ্বের পদার্থের মধ্যে কেবল শতকরা ৪ ভাগ চেনাজানা ব্যারিয়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত, যে পদার্থ দিয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা কিংবা মানুষজন তৈরি হয়েছে বলে আমরা জানি। বাদবাকি পদার্থের শতকরা ২৩ ভাগ হচ্ছে গুপ্ত পদার্থ, যাদের ল্যাবরেটরিতে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে না করা গেলেও মাধ্যাকর্ষণের ওপর এর প্রভাব শনাক্ত করা হয়েছে। বাকি শতকরা ৭৩ ভাগ তৈরি হয়েছে আরো রহস্যময় গুপ্ত শক্তি দিয়ে যা মহাবিশ্বের প্রসারণকে ত্বরান্বিত করছে।

গণিতের ভাষায় বললে, আমাদের হাতে তখন Ω(পদার্থ) = 0.২৭ মানের সমান উপকরণ ছিল। মহাবিশ্বকে সমতল করার জন্য আমাদের দরকার ছিল বাদবাকি Ω(Λ) = ০.৭৩-এর হিসাব। সেটাই পাওয়া গেল ১৯৯৮ সালে। টাইপ ১-এ সুপারনোভা নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের দুই দল মহাবিশ্বের প্রসারণের হার কতটুকু কমছে সেটা বের করতে গিয়ে দেখেন, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার আসলে কমছে না বরং সমানে বেড়ে চলেছে। আর এই বেড়ে চলার পেছনে আছে এক অজ্ঞাত শক্তি—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল টার্নারের সুপারিশক্রমে এর

নামকরণ করা হয়েছে ‘গুপ্ত শক্তি’ বা ডার্ক এনার্জি হিসেবে। গুপ্ত শক্তির হদিস পাওয়ার পরপরই গণিতের হিসাবটা মিলে গেল খাপে খাপ —

$$\Omega(\text{চেনা জানা ব্যারিয়নিক পদার্থ}) + \Omega(\text{গুপ্ত পদার্থ}) + \Omega(\Lambda)$$
$$= ০.০৪ + ০.২৩ + ০.৭৩$$
$$= ১$$

কেবল গুপ্ত শক্তির হিসাব থেকেই নয়, মহাবিশ্বের জ্যামিতি যে সামতলিক, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেও। প্রথম প্রমাণ এসেছিল ১৯৯৭ সালের দিকে যখন একদল বিজ্ঞানী অ্যান্টার্কটিকায় বড়সড় বেলুন উড়িয়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের প্রকৃতি ধরার চেষ্টা করলেন। তারা তাঁদের বেলুনে লাগিয়ে দিয়েছিলেন খুব সংবেদনশীল এক টেলিস্কোপ। সে বেলুন মাটির ১২০,০০০ ফুট ওপর থেকে সাড়ে দশ দিন ধরে ডেটা সংগ্রহ করে ফলাফল প্রকাশ করল। সে ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন যে মহাবিশ্বের প্রকৃতি সত্যই সমতল।

আরো নিখুঁত ফলাফল পাওয়া গেল কয়েক বছর পর WMAP-এর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে। সেখানে ওমেগার মান পাওয়া গেছে $\Omega = ১.০২ \pm ০.০২$, যা স্ফীতি তত্ত্বের অনুমানের সাথে প্রায় অবিকল মিলে যায়[69]। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ২০১৩ সালে নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকার সাথে একটি সাক্ষাৎকারে বলেই ফেললেন, ‘ডব্লিউম্যাপ থেকে পাওয়া স্ফীতির সাক্ষ্যগুলো আমার পেশাগত জীবনে সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য’।

[69] Alan H. Guth, Inflation, Carnegie Observatories Astrophysics Series, Vol. 2, Measuring and Modeling The Universe, 2004

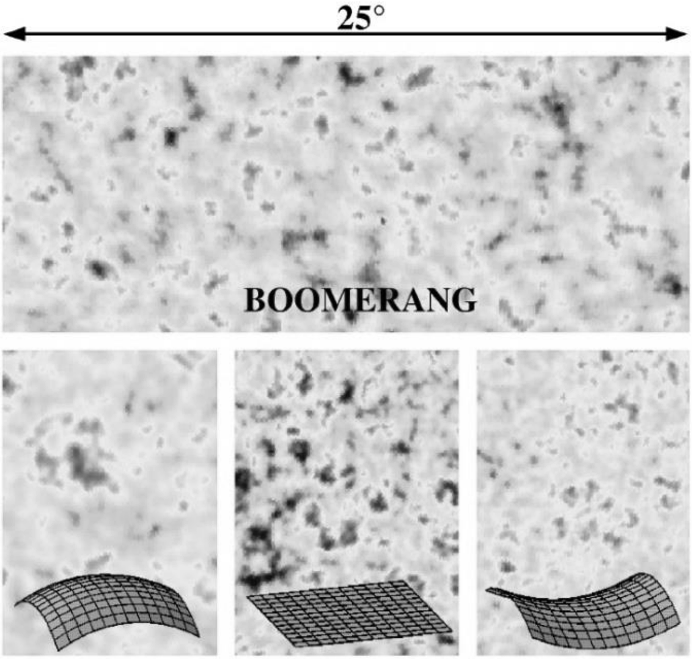

চিত্র: বুমেরাং প্রজেক্ট থেকে পাওয়া ডেটা আমাদের নিশ্চিত করেছে যে মহাবিশ্বের জ্যামিতি সামতলিক (মাঝের ছবি)। যদি মহাবিশ্বের প্রকৃতি সামতলিক না হয়ে বদ্ধ হতো, তবে উত্তপ্ত অঞ্চলের (hot spot) চেহারা পাওয়া যেত বাম পাশের মতো, আর এর প্রকৃতি যদি উন্মুক্ত হতো, তবে আমরা পেতাম ডান পাশের মতো।

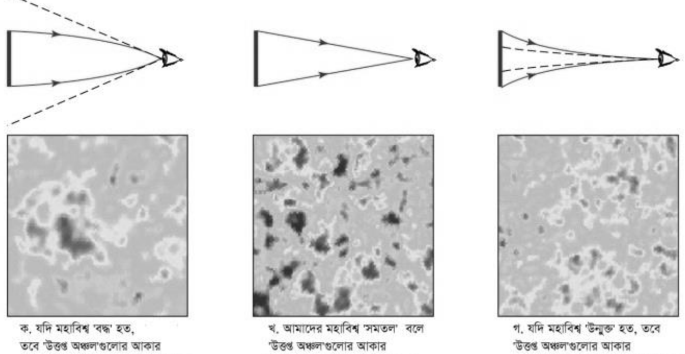

ক. যদি মহাবিশ্ব 'বদ্ধ' হত, তবে 'উত্তপ্ত অঞ্চল'গুলোর আকার প্রকৃত আকারের চেয়ে বড় দেখা যেত।

খ. আমাদের মহাবিশ্ব 'সমতল' বলে 'উত্তপ্ত অঞ্চল'গুলোর আকার প্রকৃত আকারের সমান দেখা যায়।

গ. যদি মহাবিশ্ব 'উন্মুক্ত' হত, তবে 'উত্তপ্ত অঞ্চল'গুলোর আকার প্রকৃত আকারের চেয়ে ছোট দেখা যেত।

গুপ্ত শক্তি নামে হারানোর শক্তির আবিষ্কার এবং ডব্লিউম্যাপ ডেটা থেকে পাওয়া নিখুঁত পর্যবেক্ষণ সমতল মহাবিশ্ব নিয়ে সব বিতর্কের মোটামুটি যবনিকাপাত ফেলে দেয়; এবং সেই সাথে স্ফীতি তত্ত্বের সফলতার মুকুটে যোগ করে এক নতুন পালক। ২০০১ সালে অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাগাজিন শিরোনাম করল, 'মহাবৈশ্বিক সুর গাইছে স্ফীতির গান'। এর দু মাস পরই ফিজিকস টুডেতে নিবন্ধিত হলো আরেকটি প্রবন্ধ 'স্ফীতি তত্ত্বের আরেকটি বিজয়'[70] শিরোনামে। স্ফীতি তত্ত্ব পরিণত হলো মহাজাগতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি ক্ষেত্রে।

খুব সম্প্রতি স্ফীতি তত্ত্বের মুকুটে যোগ হয়েছে সাফল্যের আরেকটি বড় পালক। স্ফীতি তত্ত্বের একটি বড় অনুমান ছিল, প্রচণ্ড রকমের স্ফীতির মধ্য দিয়ে আমাদের মহাবিশ্ব উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবে সেই ধাক্কার কিছুটা রেশ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আকারে আমাদের খুঁজে পাওয়ার কথা। এই মহাকর্ষ তরঙ্গ বয়ে নিয়ে যায় যে হাইপোথিটিকাল কণা, বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছিলেন 'গ্র্যাভিটন'। ফোটন কণার কথা যে আমরা অহরহ শুনি সেটা আলোক কণিকা বা তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ বয়ে নিয়ে যায়। তড়িচ্চুম্বক বলের ক্ষেত্রে বার্তাবহ কণিকা যেমন হচ্ছে 'ফোটন কণিকা', তেমনি সবল নিউক্লিয় বলের ক্ষেত্রে আছে 'গ্লুয়োন' (Gluon) আর দুর্বল নিউক্লিয় বলের জন্য রয়েছে W এবং Z কণা। মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও তেমনি কল্পণা করা হয়েছে গ্র্যাভিটন কণার। সেই ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন মহাবিস্ফোরণের প্রমিত মডেল সঠিক হলে এই মহাকর্ষ তরঙ্গ একদিন না একদিন খুঁজে পাবেন তারা।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মহাকর্ষীয় এ তরঙ্গ খুব দুর্বল তরঙ্গ। এটা এমনিতে খুঁজে পাওয়া মুশকিলই। গ্র্যাভিটনের সাথে পরিচিত পদার্থের মিথষ্ক্রিয়া এতোই দুর্বল যে এটা মানবীয় পরিমাপণের সীমার বাইরে বলেই এতোদিন ধরে নেয়া হত। কিন্তু সেই

---

70 A. Guth,: Inflation and the New Era of High-Precision Cosmology. MIT Physics Annual, pp. 28– 39 , 2002

অসাধ্যই সম্পন্ন করেছেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সম্প্রতি (মার্চ, ২০১৪) জন কোভাক সহ 'হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' এর সাথে নিযুক্ত পদার্থবিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ তরঙ্গ সনাক্ত করতে পেরেছেন বলে দাবী করা হচ্ছে[71]। অ্যান্টার্কটিকায় পরিচালিত বাইসেপ২ পরীক্ষার (BICEP2 experiment) মাধ্যমে এই তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে বলে মিডিয়ায় এসেছে[72]।

যেভাবে সনাক্ত করা হয়েছে, তার মূল ব্যাপারটি বর্ণনা করলে দাঁড়াবে এরকমের। বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সরাসরি দেখতে পান না বটে, কিন্তু আদি মহাবিশ্ব থেকে আসা তরঙ্গের প্রভাব আলোর উপরে কেমন সেটা তারা সনাক্ত করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা জানেন যে, তরঙ্গ আলোকে 'পোলারাইজ' করে দিতে পারে। আলো বিভিন্নভাবে পোলারাইজড হতে পারে, কিন্তু স্ফীতির উপজাত হিসেবে পাওয়া মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ একটি বিশেষ উপায়েই কেবল আলোর এই পোলারাইজেশন ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন, 'B mode polarization'। এ পোলারাইজেশন কিভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বের করতে গিয়ে অবশ্য তাদের বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের 'ক্লাম্পস' এবং 'জিগেলস' এর কৌনিক গতিপ্রকৃতি সহ বহুকিছু। আর এগুলো বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

এই আবিষ্কারের ফলে মহাকর্ষ আসলেই যে একটি কোয়ান্টাম ঘটনা থেকে উদ্ভূত উদ্ভাস – বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের ধারণার প্রমাণ পাওয়া গেল। স্বয়ং জন কোভাক 'নেচার' জার্নালের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন[73] –

> জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে জড়িত সবাই জানে, হয়তো স্পষ্ট করে বলে না যে, স্ফীতি থেকে পাওয়া 'বি মোড' এর ভবিষ্যদ্বাণী কেবল মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের ঘটনাই নয়,

---

[71] Staff, *BICEP2 2014 Results Release*, National Science Foundation, March 17, 2014

[72] D. Overbye, Detection of Waves in Space Buttresses Landmark Theory of Big Bang, New York Times, March 17, 2014

[73] How astronomers saw gravitational waves from the Big Bang, Nature | News: Q&A, March 17, 2014

সেই সাথে মকাকর্ষ নিজেও যে কোয়ান্টাইজড – সেটার ইঙ্গিতবাহী। স্ফীতিতত্ত্বের অনুমান ছিল, সবকিছুই কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে উদ্ভূত, এবং স্ফীতির মাধ্যমে বিবর্ধিত হয়েছে। কাজেই গভীর স্তরে গিয়ে চিন্তা করলে, এই আবিষ্কার কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং মহাকর্ষের সাথে এর সম্পর্কের স্থাপনার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

সেইসাথে মহাবিশ্ব যে এক ধরণের 'কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনেরই ফসল' - এই ধারণা আরো পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। তবে সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য তোলা থাক, আমরা এখানে স্ফীতি তত্ত্বের বিবর্তনের ইতিহাসের সাথে পরিচিত হব।

স্ফীতি তত্ত্বের বিবর্তন

১৯৮১ সালে দেওয়া অ্যালেন গুথের স্ফীতি তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা খুব সাদরে গ্রহণ করলেও মূল ভাষ্যে একটা ছোট সমস্যা ছিল। গুথ স্ফীতির শুরুটা কিভাবে ঘটবে সেটা বুঝতে পারলেও এর সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে সেটার সুরাহা তিনি করতে পারছিলেন না। এ যেন অনেকটা মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মতো অবস্থা। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানতেন, কিন্তু নির্গমের কীশল জানতেন না।

আসলে সমস্যাটা করেছিল প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে উত্তরণের সময় মেকি ভ্যাকুয়ামের অবক্ষয়। গুথ দেখছিলেন, এই মেকি ভ্যাকুয়ামের অবক্ষয়ের ফলে অসংখ্য বুদ্বুদ তৈরি হয়। একটা পাত্রে পানি নিয়ে চুলায় ফুটাতে থাকলে আমরা যেমন দেখি, অনেকটা সেরকমের। কিন্তু গুথের মডেলে পাওয়া বুদ্বুদগুলো ছিল মহা বদ্ খদ্। তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে অতি দ্রুত এমন 'ভ্যারাচ্যারা অবস্থা' তৈরি করে যে মহাবিশ্বের সমস্বত্ব অবস্থার একেবারে বারোটা বেজে যায়। অর্থাৎ গুথের মূল মডেল সত্য হলে মহাবিশ্ব আজকের দিনের মতো এত সুষম হবার কথা নয়। কাজেই কোথাও একটা ঝামেলা আছে। এই ঝামেলার ব্যাপারটা অবশ্য গুথের নিজেরই

নজরে পড়েছিল[74]। সেই সাথে পড়েছিল আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর অভিজ্ঞ চোখেও। হকিং একটু ভিন্ন দিক থেকে গণনা করে সিদ্ধান্তে এলেন, বুদ্বুদগুলোর সংঘর্ষ কোনো সমস্যা করবে না, কিন্তু বুদ্বুদগুলোর তুলনায় মহাবিশ্ব এত দ্রুত প্রসারিত হবে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ ঘটারই সুযোগ পাবে না, আর সেটা মহাবিশ্বকে একসময় পরিণত করবে এক ‘এম্পটি ইউনিভার্স’-এ; এর কোনো কোনো জায়গায় প্রতিসাম্যের ভাঙন ঘটবে, কোনো কোনো জায়গা থেকে যাবে অক্ষত। এই মহাবিশ্ব মোটাদাগে পরিণত হবে সমরূপতা-বিবর্জিত এক মহাবিশ্বে যা মোটেই আমাদের আজকের মহাবিশ্বের মতো নয়[75]। কাজেই গুথের ‘পুরাতন’ এ স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী হয় বুদ্বুদের স্থানান্তর ঘটবে এত দ্রুত যে যথেষ্ট স্ফীতি ঘটার সুযোগ থাকবে না, আর নয়তো এত ধীরে এগুবে যে, মহাবিশ্ব স্ফীতি থেকে বেরুতেই পারবে না। এই সমস্যাটিকে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে চিহ্নিত করা হয়েছিল ‘মার্জিত নির্গমন সমস্যা’ (graceful exit problem) হিসেবে।

এই সমস্যাটির সমাধান হাজির করলেন রুশ বিজ্ঞানী আঁদ্রে লিন্ডে ১৯৮২ সালে[76] (এর কিছুদিন পরই আরো দুই বিজ্ঞানী—পল স্টেইনহার্ট ও আলব্রিচট স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন)। লিন্ডে দেখলেন বুদ্বুদের সংযোগের সমস্যাকে সহজেই সমাধান করা যায় যদি মেকি ভ্যাকুয়ামের অবক্ষয়ের সময় উদ্ভূত বুদ্বুদগুলোকে শুরুতেই কোনো-না-কোনোভাবে একটি বড়সড় বুদ্বুদের ভেতরে সাঁটানো যায়। এর ফলে মহাবিশ্বের সমস্বত্ব অবস্থা যেমন রক্ষা করা যায়, ঠিক তেমনি পাওয়া যায় ‘মার্জিত নির্গমন সমস্যা’ থেকেও মুক্তি।

---

[74] A.H. Guth, & Weinberg, E.J. 'Could the universe have recovered from a slow first-order phase transition?', Nucl. Phys. B212, 321, 1983

[75] S.W. Hawking., Moss. I.G. & Stewart. J. M., Bubble collisions in the very early universe. Phys. Rev. D26. 2681, 1983.

[76] A. D. Linde, "A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems," Phys. Lett. B 108, 389 , 1982

এটা অবশ্য এমনি এমনি ঘটেনি; এর জন্য স্কেলার ফিল্ডের চালচলনে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছিল লিন্ডেকে। পুরনো স্ফীতি তত্ত্ব অনুযায়ী যেখানে হিগস ক্ষেত্রের মান একটি খাড়া মালভূমির ঢাল বেয়ে নিচে নামতে হতো, এবং তাকে নির্ভর করতে হতো রহস্যময় 'কোয়ান্টাম টানেলিং' প্রক্রিয়ার ওপর, সেখানে লিন্ডের নতুন মডেলে কোনো ধরনের টানেলিং-এর দরকার পড়ে না, কারণ সেখানে মালভূমি থাকে অপেক্ষাকৃত নিচু আর সমতল। মেকি ভ্যাকুয়াম থেকে প্রকৃত ভ্যাকুয়ামে পৌঁছুতে হলে এই মালভূমির ঢাল বেয়ে শক্তিঘনত্বের নিচে নেমে আসতে হবে অত্যন্ত ধীর লয়ে। প্রতিসমতার ভাঙন ঘটবে অতি ধীর গতিতে। তাঁর এই ঢিলেঢালা মডেলকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে 'নতুন স্ফীতি তত্ত্ব' হিসেবে।

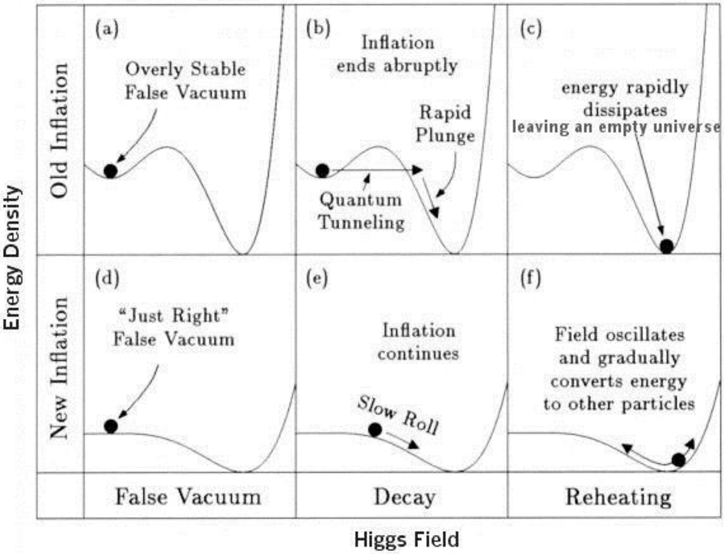

পুরাতন স্ফীতি বনাম নতুন স্ফীতি। নতুন স্ফীতি তত্ত্ব শক্তি-ঘনত্বের ঢাল থাকে অপেক্ষাকৃত নিচু আর সমতল। এই মডেল 'মার্জিত নির্গমন সমস্যা' থেকে আমাদের মুক্তি দেয়।

কিন্তু এই 'নতুন স্ফীতি তত্ত্ব'ও একেবারে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ছিল না। তথাকথিত 'মার্জিত নির্গমন সমস্যা' থেকে এই মডেল আমাদের মুক্তি দিলেও এর প্রক্রিয়া ছিল

অপেক্ষাকৃত জটিল এবং আদপে যে মোটেই বাস্তবসম্মতও নয় সেটা লিন্ডেও স্বীকার করেছিলেন[77]। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ সালে লিন্ডে সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত এক 'সুন্দর' স্ফীতি তত্ত্বের ভাষ্য আমাদের উপহার দিলেন। কেওটিক স্ফীতি বলে অভিহিত এই ভাষ্য আগের স্ফীতি তত্ত্বগুলোর চেয়ে অনেক সরল – এতে কোয়ান্টাম টানেলিং, কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি এফেক্ট, ফেইজ ট্রানজিশন কিংবা সুপার কুলিং – কোনো অনুকল্পকেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে নেওয়ার দরকার নেই। এমনকি দরকার নেই বিগ ব্যাং-এর সেই অতি উত্তপ্ত অসীম ঘনত্বের কোনো পরিবেশ কল্পনারও। কেবল স্কেলার ক্ষেত্রের বিভিন্ন মান পরিবর্তন করে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্ফীতি পেয়ে যাই আমরা। এই স্ফীতির বিভিন্ন মান থেকে আবার তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বের যেসব মহাবিশ্বের একেকটাতে একেক ধরনের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র কাজ করতে পারে।

লিন্ডের এই কেওটিক স্ফীতির একটা বৈশিষ্ট্য হলো—এটা 'চিরন্তন' এবং 'অবিরাম', কারণ একবার এটা শুরু হলে এ আর থামে না, দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে[78]। তাই এই তত্ত্বকে 'Eternal Inflation' নামেই অভিহিত করা হয় এখন। তবে এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটা অন্য জায়গায়। স্ফীতির বিভিন্ন মান ক্রমাগতভাবে এখানে-সেখানে ঘটাতে থাকে বিগ ব্যাং-এর, যা জন্ম দিতে থাকে ছোট-বড় নানা ধরনের মহাবিশ্বের[79]। এর কোনোটাতে হয়তো প্রাণের অভ্যুদয়ের মতো পরিবেশ তৈরি হয় কোনো এক গ্রহে গিয়ে, কোনোটা হয়তো থেকে যায় সাহারা মরুভূমির মতো উষর আর বন্ধ্যা – সেখানে গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা তৈরি হবার মতো

---

[77] Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe , Scientific American, Vol. 271, No. 5, pages 48-55, November 1994

[78] Andrei Linde, Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe, Phys. Lett. B175, 395 , 1986

[79] লিন্ডে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় বলেছেন, 'এই প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে, ইনফ্লেশন বা স্ফীতি বিগ ব্যাং তত্ত্বের অংশ নয়, যেটা ১৫ বছর আগেও সত্য বলে মনে করা হতো, বরং বিগ ব্যাংই এখন ইনফ্লেশনারি মডেলের অংশ হয়ে উঠেছে' (Scientific American, Vol. 271, No. 5, 1994)।

পরিবেশই তৈরি হয় না। এটাই সেই বিখ্যাত ‘মাল্টিভার্স’ বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা যা এখন বিজ্ঞানীদের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

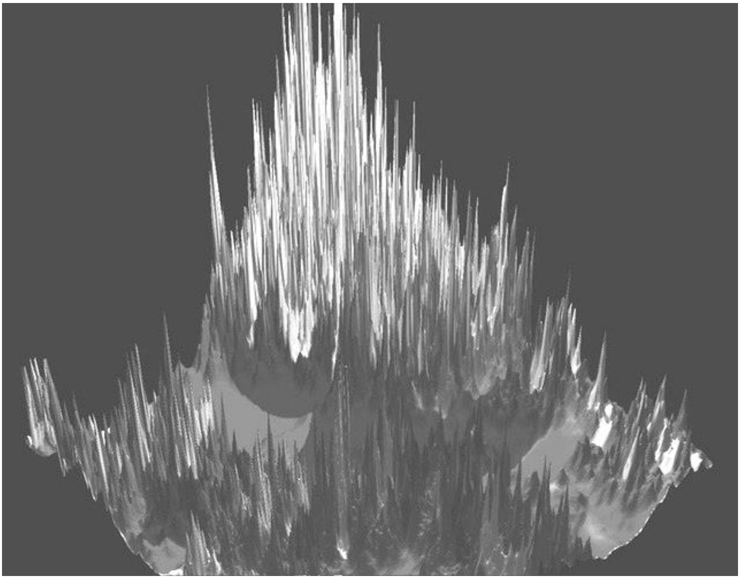

বিজ্ঞানী আঁদ্রে লিন্ডে তাঁর ‘কেওটিক ইনফ্লেশন’ তত্ত্ব কম্পিউটারে সিমুলেশন করে দেখেছেন, স্ফীতিময় অঞ্চলগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র কাজ করে। ছবির তীক্ষ্ণ চূড়াগুলো আসলে একেকটি নতুন ‘বিগ ব্যাং’ এবং চূড়ার উচ্চতাগুলো মহাবিশ্বের শক্তি-ঘনত্ব নির্দেশ করে। ছবিতে চূড়ার শীর্ষে রঙ খুব দ্রুত স্পন্দিত হতে দেখা যাচ্ছে, এর মানে হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র সেখানে এখনো পুরোপুরি সুস্থিত হয়নি। এরা সুস্থিত হয় কেবল উপত্যকার কাছে এসে, যেখানে আমাদের মহাবিশ্বের মত একটি মহাবিশ্ব অবস্থিত বলে মনে করা হয়

লিন্ডে দেখালেন, মাল্টিভার্স আসলে স্ফীতি তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক পরিণতিই[80]। পরে অবশ্য স্ট্রিং তত্ত্ব থেকেও মাল্টিভার্সের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে

[80] স্ফীতি থেকে যে অনন্ত মহাবিশ্বের অভ্যুদয় ঘটে অতি স্বাভাবিক নিয়মে তা কেবল লিন্ডে নয়, আরেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিনের চোখেও পড়েছিল, এবং সেটা লিন্ডে তত্ত্ব দেওয়ার বহু আগেই। কিন্তু মূলধারার

লিওনার্ড সাসকিন্ডসহ অন্যান্য স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের গবেষণায়[81]। সম্প্রতি পাওয়া গেছে অন্তত একটি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণগত আলামতও[82]। এ নিয়ে আমি (অ.রা) মুক্তমনায় একটা লেখা লিখেছিলাম বছর খানেক আগে 'মাল্টিভার্স : অনন্ত মহাবিশ্বের খোঁজে' শিরোনামে। মাল্টিভার্স নিয়ে আলোচনা এই অধ্যায়ের পরিসরের বাইরে রাখছি, কারণ এই বইয়ের চতুর্দশ অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আনব বলে ঠিক করেছি।

মাল্টিভার্স আছে কি নেই এ নিয়ে জমজমাট বিতর্ক করা গেলেও যে জিনিসটি ক্রমশ বিতর্কের ঊর্ধ্বে চলে যাচ্ছে তা হলো স্ফীতিতত্ত্বের সাফল্য আর গুরুত্ব। সেই আশির দশকের শুরুতে গুথ ও লিন্ডের গবেষণাপত্র প্রকাশের পর বহুদিন পর্যন্ত স্ফীতি তত্ত্বের আসলে কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। সম্প্রতি বিজ্ঞানী পল স্টেইনহার্ট ও নিল টুরক 'চক্রাকার' বা 'সাইক্লিক মডেল' নামে একটা তত্ত্বকে স্ফীতি তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করছেন অবশ্য। তবে মূলধারার বিজ্ঞানীরা এখনো এটাকে সেরকম কোনো 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বলে কিছু মনে করেন না[83]। বরং ২০১২

পদার্থবিজ্ঞানীরা এটা গ্রহণ করবেন না ভেবে তিনি এই ধারণা বাক্সবন্দী করে তাঁর কাজের টেবিলের ড্রয়ারে ফেলে রেখেছিলেন বহুদিন।

[81] Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design, Back Bay Books; 2006

[82] Stephen M. Feeney (UCL), Matthew C. Johnson (Perimeter Institute), Daniel J. Mortlock (Imperial College London), Hiranya V. Peiris (UCL), First Observational Tests of Eternal Inflation, Phys. Rev. Lett. 107, 071301, 2011

[83] পল স্টেইনহার্ট ও নিল টুরকের মডেলটি 'চক্রাকার' বা 'সাইক্লিক'। এ ধরনের সাইক্লিক মডেলে সব সময়েই একটা সমস্যা থাকে, সেটা হলো এন্ট্রপির সমস্যা। যেকোনো সাইক্লিক মডেল এটা দীর্ঘ সময় পর 'হিট ডেথ' অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এন্ট্রপি স্থিতিশীল অবস্থায় চলে আসে, যেটা আমাদের মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষণের ঠিক বিপরীত। যদিও স্টেইনহার্ট ও টুরক দাবি করেছেন, তাঁরা পূর্ববর্তী সাইক্লিক মডেলের এই এন্ট্রপির এই সমস্যা সমাধান করেছেন (তাঁদের 'এন্ডলেস ইউনিভার্স' বইয়ে আইজ্যাক আসিমভের বিখ্যাত The last question গল্পের শিরোনাম দিয়ে একটি চ্যাপ্টারও অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরা), কিন্তু বহু বিজ্ঞানীই মনে করেন না যে, তাঁরা এই সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পেরেছেন। বিজ্ঞানী শন ক্যারলের 'From Eternity to Here' বইয়ে এ নিয়ে ভাল আলোচনা আছে। অ্যালেন গুথ তাঁর একটি পেপারে (Inflation, Carnegie Observatories Astrophysics Series, Vol. 2) বলেছেন, 'স্ফীতির বিকল্প দাবি করা হলেও স্টেইনহার্ট ও টুরক মূলত স্ফীতির তত্ত্বের সাহায্যেই প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্বের আকার কেন এত বড় কিংবা মহাবিশ্বের প্রকৃতি কেন এত সমস্বত্ব কিংবা সামতলিক'। আঁদ্রে লিন্ডে দাবি করেছেন, "*স্ফীতি তত্ত্বের বিকল্প হয়ে ওঠার বদলে চক্রাকার মডেলের রূপরেখা বরং 'উদ্ভট' এবং 'স্ফীতি তত্ত্বেরই একটি সমস্যাজনক ভাষ্য' হয়ে উঠেছে*"। তার চেয়েও বড় কথা হল, সম্প্রতি BICEP2 পরীক্ষায় মহাকর্ষ তরঙ্গের

সালে প্রকাশিত ‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ বইয়ে বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস স্পষ্ট করেই বলেন, ‘বর্তমানে স্ফীতি তত্ত্বই হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব যা মহাবিশ্বের সমস্বত্ব প্রকৃতি এবং সামতলিক বৈশিষ্ট্য সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। অধিকন্তু স্ফীতি তত্ত্ব মহাবিশ্ব নিয়ে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যার সবগুলোই এখন পর্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে’।

আমাদের কাছে স্ফীতি তত্ত্বের আবেদন অবশ্য আরো বৃহৎ পরিসরে। আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন যে কথাগুলো তাঁর ‘মেনি ওয়ার্লডস ইন ওয়ান’ বইয়ে বলেছেন, সেগুলোর সাথে আমি খুবই একমত[84] –

> স্ফীতি তত্ত্বের আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে তুলনীয়। দুটি ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন সমস্ত রহস্যের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যেগুলোকে একটা সময় মনে করা হতো মানুষের জ্ঞানের বাইরে কিংবা ঐশ্বরিক কিছু। বিজ্ঞান তার হাত প্রসারিত করে কুসংস্কারকে হটিয়ে অজানাকে জয় করেছে।

ভিলেঙ্কিন ভুল কিছু বলেননি। স্ফীতি তত্ত্ব আসলে আমাদের সবচেয়ে অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রহস্যটির সমাধানের দিকে ইঙ্গিত করে —‘কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?’ এবং, এটি তৈরি করে প্রাকৃতিকভাবেই শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের নান্দনিক একটি ক্ষেত্র।

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব? অবিশ্বাস্য মনে হবে শুনলে। কিন্তু স্ফীতি তত্ত্ব সত্যি হলে এটাই হয়তো ঘটেছে বাস্তবে, তা আপাতদৃষ্টিতে যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন। স্ফীতি তত্ত্বের গণিত থেকেই বেরিয়ে এসেছে এটা। ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ উদ্ভবের

অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার ফলে পল স্টেইনহার্টের ‘চক্রাকার’বা ‘সাইক্লিক মডেলের সমাধি সূচিত হল। স্ফীতিতত্ত্বই বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব বলে অনেকেই মনে করছেন।

[84] Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang; 2007

ব্যাপারটা কোনো সায়েন্সফিকশন নয়, কিংবা নয় জুয়েল আইচের জাদু; বরং শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটা স্ফীতি তত্ত্ব থেকে আসা জোরালো অনুসিদ্ধান্তই। ধারণাটিকে গবেষণারত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা খুব গুরুত্বের সাথেই নিচ্ছেন এখন। তাঁরা জানেন স্ফীতি তত্ত্ব থেকে আসা অন্য উপসংহারগুলো যেহেতু পর্যবেক্ষণের সাথে মিলে গেছে, এটাকে পাগলামো বলে উড়িয়ে দিলে খুব ভুল হবে। আর শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটা অবাস্তব হলে পদার্থবিজ্ঞানের নামকরা জার্নালগুলোতে এর উল্লেখ পেতাম না[85], কিংবা বড় বড় বিজ্ঞানীদের লেখা (যেমন, অ্যালেন গুথের 'ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স', আলেকজান্ডর ভিলেঙ্কিনের 'মেনি ওয়ার্ল্ডস ইন ওয়ান', মিচিও কাকুর 'প্যারালাল ওয়ার্ল্ডস', ব্রায়ান গ্রিনের 'হিডেন রিয়ালিটি', স্টিফেন হকিং-এর 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' কিংবা 'গ্র্যান্ড ডিজাইন', এবং লরেন্স ক্রাউসের সাম্প্রতিক 'দ্য ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং') জনপ্রিয় ধারার বইগুলো বাজারে দেখতে পেতাম না। স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালেন গুথ মহাবিশ্বকে অভিহিত করেছেন, 'দ্য আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ' হিসেবে; তিনি স্ফীতি তত্ত্বের গণিত সমাধান করে উদ্বেলিত হয়ে বলেন –

> গ্রিক দার্শনিক লুক্রেটিয়াস খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে একটি বই লিখেছিলেন De Rerum Natura *(On the Nature of Things)* নামে। সে বইয়ে একটা লাইন ছিল –'শূন্য থেকে কোনো কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না'। ... তাঁর সেই দাবির ২০০০ বছর পর আজ মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্ব দাবি করছে, তাঁর দাবি সঠিক ছিল না।

প্রাকৃতিকভাবে মহাবিশ্বের তথা পদার্থের উদ্ভবের ব্যাপারটি আজ আর বিজ্ঞানের বাইরে নয়। দুই হাজার বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি ইঙ্গিত করছে লুক্রেটিয়াস নির্ঘাত ভুল ছিলেন। সঠিকভাবে বললে, আমাদের

---

85 উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, A. Vilenkin, "Creation of the Universe from Nothing," Physical Letters 117B: 25–8.,1982; Victor Stenger, "The Universe: the Ultimate Free Lunch", Eur J Phys 11, 236243, 1990; ইত্যাদি।

> চারদিকের আদি উপাদানগুলোর *সবকিছুই* শূন্য থেকে তৈরি হয়েছে। ‘সবকিছু’ বলতে কেবল আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যকার জিনিসগুলো নয়, এর বাইরের অনেক কিছুও এসে পড়বে। মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের কাঠামোতে বিচার করলে মহাবিশ্ব হচ্ছে *আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ*।

কিন্তু কিভাবে এত বিপুল মহাবিশ্ব, আর তার ভেতরের গ্রহ-নক্ষত্র, সৌরজগৎগুলো স্রেফ শূন্য থেকে রাতারাতি উদ্ভূত হতে পারে? প্রক্রিয়াটা ঠিক কী রকমের? এ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে শিগগিরই...

একাদশ অধ্যায়

কোয়ান্টাম শূন্যতা ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

'অসম্ভব ব্যাপারগুলোকে যখন তুমি বাদ দিয়ে দেবে, তখন যা পড়ে থাকবে তা যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, সেটাই অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্য'।

—আর্থার কোন্যান ডয়েল, ডক্টর ওয়াটসনকে শার্লক হোমস

একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছিল বইটি। 'এই যে আমাদের চারদিকের প্রকৃতি—চাঁদ, তারা, সূর্য, পৃথিবী, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন–এই সবকিছু এল কোথা থেকে?' Where did everything come from? নতুন কোনো প্রশ্ন নয় যদিও। আমাদের অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার দিকের খুব পুরনো প্রশ্ন এগুলো। কুমোর, কামার, জেলে, তাঁতি, শিক্ষক, শ্রমিক, রিকশাচালক কিংবা ব্লগার, যেই হোক না কেন, আর যে কাজেই আমরা জড়িত থাকি না কেন, কোনো এক রাতে খোলা আকাশের নিচে চলতে চলতে হঠাৎ এই অন্তিম প্রশ্নের ধাক্কায় শিহরিত হয়নি, এমন মানুষ বোধ হয় কম। একটুখানি জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরই খোকা মাকে শুধায় 'মা, এলাম আমি কোথা থেকে?' ইয়স্তেন গার্ডারের 'সোফির জগৎ'-এর শিশুচরিত্র সোফির হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল, 'এই জগৎটা কোথা থেকে এল' – এটা একটা খুব সংগত প্রশ্ন; 'জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল যে জগৎটা কোথা থেকে এলো এই ধরনের প্রশ্ন না করে এ জগতে বেঁচে থাকাটা ঠিক নয়'[86]। হ্যাঁ, এ ধরনের প্রশ্নের আঘাতে কেবল শিশু বা সাধারণ মানুষেরা নয়, আন্দোলিত হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন বিভিন্ন যুগের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতবিদ, চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক

[86] ইয়স্তেন গার্ডার, সোফির জগৎ, অনুবাদ, জি এইচ হাবীব, সন্দেশ, ২০০২।

কিংবা মরমি সাধকেরা। মজার ব্যাপার হলো, এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত এই প্রশ্নগুলো কেবল ধর্মবেত্তা আর ধর্মগুরুদেরই করায়ত্ত ছিল। তাঁরা এর উত্তর দিয়েছে প্রাচীন উপকথা আর নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। এ নিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলো সাজিয়েছে নানা ধরনের সৃষ্টিবাদী গল্পের পসরা। এ ছাড়া উপায় যে খুব ছিল তা নয়। আসলে অস্তিত্বের এ অন্তিম প্রশ্নগুলো গণ্য করা হতো বিজ্ঞানের জগতের বাইরের বিষয় হিসেবে। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে আমরা দেখছি, বিজ্ঞান বোধ হয় রূপকথা আর উপকথার জগৎ থেকে ক্রমশ আমাদের টেনে নিয়ে এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি করিয়ে দিতে চাইছে। মানবসভ্যতাকে যে রহস্য আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, দুই হাজার বছর ধরে দার্শনিক আর চিন্তাবিদেরা যে প্রশ্নের উত্তর আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে ফিরছিলেন, আধুনিক পদার্থবিদরা আমাদের শেষ পর্যন্ত সেই প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর হাজির করেছেন – 'সবকিছুই এসেছে শূন্য থেকে'। হ্যাঁ, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী আমাদের এই বিপুল মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে স্রেফ 'শূন্য' থেকে

না, শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটি নতুন কিছু নয়। যাঁরা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতির খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁরা সবাই মোটামুটি জানেন যে, বেশ অনেক দিন ধরেই এটি পদার্থবিজ্ঞানের মূলধারার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। সেই আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী এ নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকে আবার জনপ্রিয় ধারার বইপত্রও প্রকাশ করেছেন। তবে সেসব কিছুই মূলত ইংরেজিতে। বাংলায় এ ব্যাপারে রসদ ছিল একেবারেই কম। তার পরও কিছু চেষ্টা চালিয়েছিলাম মুক্তমনায় আমার নিজস্ব ব্লগে ও অন্যত্র। মনে পড়ছে, ২০০৫ সালে লেখা আমার (অ.রা) প্রথম বইটিতেই তথাকথিত শূন্য থেকে কিভাবে জড় কণিকার উৎপত্তি হয়, তা নিয়ে পাঠকদের জন্য বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম একটি অধ্যায়ে[87]। এর পর থেকে আমার নানা লেখায় বিষয়টি

---

[87] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫; মূল বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঘুরেফিরে এসেছে বিভিন্ন সময়েই। সম্প্রতি স্টিফেন হকিং-এর ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’[88] ও লরেন্স ক্রাউসের ‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ নামের বইটি রিভিউ করতে গিয়েও এ বিষয়টির কিছু পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছিল[89]। তার পরও লেখক হিসেবে কোথায় যেন খেদ থেকে গিয়েছিল একটা। খেদটা বোধ হয় অপূর্ণতার। ব্লগে ও ম্যাগাজিনে কিংবা এদিক-সেদিকে লেখালেখি করলেও বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ কোনো পূর্ণাঙ্গ বইয়ের জন্য সেভাবে বিষয়টি নিয়ে লেখা হয়ে ওঠেনি। আমাদের এবারকার বইয়ের বিষয়বস্তুই যেহেতু ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’, আমরা এই ধারণাটির পেছনের ইতিহাস এবং কিছু কারিগরি দিক নিয়ে আগের চেয়ে কিছুটা বিস্তৃত জায়গায় পৌঁছে যেতে পারব বলে আশা করছি।

শূন্য থেকে কীভাবে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে সেটা জানতে হলে প্রথমে আমাদের কোয়ান্টাম শূন্যতার ব্যাপারটি বুঝতে হবে। আসলে খুব কম কথায় বললে, কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্য-দেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষ্মস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থ-কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকট্রন ও পজিট্রন (পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল) থেকে পদার্থ তৈরি হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। এই ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মধ্যকার ব্যবধান থাকে $১০^{-১০}$ সেন্টিমিটারেরও কম, এবং পুরো ব্যাপারটার স্থায়িত্বকাল মাত্র $১০^{-২১}$ সেকেন্ড[90]। ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’।

---

[88] স্টিফেন হকিং-এর বইটির রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে অভিজিৎ রায়, শহিদুল ইসলাম ও ফরিদ আহমেদ সম্পাদিত (সভাপতি অজয় রায়) ‘বিশ্বাস ও বিজ্ঞান’ (চারদিক, ২০১২) বইয়ে।

[89] অভিজিৎ রায়, অস্তিত্বের অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?, মুক্তমনা, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০১২

[90] আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, পূর্বোক্ত।

আমরা এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে আপেক্ষিকতা থেকে আসা আইনস্টাইনের ক্ষেত্র-সমীকরণের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে, আইনস্টাইন তাঁর মহাবিশ্বকে প্রথমে 'স্থিতিশীল' একটা রূপ দেওয়ার জন্য একটা ধ্রুবক যোগ করেছিলেন, তারপর সেটাকে 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল' বলে বাদও দিয়েছিলেন। কিন্তু ছয় দশক পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও গুপ্ত শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন, আইনস্টাইন আসলে ভুল ছিলেন না। আইনস্টাইনের মতো তাঁদেরও ক্ষেত্রসমীকরণে তাঁদের একটা ধ্রুবক যোগ করতেই হচ্ছে, আর সেই ধ্রুবকটা বসছে সমীকরণের ডান দিকে ($G_{\mu\nu} = 8\pi G[T_{\mu\nu} + \rho_{vac} g_{\mu\nu}]$)। প্রতীক দেখেই অনেকে অনুমান করে নিতে পারবেন, ডান পাশে বসানো $8\pi G[\rho_{vac} g_{\mu\nu}]$ — এই কিম্ভূতকিমাকার পদটি আসলে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যতার মধ্যে নিহিত শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মানে এই ক্ষেত্র-সমীকরণ সঠিক হলে শূন্যতার মধ্যেই কিন্তু একধরনের শক্তি লুকিয়ে আছে; আর সেটাই তৈরি করে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে পদার্থ তৈরির প্রাথমিক ক্ষেত্র।

ব্যাপারটা আরেকটু বিস্তৃত করা যাক। 'রহস্যময়' এই শূন্য শক্তি কিংবা ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্বের কাঁধে ভর করে। ১৯২৭ সালে জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ গাণিতিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, কোনো বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ যুগপৎ একসাথে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুর অবস্থান ঠিকঠাকমতো মাপতে গেলে দেখা যাবে, ভরবেগের তথ্য যাচ্ছে হারিয়ে, আবার ভরবেগ চুলচেরাভাবে পরিমাপ করতে গেলে বস্তুর অবস্থান অজানাই থেকে যাবে। কাজেই হাইজেনবার্গের এই সূত্র সত্যি হয়ে থাকলে, এমনকি 'পরম শূন্যে'ও একটি কণার 'ফ্লাকচুয়েশন' বজায় থাকার কথা, কারণ কণাটি নিশ্চল হয়ে যাওয়ার অর্থই হবে এর অবস্থান ও ভরবেগ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত তথ্য জানিয়ে দেওয়া, যা প্রকারান্তরে হাইজেনবার্গের

অনিশ্চয়তা তত্ত্বের লঙ্ঘন[91]। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন কোনো রূপকথা নয়, নয় কেবল গাণিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন।

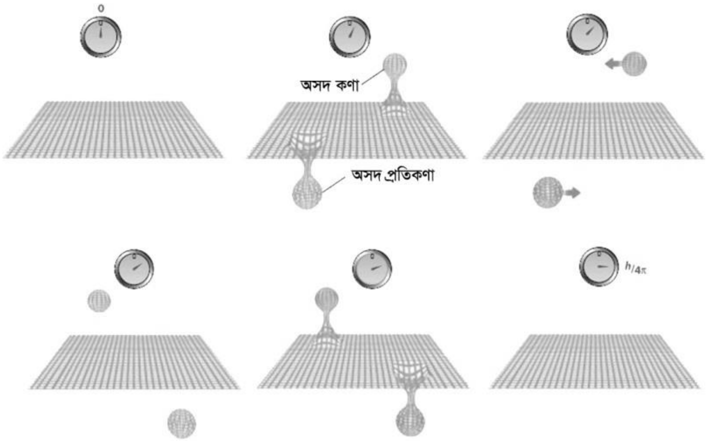

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন,যে শূন্য-দেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত,সমাহিত মনে হচ্ছে,তার সূক্ষ্মস্তরে সব সময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থ-কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। এ প্রক্রিয়াটির মূলে রয়েছে 'রহস্যময়' কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বা তথাকথিত 'জিরো পয়েন্ট এনার্জি'। এ প্রক্রিয়ায় পদার্থ ও প্রতিপদার্থ যুগলের আকারে যে অসদ কণিকা (virtual particle) প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে তা হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুযায়ী প্লাঙ্ক ধ্রুবকের পরিসীমার মধ্যে বিলীন হয়ে যায় (ছবির উৎস: সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ডিসেম্বর ১৯৯৭ সংখ্যা)।

একটি প্রমাণ হচ্ছে 'ল্যাম্ব শিফট', যা আহিত পরমাণুর মধ্যস্থিত দুটো স্তরে শক্তির তারতম্য প্রকাশ করে[92]। আরেকটি প্রমাণ হলো টপ কোয়ার্কের ভরের পরিমাপ[93]। তবে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে

---

[91] Philip Yam, Exploiting Zero-Point Energy, Scientific American, 1997

[92] বিজ্ঞানী উইলস ল্যাম্ব ১৯৫৩ সালে ল্যাম্বশিফট আবিস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

[93] জাপানি বিজ্ঞানী মাকাতো কোবায়াশি ও তোশিহিদে মাসকাওয়া ২০০৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭৩ সালে টপ কোয়ার্কসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর জন্য। টপ কোয়ার্ক ১৯৯৫ সালে ফার্মি ল্যাবে আবিষ্কৃত হয়।

বিখ্যাত ‘কাসিমিরের প্রভাব’ থেকে। ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিক কাসিমির বলেছিলেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন সত্যি হয়ে থাকলে দুটো ধাতব পাত খুব কাছাকাছি আনা হলে দেখা যাবে তারা একে অন্যকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করছে। এর কারণ হচ্ছে, ধাতব পাতগুলোর মধ্যকার সংকীর্ণ স্থানটিতে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িচ্চুম্বকীয় ‘মোড’-এর উদ্ভব ঘটে আর যেহেতু পাতগুলোর বাইরে সব কম্পাঙ্কের মোডেরই সৃষ্টি হতে পারে, সেহেতু বাইরের অধিকতর চাপ ধাতব পাতগুলোকে একে অপরের দিকে আকর্ষণে বাধ্য করে। এ ব্যাপারটিই পরবর্তীতে মার্ক্স স্প্যার্নে, স্টিভ লেমোরাক্স, উমর মহিদিন[94] প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

বিজ্ঞানীরা আজ মনে করেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ‘রহস্যময়’ ব্যাপারগুলো কণার ক্ষেত্রে যেমনিভাবে সত্য, ঠিক তেমনিভাবে মহাবিশ্বের জন্যও এইরকমভাবে সত্য হতে পারে। তারা মনে করেন এক সুদূর অতীতে কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের (Quantum Fluctuation) মধ্য দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীতির (Inflation) দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং আরো পরে পদার্থ আর কাঠামো তৈরির পথ সুগম করেছে। এগুলো কোনো বানানো গল্প নয়। মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে প্রথম এ ধারণাটি ব্যক্ত করেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে ‘নেচার’ নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে[95]। ট্রিয়নের এ প্রকাশনাটার পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৭০ সালে ট্রিয়ন একটি পদার্থবিজ্ঞানের সেমিনারে সামনের সারিতে বসে আলোচনা শুনছিলেন।

---

[94] Mohideen, U.; Roy, Anushree (1998). "Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to 0.9 µm". Physical Review Letters 81 (21): 4549.
[95] E.P. Tryon, “Is the Universe a Vacuum Fluctuation?”, Nature 246 (1973): 396-97.

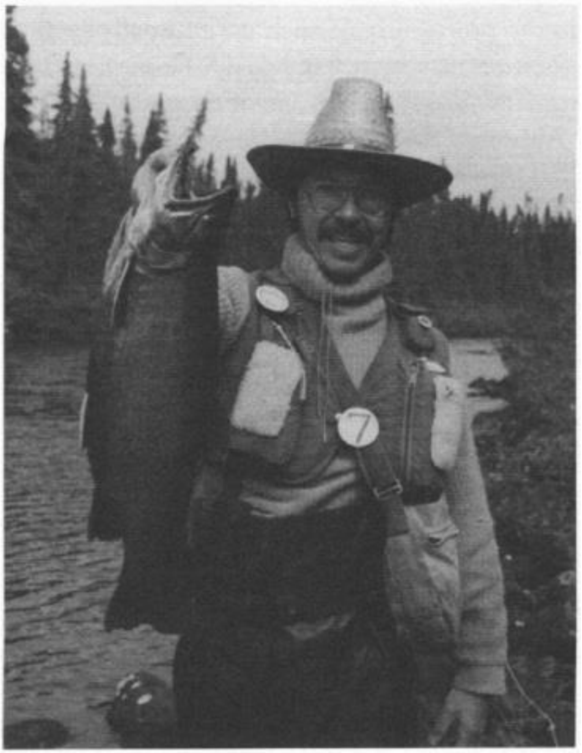

এডওয়ার্ড ট্রিয়ন, যিনি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি মাছ শিকারেও দারুণ উৎসাহী । ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'নেচার'-এ প্রথমবারের মত ব্যক্ত করেছিলেন যে মহাবিশ্ব স্রেফ ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ফসল হিসেবে শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে (ছবির উৎস: অ্যালেন গুথ, ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স, ১৯৯৭)

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ওপর কোনো এক বক্তার গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনছিলেন তিনি সেখানে। আর বসে বসে বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলেনও। এমনি সময় হঠাৎ যেন তাঁর মাথায় বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো খেলে গেল এক দুরন্ত অবিনাশী চিন্তা; আর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল স্বগতোক্তি —'মে বি...আমাদের মহাবিশ্বটা আসলে স্রেফ ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ফসল' ছাড়া কিছু নয়। বক্তা বক্তৃতা থামিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য তাঁর দিকে তাকালেন। এর মধ্যে পুরো সভাঘর অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। সবাই ভাবলেন, ট্রিয়ন যেন কোনো মজার কৌতুক করেছেন।

কিন্তু ট্রিয়নের জন্য বিষয়টা কোনো 'কৌতুক' ছিল না। তিনি সেমিনার শেষে পুরো বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবলেন। এক দিন দুই দিন নয়, এভাবে ভেবেই চললেন অন্তত দুই বছর ধরে। এর মধ্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে নিজের গণনাগুলো ঝালাই করলেন, দু-একজন সহকর্মীর সাথেও হাল্কা আলাপ করলেন নিজের প্রস্তাবিত মডেলটি নিয়ে। তিনি শেষমেশ বুঝতে পারলেন, এ ধারণা সাদা চোখে যত অবাস্তবই লাগুক না কেন, এভাবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি অসম্ভব কিছু নয়। শার্লক হোমস যেমনটি বলতেন, 'When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth', ট্রিয়নেরও হয়তো সেরকমই কিছু মনে হয়ে থাকবে! ট্রিয়ন প্রথমে তাঁর যুগান্তকারী ধারণাসংলিত গবেষণাপত্রটি নেচার জার্নালে 'লেটার টু দ্য এডিটর' ফরম্যাটে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জার্নালের সম্পাদকেরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে একে 'ফিচার আর্টিকেল' হিসেবে প্রকাশ করেন, 'মহাবিশ্ব কি একটি ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন? ' শিরোনামে, ১৯৭৩ সালে।

এর পর এল আশির দশক—স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের কাল। ট্রিয়নের সেই পুরনো পেপারের গুরুত্ব নতুন করে অনুভূত হলো যেন। এই সময়ে আলেক্সেই স্তারোবিনস্কি[96], ডেমোস কাজানাস[97], অ্যালেন গুথ[98] এবং আঁদ্রে লিন্ডে[99] পৃথক পৃথকভাবে মহাবিশ্বের উৎপত্তির বিষয়ে নিজস্ব ফলাফল প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণাগুলো বর্তমানে 'স্ফীতিশীল মহাবিশ্ব' (Inflationary Universe) হিসেবে প্রমিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের (standard cosmology) অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। তাঁদের কাজের সূত্র ধরে বহু বিজ্ঞানী পরবর্তীতে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণাকে

96 A.A. Starobinsky, A new type of isotropic cosmological models without singularity, Phys. Lett. B 91 (1), 99-102, 1980.

97 Demos Kazanas, "Dynamics of the Universe and Spontaneous Symmetry, Breaking," Astrophysical Journal 241 (1980): L59-L65

98 Alan Guth, "Infiationary universe: A possible solution to the horizon and fiatness problems", Physical Review, D23, no. 2, 1981

99 Andrie Linde, "A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems," Physics Letters B 108, 389,1982.

স্ফীতি তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের আবির্ভাবের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন[100]। শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উৎপত্তির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তই হতো, তবে সেগুলো পিয়ার-রিভিউড বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী (Scientific Journal)গুলোতে কখনোই প্রকাশিত হতো না। মূলত স্ফীতি তত্ত্বকে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে, এবং প্রায় সবগুলোতেই এই তত্ত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে[101]। স্ফীতি তত্ত্ব গ্যালাক্সির ক্লাস্টারিং, এক্স রশ্মি এবং অবলোহিত তরঙ্গের বিন্যাস, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার এবং এর বয়স, মহাবিশ্ব গঠনে এর উপাদানগুলোর প্রাচুর্য – এগুলোর প্রায় সবগুলোই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে অনুপম সৌন্দর্যে। আমি (অ.রা) এর কারিগরি দিকগুলো নিয়ে বিস্তৃতভাবে মুক্তমনায় একটা লেখা লিখেছিলাম বাংলায়—‘স্ফীতি তত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের উদ্ভব’ শিরোনামে[102]। বছর কয়েক আগে সায়েন্স ওয়ার্ল্ড ও ‘জিরো টু ইনফিনিটি’ ম্যাগাজিনের জন্য কিছু লেখা লিখেছিলাম একই শিরোনামে। লেখাগুলো পরবর্তীতে

---

[100] উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু সাম্প্রতিক পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :

* David Atkatz and Heinz Pagels, “Origin Of The Universe as a Quantum Tunneling Event” Physical review D25, 2065-73, 1982
* S.W. Hawking and I.G.Moss “Supercooled Phase Transitions in the Very Early Universe “, Physics letters B110, 35-38, 1982
* Alexander Vilenkin, “Creation of Universe from Nothing” Physics letters 117B, 25-28, 1982
* Alexander Vilenkin, “Quantum Origin of the Universe” Nuclear Physics B252, 141-152, 1985
* Andre Linde, “Quantum creation of the inflationary Universe,” Letter Al Nuovo Cimento 3, 401-405, 1984
* Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch,” European Journal of Physics 11, 236-243, 1990 ইত্যাদি।

[101] বিস্তারিত তথ্যের জন্য The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দেখুন; কিংবা অতি সাম্প্রতিক কালের ফলাফল: Planck Collaboration et al, Planck 2013 results. XXII. Constraints on inflation, arXiv:1303.5082।

[102] একই লেখা একটু পরিবর্তিত আকারে মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের ২০০৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় (বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬০, ডিসেম্বর ২০০৬) ‘ইনফেশন থিওরি : স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং মডেলের বিদায় কি তবে আসন্ন?’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার (অ.রা) এবং রায়হান আবীরের লেখা ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২) বইয়ে সংকলিত হয়েছিল। সে বইটিতে প্রাকৃতিকভাবে কিভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছাড়াও এর অস্তিত্বের পেছনে একটি আদি ঐশ্বরিক কারণের খণ্ডন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব উৎপত্তির পেছনে কোনো মিরাকলের খণ্ডন ছাড়াও পদার্থের উৎপত্তি, শৃঙ্খলার সূচনাসহ বহু ধরনের ‘শুরুর দিককার’ সমস্যা যেগুলো নিয়ে নানাভাবে ‘জল ঘোলা করার’ চেষ্টা করা হয়, সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সেই বই থেকে কিছু প্রয়োজনীয় অংশের উল্লেখ করা যাক একটু পরিবর্তিত আকারে[103]:

পদার্থের উৎপত্তি

বিংশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত মহাবিশ্বের উৎপত্তিতে যে একটি বা বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিল তা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানতেন। আমরা জানি, মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ পদার্থ দিয়ে গঠিত। আর পদার্থের ধর্ম হলো এর ভর। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধারণা করা হতো, ভরের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এটি শুধু এক রূপ থেকে আরেক রূপে পরিবর্তিত হয়। শক্তির নিত্যতার সূত্রের মতো এটি ভরের নিত্যতার সূত্র। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ ভর দেখে সবাই ধারণা করে নিয়েছিলেন একদম শুরুতে ভর সৃষ্টি হবার মতো একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যা সরাসরি ভরের নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন। এবং এটি ঘটেছিল মাত্র একবারই—মহাবিশ্বের সূচনাকালে।

পদার্থের অনেক সংজ্ঞা আমরা জানি। আমাদের কাছে এর সবচেয়ে দুর্দান্ত ও সহজ সংজ্ঞা হলো, পদার্থ এমন একটি জিনিস যাকে ধাক্কা মারা হলে এটি পাল্টা ধাক্কা মারে। কোনো বস্তুর মধ্যকার পদার্থের পরিমাপ করা যায় এর ভরের সাহায্যে। একটি বস্তুর ভর যত বেশি তাকে ধাক্কা মারা হলে ফিরিয়ে দেওয়া ধাক্কার শক্তি তত বেশি। বস্তু যখন

[103] অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীর, অবিশ্বাসের দর্শন, শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুনর্মুদ্রণ ২০১২

চলা শুরু করে তখন সেই চলাটাকে বর্ণনা করা হয় ভরবেগ বা মোমেন্টামের মাধ্যমে, যা বস্তুর ভর ও বস্তুর যে গতিতে চলছে তার গুণফলের সমান। মোমেন্টাম বা ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি, এর দিক ও বস্তুর গতির দিক একই।

ভর ও মোমেন্টাম দুটি জিনিসই পদার্থের আরেকটি ধর্মকে যথাযথভাবে সমর্থন করে, যাকে আমরা বলি ইনারশিয়া বা জড়তা। একটি বস্তুর ভর যত বেশি তত এটিকে নাড়ানো কঠিন এবং এটি নড়তে থাকলে সেটাকে থামানো কঠিন। একই সাথে বস্তুর মোমেন্টাম যত বেশি তত একে থামানো কষ্ট, থেমে থাকলে চালাতে কষ্ট। অর্থাৎ বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন।

বস্তুর গতির আরেকটি পরিমাপযোগ্য ধর্ম হলো এর শক্তি। শক্তি, ভর ও মোমেন্টাম থেকে স্বাধীন কোনো ব্যাপার নয়, এই তিনটি একই সাথে সম্পর্কিত। তিনটির মধ্যে দুটির মান জানা থাকলে অপরটি গাণিতিকভাবে বের করা সম্ভব।

লক্ষ করুন, কোনো বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন এর মোমেন্টাম শূন্য এবং এর শক্তি ভরের সমান (E=m)। এই শক্তিকে বলা হয়ে থাকে পদার্থের স্থিতিশক্তি। এটাই আইনস্টাইনের বিখ্যাত গাণিতিক সম্পর্ক $E=mc^2$ যেখানে c মান[104] ১। ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর এই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, শক্তি থেকে ভরের উৎপত্তি সম্ভব এবং একই সাথে শক্তির মাঝে ভরের হারিয়ে যাওয়া সম্ভব

---

[104] আমরা জানি, আলো প্রতি সেকেন্ডে যায় 300,000 কিলোমিটার (বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল)। কাজেই সে হিসাবে প্রতিবছরে (অর্থাৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০ সেকেন্ড) আলো কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তা আমরা বের করতে পারি। 9.4605284×10^{15} মিটার। সেটাকেই ১ আলোকবর্ষ বা 1 light year বলে। কাজেই c=1 light-year per year.

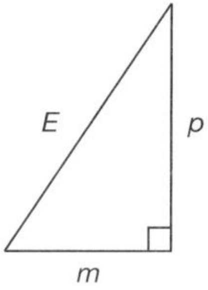

$$E^2 = p^2 + m^2$$

(ছবির উৎস: ভিক্টর স্টেঙ্গর, নিউ এথিজম, ২০০৯) ।

ভর, মোমেন্টাম ও শক্তি এই তিনটি রাশি দিয়ে আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকতে পারি। সমকোণী ত্রিভুজটির লম্ব হলো মোমেন্টাম p, ভূমি ভর m আর অতিভুজ শক্তি E। এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করে এই তিনটির সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।

স্থির অবস্থায় বস্তুর স্থিতিশক্তি ও ভরের মান সমান। এখন বস্তুটি যদি চলা শুরু করে তখন এর শক্তির মান পূর্ববর্তী স্থিতিশক্তির চেয়ে বেশি হতে শুরু করবে। অতিরিক্ত এই শক্তিকেই আমরা বলি, গতিশক্তি। রাসায়নিক ও নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা আদতে বস্তুর ভর[105]। একই সাথে উল্টো ব্যাপারও ঘটে। ভর বা স্থিতিশক্তিকে রাসায়নিক ও নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ফলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, আর সেটা করে আমরা ইঞ্জিন চালাতে পারি, কেউ কেউ আবার একই পদ্ধতি প্রয়োগে বোমা মেরে সব উড়িয়ে দিতে চায়।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, মহাবিশ্বের ভরের উপস্থিতি কোনো ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন করে না। শক্তি থেকে ভর উৎপত্তি সম্ভব একই সাথে

[105] সাধারণভাবে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, শুধু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমেই স্থিতিশক্তি থেকে গতিশক্তি বা গতি শক্তি থেকে স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরের ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু একই সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও এমনটা ঘটে। তবে ব্যাপার হলো, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের ভর খুব নগণ্য থাকে বিধায় বোঝা মুশকিল হয়।

ভরের শক্তিতে রূপান্তর হওয়াটাও একেবারে প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার। সুতরাং মহাবিশ্ব উৎপত্তির সময় ভরের উৎপত্তি জনিত কোনো মিরাকল বা অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আদিতে শক্তি তবে এল কোথা থেকে?

শক্তির নিত্যতা সূত্র বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি, শক্তিকে অন্য কোথাও থেকে আসতে হবে। আমরা ধর্মীয় অলৌকিকতার প্রমাণ পেতাম যদি কেউ দেখাত যে আজ থেকে চোদ্দ শ কোটি বছর আগে বিগ ব্যাং-এর শুরুতে শক্তির নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন ঘটেছিল, আর ঈশ্বর বা কোনো অপার্থিব সত্তার হাত ছাড়া উৎপত্তির আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মোটেও ব্যাপারটি এমন নয়। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী একটি বদ্ধ সিস্টেমে মোট শক্তির পরিমাপ স্থির থাকলেই কেবল শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। মজার এবং আসলেই দারুণ মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য[106]! বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর ১৯৮৮-এর সর্বাধিক বিক্রিত বই, 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (A Brief History of Time)-এ উল্লেখ করেছেন, যদি এমন একটা মহাবিশ্ব ধরে নেওয়া যায়, যেটা মহাশূন্যে মোটামুটি সমস্বত্ব, তাহলে দেখানো সম্ভব, যে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি এবং ধনাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি ঠিক ঠিক কাটাকাটি যায়। তাই মহাবিশ্বের মোট শক্তি থাকে শূন্য[107]। বিশেষ

---

[106] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা নং. ১২৯।

[107] ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান খুব পরিষ্কারভাবেই আমাদের দেখিয়েছে মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য; মহাবিশ্বের মোট গতিশক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের ঋণাত্মক শক্তি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্বের জন্য বাইরে থেকে আলাদা সৃষ্টি কোনো শক্তি আমদানি করার প্রয়োজন হয়নি। সহজ কথায়, ইনফ্লেশন ঘটাতে যদি শক্তির নিট ব্যয় যদি শূন্য হয়, তবে বাইরে থেকে কোনো শক্তি আমদানি করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যালান গুথ ও স্টেইনহার্ট নিউ ফিজিক্স জার্নালে (১৯৮৯) দেখিয়েছেন, ইনফ্লেশনের জন্য কোনো তাপগতীয় কাজের দরকার পড়ে না। স্টিফেন হকিং তাঁর অতি সাম্প্রতিক'গ্র্যান্ড ডিজাইন'বইয়ে সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে,এই মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবেই শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কোনো অলৌকিক কিংবা অপার্থিব সত্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

করে, পরিমাপের অতি সূক্ষ্ম বিচ্যুতি ধরে নিলেও, ক্ষুদ্র কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার মধ্যে, মহাবিশ্বের গড় শক্তির ঘনত্ব ঠিক ততটাই দেখা যায়, যতটা হতো সবকিছু একটা শূন্য শক্তির আদি অবস্থা থেকে শুরু হলে[108]।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তির এই ভারসাম্যের কথা নিশ্চিত করে বিগ ব্যাং তত্ত্বের বর্তমান পরিবর্ধিত রূপ 'ইনফ্লেশনারি বিগ ব্যাং' ধারণার সত্যতা, যেটা নিয়ে আমরা দশম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। আমরা এও জেনেছি, ইনফ্লেশন থিওরি প্রস্তাব করার পর একে নানাভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হয়েছে। যেকোনো পরীক্ষায় ব্যর্থ বা ভুল ফলাফল দানই এই তত্ত্বকে বাতিল করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এটি এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলেই গবেষকেরা মনে করেন[109]।

সংক্ষেপে, মহাবিশ্বে পদার্থ ও শক্তির উপস্থিতি কোনো ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ধর্মীয় গ্রন্থের বাণীগুলো এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কাল্পনিক গালগল্প ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের দেখাচ্ছে কারও হস্তক্ষেপ নয়, বরং একদম প্রাকৃতিকভাবেই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

এই জায়গায় এসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। অনেকেই বলে থাকেন, বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলার সামর্থ্য বা সাধ্য নেই। যদি দেখা যেত, বিজ্ঞানীদের গণনাকৃত ভর-ঘনত্বের (mass density) মান মহাবিশ্বকে একদম শূন্য শক্তি অবস্থা (state of zero energy) থেকে উৎপত্তি হতে যা প্রয়োজন সেরকমের কিছু আসেনি, কিংবা সূচনালগ্নে মহাবিশ্ব বানাতে বাইরে থেকে

---

[108] V.Faraoni এবং F. I. Cooperstock, *'On the Total Energy of Open Friedmann- Robertson-Walker Universes',* Astrophysical Journal 587 (2003): 483-86

[109] Alan Guth, *The Inflationary Universe* , New York: Addison-Wesley, 1997; আরো দেখুন - Anthony Aguirre, *How did Our Universe Come to be?,* Astronomy's 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

শক্তি সরবরাহ অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারতাম, এখনে অন্য কোনো অপ্রাকৃত সত্তার হাত ছিল। সেজন্যই ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী লিওনার্ড ম্লোডিনোর সাথে লেখা সাম্প্রতিক 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়ে স্টিফেন হকিং উল্লেখ করেছেন[110] -

> মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র কার্যকর রয়েছে, তাই একদম শূন্যতা থেকেও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব এবং সেটি অবশ্যম্ভাবী। 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি' হওয়ার কারণেই 'দেয়ার ইজ সামথিং, রদার দ্যান নাথিং', সে কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের। মহাবিশ্ব উৎপত্তির সময় বাতি জ্বালানোর জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।

শৃঙ্খলার সূচনা

সৃষ্টিবাদের আরেকটি অনুমানও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে মেলে না। যদি মহাবিশ্বকে সৃষ্টিই করা হয়ে থাকে তাহলে সৃষ্টির আদিতে এর মধ্যে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা থাকবে— একটি নকশা থাকবে যেটার নকশাকার স্বয়ং স্রষ্টা। এই যে আদি শৃঙ্খলা, এটার সম্ভাব্যতাকে সাধারণত প্রকাশ করা হয় তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের আকারে। এই সূত্রমতে, কোনো একটা আবদ্ধ সিস্টেমের সবকিছু হয় একইরকম সাজানো-গোছানো থাকবে (এন্ট্রপি স্থির) অথবা সময়ের সাথে সাথে বিশৃঙ্খল হতে থাকবে (অর্থাৎ এন্ট্রপি বা বিশৃঙ্খলা বাড়তেই থাকবে)। একটি সিস্টেমের এই বিক্ষিপ্ততা কমানো যেতে পারে শুধু বাইরে থেকে যদি কেউ সেটাকে গুছিয়ে দেয় তখন। তবে বাইরে থেকে কোনো কিছু সিস্টেমকে প্রভাবিত করলে সেই সিস্টেম আর আবদ্ধ সিস্টেম থাকে না।

তাপগতিবিদ্যার এই দ্বিতীয় সূত্রটি প্রকৃতির অন্যতম একটি মৌলিক সূত্র, যার

---

110 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010

কখনো অন্যথা হয় না। কিন্তু আমরা চারপাশে তাকালে এলোমেলো অনেক কিছুর সাথে সাথে সাজানোগোছানো অনেক কিছুই দেখি। আমরা একধরনের শৃঙ্খলা দেখতে পাই যেটা প্রকৃতির নিয়মেই (তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র) দিনে দিনে বিশৃঙ্খল হচ্ছে (যেমন তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অথবা ক্ষয়ে যেতে থাকে পুরনো প্রাসাদ)। তার মানে সৃষ্টির আদিতে নিশ্চয়ই সবকিছুকে একরকম ‘পরম শৃঙ্খলা’ দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতির সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া তাপগতিবিদ্যা মেনে সেই শৃঙ্খলাকে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খল করে চলেছে। তাহলে শুরুতে এই শৃঙ্খলার সূচনা করল কে?

কে আবার? নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা! ১৯২৯-এর আগ পর্যন্ত সৃষ্টিবাদের পেছনে এটাই ছিল অলৌকিক সৃষ্টিবাদীদের এটা একটা শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। কিন্তু সে বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল পর্যবেক্ষণ করলেন যে গ্যালাক্সিসমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নিজেদের দূরত্বের সমানুপাতিক হারে। অর্থাৎ দুইটা গ্যালাক্সির পারস্পরিক দূরত্ব যত বেশি, একে অপর থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি। এই পর্যবেক্ষণই বিগ ব্যাং তত্ত্বের সর্বপ্রথম আলামত। আর আমরা জানি, একটা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব চরম বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু হলেও এর মধ্যে আঞ্চলিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ সবকিছু এলোমেলোভাবে শুরু হলেও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে ভঙ্গ না করেও প্রসারণশীল কোনো সিস্টেমের কোনো কোনো অংশে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

ব্যাপারটাকে একটা গৃহস্থালির উঠানের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করা যায়। ধরুন, যখনই আপনি আপনার বাড়ি পরিষ্কার করেন তখন জোগাড় হওয়া ময়লাগুলো জানালা দিয়ে বাড়ির উঠানে ফেলে দেন। এভাবে যদিও দিনে দিনে উঠানটা ময়লা-আবর্জনায় ভরে যেতে থাকে, ঘরটা কিন্তু সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কারই থাকে। এভাবে বছরের পর বছর চালিয়ে যেতে হলে যেটা করতে হবে উঠান সব আবর্জনায় ভরে গেলে আশপাশের নতুন জমি কিনে ফেলতে হবে। তারপর সেসব জমিকেও

ময়লা ফেলার উঠান হিসেবে ব্যবহার করলেই হলো। তার মানে এভাবে আপনি আপনার ঘরের মধ্যে একটা আঞ্চলিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন কিন্তু এর জন্য বাদবাকি জায়গায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

একইভাবে মহাবিশ্বের একটি অংশে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেতে পারে, যদি সেখানে সৃষ্ট এন্ট্রপি (বিশৃঙ্খলা) ক্রমাগতভাবে বাইরের সেই চিরবর্ধনশীল মহাশূন্যে ছুড়ে দেওয়া হয়। ওপরের চিত্রে আমরা দেখি, মহাবিশ্বের সার্বিক বিশৃঙ্খলা তাপগতিবিদ্যা মেনেই ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে[111]। কিন্তু মহাবিশ্বের আয়তনও আবার বাড়ছে ক্রমাগত। সেই বর্ধিত আয়তন (স্পেস)-কে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলায় ভরে ফেলতে যে বাড়তি এন্ট্রপি লাগত সেটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য-বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ওপরের ছবি থেকেই আমরা দেখি বাস্তবে বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধির হার ততটা নয়। আর বিশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি মানেই শৃঙ্খলা। তাই এই বাড়তি স্থানে অনিবার্যভাবেই শৃঙ্খলার উদ্ভব হচ্ছে, এবং সেটা তাপগতিবিদ্যার কোনো সূত্রকে ভঙ্গ না করেই।

ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা যায়। আমরা জানি, কোনো একটা গোলকের (আমরা এখানে মহাবিশ্বকে গোলক কল্পনা করছি) এন্ট্রপি যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে সেই গোলকটা কৃষ্ণগহ্বরে (Black hole) পরিণত হয়। অর্থাৎ ঐ গোলকের আয়তনের একটা ব্ল্যাক হোলই হচ্ছে একমাত্র বস্তু যার এন্ট্রপি ঐ আয়তনের জন্য সর্বোচ্চ। কিন্তু আমাদের এই ক্রমপ্রসারণশীল মহাবিশ্ব তো পুরোটাই একটা কৃষ্ণগহ্বর নয়। তার মানে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি (বিশৃঙ্খলা) সম্ভাব্য-সর্বোচ্চের চেয়ে কিছুটা হলেও কম। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে যদিও বিশৃঙ্খলা বাড়ছে ক্রমাগত, তার পরও আমাদের মহাবিশ্ব এখনো সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল নয়। কিন্তু একসময় ছিল। একদম শুরুতে।

---

[111] চিত্রটির গাণিতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, Victor J. Stenger এর *Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe*, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003 বইয়ের appendix C, পৃষ্ঠা নং ৩৫৬-৫৭ তে।

ধরুন, যদি আমরা মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে পেছনের দিকে ১৩৮০ কোটি বছর ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে আমরা পৌঁছুব সংজ্ঞাযোগ্য একদম আদিতম সময়ে অর্থাৎ প্লাঙ্ক সময় ৬.৪ x ১০$^{-৪৪}$ সেকেন্ডে যখন মহাবিশ্ব ছিল ততটাই ক্ষুদ্র যার চেয়ে ক্ষুদ্রতম কিছু স্পেসে থাকতে পারে না। এটাকে বলা হয় প্লাঙ্ক গোলক যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের (১.৬x১০$^{-৩৫}$ মিটার) সমান। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে যেমন অনুমান করা হয় তখন মহাবিশ্বের মোট এন্ট্রপি এখনকার মোট এন্ট্রপির চেয়ে তেমনভাবেই কম ছিল। অবশ্য প্লাঙ্ক গোলকের মতো একটা ক্ষুদ্রতম গোলকের পক্ষে সর্বোচ্চ যতটা এন্ট্রপি ধারণ করা সম্ভব তখন মহাবিশ্বের এন্ট্রপি ঠিক ততটাই ছিল। কারণ একমাত্র কোনো ব্ল্যাক হোলের পক্ষেই প্লাঙ্ক গোলকের মতো এতটা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করা সম্ভব। আর আমরা জানি, ব্ল্যাক হোলের এন্ট্রপি সব সময়ই সর্বোচ্চ।

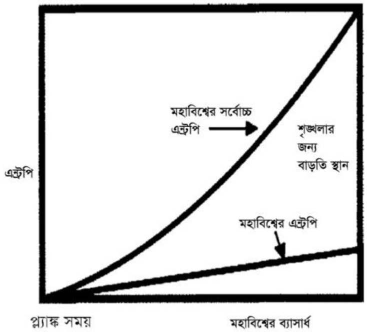

এখানে মহাবিশ্বের সর্বমোট-এন্ট্রপি এবং সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য-এন্ট্রপিকে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধের ফাংশন আকারে আঁকা হয়েছে। আমাদের মহাবিশ্ব সব সময়ই নিচের রেখা বরাবর প্রসারিত হবে, এবং সেটাই হচ্ছে। কিন্তু নিচের রেখাটি কেবল একটা সময়েই ওপরের রেখার সাথে মিলে যাবে—সেটা হচ্ছে মহাবিশ্বের উদ্ভবের সময় (প্লাঙ্ক সময়ে)। নিচের মহাবিশ্বের প্রকৃত এন্ট্রপি সূচক রেখাটি ওপরের রেখার (যেটি মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ এন্ট্রপি সূচক) সাথে মিলে যাবার অর্থ হলো, সূচনালগ্নে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু যেহেতু মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমাণ, তাই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ এন্ট্রপি তার প্রকৃত এন্ট্রপির চেয়ে দ্রুত হারে বাড়ছে, আর তার ফলে বাড়তি স্থানে মহাবিশ্বের কোনো কোনো অংশে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ভঙ্গ না করেই (ছবির উৎস: ভিক্টর স্টেঙ্গর, গড— দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস, ২০০৭)

অনেকে এই তত্ত্ব শুনে অনেক সময়ই যে আপত্তি জানান সেটা হলো, 'আমাদের হাতে এখনো প্লাঙ্ক সময়ের পূর্বের ঘটনাবলির ওপর প্রয়োগ করার মতো কোনো কোয়ান্টাম মহাকর্ষের তত্ত্ব নেই'। আমরা যদি সময়ের আইনস্টাইনীয় সংজ্ঞাটাই গ্রহণ করি, মানে ঘড়ির সাহায্যে যেটা মাপা হয়- তাহলে দেখা যায় প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্রতম সময়ের ব্যাপ্তি মাপতে হলে আমাদের প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের চেয়ে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যে মাপজোখ করতে হবে। যেখানে প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্লাঙ্ক সময়ের আলো যে পথ অতিক্রম করে তার দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ আলোর গতি ও প্লাঙ্ক সময়ের গুণফল। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে আমরা জানি, কোনো বস্তুর অবস্থান যত সূক্ষ্মভাবে মাপা হয় তার শক্তির সম্ভাব্য মান ততই বাড়তে থাকে। এবং গাণিতিক হিসাব থেকে দেখানো যায় প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সমান কোনো বস্তুকে পরিমাপযোগ্যভাবে অস্তিত্বশীল হতে হলে তার শক্তি এতটাই বাড়তে হবে যে সেটা তখন একটা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। যে ব্ল্যাক হোল থেকে কোনো তথ্যই বের হতে পারে না। এখান থেকে বলা যায় প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্রতম কোনো সময়ের বিস্তার সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়[112]।

বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করুন। পদার্থবিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র প্রয়োগেই আমাদের দ্বিধার কিছু নেই যতক্ষণ না আমরা প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্র বিস্তারের কোনো সময়ের জন্য এটার প্রয়োগ করছি। মূলত সংজ্ঞা অনুযায়ী সময়কে গণনা করা হয় প্লাঙ্ক সময়ের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হিসেবে। আমরা আমাদের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে সময়কে একটা ক্রমিক চলক হিসেবে ধরে পার পেয়ে যাই, কারণ সময়ের এই ক্ষুদ্র অবিভাজ্য একক এতই ছোট যে ব্যবহারিক ক্যালকুলাসে আমাদের এর কাছাকাছি আকারের কিছুই গণনা করতে হয় না। আমাদের সূত্রগুলো প্লাঙ্ক সময়ের মধ্যেকার অংশগুলো দিয়ে এক্সট্রাপোলেটেড হয়ে যায় যদিও এই পরিসীমার মধ্যে কিছু পরিমাপ অযোগ্য এবং অসংজ্ঞায়িত হিসেবে থেকে যাবে।

---

112 Victor J. Stenger স্তল্ম *Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe* , Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, স্ত ষ্ঠশ্লল্ভ্রফ্টস্পস্প্ক্ষ-স্প্লস্পম

এভাবে এক্সট্রাপোলেট যেহেতু আমরা 'এখন' করতে পারি, সেহেতু নিশ্চয় বিগ ব্যাং-এর শুরুতে প্রথম প্লাঙ্ক পরিসীমার শেষেও করতে পারব।

সেই সময়ে আমাদের এক্সট্রাপোলেশনের হিসাব থেকে আমরা জানি যে তখন এনট্রপি ছিল সর্বোচ্চ[113]। এর মানে সেখানে ছিল শুধু 'পরম বিশৃঙ্খলা'। অর্থাৎ, কোনো ধরনের শৃঙ্খলারই অস্তিত্ব ছিল না। তাই, শুরুতে মহাবিশ্বে কোনো শৃঙ্খলাই ছিল না। এখন আমরা মহাবিশ্বে যে শৃঙ্খলা দেখি তার কারণ, এখন বর্ধিত আয়তন অনুপাতে মহাবিশ্বের এনট্রপি সর্বোচ্চ নয়।

সংক্ষেপে বললে, আমাদের হাতে থাকা কসমোলজিক্যাল উপাত্ত মতে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে কোনো ধরনের শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা বা নির্মাণ ছাড়াই। শুরুতে ছিল শুধুই বিশৃঙ্খলা।

বাধ্য হয়েই আমাদের বলতে হচ্ছে যে আমরা চারপাশে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শৃঙ্খলা দেখি তা কোনো আদি স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট নয়। বিগ ব্যাং-এর আগে কী হয়েছে তার

---

113 এই লাইনটি আবারো একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সাধারণত পদার্থবিজ্ঞানের বইগুলোতে (যেমন শন ক্যারলের 'From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time' বইটি দ্রষ্টব্য) বলা হয়ে থাকে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে খুব নিম্ন এনট্রপির অবস্থা থেকে। মনে হতে পারে যে উপরিউক্ত লাইনটি সেই বাস্তবতার পরিপন্থী। হ্যাঁ, নিম্ন এনট্রপি থেকে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরুর ব্যাপারটা যেভাবে সাধারণ বইগুলোতে বলা হয় সেটা ভুল নয়, কিন্তু একই সাথে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করতে পারে সর্বোচ্চ এনট্রপি অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্কেলের চরম বিশৃঙ্খলা থেকেও, যাকে 'কেওস' নামে অভিহিত করা হয়। আর তারপর যখন থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করল, সর্বোচ্চ এনট্রপি বাড়তে থাকল প্রকৃত এনট্রপি থেকে দ্রুত হারে (প্রদত্ত গ্রাফ দ্রষ্টব্য)। সেজন্যই অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার 'ডিফেন্ডিং দ্য ফ্যালাসি অব ফাইনটিউনিং' শিরোনামের পেপারে বলেন, 'A volume of space can have maximal entropy and still contain very low entropy as compared to the visible universe. Assume our universe starts out at the Planck time as a sphere of Planck dimensions. Its entropy will be as low as it can be. However, at the same time, a Planck sphere is akin to a black hole whose entropy is maximal for an object of the same radius. It is not logically inconsistent to be both low and maximum at the same time. In short, the universe could have started out in complete disorder and still produced organized structures. The reason is, as the universe expands its maximum allowed entropy grows with it so that order can form without violating the second law of thermodynamics.'

কোনো চিহ্নই মহাবিশ্বে নেই। এবং সৃষ্টিকর্তার কোনো কাজের চিহ্নই বা তার কোনো নকশাই এখানে বলব নেই। তাই তার অস্তিত্বের ধারণাও অপ্রয়োজনীয়।

আবারও আমরা কিছু বৈজ্ঞানিক ফলাফল পেলাম যেগুলো একটু অন্যরকম হলেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়তো হতে পারত। যেমন মহাবিশ্ব যদি ক্রমপ্রসারণশীল না হয়ে স্থির আকৃতির হতো (যেমনটা বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো বলে) তাহলেই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মতে আমরা দেখতাম সৃষ্টির আদিতে এন্ট্রপির মান সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য-এন্ট্রপির চেয়ে কম ছিল। তার মানে দাঁড়াত মহাবিশ্বের সূচনাই হয়েছে খুবই সুশৃঙ্খল একটা অবস্থায়। যে শৃঙ্খলা আনা হয়েছে বাইরে থেকে। এমনকি পেছনের দিকে অসীম অতীতেও যদি মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকত তাহলে আমরা যতই পেছনে যেতাম দেখতাম সবকিছুই ততই সুশৃঙ্খল হচ্ছে এবং আমরা একটা পরম শৃঙ্খলার অবস্থায় পৌঁছে যেতাম যে শৃঙ্খলার উৎস সকল প্রাকৃতিক নিয়মকেই লঙ্ঘন করে।

সিংগুলারিটি বা অদ্বৈত বিন্দু

১৯৭০ সালে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এবং গণিতবিদ রজার পেনরোজ, পেনরোজের আগের একটি উপপাদ্যের আলোকে প্রমাণ করেন যে, বিগ ব্যাং-এর শুরুতে ‘সিংগুলারিটি’ বা অদ্বৈত বিন্দুর অস্তিত্ব ছিল[114]। সাধারণ আপেক্ষিকতাকে শূন্য সময়ের আলোকে বিবেচনা করার মাধ্যমে দেখা যায় যে, বর্তমান থেকে পেছনে যেতে থাকলে মহাবিশ্বের আকার ক্রমশ ছোট এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। পেছনে যেতে যেতে যখন মহাবিশ্বের আকার শূন্য হয় তখন সাধারণ আপেক্ষিকতার গণিত অনুযায়ী এর ঘনত্ব হয় অসীম। মহাবিশ্ব তখন অসীম ভর ও ঘনত্ববিশিষ্ট একটি বিন্দু যার নাম ‘পয়েন্ট অব সিংগুলারিটি’। ধর্মবেত্তারা যারা বিগ ব্যাংকে ঈশ্বরের কেরামতি হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁরা বলেন, তখন সময় বলেও কিছু ছিল না।

---

[114] Stephen W. Hawking and Roger Penrose, ‘*The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology,*’ Proceedings of the Royal Society of London, series A, 314 (1970): ল্ত ষ্ঠশ্লন্ড্রফ্টস্প্ল স্ল-স্প্রম্প

তার পর থেকে এভাবেই চলছে। বিগ ব্যাং-এর আগে অসীম ভর ও ঘনত্বের বিন্দুতে সবকিছু আবদ্ধ ছিল, তখন ছিল না কোনো সময়। তারপর ঈশ্বর ফুঁ দানের মাধ্যমে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটান, সূচনা হয় মহাবিশ্বের, সূচনা হয় সময়ের। যেমন, আমরা আমাদের 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইয়ে আমেরিকার রক্ষণশীল লেখক দিনেশ ডি'সুজার উদাহরণ হাজির করেছিলাম। ডি'সুজা তাঁর একটি বইয়ে বলেছেন, 'বুক অব জেনেসিস যে ঈশ্বরপ্রদত্ত মহাসত্য গ্রন্থ সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল শক্তি ও আলোর এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এমন না যে, স্থান ও সময়ে মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে, বরং মহাবিশ্বের সূচনা ছিল সময় ও স্থানেরও সূচনা'[115]। ডি'সুজা আরও বলেন, 'মহাবিশ্বের সূচনার আগে সময় বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। অগাস্টিন অনেক আগেই লিখেছিলেন, মহাবিশ্বের সূচনার ফলে সময়ের সূচনা হয়েছিল। এতদিনে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান নিশ্চিত করল, অগাস্টিন এবং ইহুদি, খ্রিষ্টানদের মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে আদিম উপলব্ধির সত্যতা' [116]। একই ধরনের কথা মুসলিম জগতের জনপ্রিয় 'দার্শনিক' হারুন ইয়াহিয়াও (আসল নাম আদনান অকতার; যার নামে বিবর্তন তত্ত্বকে বিকৃত করে সৃষ্টিবাদের রূপকথা প্রচার, নারী ধর্ষণ, মাদক চোরাচালানসহ বহু অভিযোগ আছে, এবং তাকে বিভিন্ন সময় কারাবাসেও যেতে হয়েছিল[117]) বলেছেন একাধিকবার, প্রাচ্যের খ্রিষ্টীয় সৃষ্টিবাদীদের ধারণাগুলোর পর্যাপ্ত 'ইসলামীকরণ' করে:

'বিজ্ঞানীরা এখন জানেন, মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে সিংগুলারিটি থেকে এক অচিন্তনীয় মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, যাকে আমরা বিগ ব্যাং নামে চিনি। অন্য কথায় মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহই একে বানিয়েছে'।

ইসলামি পণ্ডিত জাকির নায়েকও প্রায়ই তাঁর বিভিন্ন লেকচারে কোরানের একটি

---

[115] Dines D' Souza, *What's So Great About Christianity?* ,Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষ্ঠা নং ১১৬।

[116] Dines D' Souza, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩।

[117] অনন্ত বিজয় দাশ, *হারুন ইয়াহিয়া : চকচক করলেই সোনা হয় না*, যুক্তি, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০১৩

বিশেষ আয়াতকে বিগ ব্যাং-এর ‘প্রমাণ’ হিসেবে হাজির করেন[118]। ডি’সুজা, হারুন ইয়াহিয়া, আর জাকির নায়েকরা সুযোগ পেলেই এভাবে বিগ ব্যাং-এর সাথে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের আয়াত জুড়ে দিয়ে এর একটা অলৌকিক মহিমা প্রদান করতে চান। কিন্তু আদতে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার প্রাচীন এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সত্যতার কোনো রকমের নিশ্চয়তা তো দেয়ই না, বরং এই ধর্মগ্রন্থ এবং আরও অনেক ধর্মগ্রন্থে থাকা সৃষ্টির যে গল্প এত দিন ধার্মিকেরা বিশ্বাস করে এসেছেন তা কতটা ভুল এবং অদ্ভুত সেটাই প্রমাণ করে[119]।

যা-ই হোক, সিংগুলারিটির কথা বলে ধার্মিকদের মাঝে গভীর সাড়া ফেলা স্টিফেন হকিং ও পেনরোজ প্রায় বিশ বছর আগে ঐকমত্যে পৌঁছান যে, বাস্তবে সিংগুলারিটি নামের কোনো বিন্দুর অস্তিত্ব আসলে ছিল না, এবং নেই। সাধারণ আপেক্ষিকতার ধারণায় হিসাব করলে অবশ্য তাদের আগের হিসেবে কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু সেই ধারণায় সংযুক্ত হয়নি কোয়ান্টাম মেকানিকস। আর তাই সেই হিসাব আমলে নেওয়া যায় না। ১৯৮৮ সালে হকিং ‘আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম’ বইতে বলেন, There was in fact no singularity at the beginning of universe. অর্থাৎ মহাবিশ্বের সূচনার সময়ে সিংগুলারিটির অস্তিত্ব ছিল না[120]।

---

[118] যেমন, জাকির নায়েক তার একটি লেকচারে বলেছেন,

> As far as Qur’an and modern Science is concerned, in the field of ‘Astronomy’, the Scientists, the Astronomers, a few decades earlier, they described, how the universe came into existence – They call it the ‘Big Bang’. And they said... ‘Initially there was one primary nebula, which later on it separated with a Big Bang, which gave rise to Galaxies, Stars, Sun and the Earth, we live in.’ This information is given in a nutshell in the Glorious Qur’an, in Surah Ambiya, Ch. 21, Verse No. 30, which says, “Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together, and we clove them asunder?’ Imagine this information which we came to know recently, the Qur’an mentions 14 hundred years ago.

[119] এ প্রসঙ্গে পড়ুন, অবিশ্বাসের দর্শন (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুনর্মুদ্রণ ২০১২) বইটির ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ শিরোনামের অধ্যায়টি।

[120] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা ৫০

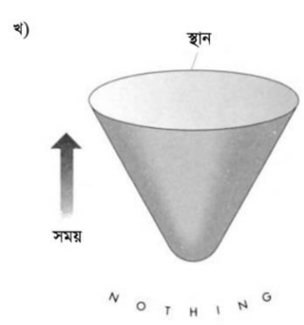

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং প্রাথমিকভাবে সিংগুলারিটি বা অদ্বৈত বিন্দু বলে একটা ধারণা প্রস্তাব করলেও (চিত্র ক) পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেকানিকসর গণনা গোনায় ধরে এটিকে বাতিল করে দেন (চিত্র খ), যদিও ধার্মিকেরা সেই বাতিল হওয়া অদ্বৈত বিন্দুকে অলৌকিক মহিমা দিয়ে এবং কখনো বা ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দিয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই চলেছে
(ছবির উৎস, পল ডেভিস, কসমিক জ্যাকপট, ২০০৭)।

ডি'সুজা, হারুন ইয়াহিয়া কিংবা জাকির নায়েকের মতো মানুষেরা 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' বইটিতে একনজর চোখ বুলিয়েছেন সেটা সত্যি। কিন্তু পড়ে বোঝার জন্য নয়। তাঁরা খুঁজেছেন তাঁদের মতাদর্শের সাথে যায় এমন একটি বাক্য এবং সেটা পেয়েই বাদবাকি কোনো দিকে নজর না দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন

সময় হকিংকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে একটা বিন্দু (সিংগুলারিটি) থেকে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে'[121]। তাঁরা মূলত হকিং-এর কথার আংশিক উদ্ধৃত করেন, মূল বিষয়টা চেপে গিয়ে। উদ্ধৃতির সামনের পেছনের বাকি বাক্যগুলোকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে এমন একটি অর্থ তাঁরা দাঁড় করান, যা আসলে হকিংয়ের মতের ঠিক উল্টো। হকিং আসলে বলছিলেন তাঁদের ১৯৭০-এ করা প্রাথমিক এক হিসাবের কথা, যেখানে তাঁরা সিংগুলারিটির কথা আলোচনা করেছিলেন। সম্পূর্ণ কথাটি ছিল এমন— 'আমার ও পেনরোজের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ১৯৭০ সালে একটি যুগ্ম প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয়, যেখানে আমরা প্রমাণ করে দেখাই যে, বিগ ব্যাং-এর আগে অবশ্যই সিংগুলারিটির অস্তিত্ব ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং এ-ও ধরে নেওয়া হয় যে, বর্তমানে মহাবিশ্বে যেই পরিমাণ পদার্থ রয়েছে আগেও তাই ছিল'[122]। হকিং আরও বলেন-

> একসময় আমাদের (হকিং ও পেনরোজ) তত্ত্ব সবাই গ্রহণ করে নিল এবং আজকাল দেখা যায় প্রায় সবাই এটা ধরে নিচ্ছে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে একটা বিন্দু (সিংগুলারিটি) থেকে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে। এটা হয়তো একটা পরিহাস যে এ বিষয়ে আমার মত পালটানোর পরে আমিই অন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছি, যে এমন কোনো সিংগুলারিটি আসলে ছিল না—কারণ, কোয়ান্টাম প্রভাব হিসাবে ধরলে সিংগুলারিটি বলে কিছু আর থাকে না'[123]।

অথচ ধর্মবেত্তারা আজ অব্দি সেই সিংগুলারিটি পয়েন্টকে কেন্দ্রে করে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণবিষয়ক অসংখ্য বই লিখে চলছেন। বছর খানেক আগে প্রকাশিত বইয়ে র‍্যাভি যাকারিয়াস বলেন, 'আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পাশাপাশি বিগ

---

[121] D' Souza, *What's So Great About Christianity?* , Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষ্ঠা ১২১।

[122] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা ৫০।

[123] Stephen W. Hawking, পূর্বোক্ত।

ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা এখন নিশ্চিত সবকিছুর অবশ্যই একটি সূচনা ছিল। সকল ডেটা আমাদের এই উপসংহার দেয় যে, একটি অসীম ঘনত্বের অদ্বৈত বিন্দু থেকেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল'[124]।

স্টিফেন হকিংয়ের প্রথম প্রবন্ধ এত ভালোভাবে পড়লেও পরবর্তীতে আর কিছু পড়ে দেখার ইচ্ছে হয়তো তাঁদের হয়নি। কিংবা পড়লেও, নিজেদের মতের সাথে মেলে না বলে তাঁরা সেটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছেন আরেক কান দিয়ে। তাঁরা অবিরাম ঘেঁটে চলছেন সেই পুরনো কাসুন্দি, যেই কাসুন্দি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন কাসুন্দি প্রস্তুতকারী মানুষটি নিজেই।

শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি কি শক্তির নিত্যতা সূত্রের লঙ্ঘন?

সাদা চোখে মনে হতে পারে শূন্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব তৈরি হওয়াটা শক্তির নিত্যতার লঙ্ঘন। আসলে কিন্তু তা নয়। আগেই বলেছি, স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন যে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরমাণ সব সময়ই শূন্য থাকে। শক্তির যোগফল শূন্য হলে এই পৃথিবী সূর্য, চেয়ার, টেবিলসহ হাজারো রকমের পদার্থ তাহলে এল কথা থেকে? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মহাবিশ্বের দৃশ্যমান জড়পদার্থগুলো তৈরি হয়েছে আসলে ধনাত্মক শক্তি থেকে, আর অন্যদিকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। এই দুটো পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই, মহাবিশ্বের শক্তির বীজগণিতীয় যোগফল হিসাব করলে সব সময় শূন্যই পাওয়া যায়।

ব্যাপারটাকে আরেকটু বিস্তৃত করা যাক। গুথের দেওয়া স্ফীতি তত্ত্ব থেকে আমরা জেনেছি আলোক কণা—ফোটন কিংবা চেনাজানা পদার্থের আদি উপাদানগুলো—তৈরি হয়েছে মেকি শূন্যতা বা ফলস ভ্যাকুয়াম থেকে দশার

---

[124] Ravi K. Zacharias, *The End of Reason: A Response to the New Atheist*, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2008, পৃষ্ঠা নং ৩১।

স্থানান্তরের (Phase transition) মাধ্যমে (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এ উপাদানগুলোর রয়েছে ধনাত্মক শক্তি। এই শক্তি কাটাকাটি হয়ে যায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের ঋণাত্মক শক্তি দিয়ে[125]। কাজেই যে কেউ যেকোনো সময় বুক কিপিং-এর হিসাব মেলাতে বসলে দেখবেন, নিট যোগফল শূন্যই পাচ্ছেন তিনি। যত ভারী বস্তুকণা আমরা তৈরি করতে যাব, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কাছে আমাদের তত ভারী ট্যাক্স দিতে হবে আগে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মহাবিশ্বের দৃশ্যমান জড়পদার্থগুলো তৈরি হয়েছে আসলে ধনাত্মক শক্তি থেকে, আর অন্যদিকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। এই দুটো পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় (ছবির উৎস: স্টিফেন হকিং, ইউনিভার্স ইন নাটশেল, ২০০১)

অর্থাৎ, মহাবিশ্বের আকার বাড়াতে হলে বিপরীত দিকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মানও বাড়াতে হবে। স্টিফেন হকিং তাঁর বিখ্যাত 'ইউনিভার্স ইন নাটশেল' বইয়ে বলেন, 'মহাবিশ্বের আকার দ্বিগুণ হবার অর্থ হলো পদার্থ ও মহাকর্ষীয় শক্তি উভয়েরই দ্বিগুণ

[125] Alexei V. Filippenko and Jay M. Pasachoff, A Universe from Nothing (Adapted from The Cosmos: Astronomy in the New Millennium, 1st edition, 2001).

হওয়া। শূন্যের দ্বিগুণ করলেও শূন্যই হয়। আহা, আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমও যদি এভাবে কাজ করত ...'।

শক্তির নিত্যতাকে লঙ্ঘন না করেই স্রেফ শূন্য থেকে কিভাবে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটতে পারে, তা পরিষ্কার করেছেন স্টিফেন হকিং তাঁর 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (দ্য ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম) গ্রন্থে এভাবে [126]—

> মহাবিশ্বে এই পরিমাণ জড়পদার্থ কেন রয়েছে তা মহাস্ফীতির ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। মহাবিশ্বের যেসব অঞ্চল আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেখানে রয়েছে দশ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (অর্থাৎ ১-এর পিঠে আশিটি শূন্য = ১.০ x $১০^{৮০}$) সংখ্যক জড় কণিকা। কোত্থেকে এগুলো সব এল? এর উত্তর হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তি থেকে কণিকা ও প্রতি কণিকা যুগল আকারে উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই শক্তি এল কোত্থেকে? এরও উত্তর হলো মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ হলো শূন্য। মহাবিশ্বে পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে ধনাত্মক শক্তি থেকে। অবশ্য জড়পদার্থ মহাকর্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আকর্ষণ করছে। দুটি বস্তুখণ্ড যখন কাছাকাছি থাকে তখন তাদের শক্তির পরিমাণ যখন তারা অনেক দূরে থাকে তা থেকে কম। এর কারণ হলো এদের পৃথক করতে হলে যে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সেই বলের বিরুদ্ধে আপনাকে শক্তি ব্যয় করতে হবে। তাই এক অর্থে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। এমন একটি মোটামুটি স্থানিক সুষম (approximately uniform in space) মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে দেখানো যেতে পারে যে এই ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি পদার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ধনাত্মক

---

[126] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা ১৩৬

শক্তিকে নিখুঁতভাবে বিলুপ্ত করে দেয়। কাজেই মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ সব সময়ই শূন্য।

হকিং-এর ওপরের বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে, মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র জন্য বাইরে থেকে আলাদা কোনো শক্তি আমদানি করার প্রয়োজন হয়নি। সহজ কথায়, ইনফ্লেশন ঘটাতে যদি শক্তির নিট ব্যয় যদি শূন্য হয়, তবে বাইরে থেকে কোনো শক্তি আমদানি করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যালান গুথ ও স্টেইনহার্ট নিউ ফিজিকস জার্নালে (১৯৮৯) দেখিয়েছেন, ইনফ্লেশনের জন্য কোনো তাপগতীয় কাজের (thermodynamic work) দরকার পড়েনি।

মোটা দাগে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র আগেকার মোট শক্তি যা ছিল অর্থাৎ শূন্য, সৃষ্টির পরও আমরা তা-ই পাচ্ছি –অর্থাৎ শূন্য। কাজেই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটতে গিয়ে শক্তির নিত্যতার লঙ্ঘন ঘটেনি। মহাবিশ্বের ব্যাপারে মূলধারার অধিকাংশ পদার্থবিদেরই এই একই অভিমত। উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রখ্যাত পদার্থবিদ মিচিও কাকুর কথা বলতে পারি। আমাদের এই কাকাবাবু নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের অধ্যাপক এবং বর্তমানে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার পেছনে একজন শীর্ষস্থানীয় কান্ডারি। 'ফিজিকস অব দ্য ইম্পসিবল'সহ বহু নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার বই আছে তাঁর ঝুলিতে। এমনি একটি সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে 'সমান্তরাল বিশ্বগুলো'[127]। বইটি ২০০৫ সালে প্রকাশের পর ব্রিটেনের স্যামুয়েল জনসন প্রাইজের জন্য শীর্ষ তালিকায় এসেছিল। এই বইয়ের স্ফীতিসংক্রান্ত অধ্যায়টিতে একটি অনুচ্ছেদ যোগ করেছেন কাকু 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' নামে। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেন শক্তির নিত্যতার সূত্র অক্ষুণ্ণ রেখেই শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। হকিং-এর সাম্প্রতিক 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইটি বেরোনোর পর তিনি এ নিয়ে একটি ব্লগও লিখেছিলেন – 'Can a Universe Create Itself Out of

[127] Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor; Reprint edition, 2006

Nothing?' শিরোনামে[128]। সেখানেও ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে। এ ছাড়া ইউটিউবেও কাকুর একটি চমৎকার ভিডিও আছে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন[129],

> আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারনাটা পদার্থ ও শক্তির নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন। কিভাবে আপনি শূন্য থেকে রাতারাতি একটা মহাবিশ্ব তৈরি করে ফেলতে পারেন? ওয়েল...যদি আপনি মহাবিশ্বের সমস্ত ভর হিসাব করেন, দেখবেন এটা ধনাত্মক। আর যদি আপনি মহাবিশ্বের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তির হিসাব নেন, দেখবেন সেটা ঋণাত্মক। যখন আপনি এ দুটোকে যোগ করবেন, কী পাবেন? শূন্য। তার মানে মহাবিশ্ব তৈরি করতে কোনো শক্তি আসলে লাগছে না। মহাবিশ্ব ফ্রি পাচ্ছেন আপনি যেন ফ্রি লাঞ্চ হিসেবে। আপনি হয়তো মাথা নেড়ে ভাবতে পারেন – নাহ, এটা ঠিক নয়। এই যে চারদিকের ধনাত্মক চার্জ আর ঋণাত্মক চার্জ দেখি, কই তারা তো একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে না। তাহলে কিভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব পাওয়া যাবে? ওয়েল, আপনি যদি একইভাবে মহাবিশ্বের যাবতীয় ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ আর ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ ধরে যোগ করেন, দেখবেন, যোগফল পাওয়া যাচ্ছে শূন্য! মহাবিশ্বের আসলে কোনো নেট চার্জ নেই। আচ্ছা স্পিন বা ঘূর্ণনের ব্যাপারেই বা ঘটনা কী? গ্যালাক্সির ঘূর্ণন আছে, তাই না? এবং তারা ঘুরে বিভিন্ন ডিরেকশনে। আপনি যদি গ্যালাক্সিগুলোর সমস্ত ঘূর্ণন যোগ করেন, কী পাবেন? শূন্য। সুতরাং – মহাবিশ্বের রয়েছে 'শূন্য স্পিন', 'শূন্য চার্জ', এবং 'শূন্য এনার্জি কনটেন্ট'। অন্য কথায় পুরো মহাবিশ্বই শূন্য থেকে পাওয়া।

[128] Michio Kaku, Can a Universe Create Itself Out of Nothing?, November 24, 2010

[129] Michio Kaku, Michio Kaku: Space Bubble Baths and the Free Universe (Youtube video); Transcript : A Universe is a Free Lunch; (bigthink.com)

আদি কারণ

মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আদি কারণ বলে কি কিছু আছে? থাকলে সেটা কী রকমের? আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো পাওয়ার আগ পর্যন্ত ঢালাওভাবে ঈশ্বরকেই 'আদি কারণ' হিসেবে অভিহিত করা হতো, অনেক মহল থেকে এখনো করা হয় তুমুল উৎসাহের সাথেই। বার্টরান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত 'Why I am not a Christian' প্রবন্ধে প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলেন,

> আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সবকিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First Cause) সম্মুখীন হবেন,এবং এই প্রথম কারণকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ঈশ্বর' হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।... আমিও বহুদিন ধরেই এটিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ছিলাম, আর পড়তে গিয়েই সেখানে এই বাক্যটি পেলাম: 'আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু এই প্রশ্নটি আমাকে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল। যেটি হলো, ঈশ্বরই যদি আমাকে তৈরি করে থাকেন, তবে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' আমি এখনো মনে করি, 'ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' এই সহজ-সরল বাক্যটি প্রথম কারণসম্পর্কিত যুক্তির দোষটি প্রথম আমাকে দেখাল। যদি প্রতিটি জিনিসের পেছনে একটি কারণ থাকে, তবে ঈশ্বরেরও কারণ থাকতে হবে। আবার যদি কারণ ছাড়াই কোনো কিছু থাকতে পারে (যেমন ঈশ্বর), তবে এই যুক্তি ঈশ্বরের জগতের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

আমরা নবম অধ্যায়ে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে বলেছিলাম, একটা সময় পর্যন্ত মহাবিস্ফোরণ বা 'বিগ ব্যাং'

তত্ত্বের পাশাপাশি ‘স্টেডি স্টেট’ বা ‘স্থিতিশীল তত্ত্ব’ নামে আরেকটি তত্ত্ব পাশাপাশি রাজত্ব করত। স্থিতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেডরিক হয়েল। তাঁর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন কেমব্রিজ কলেজের হারমান বন্ডি, থমাস গোল্ড এবং পরবর্তীকালে একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী – জয়ন্ত নারলিকার। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে সমাধানটা কি মহাবিস্ফোরণ নাকি স্থিতিশীল তত্ত্ব থেকে আসবে এ নিয়ে ঝানু ঝানু বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন সে সময়। তবে পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের সূত্রে বেরিয়ে আসতে শুরু করল যে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয়, বরং ক্রমশ প্রসারমাণ। বিশেষ করে ১৯৬৪ সালের দিকে আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন আকস্মিকভাবে ‘মহাজাগতিক পশ্চাদপট বিকিরণ’-এর খোঁজ পাওয়ার পর স্থায়ীভাবে স্থিতি তত্ত্বকে হটিয়ে বিগ ব্যাং-কে জায়গা করে দেয় সঠিক তত্ত্বের সিংহাসনে।

তবে মহাবিস্ফোরণ বা ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর থেকেই যেন বিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন করে ‘প্রথম কারণ’টিকে প্রতিষ্ঠিত করার নব উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছে। ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিকাল একাডেমির সভায় বলেই বসলেন—

> ‘যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর’।

আমরা আজ জানি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগ ব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন) পোপকে সে সময় বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এগুলো সবই আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে বরং আমরা এই তথাকথিত ‘আদি কারণের’ দার্শনিক ভিত্তিটি নিয়ে একটু আলোচনা করব।

অনেকেই হয়তো জানেন, 'কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট' (Kalam Cosmological Argument) নামে একটি দার্শনিক যুক্তিমালা আছে যেটা বিশ্বাসীরা মহা উৎসাহের সাথে 'ঈশ্বরের প্রমাণ' হিসেবে হাজির করেন। বিতার্কিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সালে লেখা 'দ্য কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট' নামক বইয়ের মাধ্যমে যুক্তির এই ধারাকে একসময় সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। যদিও বহুবারই তাঁর এই যুক্তিমালা বিভিন্নভাবে খণ্ডিত হয়েছে, তার পরও ভাঙা রেকর্ডের মতো এই যুক্তিমালাকে এখনো 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কালামের যুক্তির ধারাটিকে নিচের চারটি ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়:

১। যার শুরু (উৎপত্তি) আছে, তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে।

২। আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের একটি উৎপত্তি আছে।

৩। সুতরাং এই মহাবিশ্বের পেছনে একটি কারণ আছে।

৪। সেই কারণটিই হলো 'ঈশ্বর'।

সংশয়বাদী দার্শনিকেরা কালামের যুক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়েই[130]। আমাদের পূর্ববর্তী 'অবিশ্বাসের দর্শন' কিংবা 'বিজ্ঞান ও বিশ্বাস' প্রভৃতি বইয়ে কালামের এই 'আদি কারণের' বিস্তৃত খণ্ডন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে বাহুল্য বিধায় সেগুলোর পুনরুল্লেখ করা হলো না। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। সবকিছুর পেছনেই 'কারণ' আছে বলে পেছাতে পেছাতে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে যান। এ সময় আর তাঁরা যেন কোনো কারণ খুঁজে পান না। মহাবিশ্বের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বর নামক একটি সত্তার আমদানি করতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার জন্য একই যুক্তিতে আরেকটি 'ঈশ্বর'কে কারণ হিসেবে আমদানি করা উচিত। তারপর সেই 'ঈশ্বরের

---

[130] উৎসাহী পাঠকেরা 'অবিশ্বাসের দর্শন' (শুদ্ধস্বর) 'বিশ্বাস ও বিজ্ঞান' (চারদিক) বই দুটো পড়ে দেখতে পারেন। দেখতে পারেন মুক্তমনায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধও।

ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য লাগবে আরেকজন ঈশ্বর। এভাবে আমদানির খেলা চলতেই থাকবে একের পর এক, যা আমাদের অসীমের দিকে ঠেলে দেবে। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই সকল বিশ্বাসীর কাছে আপত্তিকর। তাই ধর্মবাদীরা নিজেরাই 'সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে' এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে থাকেন আর সোচ্চারে ঘোষণা করেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে কোনো কারণের প্রয়োজন নেই।' সমস্যা হলো যে, এই ব্যতিক্রমটি কেন শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কেন নয়, এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন না।

আর তাছাড়া 'যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে'— কালামের যুক্তিমালার প্রাথমিক ধাপটিকে বিজ্ঞানের জগতে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণ হাজির করে। পারমাণবিক পরিবৃত্তি, পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ 'কারণবিহীন ঘটনা' হিসেবে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত[131]। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য শক্তির (যা $E = mc^2$ সূত্রের মাধ্যমে শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে) উদ্ভব ও বিনাশ ঘটতে পারে— স্বতঃস্ফূর্তভাবে— কোনো কারণ ছাড়াই। এগুলো সব পরীক্ষিত সত্য। কাজেই ওপরের উদাহরণগুলোই কালামের যুক্তিকে বৈজ্ঞানিকভাবে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

আমরা অবশ্য 'আদি কারণ' নিয়ে দার্শনিক কথার ফুলঝুরি কিংবা মারপ্যাঁচের চেয়ে ঢের আগ্রহী আধুনিক বিজ্ঞান কী বলছে জানতে। আলোচ্য স্ফীতির প্রসঙ্গেই আসা যাক। স্ফীতি তত্ত্বের মূল ধারণাগুলো কোয়ান্টাম কসমোলজি নামক আধুনিক শাখাটির ক্রমিক

---

131 "... Quantum phenomenon, such as atomic transitions and radioactive decay of nuclei, seem to happen without prior cause. In fact, the highly successful theory of quantum mechanics does not predict the occurence of these events, just their probabilities for taking place;... we have no current basis for assuming such cause exist. After all Quantum mechanics is almost a century old and has been utilized with immense success over the period, with no sign of such causes ever being found (Quoted from Prof. Victor Stenger's *Has Science Found God? : The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe* , Prometheus Books, pp 173)

উন্নয়নের প্রভাবজাত ফলাফল বললে অত্যুক্তি হবে না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রগুলো একসময় কেবল আমরা খুব ক্ষুদ্র স্কেলে পারমাণবিক জগতের জন্য প্রযোজ্য বলে ভাবতাম। কিন্তু আশির দশকের পর থেকে স্টিফেন হকিংসহ অন্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, আমাদের মহাবিশ্ব যেহেতু এ ধরনের কোয়ান্টাম স্তরের মতো ক্ষুদ্র অবস্থা থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো মহাবিশ্বের আদি অবস্থায়ও প্রয়োগ করা যাবে[132]। পরে এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয় ইনফ্লেশনারি জোতির্বিদ্যা থেকে আহৃত জ্ঞান। এই দুই শাখার সুসংহত উপসংহারের মূল নির্যাসটিই হচ্ছে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের উদ্ভব আর তারপর স্ফীতির মাধ্যমে এর দানবীয় প্রসার। শুরুর দিকে ছোট্ট একটা শূন্য স্থানের কথা আমরা ভাবতে পারি, যার মধ্যে 'ভ্যাকুয়াম এনার্জি' লুকিয়ে ছিল। এই ধরনের মেকি স্থানকে আমরা আগের অধ্যায়ে 'ফলস ভ্যাকুয়াম' হিসেবে জেনেছি। আমরা আরো জেনেছি এই মেকি শূন্যতা সূচকীয় হারে প্রসারিত হতে থাকবে এবং সেটাই হয়েছিল। শূন্যতার যে শক্তির কথা আমরা বলছি সেটা যদি 'ডায়নামিক' বা গতিময় ধরনের কিছু হয়ে থাকে, তবে এটা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হবে, আর একটা সময় এটা নিজেকে তরঙ্গশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এই তরঙ্গশক্তির কিছু অংশ হয়তো আমাদের চেনাজানা পদার্থে পরিণত হবে, কিছুটা হয়তো থেকে যাবে গুপ্ত শক্তি হিসেবে। এভাবে উত্তপ্ত মিশ্রণ একসময় কিছুটা ঠান্ডা হবে আর শেষ পর্যন্ত তৈরি করবে এমন এক মহাবিশ্ব যেটা ১৪০০ কোটি বছর আগে আমাদের মহাবিশ্বের অনুরূপ। আমরা দশম অধ্যায়ে স্ফীতি তত্ত্বের পেছনের মূল বিজ্ঞানটি এবং এর ইতিহাস নিয়ে আমরা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেছিলাম। সে সবের পুনরুল্লেখ এখানে প্রয়োজনীয় নয়; আমরা এখানে দেখব ইনফ্লেশনের পেছনে যদি 'আদি' কারণ থাকে সেটি কী হতে পারে! এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনার কথা আমরা বলতে পারি:

[132] Stephen W. Hawking, The Edge of Spacetime, in Paul C. Davies, ed., The New Physics, Cambridge University Press; 1989

এক, স্ফীতির প্রাথমিক বীজ আসতে পারে আণুবীক্ষণিক আকারের বিকর্ষণমূলক পদার্থ থেকে। অ্যালেন গুথ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, খুব ছোট – মাত্র এক আউন্সের মতো একটা ভর থেকেই ইনফ্লেশন যাত্রা শুরু করতে পারে, যার ব্যাস হতে পারে একটি প্রোটনের চেয়েও একশত কোটি গুণ ছোট কিছু। স্ফীতির সেই ছোট্ট বীজ ট্রিয়ন বর্ণিত ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের সমান, যা কোয়ান্টাম শূন্যতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে সময় সময়।

মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে একটি বড় একটি সম্ভাবনা হচ্ছে একেবারে 'শূন্য' থেকে উদ্ভূত হওয়া, যেটা টাফট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিনের গবেষণা থেকে উঠে এসেছে। ভিলেঙ্কিনের এই শূন্যতা মানে কিন্তু কেবল শূন্যস্থান বা 'এম্পটি স্পেস' নয়, একেবারেই যাকে বলে 'নাথিং'। ভিলেঙ্কিন দেখিয়েছেন যে সেই 'নাথিং' থেকে কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটতে পারে[133]।

দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভাবনা কিংবা প্রস্তাবনা হলো, শুরু নিয়ে এ ধরনের প্রশ্নই অর্থহীন। স্টিফেন হকিং 'প্রান্তহীন প্রস্তাবনা' (no -boundary proposal) শীর্ষক একটি মডেলে দেখিয়েছেন, 'স্থান', 'কাল', 'আগে' , 'পরে' কোনো কিছুই আসলে মহাবিশ্ব উদ্ভবের উষালগ্নে দ্ব্যর্থবোধক নয়। এগুলো অর্থহীন প্রশ্ন, অনেকটা 'উত্তর মেরুর উত্তরে কী আছে'— প্রশ্নের মতো শোনায়। আশির দশকের শুরুতে জেমস হার্টলির সাথে তৈরি করা এই মডেলে হকিং দেখিয়েছেন, মহাবিশ্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ (self contained)[134]। তিনি তাঁর 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'যদি মহাবিশ্বের সূচনা থাকে, তবে হয়তো ভাবতে পারি এর পেছনে ঈশ্বর বলে কেউ হয়তো থাকতে পারেন। কিন্তু মহাবিশ্ব যদি পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণই হয়, যদি তার কোনো সীমারেখা কিংবা প্রান্ত না থাকে, তবে তো এর কোনো শুরু নেই, শেষ নেই, it would simply be! তাহলে এখানে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?'

---

[133] Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2006

[134] Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam; 10th anniversary edition, 1998

তৃতীয় আরেকটি জোরালো সম্ভাবনা আছে অবশ্য। সম্ভাবনাটি হলো —ইনফ্লেশন হয়েছে বটে, কিন্তু এর সূচনা কিংবা এর পেছনে আদি কোন কারণ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান্টা-ক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী অ্যান্থনি অ্যাগুরি এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন গ্র্যাটন 'ইনফ্লেশন উইদাউট আ বিগিনিং' শীর্ষক সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে, যেকোনো ধরনের 'শুরুর প্রস্তাবনা' ছাড়াও ইনফ্লেশন বা স্ফীতি কাজ করতে পারে খুব ভালোভাবেই [135]।

আর লিন্ডের 'চিরন্তন' স্ফীতি তত্ত্ব এসে আদি কারণকে খুব জোরেশোরে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে বলা যায়। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী এ ধরনের স্ফীতি অবিরামভাবে স্ব-পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রতি মুহূর্তেই তৈরি করছে এবং করবে নতুন নতুন মহাবিশ্ব। এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে অতীতে যেমন চলেছে,ভবিষ্যতেও চলবে অবিরামভাবেই।

সে হিসেবে ১৪০০ কোটি বছর আগে ঘটা বিগ ব্যাং আমাদের মহাবিশ্বের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও অন্য সব মহাবিশ্বের জন্য সেটি 'শুরু' নয়। আসলে এই অনন্ত মহাবৈশ্বিক সিস্টেমের কোনো শুরু নেই,শেষও নেই। আজ থেকে ১০০ বিলিয়ন কিংবা ১০০ ট্রিলিয়ন বছর আগে কিংবা পরে যে সময়েই যাওয়া হোক না কেন, স্ফীতির মাধ্যমে 'মাল্টিভার্স' তৈরির চলমান প্রক্রিয়া অতীতে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। আর এটা গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে খুবই সম্ভব[136]। লিন্ডে নিজেই বলেছেন, চিরন্তন এ স্ফীতি তত্ত্ব আজ অনেকের মাঝেই তৈরি করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা' এক সর্বজনীন দার্শনিক আবেদনের—এ মহাবিশ্ব যদি কোন দিন ধ্বংস হয়ে যায়ও, জীবনের মূল সত্তা হয়তো টিকে থাকবে অন্য কোনো মহাবিশ্বে, হয়তো অন্য কোনোভাবে, অন্য কোনো পরিসরে[137]।

---

[135] Anthony Aguirre and Steven Gratton, , "Inflation without a beginning: A null boundary proposal", Phys.Rev. D67 083515, 2003

[136] Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013

[137] Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe, Scientific American, November, 1994

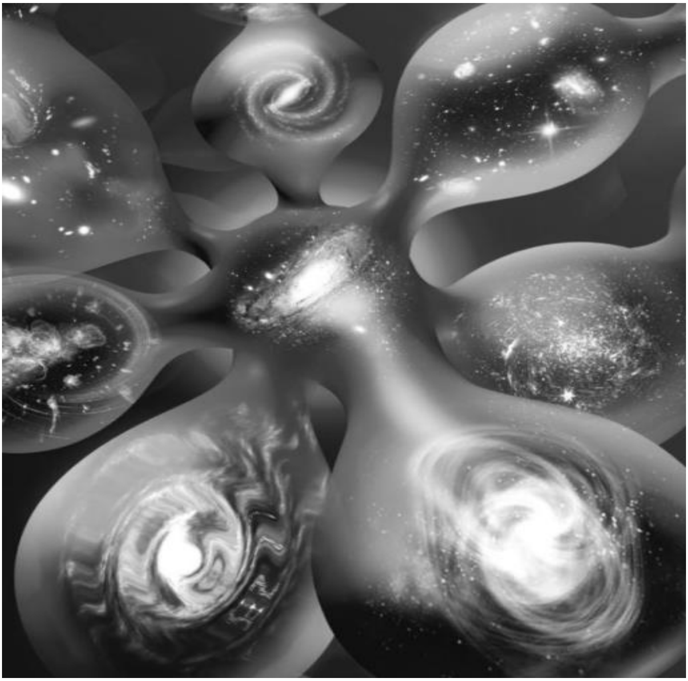

লিন্ডের স্ফীতি তত্ত্ব বলছে, কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বুদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি 'বিগ ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি (ছবির উৎস:সায়েন্টিফিক আমেরিকান, জানুয়ারি ২০১০)

মহাবিশ্বের জন্য ওপরের কোনো সম্ভাবনা সত্য সেটা জানার জন্য হয়তো আমাদের ভবিষ্যতের কারিগরি দক্ষতা এবং উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, কিন্তু এটা সত্য যে, মডেলগুলোর কোনোটিই শুরু কিংবা আদি কারণের জন্য অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করছে না। কয়েকটি মডেলে আদি কারণের একেবারেই দরকারই নেই, আর কয়েকটিতে যাও বা আছে, সেগুলোর সবগুলোই বরং প্রাকৃতিক উপায়ে মহাবিশ্বের উদ্ভবের দিকেই ইঙ্গিত করছে। প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে সেটাই আমরা দেখব পরবর্তী অনুচ্ছেদে।

প্রাকৃতিক উপায়ে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সূচনা

প্রাকৃতিক উপায়ে অর্থাৎ, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব থেকে উৎপন্ন হতে পারে এ ধারণাটি যে এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে ব্যক্ত করেছিলেন সেটা আমরা আগেই জেনেছি। কেন এভাবে, মানে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটল? এর উত্তরে ট্রিয়ন বলেছিলেন, 'আমি এক্ষেত্রে একটা বিনয়ী প্রস্তাবনা হাজির করতে চাই যে, আমাদের মহাবিশ্ব হচ্ছে এমন একটি জিনিস যেটা কিনা সময় সময় উদ্ভূত হয়'। তবে 'নেচার' জার্নালে প্রকাশিত 'ইজ দ্য ইউনিভার্স এ ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন' শিরোনামের সেই প্রবন্ধে যেভাবে মহাবিশ্ব উৎপত্তি হয়েছে বলে ট্রিয়ন ধারণা করেছিলেন, তাতে কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমত: এই প্রক্রিয়ায় ১৪০০ কোটি বছর আগেকার মহাবিশ্বের উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। কারণ ফ্লাকচুয়েশনগুলো সাধারণত হয় খুবই অস্থায়ী। সে হিসাবে একটি ফ্লাকচুয়েশন প্রায় ১৪০০ কোটি বছর টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই বলতে হবে। আসলে ফ্লাকচুয়েশনের স্থায়িত্ব বা জীবনকাল নির্ভর করে এর ভরের ওপর। ভর যত বড় হবে, ফ্লাকচুয়েশনের জীবনকাল তত কম হবে। দেখা গেছে একটি ফ্লাকচুয়েশনকে তের শ কোটি বছর টিকে থাকতে হলে এর ভর $১০^{-৬৫}$ গ্রামের চেয়েও ছোট হতে হবে, যা একটি ইলেকট্রনের ভরের $১০^{৩৮}$ গুণ ছোট। আর দ্বিতীয়ত এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যাবস্থা (empty space) থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়, আদিতে সেই শূন্যাবস্থাই বা এল কোথা থেকে (আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্পেস বা শূন্যাবস্থাকে দেশকালের বক্রতার পরিমাপে প্রকাশ করা হয়)। প্রথম সমস্যাটির সমাধান ট্রিয়ন নিজেই দিয়েছিলেন। ট্রিয়ন আপেক্ষিক তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদলের (যেমন পদার্থবিদ পিটার বার্গম্যান) সাথে সে সময়ই আলোচনা করে বুঝেছিলেন, একটি আবদ্ধ মহাবিশ্বে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধনাত্মক ভর শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ (এবং

এই শক্তির সমতুল্য পদার্থের পরিমাণ) শূন্য[138]। সে হিসেবে প্রায় ভরশূন্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করলে একটি ফ্লাকচুয়েশন প্রায় অসীম কাল টিকে থাকবে।

১৯৮২ সালে আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) দ্বিতীয় সমস্যাটির একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে, মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'শূন্য' থেকে, তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু 'পদার্থবিহীন' শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়-শূন্যতা এবং স্থান-শূন্যতাও বটে। ভিলেঙ্কিন কোয়ান্টাম টানেলিং-এর ধারণাকে ট্রিয়নের তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অশূন্য অবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মতো আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে[139]।

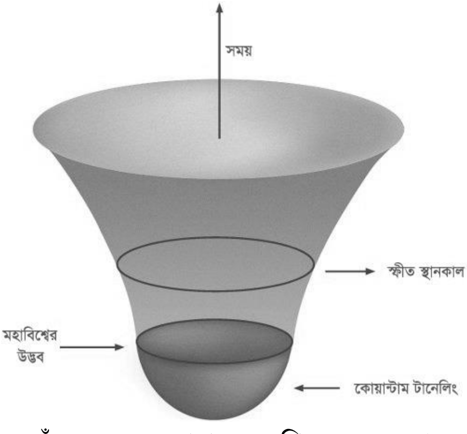

আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন তাঁর মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে শূন্যতা থেকে কোয়ান্টাম টানেলিং-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটতে পারে

---

138 আবদ্ধ মহাবিশ্বে মোট শক্তি যে শূন্য থাকে তা ট্রিয়নের সময়ই বিজ্ঞানীরা জানতেন। যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ এল ডি লান্ডাউ এবং ই এম লিফশিৎস ১৯৬২ সালে লেখা'The Classical Theory of Fields'পাঠ্য বইয়ে এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু ট্রিয়ন সম্ভবত এই উৎস সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।

139 Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28

ভিলেঙ্কিনের দেওয়া 'পরম শূন্যের' ধারণাটি (absolute nothingness) আত্মস্থ করা আমাদের জন্য একটু কঠিনই বটে! কারণ আমরা শূন্যাবস্থা বা স্পেসকে সব সময়ই পেছনের পটভূমি হিসেবেই চিন্তা করে এসেছি—এ ব্যাপারটি আমাদের অস্তিত্বের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে মনের আঙিনা থেকে একে তাড়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মাছ যেমন জল ছাড়া নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না, ঠিক তেমনি স্পেস ও সময় ছাড়া কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংগঠন যেন আমাদের মানস-কল্পনার বাইরে। তবে একটি উপায়ে 'অ্যাবসোলুট নাথিংনেস'-এর ধারণাটিকে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি পুরো মহাবিশ্বটিকে সসীম আয়তনের একটি আবদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে চিন্তা করা হয়, এবং এর আয়তন যদি ধীরে ধীরে কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনা যায়, তবে এই প্রান্তিক ব্যাপারটাকে 'অ্যাবসোলুট নাথিংনেস' হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা ছবিটিকে আমাদের মানসপটে কল্পনা করতে পারি আর না-ই পারি, ভিলেঙ্কিন কিন্তু প্রমাণ করেছেন, এই শূন্যতার ধারণা গাণিতিকভাবে সুসংজ্ঞায়িত, আর এই ধারণাটিকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির গণিত হিসেবে প্রয়োগ করা যেতেই পারে। ভিলেঙ্কিন তাঁর ধ্যানধারণা এবং সেই সাথে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতি নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি 'একের ভেতর অসংখ্য—অন্য মহাবিশ্বের সন্ধান' শিরোনামে[140]। বইটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ কেবল নয়, নানা হাস্যরস এবং কৌতুকসমৃদ্ধ উপাদানেও ভরপুর।

১৯৮১ সালে স্টিফেন হকিং ও জেমস হার্টলি ভিন্নভাবে সমস্যাটির সমাধান করেন। তাঁদের মডেল পদার্থবিজ্ঞানের জগতে 'প্রান্তহীন প্রস্তাবনা' (no-boundary proposal) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে[141]। তাঁদের মডেলটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যানের বিখ্যাত ইতিহাসের যোগ বা 'sum over histories'-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফেইনম্যান কোয়ান্টাম বলবিদ্যা

---

[140] Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2006

[141] James B. Hartle and Stephen W. Hawking, "Wave Function of the Universe," Physical Review D28, 2960-75, 1983

নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, একটি কণার কেবল একটি ইতিহাস থাকে না, থাকে বিভিন্ন সম্ভাব্য হিস্ট্রির সমাহার, অর্থাৎ গাণিতিকভাবে - অসংখ্য সম্ভাবনার অপেক্ষকের সমষ্টি। আমরা কণার দ্বিচিড় বা ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টসহ বহু বিখ্যাত পরীক্ষা থেকে ব্যাপারটার সত্যতা জেনেছি। ঠিক একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হকিং দেখিয়েছেন যে, এই ব্যাপারটা আমাদের মহাবিশ্বের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। মহাবিশ্বেরও কেবল একক ইতিহাস আছে মনে করলে ভুল হবে, কারণ মহাবিশ্বও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে সেই কোয়ান্টাম স্তর থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। হকিং তাঁর 'ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল' বইয়ে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'প্রান্তহীন প্রস্তাবনাটা ফেইনম্যানের সেই একাধিক ইতিহাসের ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু ফেইনম্যানের যোগফলে কণার ইতিহাস এখন স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছে সর্বতোভাবে স্থানকাল দিয়ে, যেটা কিনা মহাবিশ্বের ইতিহাসের সমষ্টি তুলে ধরে'। হকিং ইতিহাসের যোগসূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে আরো দেখলেন, স্থান ও কালের পুরো ব্যাপারটা প্রান্তবিহীন সসীম আকারের বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়[142]। ব্যাপারটা যেন অনেকটা পৃথিবীর আকারের সাথে তুলনীয়। আমরা জানি, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশও আকারে সসীম, কিন্তু প্রান্তবিহীন গোলকের মতো। গোলকের কোনো প্রান্ত থাকে না। সেজন্যই দক্ষিণ মেরুর ১ মাইল দক্ষিণে কী আছে তা বলার অর্থ হয় না। হকিং-এর দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের আদি অবস্থাটাও তেমনি। হকিং নিজেই লিখেছেন তাঁর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়ে[143]:

> আমরা যদি আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাথে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মেলাই তাহলে দেখা যায় প্রান্তিক ক্ষেত্রে স্থান -কালের বক্রতা এমন ব্যাপক হতে পারে যে, সময় তখন স্থানের স্রেফ আরেকটা মাত্রা হিসেবেই বিরাজ করে। একদম আদি মহাবিশ্বে, যখন মহাবিশ্ব এতটাই ক্ষুদ্র ছিল যে এর ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উভয়েই কাজ করত তখন আসলে

---

[142] Stephen William Hawking, The Universe in a Nutshell, Bantam, 2001

[143] 'দ্য গ্যান্ড ডিজাইন' – স্টিফেন হকিং [অধ্যায় ৬] (অনুবাদ তানভীরুল ইসলাম)

মহাবিশ্বের চারটি মাত্রাই ছিলো স্থানিক মাত্রা এবং কোনো আলাদা সময়ের মাত্রা ছিল না। এর অর্থ, আমরা যখন মহাবিশ্বের "সূচনা" সম্পর্কে বলি তখন একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাই। সেটা হলো, তখন সময় বলতে আমরা যা বুঝি, তারই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটা জানা থাকা প্রয়োজন যে, স্থান ও কাল নিয়ে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা, সেটা একদম আদি মহাবিশ্বের ওপর খাটে না। অর্থাৎ সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে, অবশ্য আমাদের কল্পনা এবং গণিতের ঊর্ধ্বে নয়। এখন, আদি মহাবিশ্বে চারটি মাত্রাই যদি স্থানের মাত্রা হিসেবে কাজ করে তাহলে সময়ের সূচনা হলো কিভাবে?

এই যে ধারণা যে, সময় জিনিসটাও স্থানের আরেকটি মাত্রা হিসেবে আচরণ করতে পারে, সেখান থেকে আমরা সময়ের সূচনাবিষয়ক সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে পারি; ঠিক যেভাবে আমরা "পৃথিবীর শেষ কোথায়" এই প্রশ্নকেও কাটিয়ে উঠি, গোলাকার পৃথিবীর ধারণা মাথায় রেখে। মনে করুন, মহাবিশ্বর সূচনা অনেকটা পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর মতো। কেউ যখন সেখান থেকে উত্তর দিকে যেতে থাকে, তখন একই অক্ষাংশের বৃত্তও বড় হতে থাকে, যেটা মহাবিশ্বের আকার ও স্ফীতি হিসেবে ভাবা যায়। তার মানে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে দক্ষিণ মেরুতে, কিন্তু এই দক্ষিণ মেরুবিন্দুর বৈশিষ্ট্য পৃথিবীপৃষ্ঠের আর যেকোনো সাধারণ বিন্দুর মতোই হবে।

এই প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিল, এই প্রশ্নটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, এই প্রশ্নটা "দক্ষিণ মেরুর দক্ষিণে কী আছে", এই প্রশ্নের সমতুল। এই চিত্রে মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই— প্রকৃতির যে আইন দক্ষিণ মেরুতে কাজ করে, সেটা অন্য যেকোনো জায়গাতেও কাজ করবে। একই ভাবে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিল, এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের ইতিহাসও যে সীমানাহীন একটা

বদ্ধ তল হতে পারে, এই ধারণাকে বলে “নো বাউন্ডারি কন্ডিশন” বা প্রান্তহীনতার শর্ত।

এখানে মূল ব্যাপারটি হলো, হকিং-এর মডেলটিও ভিলেঙ্কিনের মডেলের মতো প্রাকৃতিক ভাবে মহাবিশ্বের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে হকিং-হার্টলি মডেলের সাথে ভিলেঙ্কিনের মডেলের পার্থক্য এই যে, এই মডেলে ভিলেঙ্কিনের মতো ‘পরম শূন্য’র ধারণা গ্রহণ করার দরকার নেই।

ভিলেঙ্কিন ও হকিং-এর এই দুই মডেলের বাইরে আরেকটা মডেল আছে যেটা বাইভার্স (Biverse) নামে পরিচিত। এটা মূলত হকিং-হার্টলি মডেল এবং ভিলেঙ্কিনের প্রস্তাবিত মডেল দুটোর একধরনের সমন্বয় বলা যায়। পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গর এই মডেলের প্রবক্তা[144]। ২০১১ সালে প্রকাশিত আমাদের ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইয়েও এই মডেলটির উল্লেখ করেছিলাম।

ভিক্টর স্টেঙ্গরের বাইভার্স মডেল। আমাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে অপর মহাবিশ্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু অপর মহাবিশ্বের সময়ের দিক আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের দিকের ঠিক বিপরীত বলে দুটো মহাবিশ্বই উদ্ভূত হবে আসলে একই ‘আনফিজিকাল রিজন’ হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ ধরনের শূন্যাবস্থা থেকে

[144] ভিকটর স্টেঙ্গরের এই বাইভার্স মডেলের সাথে পরিচিত হতে হলে তাঁর The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us (Prometheus Books, 2011) অথবা Timeless Reality : Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes (Prometheus Books, 2000) দ্রষ্টব্য।

এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় অপর একটি মহাবিশ্ব থেকে, যে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল অসীম সময় পর্যন্ত, অন্তত আমাদের সময় পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে। কোয়ান্টাম টানেলিং বিজ্ঞানের জগতে একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধারণা। সাধারণ ভাষায়, কোনো বস্তুর একটি নিউটনীয় বাধা বা দেয়ালের ভেতর গলে বের হয়ে যাওয়াই কোয়ান্টাম টানেলিং। বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে স্থানের প্রসারণের যে অভিজ্ঞতা আমাদের মহাবিশ্বের অধিবাসীরা উপলব্ধি করেছে, অপর মহাবিশ্বটি উপলব্ধি করবে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ সংকোচনের অভিজ্ঞতা।

আরও একটি ব্যাপার হলো, একটি মহাবিশ্বে সময়ের দিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এনট্রপি বৃদ্ধি বা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির দিকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সেই শর্তকে সিদ্ধ করতে গেলে অপর মহাবিশ্বের সময়ের দিক আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের দিকের ঠিক বিপরীত হতে হবে। আর তাহলেই এই বাইভার্স মডেলে আমাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে অপর মহাবিশ্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হবে; ঠিক একইভাবে অপর মহাবিশ্বের অধিবাসীদের কাছে মনে হবে তাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব থেকে। দুই মহাবিশ্বেরই আপাত উদ্ভব ঘটবে ছবিতে ‘আনফিজিকাল রিজন’ হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ ধরনের শূন্যাবস্থা থেকে। গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে মডেলটি ত্রুটিপূর্ণ না হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে মডেলটির কিছু জটিলতার কারণে মূলধারার পদার্থবিদদের কাছে এটি জনপ্রিয় নয়। আমরাও এ মডেলটি নিয়ে বেশি আলোচনাতে আগ্রহী নই। তার চেয়ে স্ফীতি থেকে উঠে আসা আধুনিক মডেলগুলোর দিকে বরং দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আশির দশকে যখন হকিংসহ অন্য বিজ্ঞানীরা প্রান্তহীন প্রস্তাবনা নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে কাজ করে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময়টাতে গুথ-লিন্ডে-ভিলেঙ্কিন-স্টেইনহার্ট প্রমুখ বিজ্ঞানী কাজ করছিলেন তাঁদের প্রস্তাবিত ‘স্ফীতি তত্ত্ব’ নিয়ে। এই তত্ত্বের সাফল্যের ইতিহাস আমরা ইতোমধ্যেই আগের অধ্যায়গুলো থেকে জেনেছি। স্ফীতি তত্ত্বের

আবির্ভাবের পর থেকেই এ তত্ত্ব সন্দিগ্ধজনের কাছ থেকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, এবং বলা যায় সাফল্যের সঙ্গেই সে নিজেকে সামাল দিতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে মহাবিশ্বের জ্যামিতি শেষ পর্যন্ত 'সামতলিক' প্রমাণিত হওয়া। মূলত গুপ্ত শক্তির খোঁজ পাওয়া এবং কোবে আর ডব্লিউম্যাপ এবং অতি সম্প্রতি প্লাঙ্ক থেকে পাওয়া সূক্ষ্ম উপাত্ত থেকে আমরা প্রায় শতভাগ নিশ্চয়তায় জানতে পেরেছি যে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি সমতল (অর্থাৎ ওমেগার মান হবে ১-এর একদম কাছাকাছি), যেটা ছিল একসময় স্ফীতি তত্ত্বের জোরালো অনুকল্প। সমতল মহাবিশ্বের ব্যাপারটি এই অধ্যায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমতল মহাবিশ্বের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এটি তৈরি করে দেয় শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভবের নান্দনিক ক্ষেত্র। এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস তাঁর বিভিন্ন লেকচারে এবং বইয়ে। লরেন্স ক্রাউস ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে লস এঞ্জেলেসে এথিস্ট কনভোকেশনে 'ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং' নামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই এক ঘণ্টা চার মিনিটের সেই লেকচারটি রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন থেকে ইউটিউবে প্রকাশিত হলে পাঠক ও দর্শকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি করে। কিছুদিনের মধ্যেই ভিডিওটির দর্শকের সংখ্যা মিলিয়নের ওপর ছাড়িয়ে যায়[145]। লেকচারটিকে উপজীব্য করে তিনি পরবর্তীতে (২০১২) একই শিরোনামে একটি জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেন, যা নিউ ইয়র্ক টাইমসে বেস্ট সেলার হয়েছিল[146]। সেই মূল লেকচারের একটি অংশে সমতল মহাবিশ্ব এবং এর প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ক্রাউস উল্লেখ করেন[147] -

> মহাবিশ্বের জ্যামিতি অবশ্যই সমতল হতে হবে। কেন? দুটি কারণ। প্রথমত যেটা আমি সাধারণত বলি—সমতল মহাবিশ্বই একমাত্র মহাবিশ্ব যেটা কিনা

[145] ইউটিউব ভিডিও: 'A Universe From Nothing' by Lawrence Krauss, AAI 2009; Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, Uploaded on Oct 21, 2009

[146] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Atria Books;, 2012

[147] ইউটিউব ভিডিও: A "Flat" Universe; Uploaded on May 20, 2010.

> পদার্থবিদদের চোখে 'ম্যাথেম্যাটিকালি বিউটিফুল'। এটা হয়তো ঠিক; কিন্তু এটা মূল কারণ নয়। আরেকটা বড় কারণ আছে। সমতল মহাবিশ্ব এবং একমাত্র সমতল মহাবিশ্বই একমাত্র মহাবিশ্ব যেখানে মোট শক্তির পরিমাণ একেবারে নিখুঁতভাবে শূন্য হয়ে যায়। কারণ মহাকর্ষের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। আর এই ঋণাত্মক শক্তি নিখুঁতভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় মহাবিশ্বের ধনাত্মক ভর শক্তি দিয়ে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের মোট শক্তি থাকে শূন্য। এখন, মহাবিশ্বের মোট শক্তি শূন্য হবার মাজেজাটা কী? মাজেজাটা হলো কেবল এ ধরনের মহাবিশ্বই শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এ ব্যাপারটা সত্যই অনন্যসাধারণ। কারণ, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো একেবারে শূন্য থেকে মহাবিশ্বকে উদ্ভূত হবার অনুমতি দেয়। আপনার আর অন্য কিছুর দরকার নেই শূন্যতা ছাড়া, যার মোট শক্তি হবে শূন্য। সেখানে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটবে।

আরও মজার ব্যাপার হলো, স্ফীতি তত্ত্বের সর্বাধুনিক ধারণা (যাকে লিন্ডে 'কেওটিক ইনফ্লেশন' বলে অভিহিত করেছেন) অনুযায়ী, শুধু যে একবারই বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু নয়, এরকম বিগ ব্যাং কিন্তু হাজার হাজার, কোটি কোটি এমনকি অসীম-সংখ্যকবার ঘটতে পারে; তৈরি হতে পারে অসংখ্য 'পকেট মহাবিশ্ব'। আমরা সম্ভবত এমনই একটি পকেট মহাবিশ্বে অবস্থান করছি বাকিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে। এটাই সেই বিখ্যাত 'মাল্টিভার্স' বা 'অনন্ত মহাবিশ্বের' ধারণা।

বিজ্ঞানীরা আজ মনে করছেন, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যখন কেবল একটি নয়, অসংখ্য মহাবিশ্বের উদ্ভবের একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি 'বাড়তি হাইপোথিসিস' ছাড়া আর কিছু নয়। বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেঙ্গর, লরেন্স ক্রাউস, অ্যালেন গুথ, আঁদ্রে লিন্ডেরা সেটা অনেক আগে

থেকেই বলে আসছিলেন[148]। হকিংও তাঁর ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’ বইয়ে বলেছেন, ‘গড হাইপোথিসিস’ বা ‘ঈশ্বর অনুকল্প’ মোটা দাগে ‘অক্কামের ক্ষুরের’ লঙ্ঘন[149]। অবশ্য তাতে বিতর্ক থেমেছে এমন বলা যাবে না; বরং জাল ফেলে রাসেলের ‘শেষ কচ্ছপ’ ধরার প্রচেষ্টা চলছেই বিভিন্ন মহল থেকে।

রাসেলের শেষ কচ্ছপ?

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে নিয়ে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। তিনি একবার সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত এক সেমিনারে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সূর্যকে কেন্দ্র করে কিভাবে পৃথিবী এবং অন্য গ্রহমণ্ডল ঘুরছে, এবং সূর্য আবার কিভাবে আমাদের ছায়াপথে ঘুরছে এগুলোই ছিল বক্তৃতার বিষয়। বক্তৃতা শেষ হলে এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এতক্ষণ তুমি যা যা বলেছ তা সব বাজে কথা। পৃথিবী আসলে সমতল, আর সেটা রয়েছে একটা বিরাট কচ্ছপের ওপর। রাসেল মৃদু হেসে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কচ্ছপটা তাহলে কার ওপর দাঁড়িয়ে আছে?’ বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ভেবে জবাব দিলেন, ‘ছোকরা, তুমি খুব চালাক। তবে জেনে রাখো, কচ্ছপটার তলায় আরেকটা কচ্ছপ, আর ওটার তলায় আরেকটা— এভাবে পরপর সবই কচ্ছপ রয়েছে’।

তো প্রাকৃতিকভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ব্যাখ্যা পাওয়ার পর কি রাসেলের গল্পের সেই শেষ কচ্ছপের খোঁজ পাওয়া গেল? কচ্ছপের খোঁজ পাওয়া গেছে কি না জানি না, তবে অনেকেই মনে করছেন, মহাবিশ্ব ‘সৃষ্টি’র পেছনে কচ্ছপচালক ঈশ্বরের ভূমিকা অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনে

---

[148] এ প্রসঙ্গে পড়া যেতে পারে অ্যালেন গুথের ‘The Inflationary Universe’ (Basic Books, 1998) কিংবা ভিক্টর স্টেঙ্গরের ‘God: The Failed Hypothesis (Prometheus Books, 2008)’, কিংবা ইউটিউব থেকে দেখা যেতে পারে লরেন্স ক্রাউসের বিখ্যাত 'A Universe From Nothing' ভিডিওটি (Lawrence Krauss, AAI 2009) ইত্যাদি।

[149] অক্কামের ক্ষুর প্রসঙ্গে জানতে হলে ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুনর্মুদ্রণ ২০১২) দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া অনলাইনে, অভিজিৎ রায়, অক্কামের ক্ষুর (occam’s razor) এবং বাহুল্যময় ঈশ্বর, মুক্তমনা, জানুয়ারি ১৯, ২০১০ দ্রষ্টব্য।

অনিবার্যভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারলে মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের আদৌ কোনো আর ভূমিকা থাকে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন বটে। স্টিফেন হকিং-এর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইটি বের হবার প্রাক্কালে লন্ডন টাইমসে শিরোনাম করা হয়েছিল—'ঈশ্বর মহাবিশ্ব তৈরি করেননি: হকিং-এর অনুধাবন'[150]। হ্যানা ডেভলিনের রিপোর্টে প্রকাশিত টাইমসের সেই নিবন্ধে সে সময় লেখা হয়েছিল[151] -

> আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ঈশ্বরের জন্য কোনো জায়গা আর খালি রাখেনি, স্টিফেন হকিং-এর উপসংহার এটাই। যে ভাবে ডারউইনবাদ জীববিজ্ঞানের চৌহদ্দি থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়েছে, ব্রিটেনের সবচেয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ঠিক সেরকমভাবেই মনে করেন, পদার্থবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বগুলো ঈশ্বরের ভূমিকাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলেছে।

বলা বাহুল্য, ২০১০ সালে প্রকাশিত স্টিফেন হকিং-এর বইটিকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল মিডিয়ায়। বিতর্ক হয়েছে গ্র্যাণ্ড ডিজাইনের পরে বাজারে আসা লরেন্স ক্রাউসের 'ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং' (২০১২) বইটি নিয়েও। বিরূপতা এসেছে মূলত ধার্মিক এবং ধর্মপন্থী দার্শনিকদের দিক থেকেই বেশি। তাঁরা সোরগোল তুলেছেন শূন্যতার অভিব্যক্তি নিয়ে। তাঁরা দাবি করেছেন যে শূন্যতার কথা ক্রাউস তাঁর বইয়ে বলেছেন সেটা নাকি 'প্রকৃত শূন্যতা' নয়। কিন্তু প্রকৃত শূন্যতাটা ঠিক কী সেটা তাঁরাও যে খুব পরিষ্কারভাবে বলতে পারেন তা নয়। এটা অবশ্য স্বাভাবিকই। শূন্যতাকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে প্রথমেই শূন্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপিত করতে হবে, যার নিরিখে শূন্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। কিন্তু কোনো বৈশিষ্ট্য আরোপ করা মানেই সেটা আর 'প্রকৃত শূন্যতা' হবে না[152]। এ ধরণের শূন্যতা নিয়ে দার্শনিক ত্যানা প্যাঁচানোর নানা খেলা খেলা যায়, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীদের চোখে সেগুলো অর্থহীন। ক্রাউস এ

---

[150] Hannah Devlin, Hawking: God Did Not Create Universe - The Times (London) 2 September, 2010;

[151] "Modern physics leaves no place for God in the creation of the Universe, Stephen Hawking has concluded. Just as Darwinism removed the need for a creator in the sphere of biology, Britain's most eminent scientist argues that a new series of theories have rendered redundant the role of a creator for the Universe"; The Times newspaper on 2 September, 2010;

[152] Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013

ধরনের ‘দার্শনিক ত্যানা প্যাঁচানো শূন্যতা’কে অস্বচ্ছ (vague), অসম্যকবিবৃত (ill-defined) এবং অক্ষম (impotent) হিসেবে অভিহিত করেছেন[153]। কেউ কেউ সামঞ্জস্যহীন (inconsistent) কিংবা পরস্পরবিরোধীও (self-contradictory) হয়তো ভাববেন। পদার্থবিজ্ঞানীরা এই ধরনের পরস্পরবিরোধী দার্শনিক শূন্যতা নিয়ে কাজ করেন না[154], তাঁরা যে শূন্যতার কথা বলেন, সেটাকে বলে ‘ভয়েড’ বা স্থান-শূন্যতা। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে খুব ভালোভাবেই সংজ্ঞায়িত। চাইলে গাণিতিকভাবেও একে প্রকাশ করা যায়। এর প্রকাশমান তরঙ্গ অপেক্ষক (explicit wave function) আছে। এই ভয়েডজনিত শূন্যতা আসলে কোয়ান্টাম মহাকর্ষের শূন্যতা যা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের সমতুল[155]। এই ধরনের শূন্যতা থেকে আমাদের চেনা মহাবিশ্বের মতো কিছুর উৎপত্তিতে কোনো বাধা নেই। ক্রাউস সঠিকভাবেই বলেছেন, ‘কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি কেবল শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বর সৃষ্টির অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; এক্ষেত্রে আমি জোরালোভাবে বলব, এটা অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যকও’। এ জন্যই শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্ভবপর।

অবশ্য তাতে যে বিতর্ক থেমেছে তা নয়। ধর্মপন্থী দার্শনিকেরা প্রশ্ন করেছেন, ‘শূন্যতার মধ্যে যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন ঘটে তবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূত্রগুলোই বা এল কোত্থেকে?’। ‘কে নাজিল করল এই সব নিয়ম?’ মুশকিল হলো, এ ধরনের প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত চলতে থাকে, কচ্ছপের গল্পের মতোই। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে যে সমাধানই দেওয়া হোক না কেন, সেটারই বা কারণ কী বলে সে সমাধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে। সেটারও কোনো ব্যাখ্যা বা উত্তর হাজির করলে ‘সেই উত্তরেরও বা কারণ কী’ বলে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হবে। এভাবে

---

[153] Lawrence M. Krauss, The Consolation of Philosophy, Scientific American, April 27, 2013

[154] তবে অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে স্থানশূন্যতার বাইরে গিয়েও অর্থাৎ পরমশূন্যতা গোনায় ধরেও মহাবিশ্বের উদ্ভব ব্যাখ্যা করা গেছে, তার হদিস আছে ভিলেঙ্কিনের মডেলে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: Alexander Vilenkin, “Creation of Universe from Nothing” Physics letters 117B, 25-28, 1982

[155] Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013

ঠেলে ঠেলে শেষ পর্যন্ত উত্তরটাকে সকল রহস্যের একমাত্র সমাধান আরাধ্য 'ঈশ্বর'-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। এবং তার পরই লম্বা একটা দাঁড়ি – কমপ্লিট ফুলস্টপ যাকে বলে। তখন 'ঈশ্বরই বা এল কোথা থেকে' কিংবা 'ঈশ্বরের পেছনেই বা কারণ কী?' – এই ধরনের প্রশ্ন আর আমরা করতে পারব না। হাত-পা বেঁধে দেওয়া হবে। টেপ মেরে দেওয়া হবে তাঁদের মুখে যাঁরা এগুলো প্রশ্ন করবেন।

সৌভাগ্যবশত বিজ্ঞান এভাবে কাজ করে না। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নীতিগুলো আসলে কী, এবং এর উদ্ভব কীভাবে ঘটতে পারে, এটা এখনো বিজ্ঞানীদের গবেষণার সজীব একটি বিষয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা অন্তত জানেন যে, বিজ্ঞানের এই নিয়মনীতিগুলো শরিয়া আইনের মতো কিছু নয়, যে কারো দ্বারা 'নাজিল' হতে হবে। বরং কিভাবে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হতে পারে তা অনেক বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। যেমন বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেঙ্গর তাঁর 'The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?' বইয়ে দেখিয়েছেন যে, শূন্যতার প্রতিসাম্যতা এবং সেই প্রতিসাম্যের ভাঙনের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবেই পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উদ্ভব ঘটতে পারে[156]। সে সমস্ত গাণিতিক মডেলের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর অনলাইনে রাখা পেপারেও[157, 158]। তিনি মূলত গণিতবিদ এমি নোদারের (Emmy Noether, ১৮৮২-১৯৩৫) সহজ-সরল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ওপর ভিত্তি করে মূল গণনাগুলো করেন; তার সাথে 'গেজ সিমেট্রি'র ধারণার গাণিতিক সমন্বয় ঘটান (যাকে তিনি তাঁর বইয়ে অভিহিত করেছেন 'পয়েন্ট অব ভিউ' নীতি নামে), এবং সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে এই উপসংহার।

---

[156] Victor J. Stenger, The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?, Prometheus Books, 2006

[157] Victor J. Stenger, Where Do the Laws of Physics Come From?, colorado.edu; October 18, 2007

[158] Victor J. Stenger, Where Do the Laws of Physics Come From?, http://arxiv.org/vc/physics/papers/0207/0207047v2.pdf

এমি নোদারের তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটা নিয়ে বলার আগে এমি নোদার সম্বন্ধেই দু-চার কথা বলে নেওয়া যাক। নোদার জন্মেছিলেন ১৮৮২ সালে জার্মানির বাভারিয়ায়। গণিতজ্ঞ বাবার অনুপ্রেরণায় আর মূলত নিজের চেষ্টায় নিজেও একসময় গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু হলে কী হবে, নোদার যে সময়টায় জন্মেছিলেন, সে সময় গণিতবিদ হিসেবে নারীদের তেমন কোন স্বীকৃতি ছিল না। তাঁর নিজের শহরের আর্লেংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ক্লাসে অডিট করা ছাড়া আর কোনো কিছু করতে দেওয়া হয়নি। তারপরেও ১৯০৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্মান ব্যাচেলর ডিগ্রির সমতুল্য ডিগ্রি নিয়ে বেরোতে পারলেন। পরের এগারো বছর তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্টের অধীনে কাজ করার সুযোগ পান, সুযোগ পান আর্লেংগেন ও গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোরও, যদিও এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক তাকে দেওয়া হয়নি। ১৯১৮ সালের দিকে তাঁকে 'আনটেনিউরড প্রফেসর' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং ১৯২৩ সাল থেকে তিনি সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পেতে শুরু করেন। এভাবেই তাঁকে থাকতে হয়েছিল। গণিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা থাকলেও কখনোই তাঁর চাকরি স্থায়ী করা হয়নি, তাঁকে দেওয়া হয়নি গোটিংগেন একাডেমি অব সায়েন্সের কোনো পদও।

এমি নোদার (১৮৮২ -১৯৩৫), একদা বিস্মৃত এই গণিতজ্ঞের কাজ এবং তত্ত্ব ক্রমশ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে

এর মধ্যে ত্রিশের দশক থেকে জার্মানিতে নাৎসি বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে, শুরু হয় ইহুদিদের ওপর লাগাতার অত্যাচার। এমি নোদার জার্মানির ইহুদি পরিবারে জন্মেছিলেন। বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝে তাঁকে জার্মানি ত্যাগ করতে হয়। ১৯৩৩ সালে তিনি আমেরিকা এসে পেনসেলভেনিয়ার ব্রায়ান মেওর কলেজে যোগ দেন। কিন্তু দুই বছরের মাথায় তাঁকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। তিনি মারা যাবার সময় খুব কম লোকই তাঁর নাম জানত[159]। কিন্তু এখন দিন বদলাচ্ছে। তাঁর কাজ খুব গুরুত্ব সহকারে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উঠে আসছে। বিশেষ করে এমি নোদার ১৯১৫ সালে একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব দিয়েছিলেন, যেটা এখন 'নোদারের তত্ত্ব' (Noether's theorem) নামে অভিহিত হয়। এ তত্ত্ব এখন ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক পদার্থবিদ্যার বহু শাখায়[160]। গুরুত্ব, প্রয়োগ ও ব্যবহারের নিরিখে তাঁর তত্ত্বটি বর্তমানে হয়ে উঠেছে গণিতের ইতিহাসের অন্যতম সার্থক তত্ত্ব। এর সার কথা হলো, প্রতিটি লাগাতার স্থান-কাল সাম্যতার জন্য একটি করে নিত্যতার নীতি রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানে তিনটি নিত্যতার নীতি মৌলিক বলে বিবেচিত: শক্তির নিত্যতা, রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা, কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা।

নোদারের তত্ত্ব থেকে দেখা গেল, শক্তির নিত্যতার সূত্র (conservation of energy) আসলে সেরকম মৌলিক কিছু নয়, সময় অবস্থান্তর সাম্যতা (time translation symmetry) থেকেই বেরিয়ে আসে এটা । রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা (conservation of linear momentum) বেরিয়ে আসে স্থান অবস্থান্তর সাম্যতা

159 তার পরও প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের চোখকে নোদার ফাঁকি দিতে পারেননি। নোদার মারা যাবার পরপরই আইনস্টাইন নিউইয়র্ক টাইমসের একটি নিবন্ধে নোদারকে একজন 'গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিশীল গণিত-প্রতিভা' (significant creative mathematical genius) হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

160 Dwight E. Neuenschwander, Emmy Noether's Wonderful Theorem, Johns Hopkins University Press; 2010

(space translation symmetry) থেকে। কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা আসে স্থানিক ঘূর্ণন সাম্যতা (space rotation symmetry) থেকে।

এর মানে কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে, পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন গাণিতিক মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেন, তখন যদি তাঁদের সময় নিয়ে চিন্তা করতে না হয়, তাহলে তাঁদের শক্তির সংরক্ষণ নিয়েও আলাদা করে চিন্তার কিছু নেই। এটা এমনিতেই সিস্টেমে চলে আসবে। অর্থাৎ, একই মডেল যদি আজকে কাজ করে, কালকে কাজ করে কিংবা পরশু, কিংবা এক হাজার বছর আগে, কিংবা এক হাজার বছর পরে, তাহলে মডেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শক্তির নিত্যতা বলবৎ থাকবে। পদার্থবিজ্ঞানীদের এখানে আলাদা করে কিছুই করণীয় নেই।

একইভাবে, যদি আরেকজন পদার্থবিদ আরেকটি মডেল নির্মাণ করেন যেটা কিনা স্থানের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না, অর্থাৎ মডেলটি বাংলাদেশের বান্দরবান যেভাবে কাজ করবে, সেভাবেই কাজ করবে বিলেতের অক্সফোর্ডে, আমেরিকার টেক্সাসে, টিম্বুকটুতে কিংবা প্লুটোতে, তাহলে আমরা বলতে পারি, সেই মডেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রৈখিক ভরবেগের নিত্যতাও ধারণ করবে। এক্ষেত্রেও পদার্থবিজ্ঞানীদের আলাদা করে কিছু করার নেই।

ঠিক একইভাবে কোন মডেল যদি তার ওরিয়েন্টেশন বা দিকস্থিতির ওপর নির্ভরশীল না হয়, তবে কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার ব্যাপারটিও এমনিতেই বেরিয়ে আসবে।

নোদারের তত্ত্বের পাশাপাশি গেজ প্রতিসাম্যের বিষয়টিও এখানে প্রাসঙ্গিক। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, নাম আলাদা হলেও এদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; গেজ সিমেট্রির অনেক কিছুই আসলে নোদারের তত্ত্ব থেকেই বেরিয়ে আসে[161]। এই গেজ

---

[161] Katherine Brading and Harvey R. Brown, Noether's Theorems and Gauge Symmetries, August 2000

প্রতিসাম্যের ব্যবহার পদার্থবিজ্ঞানে অনেক। বৈদ্যুতিক চার্জের সংরক্ষণের কথা যে আমরা শুনি, সেটা এই গেজ প্রতিসাম্যতা থেকেই চলে আসে। যখন আহিত কণার গতির সূত্রকে গেজ সিমেট্রিক হিসেবে তৈরি করা হয়, ম্যাক্সওয়েলের সূত্র সেখান থেকেই চলে আসে। গেজ প্রতিসাম্যতা কেবল চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানেই নয়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বহু শাখাতেই সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই ১৯৪০ সাল থেকেই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে আর ১৯৭০-এর পর কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে এই তত্ত্ব। প্রমিত মডেলের চারটি মৌলিক বলের তিনটিই—তাড়িতচুম্বক, দুর্বল এবং সবল নিউক্লিয় বল 'লোকাল গেজ সিমেট্রি' থেকেই বেরিয়ে আসে।

'নোদারের তত্ত্ব' এবং গেজ প্রতিসাম্যের মোদ্দা কথা হলো সিস্টেমে সিমেট্রি বজায় থাকলে পদার্থবিজ্ঞানের সংরক্ষণতার নিয়মগুলো সেখান থেকে এমনিতেই বেরিয়ে আসে। কেন আর কীভাবে আসে এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন, তাঁরা যে শূন্যতা নিয়ে কাজ করেন, তাকে বলা হয় 'সিমেট্রিক ভয়েড'। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক উইলজেক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, এ ধরনের প্রতিসাম্যতা আসলে অস্থিতিশীল[162]। কাজেই এ ধরনের সিস্টেম থেকে প্রতিসমতার ভাঙনের মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উন্মেষ ঘটাবে। অস্থিত অবস্থা থেকে স্থিতাবস্থায় আসার জন্যই এটা ঘটবে। সাম্প্রতিক সময়ে আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিনসহ বহু বিজ্ঞানীই তাঁদের মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, কণাবিহীন, শক্তিবিহীন, স্থানবিহীন, সময়বিহীন এই আদি শূন্যাবস্থা ('হাইলি সিমেট্রিক ভয়েড') থেকে কোয়ান্টাম টানেলিং-এর মাধ্যমে এমন মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটতে পারে, যেখানে থাকবে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ক্রিয়াশীলতা। অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর দেখিয়েছেন, কেবল চিরয়াত বলবিজ্ঞানের আলোচ্য তিনটি নিত্যতার সূত্রই নয়, নিউটনীয় বলবিদ্যা, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, আপেক্ষিকতার বিশেষ এবং সার্বিক তত্ত্ব

[162] Frank Wilczek, "The Cosmic Asymmetry Between Matter and Antimatter," Scientific American 243, no. 6, 82-90, 1980

থেকে আসা সূত্রগুলো ‘পয়েন্ট অব ভিউ ইনভ্যারিয়েন্স’ এবং গেজ প্রতিসাম্যতা থেকেই বের করা সম্ভব।

আর পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোই বা আসলে কী? এগুলো কি আদপেই মৌলিক কিছু, নাকি মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যার প্রয়োজনে গণিতবিদ ও পদার্থবিদদের সৃষ্ট একধরনের বর্ণনা—সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ মুহূর্তে। অনেক সূত্রের কথাই আমরা জানি যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে সূত্র মনে হলেও আসলে সেরকমভাবে মৌলিক কিছু নয়। আমাদের চেনাজানা বলগুলোর অনেকগুলোই ‘কল্পিত বল’ (Fictitious force)। ‘কল্পিত’ বলা হচ্ছে, কারণ এগুলো কোনো সত্যিকারের বল নয়, এগুলো মূলত উঠে আসে বস্তুর সাথে ক্রিয়াশীলতার প্রেক্ষাপটে। বস্তু এবং মিথস্ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকলে বলগুলোও অনুপস্থিত থাকে। যেমন ছোটবেলায় স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যবইগুলোতে আমরা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বা কেন্দ্রাতিগ বলের কথা পড়েছি। কোনো বস্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরতে গেলে বাইরের দিকে একধরনের বল অনুভব করে, সেটাই কেন্দ্রাতিগ বল। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, এটা আসলে একটা কল্পিত বল, এর কোনো প্রকৃত উৎস নেই। এই বলের ধাক্কা অনুভূত হয় বৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় বৃত্তের অক্ষ থেকে বাইরের দিকে। বৃত্তাকার পথে না ঘুরলে এই বলের অস্তিত্বও থাকবে না। এরকম আরো অনেক বল আছে যেগুলো কল্পিত[163]। যেমন কোরিলয়িস বল। এমনকি মাধ্যাকর্ষণ বলও।

[163] What is a "fictitious force"?, Scientific American, July 9, 2007

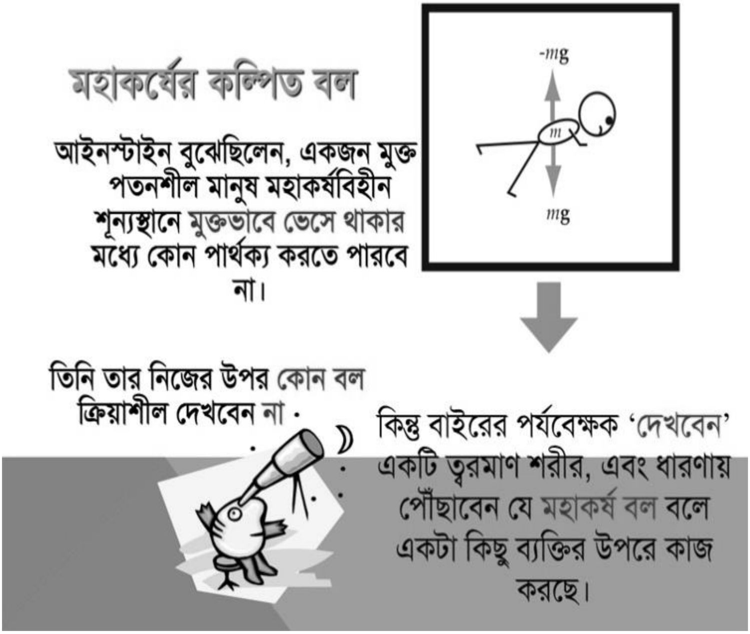

মাধ্যাকর্ষণ বলকে সত্যিকারের বল বলেই আমরা সাধারণত জানি। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবনার সময় বুঝতে পেরেছিলেন, মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তপতনশীলতার অভিজ্ঞতা আর মহাকর্ষবিহীন শূন্যাবস্থায় ভেসে থাকার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। সেখান থেকেই তিনি বের করে আনলেন ‘ইকুইভ্যালেন্ট প্রিন্সিপাল’—যা ছিল সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি। সে হিসেবে মহাকর্ষও একটি কল্পিত বল, নিদেন পক্ষে এমন একটি বল যা কল্পিত বল থেকে অনেক সময়ই আলাদা করা যায় না।

আরো একটি বড় সমস্যা হলো, পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্রগুলোকে আমরা নিত্য বা ধ্রুব বলে জানি, সেগুলোর অনেকগুলোই সর্বজনীন নয়। যেমন, আমরা জানি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র মাটিতে আপেলের পতনকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও অন্তিম কিছু পরিস্থিতিতে ঠিকমতো কাজ করে না, যেমন কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি, কিংবা

আলোর বেগের প্রায় সমান বা তুলনীয় কোনো বেগের ক্ষেত্রে। আমরা তখন শরণাপন্ন হই আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের। কিন্তু আবার দেখা গেছে, আইনস্টাইনের তত্ত্বও প্লাঙ্ক স্কেলের চেয়ে ছোট জায়গায় কাজ করে না, আমরা শরণাপন্ন হই, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কিছু সূত্রের। তাই পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো হয়তো 'ধ্রুব' কিছু নয়, এরা আসলে আমাদের মডেলের সীমাবদ্ধতা তৈরি করছে, পদার্থের নয়। এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, 'কনজারভেশন অব লিনিয়ার মোমেন্টাম' বা রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা নামের সূত্রের কথা যে আমরা আগে জেনেছি, তা আর সংরক্ষিত থাকে না যখন সময় অবস্থান্তর বা 'স্পেস ট্রান্সলেশন' প্রতিসাম্যতা ভেঙে যায়। ঠিক একইভাবে কৌণিক ভরবেগও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়। আর কোয়ান্টাম জগতে আমাদের চেনাজানা জগতের অনেক সূত্রই কাজ করে না। যেমন, কোয়ান্টাম টানেলিং-এর সময় নিউটনীয় বাধা কাজ করে না; কোয়ান্টাম এন্টাংগেলমেন্টের মতো ব্যাপার-স্যাপার ঘটে, কিংবা কণা-প্রতিকণার উদ্ভব ঘটে শূন্য থেকে, যেগুলো আমাদের সজ্ঞাত ধারণা কিংবা প্রচলিত নিয়মের বিরোধী। কাজেই এ উদাহরণগুলো গোনায় ধরলে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র বা নিয়মগুলোকে যেভাবে চিরায়ত বা 'প্লেটোনিক' বলে উল্লেখ করা হয়, সেগুলো কি সেরকমই নাকি আসলে মডেল তৈরির প্রয়োজনে পদার্থবিদদের বর্ণন,তা সত্যই প্রশ্নসাপেক্ষ; যদিও অধিকাংশ মানুষ এবং এমনকি পদার্থবিদদেরও একটি বড় অংশ মনে করেন এই সূত্রগুলো 'প্লেটোনিক'।

কিন্তু এই 'প্লেটোনিক' ব্যাপারটা আসলে কী? এ নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এর উৎস পাওয়া যায় গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর রিপাবলিকে বর্ণিত ধারণায়। প্লেটো কল্পনা করতেন, আমাদের জগতের বাইরেও একটা স্বর্গীয় জগৎ আছে, সেখানে সব নিখুঁত গাণিতিক বিমূর্ত ধারণাগুলো বাস করে। আমরা আমাদের জগতে শতভাগ নিখুঁত রেখা, বৃত্ত, ত্রিভুজ, অসীমসংখ্যক সমান্তরাল রেখা দেখতে পাই না। আমাদের জগতে না পাওয়া গেলেও প্লেটো ভাবতেন, সেগুলো পাওয়া যাবে সেই স্বর্গীয় জগতে। শুধু

জ্যামিতিক অবয়ব নয়, আমাদের সংখ্যাপদ্ধতি, গাণিতিক, অনুপাত, ধ্রুবক সবকিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে সেই স্বর্গীয় জগতে। গণিতবিদদের মধ্যে যাঁরা এখনো, প্লেটোর রিপাবলিকের অর্ধশতাব্দী পরও এই স্বর্গীয় ফ্যান্টাসিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, তাঁদের বলা হয় 'প্লেটোনিস্ট'। তাঁরা সত্যই মনে করেন, এমন এক জগৎ আছে যেখানে গণিতের 'পাই', 'সুবর্ণ অনুপাত', 'ফিবোনাচি রাশিমালা' এরা সবাই হাত-ধরাধরি করে বাস করে। যেমন, কলেজ ডি ফ্রান্সের বিশ্লেষণ এবং জ্যামিতি বিভাগের চেয়ারপারসন অ্যালেইন কোনস বলেন, 'মানবমনের বাইরেও আদি এবং ইমিউটেবল গাণিতিক বাস্তবতার অস্তিত্ব রয়েছে'। প্লেটোনিস্ট গণিতবিদেরা মনে করেন, গণিতবিদের কাজ হচ্ছে সেই গাণিতিক বাস্তবতাগুলো 'ডিসকোভার' করা, 'ইনভেন্ট' নয়। অর্থাৎ গণিতের নিয়মগুলো তৈরি করা যায় না, কেবল খুঁজে বের করা যায়। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোও ঠিক তেমনি, এরা বাস করে বিমূর্ত এক কল্পলোকে, আর এরা বাস্তব জগৎকে স্পর্শ করে তখনই যখন তারা এর ওপর 'ক্রিয়া' করে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলেই ঠিক সেরকম? আমরা এই বইয়ের প্রথমদিকে সুবর্ণ অনুপাতের সাথে পরিচিত হয়েছি। আমরা দেখেছি ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা কিংবা গ্রীসের পার্থেনন প্রাসাদ থেকে শুরু করে আনারস,শামুক,গাছের পাতা, ফুলের পাপড়ি, পাইনকোন, গাছের শাখা, গ্যালাক্সিসহ প্রকৃতির বিভিন্ন নকশায় রয়েছে সুবর্ণ অনুপাতের সরব উপস্থিতি। একই কথা ফিবোনাচি রাশিমালার ক্ষেত্রেও খাটে। প্লেটোনিস্ট গণিতবিদেরা এই রহস্য দেখে উদ্বেলিত হন, তাঁরা যেন অনুভব করেন গাণিতিক বিমূর্ততার সত্যিকার অস্তিত্ব: 'Mathematics feels real, and the world feels mathematical'. কেউ কেউ জেমস জিনসের মতো জিজ্ঞেসা করেই বসেন, 'ইজ গড আ ম্যাথেম্যাটেশিয়ান?'।

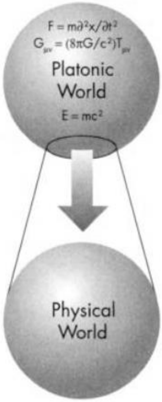

পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো থাকে কোথায়? প্লেটো বিশ্বাস করতেন, গণিতের ধারণাগুলোর সত্যিকার অস্তিত্ব আছে, এবং তারা বাস করে কল্পলোকের বিমূর্ত জগতে। তাদের আহরণ করা যায় অভীষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। অধিকাংশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রকে প্রকাশ করে থাকেন, এবং তাঁরাও একই ঐতিহ্য অনুসরণ করে থাকেন।

তবে, প্লেটোনিক ব্যাপারটায় 'রোমান্টিকতা' থাকলেও এটা সর্বজনগ্রাহ্য কোনো কিছু নয়। বরং এর 'আঁশটে' গন্ধের জন্য বহুদিক থেকেই এর বহু সমালোচনা আছে। এ প্রসঙ্গে জর্জ লেকফ ও রাফায়েল নুনেজের 'Where Mathematics Come From: How The Embodied Mind Brings Mathematics Into Being' বইটি পড়া যেতে পারে। বইটিতে লেখকদ্বয় প্লেটোনিক ধারণার সমালোচনা করে বলেছেন, 'প্লেটোনিক গণিত বিশ্বাসের ব্যাপার, অনেকটা ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতোই। এটার অস্তিত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই'। জ্যোতিঃপদার্থবিদ মারিও লিভিও তাঁর 'Is God a Mathematician?' বইয়ে দেখিয়েছেন, সুবর্ণ অনুপাতসহ গণিতের বেশ কিছু ধারণা, যেগুলো মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে, তার অনেকগুলোই আসলে প্লেটোনিক নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে মানুষেরই আবিষ্কার, কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ দুই বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ[164]। মারিও লিভিও তাঁর আরেকটি বই 'গোল্ডেন রেশিও'তে জোরালোভাবে

164 Mario Livio, Is God a Mathematician?, Simon & Schuster, 2010

অভিমত দিয়েছেন যে, স্থাপত্য, শিল্পকলাসহ বহুক্ষেত্রে আমরা গোল্ডেন রেশিও বা সুবর্ণ অনুপাতের যেরকম মাহাত্ম্যের কথা শুনি, তার বেশিরভাগই আসলে 'মিথ' বা অতিকথন[165]।

তবে আমরা সেসব দার্শনিক জটিলতায় যেতে চাই না। আমরা খুব সহজ কিছু উদাহরণের সাহায্যে সোজাসাপ্টাভাবে ব্যাপারগুলো বুঝতে চাই। এ প্রসঙ্গে চলুন আমরা বেছে নিই সবার চেনাজানা গাণিতিক ধ্রুবক 'পাই' (π) বাবাজিকে। ছোটবেলায় স্কুলের শিক্ষকেরা শিখিয়েছিলেন-এর মান ৩.১৪-এর মতন। যত বড় হতে লাগলাম তত দেখলাম পাইয়ের হরেক রকমের ব্যবহার। বৃত্তের ক্ষেত্রফল ($A = \pi r^2$) বের করতে 'পাই' লাগে, গোলকের আয়তন ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$) বের করে 'পাই' দরকার, 'পাই' লাগে গোলকের পৃষ্ঠক্ষেত্র ($A = 4\pi r^2$) বের করতে গেলেও। নবম-দশম শ্রেণীতে উঠে বৈদ্যুতিক চার্জের সাথে আর কুলম্বের সূত্রের সাথে যখন পরিচিত হলাম, দেখলাম 'পাই' বাবাজি খুঁটি গেড়েছে সেখানেও –

$$F = \frac{q_1 q_2}{\varepsilon_\circ 4\pi r^2}$$

যেখানে,

F = চার্জ q_1 এবং চার্জ q_2-এর মধ্যকার বল

$4\pi r^2$ = গোলকের পৃষ্ঠক্ষেত্র

q_1 = প্রথম বস্তুকণার আধান

q_2= দ্বিতীয় বস্তুকণার আধান

r = আহিত বস্তুকণাদ্বয়ের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব

$\varepsilon_\circ$= বৈদ্যুতিক প্রবেশ্যতা বা পার্মিবিলিটি কনস্ট্যান্ট

[165] Mario Livio, The Golden Ratio: The Story of PHI, the World's Most Astonishing Number, Broadway Books, 2003

আইনস্টাইনের বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে পরিচিত হবার পর দেখলাম, তাঁর বিভিন্ন সূত্রেই ‘পাই’য়ের নানা ধরনের ব্যবহার আছে। যেমন তাঁর ভর আর শক্তির মধ্যে সম্পর্কসূচক বিখ্যাত সমীকরণটাকে সহজেই ‘পাই’-এর মাধ্যমে লেখা যায় –

$E = mc^2 = \frac{m}{\varepsilon_0 \mu_0}$, [illegible] $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}\ henry/meter$

আর আমরা অষ্টম অধ্যায়ে আপেক্ষিকতত্ত্বের যে ক্ষেত্র-সমীকরণের সাথে পরিচিত হয়েছি, সেখানেও রয়েছে ‘পাই’ –

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

দেখে মনে হতে পারে পুরো মহাবিশ্বই যেন ‘পাই’ময়। মহাবিশ্বের ডিজাইনের মূলেই যেন ‘পাই’। বহু লেখকের বইয়েই দেখা যায়, মিসরের প্রাচীন পিরামিড থেক শুরু করে বহু প্রসিদ্ধ স্থাপত্যকর্মের নকশায় নাকি ‘পাই’ লুকিয়ে আছে[166]। ভাবখানা এমন, এই ‘পাই’ ব্যাপারটা ধ্রুবক হিসেবে না থাকলে বোধ হয় মহাবিশ্ব কাজই করত না। নিশ্চয় এটা স্বর্গীয় কিছু। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নিশ্চয় ‘পাই’-এর মান এমনতর করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল - ভাবনাটা যে ঠিক তার কোনো প্রমাণ নেই। সবকিছুর পেছনে একধরনের ‘উদ্দেশ্যের বিভ্রম’ তৈরি করা মানুষের মজ্জাগত; হয়তো এটা অতীতে কোনো বিবর্তনীয় উপযোগিতা দিয়েছিল মানুষকে, তাই অধিকাংশ মানুষ এভাবেই চিন্তা করে; কিন্তু মহাবিশ্ব তো আর মানুষের চিন্তা অনুযায়ী কিংবা তার আরোপিত বিভ্রম অনুযায়ী কাজ করার জন্য দিব্যি দিয়ে বসে নেই। পদার্থবিদ শন ক্যারল সেটা স্পষ্ট করেছেন নিচের এই উদ্ধৃতিতে –

> ‘মানুষের একটা সাধারণ প্রবণতা হলো মহাবিশ্বের সব কিছুর পেছনে একটা উদ্দেশ্য ও অর্থ খুঁজে ফেরা। কিন্তু সেই প্রবণতাকে মহাজাগতিক

---

166 মজার ব্যাপার হচ্ছে, পিরামিডের নকশায় সুবর্ণ অনুপাত এবং পাই-এর ব্যবহার থাকার দাবি করা হলেও প্রাচীন মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা যে সুবর্ণ অনুপাতের ব্যবহার জানতেন, তার কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা ‘পাই’-এর ব্যবহার জানলেও সাম্প্রতিক sekedতত্ত্ব অনুযায়ী পিরামিড নির্মাণে এর কোনো ভূমিকাই ছিল না (Mario Livio, Golden Ratio, 2003)।

নিয়মনীতির দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। 'অর্থ' ও 'উদ্দেশ্য'—এগুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি; এগুলো বাস্তবতার পরম নির্মাতার কোথাও ওত পেতে থাকার ইঙ্গিত নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি। তাতে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। আমাদের মহাবিশ্বটা যেরকম, সেরকমভাবে খুঁজে পেয়েই আমি খুশি'।

শন কারলের মতো পদার্থবিদ মহাবিশ্বের প্রকৃতি যেরকম সে রকমভাবে পেয়েই খুশি হতে পারেন, কিন্তু আমাদের অনেকেই হই না। নানা রকম অর্থ খুঁজে ফিরি, নানা পদের উদ্দেশ্য তৈরি করি এর পেছনে। সামান্য একটা 'পাই'-এর মান কেন ৩.১৪ হল তা নিয়ে ভাবাপ্লুত হয়ে যাই, বিস্মিত হই প্রকৃতিতে 'বুদ্ধিদীপ্ত নকশা' কিংবা 'সূক্ষ্ম সমন্বয়' খুঁজে পেয়ে।

'পাই'-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। এর সংজ্ঞা খুবই সোজা। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে যেকোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে এই পাই নামের ধ্রুবক দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

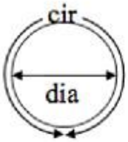

যে কোন আকারের বৃত্তের জন্য
π = cir/dia =3.14159…

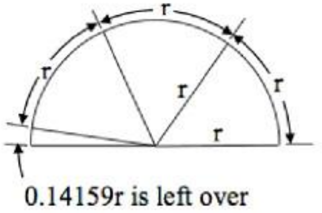

Pi (π) is also the number of times the radius, r, will fit into the arch of a half circle.

পাই ব্যাপারটা আমরাই সংজ্ঞায়িত করেছি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়ে

ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পাই ব্যাপারটা আমরাই সংজ্ঞায়িত করেছি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়ে। এই সংজ্ঞা স্বর্গ থেকে আসেনি। মানুষই বানিয়েছে। মানুষ আরো দেখেছে, এই অনুপাতের একটা মান আছে এবং সেটা একটা অমূলদ সংখ্যা, যাকে পিথাগোরাস এবং তাঁর অনুসারীরা যমের মতো ভয় করতেন। গণিতবিদেরা পাই-এর মান দশমিকের পর এমন সূক্ষ্মতায় নির্ণয় করেছেন যে এই বইয়ের সমস্ত পাতাকে সংখ্যা দিয়ে ভরে ফেলা যাবে। কেউ কেউ আবার নিজেদের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিতে পাই-এর সেই মান গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারেন, আর নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অন্যদের তাক লাগিয়ে দিতে পারেন। এগুলো সবই মানুষ করে ঐশ্বরিক কোনো ক্ষমতার দাবি ছাড়াই, যেকোনো ভাবালুতা এড়িয়ে।

কিন্তু চাইলে কেউ ভাবালু হয়ে আলুথালু বেশ নিতে পারেন অবশ্য। ছোটবেলায় আমরাও নিতাম। একটা ধাঁধা ছিল ছোটবেলায় —পঁচিশ পয়সার একটা কয়েনকে মাঝখানে রেখে এর চারদিকে সর্বোচ্চ কয়টা সিকি বসানো যাবে, যাতে তাদের মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে?

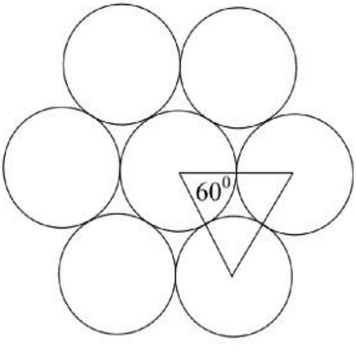

কেন মাঝখানের একটি বৃত্তের চারিদিকে ঠিক ছয়টি বৃত্তই একদম গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারে?
কেনই বা ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি হয়?
এটা কি কোন সূক্ষ্ম সমন্বয়, ঐশ্বরিক যাদু, নাকি স্রেফ আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতিক বাস্তবতা?

ছোটবেলায় ধাঁধাটির সমাধান বের করতে মাথা চুলকালেও এখন জানি এর সমাধান আসলে খুবই সোজা। যাঁরা পিথাগোরাসের জ্যামিতি জানেন, তাঁরা টেবিলে পয়সা না বসিয়েই উত্তর বলে দিতে পারবেন। যাঁরা পারবেন না তাঁরা ওপরের ছবিটা দেখুন। দেখবেন, মাঝখানের কয়েনের চারদিকে মোট ৬টা কয়েন বসানো যাবে। কিভাবে পাওয়া গেল এই উত্তর? মাঝখানের কয়েন আর তার চারপাশের দুটো কয়েনের কেন্দ্র মিলে তৈরি করবে এক সমবাহু ত্রিভুজ। আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি। সে হিসেবে সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণ হবে ৬০ ডিগ্রি। এখন সমগ্র বৃত্তকে যেহেতু ৩৬০ ডিগ্রি দিয়ে প্রকাশ করা হয়, সেক্ষেত্রে চারপাশের বৃত্তের সংখ্যা হবে: $\frac{৩৬০}{৬০} = ৬$ টি।

দেখাই যাচ্ছে খুব সোজাসাপ্টা হিসাব। কোনো রহস্য নেই। একটা সিকির চারদিকে সাতটা বা আটটা সিকি বসানো যাবে না। ৬টিই হতে হবে। এটা কি কোনো সূক্ষ্ম গায়েবি সমন্বয়? না, তা নয়। আগেই দেখানো হয়েছে, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি হিসেবে সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটি কোণকে হতে হবে ৬০ ডিগ্রি। কাজেই ৬টির বেশি কয়েন এতে আটবে না। কিন্তু যাঁরা ঐশী ভাবালুতা খোঁজেন তাঁরা সব সময়ই নানা পদের রহস্য আমদানি করবেন, হয়তো বলবেন তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিই বা হলো কেন, কেন ১৭০.৭৫ ডিগ্রি নয়?

এর কারণ হলো, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে আমাদের মহাবিশ্বের জ্যামিতি সামতলিক বা ফ্ল্যাট। সামতলিক জ্যামিতির মহাবিশ্বে দুটি সমান্তরাল রেখা সব সময় সমান্তরালভাবেই চলতে থাকে। আর সেখানে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় ঠিক ১৮০ ডিগ্রি। ভিন্ন টপোলজির মহাবিশ্বে সেটা ভিন্ন রকম হতে পারে যদিও। যেমন কোনো বদ্ধ মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিকে ছাড়িয়ে যায়, আর সমান্তরাল আলোর রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। আবার উন্মুক্ত কিংবা পরাবৃত্তাকার (hyperbolic) মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে কম।

সেখানে সমান্তরাল আলোর রেখাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই যে ভাবালুরা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৭০.৭৫ ডিগ্রি হিসেবে দেখতে চান, তাঁদেরকে কষ্ট করে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে গিয়ে কোনো হাইপারবলিক উন্মুক্ত মহাবিশ্ব খুঁজে নিয়ে সেখানে আবাস গড়তে হবে।

ব্যাপারটা কেবল 'পাই'-এর মান নির্ণয়ে কিংবা তিন কোণের সমষ্টি পরিমাপের ক্ষেত্রেই নয়, যেকোনো পদার্থবিজ্ঞান বা গণিতের সূত্রের ক্ষেত্রেই একইভাবে প্রযোজ্য। মারিও লিভিও তাঁর 'গোল্ডেন রেশিও' বইয়ে বলেন, 'কোনো কারণে পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ বলের টান যদি একটু বেশি অনুভূত হতো, তাহলে ব্যাবলনীয়রা কিংবা ইউক্লিডিয়ানরা হয়তো ভিন্ন কোনো জ্যামিতি প্রস্তাব করত। মাধ্যাকর্ষণ বেশি হলে আমরা জানি যে, আমাদের চারদিকের স্থান সমতল না হয়ে বাঁকা হতো। আলোকেও সোজা পথে না চলে বাঁকা পথেই চলতে হতো। সেই বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতির যে স্বীকার্যগুলো উঠে আসত তা আজকে থেকে ভিন্নরকম'। সে ধরনের বাস্তবতা হয়তো থাকতেই পারে, তবে আমাদের মহাবিশ্বে নয়, অন্য কোনো মহাবিশ্বে।

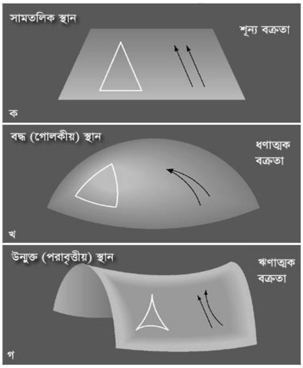

(ক) সামতলিক মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় ১৮০ ডিগ্রি, এবং সমান্তরাল দুটি রেখা সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। (খ) বদ্ধ (গোলকীয়) মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে বেশি হয়, এবং সমান্তরাল দুটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করে যায়। (গ) উন্মুক্ত (পরাবৃত্তীয়) মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রির চেয়ে কম হয়, এবং সমান্তরাল দুটি রেখা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়

লিণ্ডের কেওটিক ইনফ্লেশনারি মডেলকে গোনায় ধরলে সেটা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। স্ফীতির এই সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের বাইরেও অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে। ‘স্ট্রিং ল্যান্ডস্কেপ’ থেকে পাওয়া সমাধান থেকে জানা গেছে যে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরেও অন্তত $১০^{৫০০}$ টির মতো ‘ভ্যালি’ আছে, এবং তা থেকে জন্ম নিতে পারে আলাদা আলাদা মহাবিশ্ব। সে সমস্ত মহাবিশ্বে একেক রকম পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র কাজ করতে পারে। সম্ভাব্য মহাবিশ্বের যে বিশাল সমাধান পাওয়া গেছে তার বিন্যাস এবং সমাবেশ করলেই বোঝা যায় কত ধরণের বহুমুখী মহাবিশ্ব বাস্তবে তৈরি হতে পারে। কোনো মহাবিশ্বে হয়তো গ্রহ বা নক্ষত্র তৈরিই হতে পারবে না কখনো, কোনোটায় তৈরি হলেও প্রাণের বিকাশের জন্য খুবই বৈরি পরিবেশ থাকবে, কোনো মহাবিশ্বে হয়তো আমাদের মতোই কোনো এক সুনীল গ্রহে বুদ্ধিমান সত্তার উদ্ভব ঘটার মতো পরিবেশ তৈরি হয়েছে, কোনোটায় হয়তো দেখা যাবে মানুষের বদলে ডাইনোসরেরা ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরছে, আর কোনোটায় পিথাগোরাসের জ্যামিতি সমাধান করতে গিয়ে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি পাওয়া যাচ্ছে ১৭০.৭৫ ডিগ্রি। অর্থাৎ,আমাদের মহাবিশ্বের নিয়মগুলোকে যেভাবে ‘চিরায়ত’ কিংবা ‘পাথরে খোদাই করা’ বলে ভাবা হচ্ছে, মাল্টিভার্স সত্য হলে সেই ছবিটা আর সেরকম থাকবে না। তা না হওয়াটাই বরং অধিকতর সম্ভাব্য। পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস তাঁর ‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন, পদার্থবিজ্ঞানের বিধিগুলো কোনো ঐশী স্পর্শে নয়, বরং র‍্যাণ্ডমলি বা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন মহাবিশ্বে বিভিন্ন রকমভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি বলেন,

> ‘সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের বিধিগুলো যদি এলোপাতাড়ি এবং বিক্ষিপ্ত হয়, তবে আমাদের মহাবিশ্বের জন্য এর কোনো কোনোটি প্রযুক্ত হবার জন্য কোনো নির্ধারিত ‘cause’-এর দরকার নেই। কোনো কিছুর উপরে যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করা হয়, তবে, সাধারণ নিয়মেই কোনো একটা

মহাবিশ্বে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু জুতসই নিয়ম প্রযুক্ত হবে, যেগুলো আমরা সেখানে খুঁজে পেয়ে ধন্য হয়ে যাব।’

একই কথা বলেছেন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী মার্টিন রিসও। তিনি এই মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের পুরো সিস্টেমকে তুলনা করেছেন বঙ্গবাজারের কিংবা গাউছিয়ার মতো কোনো একটা পুরনো সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সঙ্গে। কাপড়ের জোগান যদি বিশাল হয়, তার মধ্যে কোনো একটা পুরনো জামা আমাদের দেহে মাপমতো লেগে গেলে, আমরা যেমন অবাক হই না, ঠিক তেমনি আমাদের মহাবিশ্বের বিধিগুলোর তথাকথিত সূক্ষ্ম সমন্বয় দেখেও এত হতবিহবল হবার কিছু নেই[167]।

কিন্তু কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বে কাজ করছে? আর কেনই বা এই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাকে মূলধারার বিজ্ঞানীরা এত জোরালোভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন ইদানীং? ‘মাল্টিভার্স’-এর ধারণা, যা কিছুদিন আগেও কেবল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি এবং ফ্যান্টাসির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমশ এখন পদার্থবিজ্ঞানের মূলধারার গবেষণার অংশ হয়ে উঠছে কিভাবে? এ নিয়ে আমরা জানব পরবর্তী একটি অধ্যায়ে।

কিন্তু তার আগে আমাদের হিগস সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। কারণ, আমাদের এই শূন্যতার সাথে হিগসের একটা গভীর সম্পর্ক আছে।

[167] Martin Rees, Why does the Universe Appear to be Fine-Tuned for life?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

দ্বাদশ অধ্যায়

হিগস কণার খোঁজে

'উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের সাহসিকতা আর তাদের উত্তরের গভীরতা দিয়েই আমরা আমাদের বিশ্বকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলি'।

—কার্ল স্যাগান

সুইজারল্যান্ডে কয়েক দিন

সারা বছর কাজের ভিড়ে ঘোরাঘুরির যে খুব একটা সময় পাই তা নয়। তার পরও চেষ্টা করি বছরের কোনো একটা সময় যাবতীয় কাজকর্ম সব শিকেয় তুলে অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার। লাপাত্তা মানে কেবল বাড়ি কিংবা শহর থেকে হাওয়া নয়, একেবারে দেশ থেকেই সপরিবারে পলায়ন। এতে দুটা উপকার। একঘেয়ে কাজের আবর্জনা থেকে অন্তত সপ্তাহ খানেকের জন্য হলেও রেহাই পাওয়া যায়, এতে মনে কেমন একটা ফুর্তি ফুর্তি ভাব আসে, মনপ্রাণ চাঙা হয়; আর এর পাশাপাশি নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন কৃষ্টির সাথে একটা পরিচয় ঘটার সুযোগ হয়ে যায়।

সুইজারল্যান্ড দেশটা নেহাত মন্দ নয়। ছবির মতন দেশ। একবার গেলে আর ফিরতে মন চাইবে না। আমারও (অ.রা) কি ছাই চাইছিল? ২০১২ সালের মার্চ মাসের শেষ থেকে শুরু করে এপ্রিলের পুরো প্রথম সপ্তাহটা কাটিয়ে এসেছিলাম সুইজারল্যান্ডে। কেমন যেন ঘোরলাগা পরিবেশ। সবুজ প্রান্তর ঘেঁষে উঁচু পাহাড়,

সুনীল আকাশ আর বহমান নদীর তীরঘেঁষা শহর। আমরা ছোটবেলায় ছবি আঁকার খাতায় যে অবারিত সবুজের যে ছবি আঁকতাম, পুরো সুইজারল্যান্ডই যেন সেরকম সবুজ প্রান্তরের এক ছিমছাম ক্যানভাস। তবে সুইজারল্যান্ডে কেবল নদী আর সবুজ মাঠই নেই, উপরি পাওনা হিসেবে আছে শ্বেতশুভ্র বরফাচ্ছাদিত পাহাড়। হয়তো ভাবছেন, কয় ছিলিম গাঁজা খেয়ে লিখতে বসেছি; মার্চ মাসে আর বরফ কোথায়? এইবার বুঝি রাম ধরা! তবে কানে কানে বলে রাখি, সুইজারল্যান্ডের কোনো কোনো জায়গা সারা বছরই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। তবে সে সমস্ত জায়গায় আপনি হেঁটে বা বাসে করে যেতে পারবেন না। আপনাকে চাপতে হবে এক বিশেষ ধরনের বাহনে। নাম তার *গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস*। সুইসরা আদর করে বলে, 'স্লোয়েস্ট ফাস্ট ট্রেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'। আট ঘণ্টা ধরে আপনি ট্রেনে চেপে গজকচ্ছপ গতিতে চলতে চলতে সুইজারল্যান্ডের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত মোহনীয় সব দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন, আর মাঝেমধ্যেই পেয়ে যাবেন পরম আরাধ্য তুষারাচ্ছাদিত হিমশৈলের দেখা। গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেসে চড়বেন, কিন্তু গ্লেসিয়ার দেখবেন না তা হয় নাকি!

গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস – 'স্লোয়েস্ট ফাস্ট ট্রেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'

তো আমরাও দেখলাম। জুরিখের অদূরে chur নামে একটা জায়গা আছে, ভুলেও এটাকে 'চার' উচ্চারণ করবেন না। সটান তাইলে শচীন তেন্ডুলেকরের প্যাঁদানি খেয়ে

বাউন্ডারির বাইরে চলে যেতে হবে। ওখানকার লোকে ওটাকে ‘ক্ষুর’ বলে। যস্মিন দেশে যদাচার। ক্ষুরই সই। সেই ঘোড়ার ক্ষুর থেকে গজেন্দ্র গমনে গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেস করে নানা চড়াই-উতরাই পার করে অবশেষে জার্মেট নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম।

জার্মেট জায়গাটা গ্লেসিয়ার এক্সপ্রেসের একেবারে শেষ স্টেশন। সেখানে নেমে ম্যাটারহর্ন দেখা হলো। ও ভালো কথা, ম্যাটারহর্ন হচ্ছে সুইস—ইতালি সীমান্তের একটা পর্বতশৃঙ্গের নাম। ইতালিয়ান নাম মন্টে কার্ভিনো। আর ফ্রেঞ্চ নাম মন্ট কার্ভিন। তবে ইতালি, ফ্রান্স জার্মানরা যে নামেই ডাকুক না কেন, উচ্চতায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুটকেও ছাড়িয়ে যাওয়া পাহাড়টা পৃথিবীতে সুইসদের ছাপ্পা মারা পর্বতশৃঙ্গ হিসেবেই বেশি বিখ্যাত; এমনকি এটা অনেকের কাছেই এখন সুইস-আল্পস পর্বতমালার প্রতীক। ভারতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যেমন লোকে ভিড় করে, ঠিক তেমনি বহু লোক জার্মেট স্টেশনে নেমেও উদাস নয়নে ম্যাটারহর্নের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন সূর্য ডুবে প্রায় সন্ধ্যা। আমরাও তাকালাম। পুব আকাশের পর্বতশৃঙ্গটা দেখতে অনেকটা এরকমের লাগল –

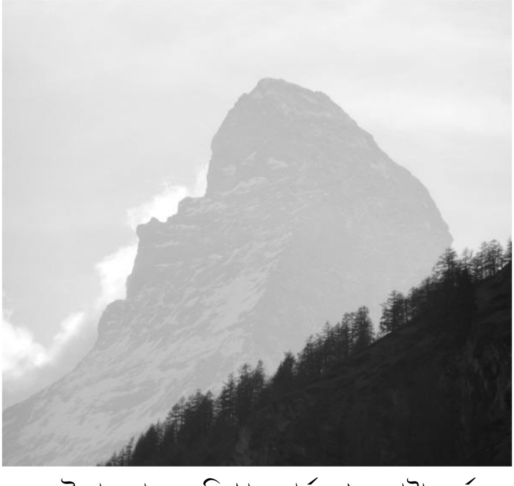

সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ ম্যাটারহর্ন

ভাবছেন, এ আর এমন কী! সামান্য পাহাড় বই তো কিছু নয়। কিন্তু ম্যাটারহর্নের আসল মজাটা সন্ধ্যবেলায় নয়। সকালবেলায় সূর্যোদয়ের সময়। প্রভাতবেলার ম্যাটারহর্নের ছবি একেবারেই আলাদা, সূর্যের প্রথম কিরণ আকাশের ফালি ভেদ করে পর্বতশৃঙ্গে পড়ছে আর ধীরে ধীরে গোটা পাহাড়টা যেন লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠছে, পুরো দৃশ্যটা আমাদের পরিচিত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে মনে করিয়ে দেয় অনেকটা এরকমভাবে –

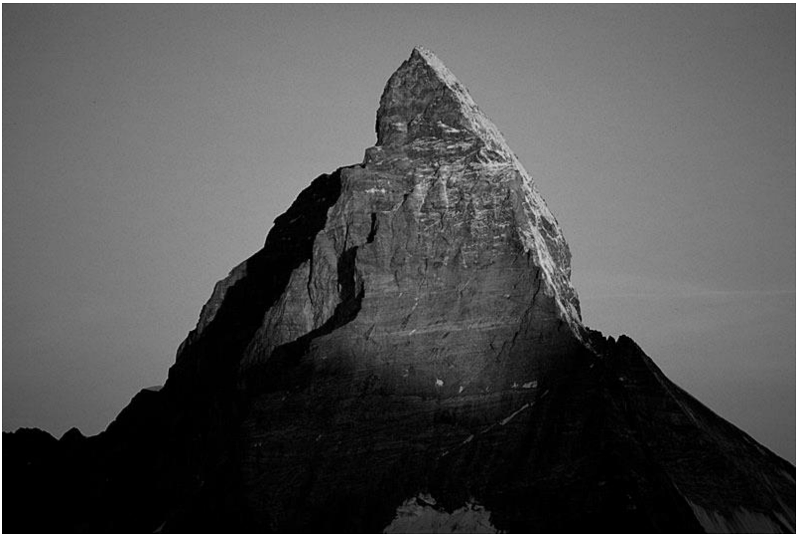

ভারতে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যেমন লোকে ভিড় করে, ঠিক তেমনি বহু লোক জার্মেট স্টেশনে নেমেও উদাস নয়নে ম্যাটারহর্নের দিকে তাকিয়ে থাকে

তবে একটা সত্য কথা চুপি চুপি বলে রাখি, প্রত্যুষবেলায় ম্যাটারহর্নের লজ্জায় আরক্তিম মুখ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। ম্যাটারহর্নের প্রথম ছবিটা (মানে সন্ধেবেলার ছবিটা) আমার ক্যামেরায় তোলা হলেও দ্বিতীয়টা নয়, ওটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া[168]।

---

168 উৎস: http://www.swisseduc.ch/glaciers/alps/gornergletscher/icons-gipfel/matterhorn.jpg

এমন নয় যে ম্যাটার্হনে সূর্যোদয় দেখায় আমাদের কোনো আগ্রহের কমতি ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা কৌতূহল আমাদের সে সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কৌতূহলের মাত্রা এতোই বেশি ছিল যে জার্মেটে ম্যাটারহর্নের লজ্জাবিধুর নববধূকে এক ঝলক দর্শন করেই বিদায় দিয়ে উঠে পড়তে হয়েছিল লোকাল ট্রেনে। কারণ যেতে হবে জেনেভা। আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সার্ন তো ওখানেই!

জেনেভা যখন পৌঁছুলাম তখন গভীর রাত্তির। প্রায় মধ্যরাত। এই সময় তো আর সার্নে যাওয়া যায় না। তাই কৌতূহলের ঝাঁপি বন্ধই রাখতে হলো সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

অবশেষে সার্ন

সার্নে যাওয়া কেন? কারণ ওটাই এই মুহূর্তে বিজ্ঞানের 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'! জীবন-জগতের তাবৎ বড় বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছেন ঝানু-মাথা বিজ্ঞানীরা ওখানে বসে। এই যে, সব মহাবিশ্বটা কিভাবে তৈরি হলো, এটা তৈরি হয়েছেই বা কী দিয়ে, এর পেছনে কোন কোন প্রাকৃতিক বলগুলো কাজ করছে, মহাবিশ্ব যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চলে তার উৎসই বা কোথায়, আমরাই বা এলাম কোথা থেকে, আমাদের গন্তব্যই বা কোথায়—সবই এখানকার বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তবে আপনাকে সার্নের ভ্রমণার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ভবনটা ঘুরতে হবে। ভবনটা দেখে আহামরি কিছু মনে হবে না। ওটার ঠিক উল্টো দিকে গ্যালিলিও গ্যালিলি স্কয়ার আছে, সেটাই হয়তো আপনার নজর কাড়বে সবার আগে। সেখানে ঢুকলে প্রথমেই মুখোমুখি হবেন জগতের অন্তিম সব প্রশ্নগুলোর, যা আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে জীবনের কোনো-না-কোনো সময় –

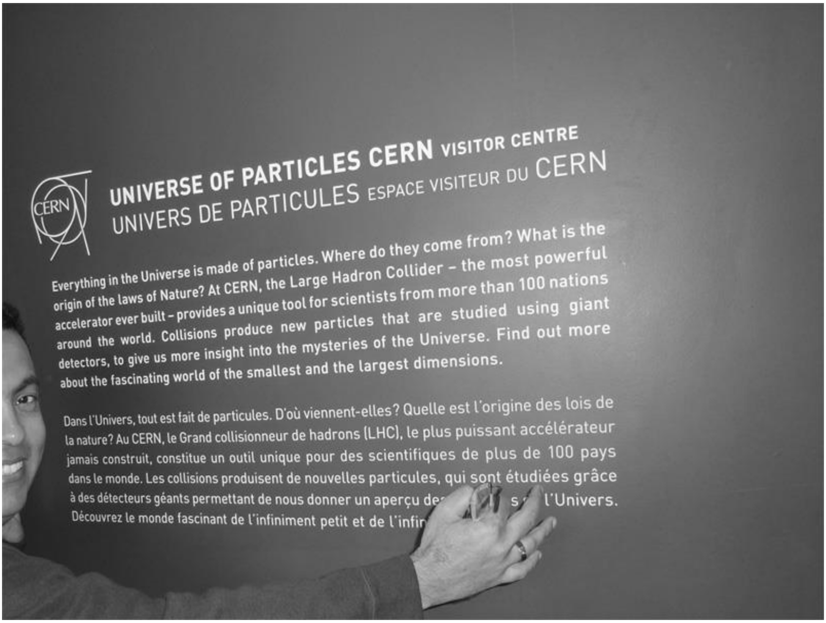

মহাবিশ্বটা কিভাবে তৈরি হলো, এটা তৈরি হয়েছেই বা কী দিয়ে, এর পেছনে কোন কোন প্রাকৃতিক বলগুলো কাজ করেছে, মহাবিশ্ব যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চলে তার উৎসই বা কোথায়, আমরাই বা এলাম কোথা থেকে, আমাদের গন্তব্যই বা কোথায়- এ ধরনের অন্তিম প্রশ্ন শোভা পায় সার্নের গ্যালিলিও স্কয়ারের দেয়ালে।

তবে সার্নের মূল আকর্ষণ অবশ্যই দার্শনিক কচকচানি প্রতিষ্ঠা নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীবাসীর যাবতীয় আকর্ষণ শ্যেন চক্ষুর নিচে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম কণা ত্বরক। নাম, ‘লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার’, যাকে সংক্ষেপে আমরা LHC বলি। সে এক বিশাল যন্ত্রদানব। আমাদের কোনো ধারণাতেও আসবে না কতটা বিশাল। জেনেভার সীমান্তে জুরা পাহাড় বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নানা কায়দা-কসরত করে মাটির পঞ্চাশ থেকে একশ পঞ্চাশ মিটার (মানে প্রায় ১৬৫ ফুট থেকে পাঁচশ ফুট) নিচে ২৭ কিলোমিটার (মানে প্রায় সাড়ে সতেরো মাইল) পরিধির ধাতব এক টিউব বসানো হয়েছে। নিচে একটা ছবি দিলাম ব্যাপারটা বোঝাতে:

লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার

বলা বাহুল্য, এই লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার নামের দানবটা শুধু সুইজারল্যান্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুইজারল্যান্ডের লেক জেনেভার নিচ দিয়ে চলে গেছে একেবারে ফ্রান্স অব্দি। এখন কথা হচ্ছে, এত কষ্ট করে এই টিউব বসানোর প্রয়োজন পড়লো কেন? টিউব বললাম বটে, কিন্তু টিউবের মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, যেগুলো একচুল এদিক-ওদিক হলে যন্ত্রটা আর কাজ করবে না। আর তার ওপরে রয়েছে আবার চার জায়গায় চার ধরনের বিশাল পার্টিকেল ডিটেক্টর বা কণা শনাক্তকারক। এলিস (ALICE), আটলাস (ATLAS), সিএমএস (CMS) এবং এলএইচসিবি (LHCb)। মনে রাখতে হবে, এই হতচ্ছাড়া প্যাঁচানো টিউবটাই যত নষ্টের গোঁড়া, যাবতীয় কুকর্ম আর কৃষ্ণলীলার আঁধার। ঐ যে আমরা জানি, প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে এক বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছিল আর তার ফলে তৈরি

হয়েছিল এই মহাবিশ্ব, সেটার পুরোপুরি না হলেও একধরনের কৃত্রিম দশা তৈরি করতে পারেন বিজ্ঞানীরা এই ধাতব টিউবের মধ্যে। আমরা তো জানি, এ মহাবিশ্বের কিভাবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের নানা তত্ত্ব ছিল, এখনো আছে। আর ধার্মিক-বাবাদের 'কুন ফায়া কুন' কিংবা 'ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টি আর সপ্তম দিনে সাবাত' গ্রহণের নানা গল্পকথার কথা নাহয় বাদই দিলাম। এর মধ্যে সবচেয়ে 'স্বীকৃত তত্ত্ব' বলে বিজ্ঞানীরা যেটা গ্রহণ করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণের প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড মডেল[169]। তবে প্রমিত মডেলের সবকিছুই যে পরীক্ষালব্ধভাবে প্রমাণিত তা নয়। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকফোকর আছে। কিন্তু ফাঁকফোকর থাকলেও সে ফাঁকে কী ছাতামাথা বসবে তা ভালোই বুঝতে পারেন বিজ্ঞানীরা। আপনারা যাঁরা jigsaw puzzle নিয়ে ছোটবেলায় খেলা করেছেন, তাঁরা জানেন ব্যাপারটা। বিভিন্ন টুকরা জোড়া দিতে দিতে আপনি যখন ক্রমশ বুঝতে পারেন আপনার সামনে একটা পরিচিত ছবি ক্রমশ ফুটে উঠতে শুরু করেছে, তখন দুএকটা টুকরা বাকি থাকলেও বুঝতে সমস্যা হয় না, যে পুরো ছবিটা আসলে দেখতে কেমন হবে। সার্নের বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, নানা ধরনের কণার ধুমধাড়াক্কা সংঘর্ষ (এই সংঘর্ষ যেমন হতে পারে প্রোটন-প্রোটনে, তেমনি আবার হতে পারে লিড বা সিসার আয়নের মধ্যে) ঘটিয়ে জিগস পাজেলের হারানো অংশগুলো খুঁজে পাবেন আর তারপর সেগুলো জায়গামতো জোড়া দিয়ে প্রমিত মডেলকে পূর্ণরূপ দিতে পারবেন। আর ঠিক এমনি একটা জিগস পাজেলের টুকরো খুঁজে পেয়ে সম্প্রতি (২০১২) ঠিকমতো জোড়া দিতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। হ্যাঁ, এই সেই হিগস বোসন কণা, যার সন্ধান লাভ করে সবাই ছিলেন আনন্দে উদ্বেলিত।

---

[169] কণা পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেল (The Standard Model of Particle Physics) সত্তুরের দশকে বিকশিত কণা পদার্থবিজ্ঞানের একটি সার্থক তত্ত্ব যা মৌলিক কণাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়াকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই তত্ত্বের সাহায্যে আমরা মহাকর্ষ বাদে অন্য বলগুলোর (তাড়িত চৌম্বক, দুর্বল নিউক্লীয় এবং সবল নিউক্লীয়) মিথস্ক্রিয়ার ব্যাখ্যা পাই। তত্ত্বটির আসলে দুটি অংশ। একটি অংশ কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্স সবল মিথস্ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে, অন্য দিকে তাড়িতদুর্বল ব্যাখ্যা করে তাড়িত চৌম্বক এবং দুর্বল বলের মিথস্ক্রিয়া।

হিগসের কথা

স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময় দশম অধ্যায়ে হিগসের সাথে আমরা কিছুটা পরিচিত হয়েছি। সেই ষাটের দশক থেকে প্রমিত মডেলের একটা জোরালো অনুমিতি ছিল যে আমাদের এই চিরচেনা মহাবিশ্ব হিগস কণাদের সমন্বয়ে গঠিত হিগস ক্ষেত্রের (Higgs field) এক অথৈ সমুদ্রে ভাসছে। এই অথৈ সমুদ্রে চলতে গিয়েই নাকি উপপারমাণবিক বস্তু কণারা সব ভর অর্জন করে। যদি হিগস ক্ষেত্র বলে কিছু না থাকত, তাহলে কোনো বস্তুকণারই ভর বলে কিছু থাকত না,তা সে রোগা-পটকা ইলেকট্রনই হোক, আর হোঁতকামুখো হিপোপটেমাস মানে টপ কোয়ার্কই হোক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কেবল হিগস ফিল্ড বলে কিছু একটা আছে বলেই এই সব কণা ভর অর্জন করতে পারছে, যা আবার তৈরি করতে পারছে আমাদের গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথসহ সবকিছুই। চিন্তা করে দেখুন, আমরা ফোটনের মতো ভরহীন কণার কথা জানি যারা ছোটে আলোর বেগে। আলোর বেগে ছুটতে পারে কারণ এরা হিগস ফিল্ডের সাথে কোনো ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় না। হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় না জড়ানোর কারণে তারা থেকে যায় ভরহীন। আর ভরটরের ঝামেলা নেই বলেই তারা ওমনি বেগে হুহু করে ছুটতে পারে। কিন্তু ওভাবে ছুটলে কী হবে, তারা জোট বাঁধতে পারে না কারো সাথেই। জোট বাঁধতে হলে ভর থাকা চাই। এই যে আমাদের চারপাশে এত বস্তুকণার সমারোহ দেখি, দেখি পাহাড়-পর্বত, নদী নালা, গাছপালা আর মানুষ—সবারই অল্প বিস্তর ভর রয়েছে। ভর জিনিসটা তাই আমাদের অস্তিত্বের সাথেই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বলে আমরা মনে করি। তাই কোনো কণা যদি পাওয়া যায় যেটা মহাবিশ্বের ব্রাহ্মমুহূর্তে সবাইকে ভর প্রদান করছে, করছে অস্তিত্বহীনকে অস্তিমান, তার গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিসীম। বহু বছর আগে ১৯৬৪ সালের দিকে পিটার হিগস নামে এক বিজ্ঞানী ধারণা করেছিলেন, এই ধরনের এক 'হাইপোথিটিক্যাল কণা'র। যদিও ধারণাটির পেছনে কেবল পিটার হিগসের একার অবদানই ছিল তা নয়, এর সাথে জড়িত ছিলেন রবার্ট ব্রাউট ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের

মতো বিজ্ঞানীরাও[170], তার পরও একধরনের কণা দিয়ে তৈরি ফিল্ডের ব্যাপারটা হিগসের মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন, তাই তাঁর নামানুসারেই এই অনুকল্প কণাটির নাম দেওয়া হয় হিগস কণা[171]। কিন্তু নাম দিলে কী হবে, সে কণার কোনো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা কখনোই দিতে পারেননি। ওই যে জিগস পাজেলের হারানো টুকরোর কথা বলছিলাম না, এটা ছিল তেমনি একটা হারানো টুকরো।

এই হারানো টুকরাই যেন খুঁজে পেলেন সার্নের বিজ্ঞানীরা। পেলেন হিগস কণার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। জোড়া লেগে গেল জিগস পাজেলের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর সেই সাথে প্রমিত মডেলের মোনালিসা-মার্কা হাসির ছবিটাও যেন আরো অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল আমাদের কাছে। তা কীভাবে হিগস কণার সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা? ঐ যে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের কথা বলছিলাম না, সেটাই তাঁরা ঘটিয়েছেন লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে, আর নতুন যে কণার কথা বললাম, সেটা ধরা

170 Jim Baggott, Higgs: The Invention and Discovery of the God Particle, Oxford University Press, 2012

171 এ থেকে যদি কেউ ধরে নেন যে, হিগস কণার অনুকল্প যাদের মাথা থেকে এসেছে সেসব তাত্ত্বিকদের মধ্যে পিটার হিগসের অবদানই ছিল সর্বাধিক, তাই তাঁর নামে কণাটির নামকরণ করা হয়েছে, তাহলে কিন্তু ভুল উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া হবে। আসলে ১৯৬৪ সালে হিগসের ধারণাসূচক যে তিনটি মহামূল্যবান পেপার প্রকাশের কথা বলা হয়, তার মধ্যে হিগসের পেপারটি ছিল ২য়। হিগসের আগে বেলজীয় পদার্থবিদ রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের একটি পেপার প্রকাশিত হয়। আর হিগসের পেপারটির পরে জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন ও টম কিব্বল-এর আরো একটি পেপার প্রকাশিত হয়। প্রতিসমতার ভাঙনের জন্য দায়ী 'হিগস প্রক্রিয়া' হিসেবে যে প্রক্রিয়াটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেটার পেছনে এদের সবারই কমবেশি অবদান আছে। এমনকি তাদের কাজের আগে জাপানি-আমেরিকান পদার্থবিদ ইয়োইচিরো নামবু এবং ভূতপূর্ব বেল ল্যাবের ফিলিপ অ্যান্ডারসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের উত্তরসূরিদের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে দেয়। এদের সকলের অবদানই উল্লেখযোগ্য, তার পরও কেবল পিটার হিগসের নামেই কেন হিগস কণা, হিগস ক্ষেত্র, হিগস প্রক্রিয়া— সবকিছুর নামকরণ হলো এটা একটা রহস্য। পিটার হিগস নিজেই নিজের নামে কণাটির নামকরণ করেননি এটা নিশ্চিত। অনেকেই এই নামের জন্য আঙুল তোলেন মেধাবী কোরিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিদ বেঞ্জামিন লির প্রতি, যিনি ১৯৭৭ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে, হিগসের সাথে তাঁর আলাপ হয়, এবং এই আলাপ থেকে তিনি প্রতিসমতার ভাঙনের মাধ্যমে কিভাবে কণারা ভরপ্রাপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এই সূত্র ধরে উৎসাহী লী বেশ কিছু সেমিনারে সেটাকে 'হিগস মেকানিজম' বলে উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের ১৯৬৭ সালের গুরুত্বপূর্ণ একটি পেপারে ভুলক্রমে রেফারেন্সে পিটার হিগসের নাম অন্যদের আগে চলে যায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে। এগুলোর বাইরে 'হিগস বোসন' শব্দটির দ্যোতনা শ্রুতিমধুর, উচ্চারণও সহজ। এ সবকিছুই এই নামের পক্ষে গেছে।

পড়েছে কোথায়? ঐ যে কণা শনাক্তকারক বা ডিটেক্টরগুলোর কথা বলেছিলাম ওপরে, তাদের দুটোতে—অ্যাটলাস ও সিএমএস ডিটেক্টরে। আসলে এই অ্যাটলাস আর সিএমএস এই দুটো ডিটেক্টরকে প্রথম থেকেই রাখা হয়েছিল কেবল হিগস ধরবার কাজে[172]। এই দুই ডিটেক্টরের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীদের দুটো পৃথক দল আমাদের হিগস বোসনের খোঁজ দিলেন। ফলাফল বিশ্লেষণে স্পষ্ট দেখা গেল, দু'দলই পাচ্ছেন নতুন একটি কণার চিহ্ন। সেটা একটা বিশাল ভারী বোসন কণা। হিগস যার নাম।

একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যানালজি

১৯৯৩ সালের কথা। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার তখনো এই দানবীয় রূপ নেয়নি, বিজ্ঞানীদের কল্পনা আর ড্রয়িংবোর্ডের নকশাতেই ঘুরছে কেবল। কোন আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় কিনা বুঝতে সার্নের একদল বিজ্ঞানী যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল সরকারের বিজ্ঞানমন্ত্রী উইলিয়াম ওয়াল্ডেগ্রেভ-এর কাছে ধরণা দিলেন। ওয়াল্ডেগ্রেভ হিগস নিয়ে বিজ্ঞানীদের অভিমত আর সেটাকে ধরার কসরতের কথা মন দিয়ে শুনলেন বটে, কিন্তু এক বর্ণ বুঝলেন বলে বোধ হলো না। এটা স্বাভাবিকই। হিগস বোসন আসলে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের খুব গূঢ় এক বিষয়। অনেকেই বলেন এটা সন্তোষজনকভাবে বোঝার ন্যূনতম শর্ত হলো কোনো মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট (মাস্টার্স বা পিএইচডি) প্রোগ্রামের কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের তিন সিকোয়েন্সের কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করা। কেবল তাত্ত্বিক কণাপদার্থবিজ্ঞনী কিংবা এ ধরনের গবেষণার সাথে জড়িতরাই হয়তো এর সবটুকু বোঝেন[173]। এর সাথে জড়িত থাকে খুব উঁচু স্তরের গাণিতিক বিমূর্ততা। এ ধরনের জটিল বিষয়কে জনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা অনেকসময়ই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

---

[172] Michael Riordan , Guido Tonelli and Sau Lan Wu, The Higgs at last, Extrme Physics, Scientific American, May 2013

[173] [illegible]

কিন্তু ওয়াল্ডেগ্রেভ হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি সবার উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন: মাত্র এক পাতার একটা সাদা কাগজে খুব সহজ ভাষায় হিগসের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হাজির করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। যিনি পারবেন তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে পুরস্কার হিসেবে পাবেন একটা ভিন্টেজ শ্যাম্পেইনের বোতল! লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড মিলার তাঁর চারজন সহকর্মীর সাথে মিলে জিতে নিলেন চ্যালেঞ্জটা। তাঁরা হিগস কণার মাধ্যমে অন্য কণাদের ভরপ্রাপ্তির ব্যাপারটা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটা এখন হিগসের অন্যতম সহজ-সরল, মজাদার এবং জনবোধ্য ব্যাখ্যা হিসেবে স্বীকৃত।

ডেভিড মিলারের অ্যানালজিটা ছিল এরকমের: ধরুন মার্গারেট থ্যাচারের মতো কোনো বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমার বা আপনার মতো ছাপোষা কারো সাথে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিটেনের কোনো এক জনসভার দিকে যাচ্ছেন। মার্গারেট থ্যাচার যেহেতু একজন চেনাজানা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, স্বভাবতই তাঁকে ঘিরে জনগণের মধ্যে নিদারুণ উৎসাহ তৈরি হবে। সমর্থকেরা তাঁর চারদিকে জটলা পাকিয়ে এক দুর্দমনীয় বাধার সৃষ্টি করবে; যার ফলে থ্যাচারের এগিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হবে। অন্যদিকে আমার মতো ছাপোষা লোককে কেউ পুছেও দেখবে না। ফলে আমি জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে সুর সুর করে এগিয়ে যাব। দেখলে মনে হবে থ্যাচারের ওজন যেন তাঁর চারপাশে দলা পাকানো ভক্তদের কারণে বহুগুণ বেড়ে গেছে, আর আমার মতো অচেনা লোকেরা রয়ে গেছে হাল্কা-পটকা। হিগস ফিল্ডও কাজ করে ঠিক ওমনিভাবে, অনেকটা জনসমুদ্রের মতোই। এর সাথে একেক কণা একেক রকমভাবে মিথস্ক্রিয়া করে ভরপ্রাপ্ত হয়। যেমন টপ কোয়ার্ক অনেকটা মার্গারেট থ্যাচারের মতো খুব সহজেই হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, আর অন্যদিকে আপ কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রনের মতো গোবেচারা ঘরকুনোরা থেকে যায় হাল্কা-পটকা। এই সহজবোধ্য অ্যানালজি দিয়েই মিলার এবং তাঁর চারজন সঙ্গী প্রত্যেকে একটা করে শ্যাম্পেনের বোতল বগলদাবা করে নিয়েছিলেন।

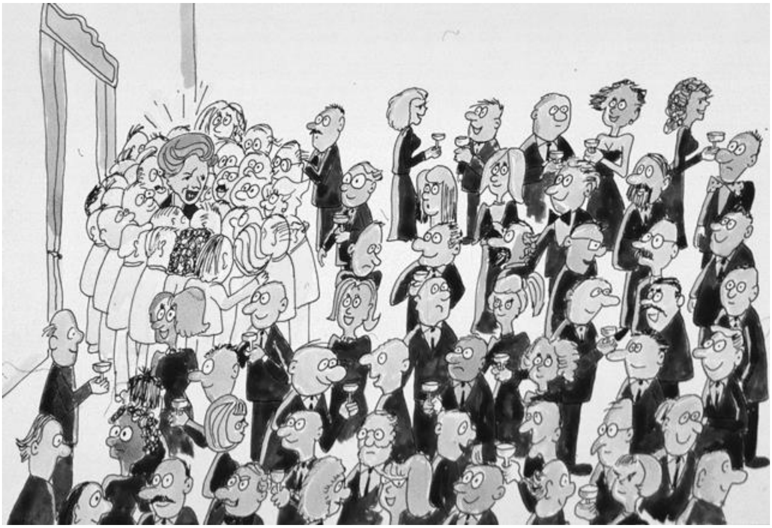

ডেভিড মিলারের পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যানালজি: মার্গারেট থ্যাচারের মতো কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কোনো জনসভায় প্রবেশ করলে তাঁকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় গণমানুষের জটলা। আর অন্যদিকে আমার মতো অখ্যাত জন থেকে যায় অন্যদের আগ্রহের বাইরে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন কিছু কণা যেমন, টপ কোয়ার্ক মার্গারেট থ্যাচারের মতোই খুব সহজে হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে 'ভারী' হয়ে ওঠে, আর অন্যদিকে আপ কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রনের মতো কণারা থেকে যায় তুলনামূলকভাবে হাল্কা

এটা হয়তো স্থূল উপমা সঠিক বিচারে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বোঝানোর ব্যাপারে এ ধরনের উপমার জুড়ি নেই। ডেভিড মিলারের এই উপমার সাফল্যের পথ ধরে আরো অনেক পদার্থবিজ্ঞানী এ রকম কিংবা এর চেয়েও উন্নততর উপমামূলক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন জনগণের দরবারে। যেমন, কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ্পি ডি স্টেফানো থ্যাচারের বদলে কানাডিয়ান পপ তারকা জাস্টিন বিবারকে ব্যবহার করেছেন; আয়ান স্যাম্পলের মতো কেউ বা গুড়ের কিংবা আলকাতরার মধ্যে পিংপং বলের চলন দিয়ে বুঝিয়েছেন, ফার্মি ল্যাবের ডন লিঙ্কন পানির মধ্যে ব্যাড়াকুডা মাছের বিচরণের উপমা ব্যবহার করেছেন হিগসের কাজকর্ম

বোঝাতে। পদার্থবিদ শন ক্যারল তাঁর সাম্প্রতিক ‘দ্য পার্টিকেল অ্যাট দ্য অ্যান্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ বইয়ে হিগস বোঝাতে নিয়ে এসেছেন লাস্যময়ী অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে[174]।

তার পরও জাস্টিন বিবার বলুন আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলিই বলুন, কিংবা হোকনা সে ব্যাড়াকুডা অথবা পিংপং—সবই শেষ পর্যন্ত উপমাই। উপমারা উপমার জায়গায় থাকুক, আমরা এই বইয়ে কেবল এই ধরনের চটকদার উদাহরণ দিয়ে আবছাভাবে হিগসের ব্যাখ্যা শেষ করতে চাই না। যেতে চাই আরেকটু গভীরে। সিরিয়াসলি, কিভাবে অন্য কণারা হিগসের মাধ্যমে ভর অর্জন করে? এটা জানতে হলে হিগসের একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে হবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শূন্যস্থানেও হিগসের একটা সাংখ্যিক মান থাকে (এটা নিয়ে আমরা একটু পরই আলোচনা করব)। একে বলে হিগসের ‘প্রত্যাশিত মান’ (Expectation value)। যেহেতু হিগসের এই প্রত্যাশিত মান এমনকি শূন্যস্থানেও প্রকাশমান, এর সাথে অন্য কণারা মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে, আর ভর অর্জন করে। এ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে কণাদের ভরপ্রাপ্তির ব্যাপারটাও বোঝা যাবে খুব সহজেই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বললে বলা যায়, একটি কণার ভর = শূন্যস্থানে হিগস ক্ষেত্রের মান x হিগসের সাথে কণাটির মিথস্ক্রিয়াগত প্রাবল্য[175]। অর্থাৎ, যখন কোনো কণার সাথে হিগসের মিথস্ক্রিয়ার প্রাবল্য যত বেশি থাকে, অর্থাৎ কণাটি যত বেশি করে মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায়, তত বেশি ভরপ্রাপ্ত হয়। একটা টপ কোয়ার্ক হিগস ক্ষেত্রের সাথে অনেক বেশি মিথস্ক্রিয়ায় জড়ায় আপ কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রন থেকে। তাই এর ভরও তুলনামূলকভাবে বেশি।

তবে একটি কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। হিগসকে মিডিয়ায় যথেচ্ছভাবে সব বস্তুকণাদের ‘ভর সৃষ্টির পেছনে মুখ্য কণা’ হিসেবে তুলে ধরা হলেও,

---

[174] Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

[175] Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

বাস্তবতা হলো, মহাবিশ্বের বস্তুকণার তাবৎ ভর কিন্তু হিগস থেকে আসেনি। বরং সত্যি বলতে কি, তাবৎ ভরের খুব নগণ্য ছোট্ট একটা অংশই কেবল হিগস থেকে এসেছে। তবে এ নিয়ে আরো গভীর আলোচনায় যাবার আগে চলুন কণাদের নিয়ে নিয়ে কিছু কানাকানি সেরে নেওয়া যাক।

কণাদের নিয়ে কানাকানি

লেখার এই অংশটা একদম বুনিয়াদি। অনেকেই হয়তো এগুলো জানেন, বিশেষত যারা কণা-পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক বিষয়-আশয় নিয়ে খোঁজখবর রাখেন। আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে এই অংশটা পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। তবে যাঁরা স্কুলের বিজ্ঞানের বইপত্তরগুলোর কথা একেবারে ভুলে গেছেন, আবার নতুন করে 'কেঁচে গুণ্ডূষ' (এই অদ্ভুত শব্দটা কেন আমাদের স্কুলে শেখানো হয়েছিল সেটাও বোসন কণার চেয়ে কম রহস্যময় নয় যদিও) করতে চান, তাঁরা সাথে থাকতে পারেন।

আমরা সকলেই জানি, একটা বস্তুখণ্ড তা সে একটা বরফের চাঁইই হোক আর একটা পাথরখণ্ডই হোক, ভেঙে টুকরো করা সম্ভব। আবার সেই টুকরোগুলোকেও ভেঙে আরো ছোট টুকরোয় পরিণত করা যায়। এখন থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে গ্রিক পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারটি লক্ষ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, টুকরো করতে করতে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন পদার্থকে ভেঙে আরো ছোট টুকরায় পরিণত করা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাঁরা পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশের নাম দিলেন পরমাণু বা এটম। তাদের চোখে এই পরমাণুই ছিল প্রাথমিক কণিকা। তবে আজ স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে এই পরমাণু কিন্তু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বা প্রাথমিক কণিকা নয়। আমরা ছেলেবেলায় পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি যে, পরমাণুকেও ভাঙা সম্ভব। পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া যায় একটি নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনকে। আর নিউক্লিয়াস গঠিত হয় প্রোটন আর

নিউট্রনের সমন্বয়ে। বহুদিন পর্যন্ত ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রনকে প্রাথমিক কণিকা মনে করা হতো। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মারে গেলম্যান এবং ১৯৬৮ সালে স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার একসিলেটর সেন্টারের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হলো যে, প্রোটন ও নিউট্রনগুলো আসলে আরো ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম কোয়ার্ক। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা কী পেলাম?

পেলাম যে পদার্থ ভেঙে অণু। অণু ভেঙে আবার পরমাণু। পরমাণু ভাঙলে পাচ্ছি ইলেকট্রন আর নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে ভাঙলে প্রোটন আর নিউট্রন। আর ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনের জায়গায় রেখে প্রোটন আর নিউট্রনকে ফের ভেঙে পাওয়া গেল কোয়ার্ক। তাহলে এখন পর্যন্ত যা পেলাম তাতে করে কোয়ার্ক এবং ইলেকট্রনই হলো পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা, যাদের আমরা বলছি প্রাথমিক কণিকা।

ভাবছেন এখানেই শেষ? মোটেই তা নয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কোয়ার্কগুলো একেবারে পাঁজির পাঁজহারা। তাদের আছে হরেক রকমের (আসলে ছয় রকমের) চেহারা – আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ ও বটম। এর মধ্যে প্রোটন তৈরি হয় দুটো আপ আরেকটা ডাউন কোয়ার্কের সমন্বয়ে, আর অন্যদিকে নিউট্রন তৈরি হয় একটা আপ আর দুটো ডাউন কোয়ার্ক মিলে। তাহলে আমাদের প্রাথমিক কণিকা অনুসন্ধানের ছবিটা কী রকম দাঁড়াল? দাঁড়াল অনেকটা এরকমের —

এগুলো তো পাওয়া গেলই, কিন্তু পাশাপাশি কিছুদিন পরে আরো পাওয়া গেল দুটো নতুন কণিকা। এগুলো দেখতে-শুনতে ইলেকট্রনের মতো হলেও ওজনে কিঞ্চিত ভারী। এরা ইলেকট্রনের খালাতো দুই ভাই—মিউয়ন ও টাউ।

আর ওদিকে আরেক দল বিজ্ঞানী এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আরো অদ্ভুতুড়ে ভৌতিক এক কণা – নিউট্রিনো নাম তার। এই নিউট্রিনোগুলোও চুপা বজ্জাত। এরাও থাকে হরেক রকমের চেহারার মাঝে লুকিয়ে – ইলেকট্রন-নিউট্রিনো, মিউয়ন নিউট্রিনো, টাউ নিউট্রিনো। আর এরা লক্ষ লক্ষ মাইল সিসার পুরু স্তরকে নাকি অবলীলায় ভেদ করে চলে যেতে পারে কোনো ধরনের গুঁতাগুঁতি করা ছাড়াই।

তাহলে এ পর্যন্ত জানা জ্ঞানের সাহায্যে প্রাথমিক কণিকার তালিকা করতে গিয়ে আমরা কী পেলাম? পেলাম ইলেকট্রন, আর তার দুই খালাতো ভাই (মিউয়ন ও টাউ), ছয় ধরনের কোয়ার্ক আর তিন ধরনের নিউট্রিনো –এরাই হলো সেই প্রাথমিক কণিকা, যা গ্রিক পণ্ডিতেরা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

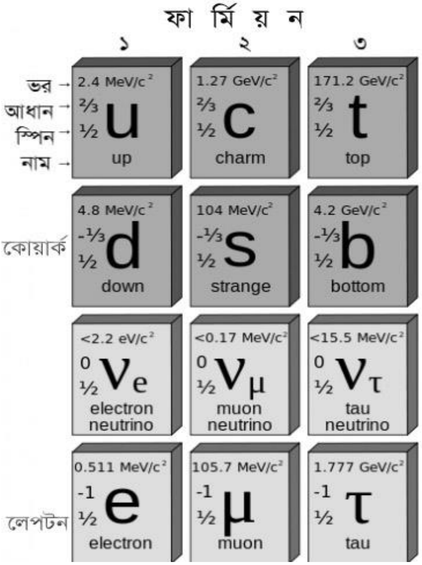

সহজভাবে বললে, এই বারো ধরনের প্রাথমিক কণিকা দিয়ে আমাদের চেনাজানা দৃশ্যমান সকল বস্তু তৈরি। এদের বলে ফার্মিয়ন। এই ফার্মিয়নদের কেউ চাইলে সাবগ্রুপে ভাগ করে ফেলতে পারেন। সেই যে ছয় রকমের হতচ্ছাড়া কোয়ার্কের দল তাদের একটা গ্রুপে রেখে বাদবাকিগুলোকে (মানে ইলেকট্রন, মিউয়ন আর টাউ) অন্য গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইচ্ছে হলে। প্রথম গ্রুপটাকে কোয়ার্ক আর অন্য গ্রুপটাকে লেপটন নামে অভিহিত করা হয়। এই ফার্মিয়নগুলোর ছবি দেওয়া হলো। ছবিটা অনেকটা আমরা ছেলেবেলায় রসায়নের বইয়ে যে পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারনির ছবি দেখেছিলাম, তার একটা সরল ভাষ্যের মতো মনে হবে। মনে রাখাও তাই সহজ।

এই ফার্মিয়ন কণাদের নিয়ে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। উলফগ্যাং পাউলি বলে এক নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন, স্বভাবে মহা রগচটা। কারো গবেষণা বা তত্ত্ব অপছন্দ হলে মুখের ওপর বলে দিতেন—‘কাজটা ‘এতই বাজে যে, ভুল হবারও যোগ্য নয়’। সেই পাউলি সাহেবের একটা নীতি ছিল কণাদের নিয়ে, যেটাকে আমরা উচ্চমাধ্যমিক বইয়ে পড়েছিলাম ‘পাউলির বর্জন নীতি’ হিসেবে’। এ নীতির মূল কথা হলো ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ভগ্নাংশ আকারে মান গ্রহণ করতে পারে, যেমন ১/২ । এর বাইরে এই পাউলির বর্জন নীতি কী, এবং এটা কিভাবে কাজ করে সেটা এই মুহূর্তে আমাদের এতটা বোঝার দরকার নেই। আমরা আরেকটু পরই সেটা পরিষ্কার করব। কেবল একটি বিষয় এখন মনে থাকলেই চলবে —ফার্মিয়নদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো—এরা সব পাউলির বর্জন নীতির অন্ধভক্ত। চোখ বন্ধ করে এরা পাউলি সাহেবের নীতি মেনে চলে।

তবে মহাবিশ্বে সবাই যে অন্ধ অনুগত স্তাবক হবেন, তা তো নয়। কিছু কিছু বিদ্রোহী কণা আছে, যারা পাউলি সাহেবের রগচটা স্বভাবকে একদমই পাত্তা দেয় না। এরা পাউলির বর্জন নীতি মানে না। অর্থাৎ এদের স্পিন বা ঘূর্ণন ভগ্নাংশ নয়, এদের

স্পিন হয় পূর্ণ সংখ্যা কিংবা শূন্য। এরাই হচ্ছে বিখ্যাত বোসন কণা—বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে যাদের নাম।

ফোটন কণার কথা যে আমরা অহরহ শুনি সেটা একধরনের বোসন কণা। এরা কী করে? সোজা কথা আলোক কণিকা বা তড়িচ্চুম্বক তরঙ্গ বয়ে নিয়ে যায়। এরা শক্তি বয়ে নেওয়ার কাজ করে বলে একে 'বার্তাবহ কণিকা' বা ম্যাসেঞ্জার পার্টিকেল বলেও ডাকা হয়। তড়িচ্চুম্বক বলের ক্ষেত্রে বার্তাবহ কণিকা যেমন হচ্ছে 'ফোটন কণিকা', তেমনি সবল নিউক্লীয় বলের ক্ষেত্রে আছে 'গ্লুয়োন' (Gluon) আর দুর্বল নিউক্লীয় বলের জন্য রয়েছে W এবং Z কণা। এরা সবাই মিলে তৈরি করে বোসন পরিবার –গেজ বোসন। আর 'হিগস' নামের নতুন বোসন কণা খুঁজে পাবার পর সেটাকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হচ্ছে। কিন্তু এটা বোসন হলেও স্বভাবে একটু আলাদা। আগেই বলেছি, হিগস কণা বার্তাবাহী কণার মতো শক্তি বয়ে নিয়ে যায় না। বরং এরা কণার জন্য ভর তৈরিতে সহায়তা করে। এই বোসন পরিবারের ছবিটা তাহলে এক ঝলক দেখা যাক –

তাহলে ফার্মিয়ন আর বোসনকে একত্র করে আমাদের পর্যায় সারণি মার্কা ছবিটা দাঁড়াবে এরকমের –

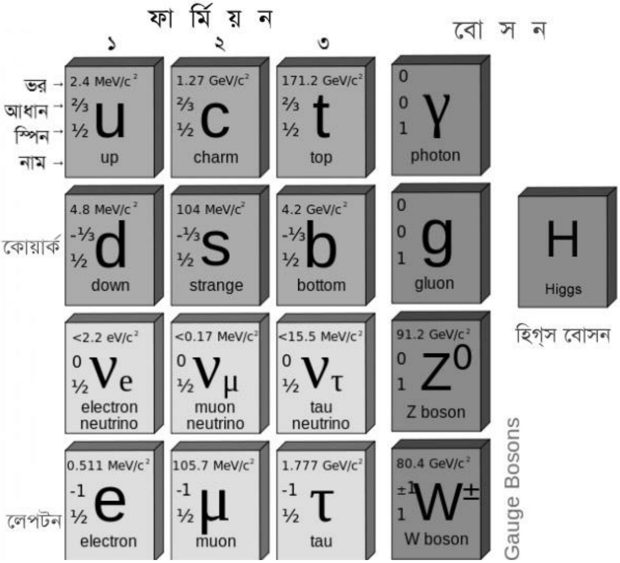

এই ফার্মিয়ন আর বোসন নিয়েই আমাদের কণাজগৎ। এর মধ্যে যে সমস্ত কণা আমাদের চেনাজানা পদার্থ তৈরি করতে সহায়তা করে তারা ফার্মিয়ন, আর যারা শক্তি বয়ে নিয়ে যায় তারা হলো বোসন। এটা আমরা আগেই জেনেছি। আমরা এখানে একটু ভিন্নভাবে এদের সংজ্ঞায়িত করব। ফার্মিয়নগুলো স্থান দখল করে। অন্যদিকে বোসনগুলোকে একটার ওপর আরেকটা বসিয়ে পাইল করে রাখা যায়। এর মানে হচ্ছে বোসন ক্ষেত্র সব সময়ই যেকোনো মান গ্রহণ করতে পারে, অন্যদিকে ফার্মিয়নক্ষেত্র কেবল হতে পারে ‘অন’ কিংবা ‘অফ’। অর্থাৎ সেখানে কোনো ফার্মিয়ন কণা থাকবে অথবা থাকবে না। মাঝামাঝি কিছু নেই। বোসন ক্ষেত্রের সাথে এটাই ফার্মিয়ন ক্ষেত্রের মৌলিক পার্থক্য। অর্থাৎ, দুটো ফার্মিয়ন কণা কখনোই একই

স্তরে থাকতে পারবে না। এটাই সেই ‘পাউলির বর্জন নীতি’র মূল উপজীব্য। অর্থাৎ পাউলির এই নীতি বলছে, আমরা দুটো হুবহু অনুরূপ ফার্মিয়ন কখনোই খুঁজে পাব না যারা একই স্থানে বসে ঠিক একই কাজ করছে।

শূন্যতা ও হিগস

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা শূন্যতা নিয়ে কিছুটা হলেও জেনেছি। কিন্তু কে জানত এই রহস্যময় হিগস-এর সাথেও শূন্যতারও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? আর আছে বলেই সেটা হয়ে উঠেছে এই বইয়েরও একটা উল্লেখযোগ্য উপজীব্য।

আমরা আগেই জেনেছি যে, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দৃষ্টিতে শূন্যতা মানে আসলে শূন্যতা নয়। শূন্যতার মধ্যে আসলে শক্তি লুকিয়ে আছে, যেটাকে আমরা বলি ‘ভ্যাকুয়াম এনার্জি’। আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে আমরা এ-ও দেখেছি যে এই শক্তি বিকর্ষণমূলক।

একই ব্যাপার কণা-পদার্থবিদদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আবার অন্যভাবে বলবেন। তাঁরা বলবেন, ভ্যাকুয়াম জিনিসটা হিগস ক্ষেত্রে ডুবে আছে। কাজেই তাদের চোখেও শূন্যস্থান জিনিসটা আসলে স্থানশূন্য নয়, তবে ওটা হিগস ক্ষেত্র দিয়ে পূর্ণ।

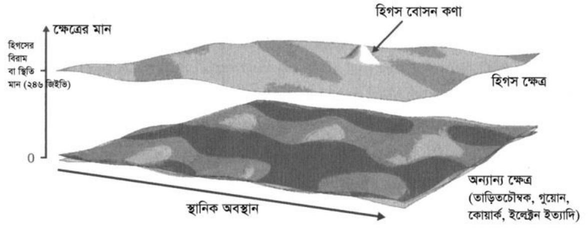

অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে হিগস ক্ষেত্রের পার্থক্য হলো, এর বিরাম বা স্থিতি মান (resting value)

শূন্য থেকে দূরে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই মান প্রায় ২৪৬ জিইভির মতো

আমরা চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা অহরহ শুনি; গ্লুয়োন, কোয়ার্ক কিংবা ইলেকট্রনসহ অনেক ক্ষেত্রের সাথেও হয়তো কেউ কেউ পরিচিত। দেখা গেছে শূন্যস্থানে এই সব ক্ষেত্রের মান শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, স্থানকে শূন্য করে দিলে ক্ষেত্রগুলো রাতারাতি ‘অফ’ হয়ে যায়। কিন্তু হিগসের বেলায় তা হয় না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শূন্যস্থানেও হিগস ক্ষেত্রের একটা মান থেকে যায়। আর সেটার মান প্রায় ২৪৬ জিইভি[176]।

কেন শূন্যস্থানে হিগসের ক্ষেত্রের একটা অশূন্য মান থাকে, এটা এখনো বিজ্ঞানীদের সজীব গবেষণার বিষয়, তবে আমরা এখানে খুব সাধারণ অ্যানালজি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব[177]। একটা সরল দোলককে সুতা দিয়ে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিলে সেটা দু’পাশে দুলতে দুলতে একসময় স্থির হয় ঠিক মাঝ বরাবর এসে। সেই অবস্থানেই দোলকটির শক্তি সর্বনিম্ন। সেই অবস্থান থেকে সরাতে হলে আমাদের দোলকটিতে ঠেলা দিতে হবে। ঠেলা খেয়ে দোলকটি হয়তো আবার দুলতে শুরু করবে, তারপর সেই একইভাবে দুলতে দুলতে আস্তে আস্তে আবার সেই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গাটাতে, মানে দোলকের মাঝবরাবর এসে থিতু হবে। সুতার বদলে হুক দিয়ে আটকানো কোনো কাঠির মাথায় ভারী বস্তু ঝুলিয়েও আমরা একই পরীক্ষা করতে পারি, এবং একই ফলাফল পাব।

এবার এক কাজ করি। কল্পনা করি, সরল দোলকটিকে উল্টে দেওয়া হলো। মানে দোলকটাকে ওপর থেকে না ঝুলিয়ে মেঝেতে হুক দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো, ফলে কাঠির আগায় ভারী মাথাটা থাকবে ওপরের দিকে। কিন্তু রাখলে কী হবে, আমরা তো জানি, দোলকটা ওটা ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। যেকোনো একদিকে কাত হয়ে পড়বে। হয় ডান দিকে না হয় বাম দিকে। আগেরবার ওপর

---

[176] এটা কিন্তু হিগস কণার ভর নয় যেটা সার্নের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছেন ১২৫ জিইভি সীমায়; এটা আসলে শূন্যস্থানে হিগসের মান।

[177] এই চমৎকার অ্যানালজিটা বিজ্ঞানী শন ক্যারল তাঁর The Particle at the End of the Universe গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন।

থেকে সরল দোলক ঝুলিয়ে দেবার সময় আমরা যেরকম একটা সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গা খুঁজে পেয়েছিলাম, এবারে কিন্তু আর তা পাচ্ছি না। বরং ভিন্ন কোনো অবস্থানে কাত হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় দোলকটিকে খুঁজে পাচ্ছি। সেই অবস্থান থেকে সরিয়ে আগেকারে সেই সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় নিতে হলে আমাদের শক্তি খরচ করতে হবে।

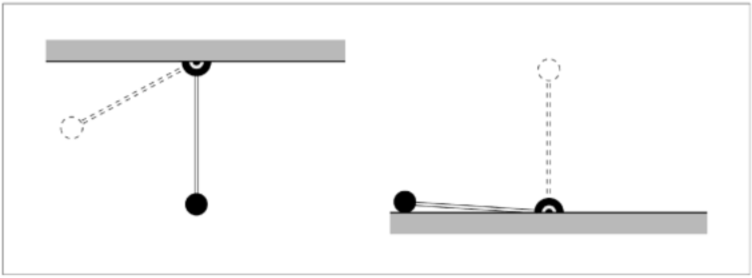

অন্য সাধারণ বলক্ষেত্রগুলোকে ছাদ থেকে ঝোলানো সরল দোলকের সাথে তুলনা করা যায়। এই ধরনের দোলকের মাঝবরাবর এর থাকে শক্তি সর্বনিম্ন। কিন্তু হিগস ক্ষেত্র একটু অন্যরকম, অনেকটা উল্টানো দোলকের মতো। সে ডান বা বাম দিকে একটা মান ধারণ করে পড়ে থাকে। একে মাঝবরাবর রাখতে হলে শক্তি খরচ করতে হবে।

হিগসের ব্যাপারটাও সেই ‘উল্টানো’ পেন্ডুলামের মতোই যেন অনেকটা। এ কেবলই অশূন্য একটা মান (অর্থাৎ ২৪৬ জিইভি) নিয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকতে চায়। কাত হওয়া অবস্থা থেকে খাড়া করতে হলে, অর্থাৎ অন্য সবার মতো একে শূন্য মানে রাখতে হলে আমাদের বাড়তি শক্তি খরচ করতে হবে। কে আর এই বাড়তি শক্তি খরচ করতে চায় বলুন? হিগস ক্ষেত্র প্রথম থেকেই সেটা চায়নি। আর চায়নি বলেই শূন্যস্থানে হিগসের একটা মান থাকে। শূন্যস্থানে হিগসের একটা মান থাকে বলেই এটা শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে রাখে, শুধু তাই না ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’ বলে একটা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে অন্য কণাদের ভরের জোগান দেয়।

হিগস কণা ও তার শনাক্তকরণ

আমরা জানলাম, হিগস স্বভাবে খুব অদ্ভুত। এমনকি শূন্যস্থানেও এর একটা অশূন্য মান থাকে। তবে হিগসের কারিশমা কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর ব্যাপ্তি তার চেয়েও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। মহাবিশ্বে আর কোনো কণা হিগসের মতো অদ্ভুতুড়ে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের কাছে আসেনি। সেই গন্ধহীন-বর্ণহীন ইথারের মতোই এটা যেন 'সর্বত্র বিরাজমান'। কিন্তু ইথারের সাথে হিগসের পার্থক্য হলো, ইথারের অস্তিত্ব যেখানে বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে, সেখানে হিগসের অস্তিত্ব হয়েছে বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত। পাশাপাশি হিগস প্রতিসমতার ভাঙনে ইন্ধন জোগায়। আর জোগায় প্রমিত মডেলের কণাদের ভর। যদি টপ অথবা বটম কোয়ার্ক বলে কিছু না থাকত তাহলে হয়তো আমাদের জীবন অপরিবর্তিতই থেকে যেত। কোনো ব্যতিক্রমী কিছুই হয়তো কারো নজরে পড়ত না; কিন্তু হিগস বলে যদি কিছু না থাকত, পুরো মহাবিশ্বের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেত[178]।

হিগস না থাকলে মহাবিশ্বের চেহারাটা ঠিক কীরকম হতো, এ নিয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রশ্ন করার মতো পরিস্থিতিই আদপে থাকতো কিনা সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। হিগস না থাকলে কণা-পদার্থবিদদের সাধের 'প্রমিত মডেল'-এর বোধ হয় সলিলসমাধি ঘটত। কণাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকত না, সবার চেহারাই হতো হুবহু অনুরূপ। ফার্মিয়নেরা সব থাকত ভরহীন হয়ে। আমরা কণাদের যে রসায়নের সাথে পরিচিত, সেই রসায়ন বলেই কিছু থাকত না। কণাদের রসায়ন না থাকলে জীবনের রসায়নও থাকতো অনুপস্থিত। সে হিসেবে আমরা বলতে পারি, হিগস বোসন হচ্ছে এমন এক মূল্যবান কণা যা কিনা মহাবিশ্বে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়েছে। কাজেই কণাদের মধ্যে কাউকে সৈয়দ বংশের খেতাব দিতে গেলে হিগসের কথাই হয়তো আগে চলে আসবে। মিডিয়ায় যে 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে হিগসকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেটা হয়তো এসব গুরুত্ব উপলব্ধি করেই।

---

[178] Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World, Dutton Adult, 2012

হিগস না থাকলে মহাবিশ্বের প্রকৃতি কেমন হতো, প্রাণের উদ্ভবের সম্ভাবনাই বা কতটুকু থাকত তা নিয়ে নানা ধরনের দার্শনিক আলোচনায় জড়ানো যায়, কিন্তু বাস্তবতা হলো, মহাবিশ্বে উদ্ভবের পর থেকেই এই কণার একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল। হিগসের অথৈ সমুদ্রের কথা যে আমরা বলছি যেটাকে বলা হয় হিগসের ক্ষেত্র বা হিগস ফিল্ড; বিগ ব্যাং-এর পর হিগস ক্ষেত্র তৈরি হবার আগ পর্যন্ত কণাদের ভর বলে কিছু ছিল না। মহা-উত্তপ্ত অবস্থা থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে যখন মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল, তারপর সেটা কিছুটা কমে যখন মিলিয়নবিলিয়ন ডিগ্রিতে (দশের পিঠে পনেরোটা শূন্য চাপালে যে তাপমাত্রা পাব সেটা) পৌঁছেছিল, তখন হিগস ব্যাচারাদের এতই ঠান্ডা লাগা শুরু করল যে তারা সব ঠান্ডায় জমে গিয়ে একধরনের করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যাকে জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা বলেন ‘কসমোলজিক্যাল ফেজ ট্রান্সিশন’। এর আগ পর্যন্ত মহাবিশ্বে কণারা লাল ঝাণ্ডা তুলে সাম্যবাদের গান গাইত। কোনো কণারই ভর বলে কিছু ছিল না, পদার্থ-প্রতি পদার্থের সংখ্যা ছিল সমান ইত্যাদি। কিন্তু যে মুহূর্তে হিগস বাবাজির ঠান্ডা লাগা শুরু হলো, অমনি সাম্যটাম্য সব ভেঙে পড়তে শুরু করল। রাতারাতি কণাদের ভর গজাতে শুরু করল, কারো কম কারো বেশি। কেউ চিকনা-পটকা-হালকা হয়ে রইল, আর কেউ বা হিগস ক্ষেত্রের সাথে বেশি করে মিথস্ক্রিয়ায় গিয়ে আর রসদ খেয়ে হয়ে উঠল হোঁদল কুতকুত। যেমন ইলেকট্রন বাবাজি কিংবা লেপটন গ্রুপের সদস্যরা হাল্কা-পাতলা থেকে গেলেও আপ কোয়ার্ক কিংবা W বা Z কণারা হয়ে উঠল গায়ে-গতরে হাতির মতন (যেমন আপ কোয়ার্ক কণাটা আয়তনে ইলেকট্রনের সমান হলেও ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে ৩৫০ হাজার গুণ ভারী)। সাম্যাবস্থা ভেঙে এই যে ভ্যারাচ্যারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় যাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেতাবি ভাষায় বিজ্ঞানীরা বলেন ‘সিমেট্রি ব্রেকিং’, বাংলা করলে আমরা বলতে পারি ‘প্রতিসাম্যের ভাঙন’। তবে এই অসাম্য আর বৈষম্য নিয়ে আমরা যতই অসন্তুষ্ট হই না কেন, হিগস কণার কল্যাণে প্রতিসাম্যের ভাঙন ব্যাপারটা না ঘটলে পরবর্তীতে তৈরি হতো না কোনো অণু-পরমাণু, কিংবা পদার্থ কিংবা সৌরজগৎ, নীহারিকা, সূর্য আর পৃথিবীর মতো গ্রহ। এই

প্রতিসাম্যের ভাঙন কিভাবে ঘটতে পারে সেটাই ১৯৬৪ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন ছয়জন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী — পিটার হিগস, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বল, রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট[179]। সেই সব বিখ্যাত পেপার সার্নে কাচের জারে ঢুকিয়ে দর্শনার্থীদের দেখার ব্যবস্থা করেছে সার্ন কর্তৃপক্ষ[180]। এত দিন জানতাম, জীববিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস মানুষের মাথা, কিডনি ফরমালিনে ডুবিয়ে জারে রাখার ব্যবস্থা করেন, সার্নের পদার্থবিজ্ঞানীরাও যে জার ব্যবহারে কম যান না তা সেখানে না গেলে জানাই হতো না। আমি (অ.রা) জারে উঁকি দিয়ে তুলতে সমর্থ হলাম সেই বিখ্যাত পেপারগুলোর একটা ছবি —

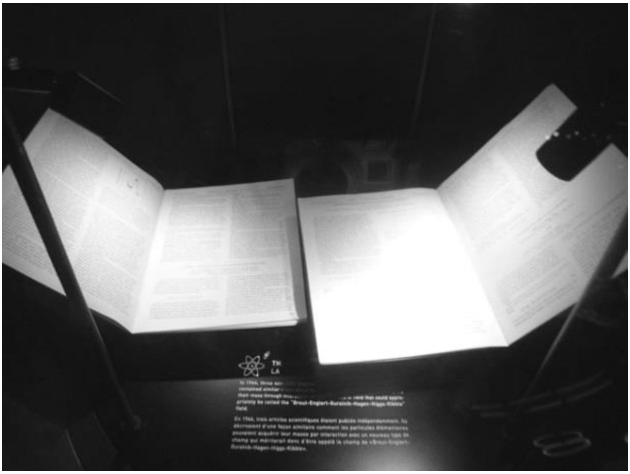

১৯৬৪ সালের বিখ্যাত পেপারগুলো কাচের জারে ঢুকিয়ে দর্শনার্থীদের
দেখার ব্যবস্থা করেছে সার্ন কর্তৃপক্ষ

---

179 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013

180 সেসব পেপারের মধ্যে রয়েছে রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন ও টম কিব্বল-এর লেখা Global Conservation Laws and Massless Particles, পিটার হিগসের Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons । সবগুলো পেপারই Physical Review Letters জার্নালের ১৩ নং ভলিউমে প্রকাশিত হয়।

সে যাক, এখন আমরা দেখি কিভাবে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের সাহায্যে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের মাধ্যমে হিগস কণার উপস্থিতির কথা জানা গেল[181]। আগেই বলেছি, হিগসের সমুদ্র যদি থেকে থাকে আর সেই সমুদ্র যদি হিগস কণাদের দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলে সেখান থেকে কিছু কণা বেরিয়ে আসতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরের নিচে প্রচণ্ড গতিতে দুটো সাবমেরিনের সংঘর্ষ হলে যেমন কিছু পানি ছিটকে চলে আসে ওপরে, আর তা দেখে আমরা বুঝি নিশ্চয় পানির নিচে কিছু একটা ঘটেছে। ঠিক তেমনি ব্যাপার হবে হিগস মহাসাগরের ক্ষেত্রেও। হিগস কণা পেতে হলে প্রচণ্ড গতিতে হিগসের সমুদ্রকে ধাক্কা দিতে হবে। এমন জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা এই পৃথিবীতে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার ছাড়া আর কারো নেই। সেখানে প্রোটনকে আলোর গতির ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শতাংশ গতিতে ত্বরান্বিত করা হয়। আর এভাবে দুদিক থেকে প্রোটনের সাথে প্রোটনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটানোর মাধ্যমে মৌলিক কণা তৈরি করা হয়। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে সংঘর্ষের মাধ্যমে ১৪ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের শক্তি উৎপন্ন হয়, আর সেই শক্তির ধাক্কায় উপপারমাণবিক কণিকারা (subatomic particles) দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটতে থাকে যত্রতত্র। সেগুলো আবার ধরা পড়ে যন্ত্রদানবের ডিটেক্টরগুলোতে। এভাবেই আটলাস আর সিএমএস ডিটেক্টরে ধরা পড়ল মহামান্যবর হিগসের অস্তিত্ব।

হিগসের শক্তি অবশ্য তাত্ত্বিকভাবে হিসাব করা হয়েছিল অনেক আগেই। গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতেন হিগস কণা যদি থেকে তাহকে তবে সেটার ভর থাকবে ১১৪ থেকে ১৩১ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (যেটাকে নতুন এককে গিগা ভোল্ট বলা হয়) এর মাঝামাঝি জায়গায়। বিজ্ঞানীদের অনুমান মিথ্যে হয়নি। প্রোটন নিয়ে গুঁতোগুঁতির ফলাফল শনাক্ত করতে গিয়ে এমন একটা কণা

181 মিডিয়ায় যদিও মোটা দাগে কেবল প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের মাধ্যমেই হিগস কণা পাওয়ার উল্লেখ করা হয়, মূল ব্যাপারটা অনেক গভীর। আমরা জানি, প্রোটন মূলত কোয়ার্ক, এন্টি কোয়ার্ক এবং গ্লুয়োন দিয়ে তৈরি। হিসাব করে দেখা গেছে কোয়ার্ক এবং অ্যান্টি কোয়ার্কের সংঘর্ষে হিগস পাওয়া যায় না; হিগস পাওয়া যাবার আশা করা যায় কেবল গ্লুয়োন-গ্লুয়োন সংঘর্ষ থেকেই। দুটো গ্লুয়োন একত্র হয়ে গলে গিয়ে হিগস তৈরি করতে পারে মধ্যবর্তী 'ভার্চুয়াল কোয়ার্ক' স্তর পার হয়ে।

পাওয়া গেল যার শক্তি ১২৫ গিগা ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। হিগস কণার যা যা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা তা এই ফলাফলের সাথে মিলে যায়। আজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, ছবিতে ১২৫ জিইভির কাছাকাছি যে ঢিপি চোখে পড়ছে সেটা হিগস কণার জন্যই হয়েছে[182]।

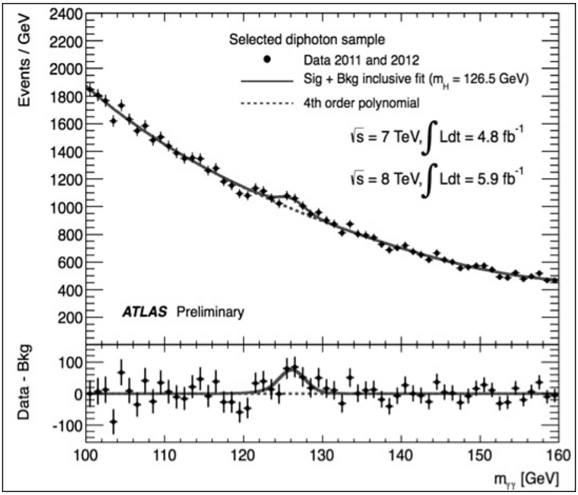

ছবিতে ১২৫ জিইভির কাছাকাছি যে ঢিপি চোখে পড়ছে সেটা হিগস কণার জন্যই হয়েছে

এবং এটাই হিগসের প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ। ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তির নেতৃত্বে এক দল (আটলাস গ্রুপ) এবং জো ইনকানডেলার নেতৃত্বে আরেক দল (সিএমএস গ্রুপ) পৃথক পৃথকভাবে এই কণার খোঁজ পেয়ে তাদের ওপর মহলে সার্ন গবেষণাগারের সার্নের মহাপরিচালক রলফ হয়ার কাছে রিপোর্ট করেন। পৃথক দুই

[182] ২০১২ সালের জুলাই মাসে যখন হিগসপ্রাপ্তির ঘোষণা সার্ন থেকে এসেছিল, বিজ্ঞানীরা অনেক সতর্ক ছিলেন। তাঁরা প্রায়শই সরাসরি কণাটিকে 'হিগস' না বলে 'হিগসসদৃশ কণা' বলতেন। কারণ, তারা জানতেন নতুন পাওয়া কণাটি হিগসের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও এটি হিগস না হয়ে সম্পূর্ণ নতুন কণিকা হবার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই দিন থেকে শুরু করে প্রায় এক বছর ধরে তাঁরা সেই কণাটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করেন, বিশেষত কণাটির স্পিন ও প্যারিটি ছিল বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। বিজ্ঞানীরা জানতেন, হিগসের স্পিন সব সময় শূন্য পাওয়া যাবে, এবং এর প্যারিটি হবে জোড়। যতগুলো পরীক্ষা করেছেন তাঁরা কণাটি নিয়ে সবগুলোতেই এই একই মান পাওয়া গেছে—প্যারিটির ক্ষেত্রে জোড়, আর স্পিনের ক্ষেত্রে শূন্য। ২০১৩ সালের মার্চ মাসে সার্ন পুনর্বার ঘোষণা দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, প্রাপ্ত কণাটি হিগসই ছিল।

দলের পৃথক গবেষণা থেকে যখন একই ফলাফল বেরিয়ে এল তখনই রলফ হয়ার বুঝতে পারলেন সত্যই হিগসের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য তারা বেশ কিছুদিন সময় নিয়ে ফলাফলগুলো পুনরায় পরীক্ষা করলেন। অবশেষে সবাই হলেন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

হিগসপ্রাপ্তির বৃহৎ ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে ফ্যাবিওলা জায়ানোত্তি, রলফ হয়ার ও জো ইনকানডেলা

শেষমেশ ২০১২ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হাই এনার্জি ফিজিকসের একটি দ্বিবার্ষিক কনফারেন্সে হিগসের প্রাপ্তির খবর জানানো হয়। জেনেভার সার্ন থেকে সরাসরি রিলে করা হয় তাঁদের ঘোষণাটি। গবেষণাগারের মহাপরিচালক রলফ হয়ার যখন এই আবিষ্কারের ঘোষণা দিলেন, তখন উল্লাস আর করতালিতে ফেটে পড়লেন সমবেত শতাধিক বিজ্ঞানী।

হিগস কণাপ্রাপ্তির খবর শুনে অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী পিটার হিগস

বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিটার হিগস স্বয়ং। ৮৩ বছর বয়স্ক এ বিজ্ঞানী ঘোষণার সময় হয়ে উঠলেন আবেগে অশ্রুসজল। বললেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা আমার জীবদ্দশাতেই ঘটবে'। স্ত্রীকে তখনই ফোনে বলে দিলেন সেলিব্রেশনের জন্য শ্যাম্পেইনের বোতল ফ্রিজে রেখে দিতে।

মহাবিশ্বের সমস্ত ভর হিগস থেকে আসেনি

আমরা জানি, মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুর ভর সৃষ্টির পেছনে মুখ্য কণা হিসেবে হিগসকে মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। বাস্তবতা কিন্তু ঠিক সেরকম কুসুমাস্তীর্ণ কিছু নয়। ভর ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হলেও এই ভর অর্জনের প্রক্রিয়াটা কিন্তু আসলে বেশ জটিলই। আমরা ছোটবেলায় বিজ্ঞানের বইতে শিখেছিলাম, 'কোনো বস্তুতে অবস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকে ঐ বস্তুর ভর বলে'। আসলে নিউটনীয় দৃষ্টিতে ভর এটাই। তিনি তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে ভরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The quantity of matter is the measure of the same, arising from its density and bulk conjointly'। পদার্থের ভরের এই সংজ্ঞায়ন দুইশ বছর ধরে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব রঙ্গমঞ্চে আসার পর ভর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটাই বদলেছে। আর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রমিত মডেলে বস্তুর ভরকে একটা ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ফাংশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা থেকে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন কণার মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতিকে[183]।

মৌল বা প্রাথমিক কণিকাগুলো কিভাবে ভরপ্রাপ্ত হয় সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কণিকার যেমন স্থিতি ভর বলে একটা জিনিস থাকে (যেটাকে পদার্থবিজ্ঞানে রেস্ট ম্যাস বা ইন্ট্রিন্সিক ম্যাস বলে), তেমনি থাকে গতীয় ভর বা কাইনেটিক ম্যাস। এই ভর আসে কোত্থেকে? আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণের কথা আমরা সবাই জানি: $E = mc^2$। মানে শক্তি = বস্তুর ভর এবং আলোর গতির বর্গের

[183] Gordon Kane, The Mysteries of Mass, Scientific American, June 27, 2005

গুণফল। কাজেই এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখছি, ভরকে যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, ঠিক তেমনি শক্তিকেও ভরে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই শক্তি থাকলে ভর পাওয়া যায়, সমীকরণটাকে একটু রদবদল করে দিলেই: $m = \frac{E}{c^2}$।

হিগস ক্ষেত্র থেকে বস্তুকণাগুলো তার স্থিত-ভর (rest mass) পায়। কিন্তু ওপরেই আমরা জানলাম, কণার গতিশক্তিজনিত একটা ভরও আছে। যেমন, ফোটনের স্থিত-ভর শূন্য হওয়া সত্ত্বেও তার একটা গতিশক্তিজনিত ভর আছে। এবং ফোটন মহাকর্ষ ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেটাও আমরা জানি। ফোটনের পাশাপাশি এবার প্রোটন বা নিউট্রনের ক্ষেত্রে ভরের ব্যাপারটা দেখা যাক। যদিও আমরা ওপরে 'কণাদের নিয়ে কানাকানি' অংশে প্রোটন বা নিউট্রনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছিলাম, এরা তৈরি হয় কোয়ার্ক দিয়ে (প্রোটন তৈরি হয় দুটো আপ এবং আরেকটা ডাউন কোয়ার্কের সমন্বয়ে, আর অন্যদিকে নিউট্রন তৈরি হয় একটা আপ আর দুটো ডাউন কোয়ার্ক মিলে), কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ রূপ নয়। একটা প্রোটন কেবল কোয়ার্ক দিয়েই তৈরি হয় না, এর মধ্যে থাকে নানাবিধ অন্যান্য 'অসদ কণা'— অ্যান্টি কোয়ার্ক ও গ্লুয়োন। সেজন্যই, আলাদা আলাদাভাবে দুটো আপ কোয়ার্ক আর একটা ডাউন কোয়ার্কের যোগফলের চেয়ে একটা প্রোটনের ওজন সব সময়ই বেশি পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, প্রোটন বা নিউট্রনের মূল ভর সৃষ্টি হয় হিগস ক্ষেত্র থেকে নয়, বরং গ্লুয়োন ও কোয়ার্কের গতিশক্তি এবং গ্লুয়োন ক্ষেত্রে কোয়ার্কের বিচরণ থেকে। সেক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র জাড্য ভরের (inertial mass) কতখানি হিগসজনিত, ও কতখানি গতি ও গ্লুয়োন ক্ষেত্রজনিত, সেটার হিসাবটা দরকার[184]। বিজ্ঞানীরা সে হিসাব করে দেখেছেন, কোয়ার্কগুলো প্রোটন কিংবা নিউট্রনে কেবল শতকরা ১ ভাগ ভরের জোগান দেয়। বাকি ৯৯ ভাগ ভাগ আসে সবল নিউক্লীয় শক্তি থেকে, যেখানে হিগসের কোনো ভূমিকা নেই[185]।

---

[184] ড. দীপেন ভট্টাচর্যের মন্তব্য; সার্ন থেকে হিগ্‌স বোসন–প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে!; মুক্তমনা

[185] Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013

আরো সমস্যা আছে। নিউট্রিনোগুলোর ভর আসলেই হিগস থেকে আসে কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। এটা এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয় গুপ্ত পদার্থ ও গুপ্ত শক্তির সাথে হিগসের সম্পর্কও। বলা বাহুল্য, আমাদের মহাবিশ্বের মাত্র চার ভাগ চেনাজানা ব্যারিয়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি, যাদের প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। বাদবাকি ৯৬ ভাগই কিন্তু গুপ্ত পদার্থ ও গুপ্ত শক্তি। হিগস বাবাজির সাথে তাদের ভরের কোনো সম্পর্ক না থাকলে এটা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, মহাবিশ্বের মোট ভরের দুই হাজার ভাগের এক ভাগের বেশি কিছু হিগস থেকে আসেনি[186]।

পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্টের নোবেল জয়

বইয়ের এই অধ্যায়টি যখন শেষের পথে তখন ২০১৩ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার খবর পেলাম। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পিটার হিগস ও ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট। মিডিয়ায় প্রকাশ, পারমাণবিক ও উপ-পারমাণবিক কণার ভরের উৎস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা যে ‘হিগস-বোসন’ কণার ধারণা করেছিলেন, গত বছর সার্নের পরীক্ষায় তা সফলভাবে প্রমাণিত হয়। এর স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য এই দুজনের নাম বিবেচনা করেছে নোবেল কমিটি। ফ্রাঁসোয়া এঙ্গলার্ট জন্মেছিলেন ১৯৩২ সালে, অধ্যাপনা করছেন ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি একটি যুগান্তকারী গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁর সহকর্মী রবার্ট ব্রাউটের (অধুনা পরলোকগত) সঙ্গে মিলে যা হিগস কণার কাজ বুঝতে সহায়ক হয়েছিল।

আর ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণকারী পিটার হিগস এমনিতেই

[186] Victor J. Stenger, Higgs and the Mass of the Universe, Huffington Post, Posted: 07/14/2012

পাদপ্রদীপের আলোতে সব সময়ই ছিলেন, বিখ্যাত কণাটির সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত থাকায়। তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার এমিরিটাস অধ্যাপক হিসেবে এখনো কাজ করছেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমাদের জন্যও এটি কম আনন্দদায়ক নয়, কারণ, অনেক আগে থেকেই এই দুই বিজ্ঞানীর কাজের উল্লেখ করে আমাদের এই বইটি লিখতে মনস্থ করেছিলাম। এই অধ্যায়েই বলেছি, হিগস ক্ষেত্রের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়িয়ে কিভাবে উপ-পারমানবিক কণিকারা ভর অর্জন করতে পারে সেটাই ১৯৬৪ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন ছজন বিজ্ঞানী—পিটার হিগস, জেরাল্ড গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বল, রবার্ট ব্রাউট ও ফ্রাঁসোয়া এ্যাঙ্গলার্ট। গত বছর সার্নের পরীক্ষায় তাঁদের যুগান্তকারী ধারণাটি সফলভাবে প্রমাণিত হয়। তখন থেকেই অনুমান করা হচ্ছিল, হিগস কণার গবেষণার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের নোবেল-প্রাপ্তি হয়তো স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

এদের মধ্যে রবার্ট ব্রাউট মারা গিয়েছেন ২০১১ সালে। নোবেল পুরষ্কার মরণোত্তর হিসেবে দেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই; তাই রবার্ট ব্রাউট মনোনীত হতে পারেননি। বাকি তিনজন—গৌরালিঙ্ক, রিচার্ড হ্যাগেন, টম কিব্বলের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল সবার শেষে। কাজেই গুরুত্ব বিচারে তাঁরাও ছাকনির জাল ভেদ করে ওপরে উঠতে পারেননি। জয়মাল্য গিয়েছে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঁসোয়া এ্যাঙ্গলার্ট ও পিটার হিগসের গলাতেই। ২০১৩ সালের নোবেল বিজয়ের পটভূমিকায় আমার (অ. রা) একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা বিডিনিউজ২৪ পত্রিকায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'হিগস-বোসন কণার নোবেল জয়' শিরোনামে [187]।

নোবেল কমিটির ঘোষণা থেকে জানা গিয়েছে, তারা এ দুজনকে

[187] অভিজিৎ রায়, হিগস-বোসন কণার নোবেল জয়, বিডিনিউজ২৪, অক্টোবর ১০, ২০১৩

পুরস্কৃত করেছে ‘একটি প্রক্রিয়ার তাত্ত্বিক আবিষ্কারের জন্য, যে প্রক্রিয়া উপ-পারমাণবিক কণাদের ভরের উদ্ভব বুঝতে সহায়তা করে এবং যেটি সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের আটলাস ও সিএমস-এর পরীক্ষায় নিশ্চিত করা গেছে।’

সত্যেন বোসের অবদান – পেছন ফিরে দেখা

প্রবন্ধের এই অংশটা লেখার সাথে একেবারেই সংগতিহীন মনে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণে কিছু অপ্রিয় কথা বলতেই হচ্ছে। বাঙালি জাতির হুজুগ-প্রিয়তার কথা বোধ হয় সর্বজনবিদিত। এমনিতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে কারো কোনো মাথাব্যথা আছে এমন নয়, চিরায়তভাবে হাসিনা-খালেদা-রাজাকার-ধর্ম ইত্যাদির বাইরে চিন্তা বা দৃষ্টি খুব একটা অগ্রসর হতে দেখা না গেলেও হিগস বোসন কণা নিয়ে মিডিয়ায় তোলপাড় হবার সাথে সাথে বাঙালি হুজুগের আগুনে যেন ঘি পড়ল। ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা হিসেবে ‘সত্যেন বোস’কে আখ্যায়িত করে গগনবিদারী কান্নাকাটির ধূম পড়ে গেল। কেউ কেউ আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করলেন, সার্নের খ্রিষ্টান—ইয়াহুদি-নাসারা সায়েন্টিস্টরা নাকি বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বোসের গবেষণা মেরে দিয়ে তাঁকেই আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। এমনি একটি লেখা আমার নজরে এল একটি ব্লগে, লেখার শিরোনাম —“GOD particle বা ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এভাবে ভুলে গেলেন বিজ্ঞানীরা!!”[188]

লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য ছিল এরকমের –

> ‘...হিগসের উল্লেখিত ওই কণার চরিত্র সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দুই বিজ্ঞানীর নামে কণাটির নাম দেওয়া হয় হিগস-বোসন। GOD particle বা ঈশ্বর কণার তত্ত্বীয়

---

[188] জেনারেশন৭৫, GOD particale বা ঈশ্বর কণা তত্ত্বের আবিষ্কারের পিতা সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এভাবে ভুলে গেলো বিজ্ঞানীরা!! http://www.amarbornomala.com/ details13684.html

ধারণাটা মূলত আসে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইন-এর যৌথ গবেষণাপত্র থেকে। জার্মানির বিখ্যাত জার্নাল ‘Zeitschrift fur Physik’-তে এটা প্রকাশিত হয়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই ধারণা মূলত আসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে। ... এটাই এখন আলোচিত ও বিখ্যাত ‘বোস-আইনস্টাইন তত্ত্ব’ হিসেবে ।...’

লেখাটির নিচে মন্তব্যকারীদের কিছু মন্তব্যের নমুনাও দেখতে পারেন পাঠকেরা, যার কিছু উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করছি—

‘ভাবতেও কষ্ট হয়। এতটা নির্লজ্জ ইউরোপিয়ানরা।’

‘ইউরোপিয়ানরা পারলে নিজেদের ছাড়া সারা বিশ্বের সব জাতিকেও অস্বীকার করবে’

‘পিটার হিগসকে নোবেলের জন্য নমিনেট করার চেষ্টা করা হচ্ছে অথচ বসু অন্তরালেই রয়ে গেলেন।’।

এ ধরনের অনেক মন্তব্যই পাওয়া যাবে ওখানে।

শুধু ব্লগ-আর্টিকেল হলেও না হয় কথা ছিল, অনলাইন, অফ লাইন সব পত্রিকার সম্পাদকীয় কিংবা কলামেও এ ধরনের হাজারো ভুল অনুমানের ছড়াছড়ি। যেমন, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম নামের পত্রিকাটিতে ৫ জুলাই তারিখে প্রকাশিত *“নতুন বিতর্কে ‘ঈশ্বর কণা’”* শিরোনামের কলামে সাব্বিন হাসান (নামের নিচে লেখা আছে আইসিটি এডিটর) আমাদের জানিয়েছেন[189] —

‘...পিটার হিগসের সঙ্গে উপমহাদেশের ভারতীয় বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এ কণার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন। এ দুই বিজ্ঞানীর নাম থেকেই ‘হিগস-বোসন’ কণা তত্ত্বের সৃষ্টি। আজ ‘ঈশ্বর কণা’ নামে পরিচিত।...’

দেখলাম আবেগে বাঁধ ভাসিয়েছেন কেবল উলুখাগড়ারা নয়, অনেক রাজা-উজিরই। আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আছেন, চিন্তায়-চেতনায় মুক্তমনা। দিন দুনিয়ার

---

[189] সাব্বিন হাসান, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, নতুন বিতর্কে ‘ঈশ্বরকণা’, জুলাই ৫, ২০১২

খোঁজখবর ভালোই রাখেন। তিনি পর্যন্ত হিগস নিয়ে মিডিয়া তোলপাড় শুরু হবার কয়দিন পর আমায় একটি লেখার লিঙ্ক পাঠালেন যার শিরোনাম [190] – For the Indian Father of the 'God Particle,' a Long Journey from Dhaka। অবশ্য কেউ কোনো লিঙ্ক পাঠানো মানেই যে লেখকের বক্তব্যের সাথে তিনি সহমত হবেন তা নয়, আর তাছাড়া এ লেখাটা অবশ্য ওপরের বাংলা-ব্লগ লেখকের মতো এলেবেলে নয়, কিন্তু মোটাদাগে বক্তব্য একই। বোসন কণার সাথে সত্যেন বোসের নাম মিলেমিশে আছে। যেহেতু এখন 'গড পার্টিকেল' পাওয়া গেছে তাই তিনিই 'ফাদার অব গড পার্টিকেল'। ইউরোপিয়ানরা তাকে ভুলে গেছে, সঠিকভাবে সম্মানিত করেন নাই। ০৫-০৭-২০১২ তারিখে প্রথম আলো এই ইংরেজি লেখাটার উপর ভিত্তি করে অনলাইন ডেস্কের বরাত শিরোনাম করেছে[191] —'উপেক্ষিত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু', এবং পরবর্তীতে আরেকটি প্রবন্ধ[192] —'ঢাকা থেকে জেনেভা'।

এই অভিযোগগুলো সঠিক না ভুল তা জানলে হলে পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদানের কথা আমাদের ঠিকমতো জানতে হবে। আমি (অ.রা) বছর কয়েক আগে 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' নামে একটি বই লিখেছিলাম[193]। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ সালে অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক এ এম হারুন-অর রশীদ। সেই বইয়ে সত্যেন বোসকে নিয়ে পরিশিষ্টে কিছু কথা লিখেছিলাম, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে:

১৯২৪ সাল। তখন আক্ষরিক অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বর্ণযুগ'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের একটি ছোট্ট কক্ষে বসে এ বিভাগের তরুণ

---

[190] Samanth Subramanian, For the Indian Father of the 'God Particle,' a Long Journey from Dhaka, http://india.blogs.nytimes.com, July 6, 2012।

[191] উপেক্ষিত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম আলো, অনলাইন ডেস্ক, তারিখ: ০৫-০৭-২০১২

[192] হুমায়ূন রেজা, ঢাকা থেকে জেনেভা, প্রথম আলো, তারিখ: ১৩-০৭-২০১২

[193] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬।

শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সত্যেন বোস হিসেবে সমধিক পরিচিত) প্লাঙ্ক বিকিরণ তত্ত্বের সংখ্যায়নিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি নতুন সংখ্যায়নের জন্ম দেন যা পরবর্তীকালে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) নামে বিশ্বে পরিচিত হয়। যেসব কণিকা সমষ্টি এই সংখ্যায়ন মেনে চলে ওদের ধর্ম হলো ভর শূন্য অথবা সীমিত, স্পিন শূন্য বা পূর্ণসংখ্যক- আর এদেরকে এখন বলা হয় বোসন। বলা বাহুল্য, বোসের নামেই এই নামকরণ।

2. *The particles are indistinguishable.* The number of ways of arranging N_i indistinguishable particles in g_i distinguishable ways, at any energy level, is given by Problem 4, Sec. 3.2, as $(g_i + N_i - 1)!/(g_i - 1)!N_i!$. Thus the number of ways of arranging the corresponding macrostate is

$$W = W_{BE} = \prod_{i=0}^{n} \frac{(g_i + N_i - 1)!}{(g_i - 1)!N_i!}$$

where the subscript BE anticipates the relationship of this thermodynamic probability to Bose-Einstein statistics.

সত্যেন বোস সেসময় দুটি অনুমিতির ভিত্তিতে এই সংখ্যায়ন মাত্র চার পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধে উপস্থাপন করেন:

১. আলোক কণিকাসমূহ (ফোটন) পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ অপার্থক্যযোগ্য।

২. এদের দশা স্থান ন্যূনতম h^3 আয়তনবিশিষ্ট অসংখ্য কোষে বিভক্ত—এ কল্পনা করা যায়।

বোস এ প্রবন্ধটি আইনস্টাইনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর মন্তব্যের জন্য এবং প্রবন্ধটি প্রকাশযোগ্য হলে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে জার্মানির কোনো গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি (৪ জুন, ১৯২৪):

> ...আপনি লক্ষ্য করবেন, আমি প্লাঙ্কের সূত্রের সহগটি চিরায়ত তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব ব্যবহার না করে নির্ধারণের চেষ্টা করেছি কেবল দশা-স্থানের ক্ষুদ্রতম আয়তনকে hν ধরা যায় এই অনুমিতি থেকে। যথোপযুক্ত জার্মান ভাষা না জানায় প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি এটি যদি প্রকাশযোগ্য মনে করেন, তবে সাইটশ্রিফট ফুর ফিজিকে (Zeits. für Physik) প্রকাশের ব্যবস্থা করলে বাধিত হব।...'

আইনস্টাইন কর্তৃক স্বয়ং অনূদিত প্রবন্ধটি 'Plancks Gresetz and Lichtquantenhypotheses' শিরোনামে প্রকাশিত হয় (Zeits. für Physik, 24, 178, 1924)। আইনস্টাইন প্রবন্ধটির শেষে একটি পাদটীকা সহযোজন করেছিলেন, যা আজও বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠককে চমৎকৃত করে[194]—

> 'আমার মতে বোস কর্তৃক প্লাঙ্ক সূত্র নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রধাপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি থেকে আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টাম তত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়, যা আমি অন্যত্র বর্ণনা করব।'

তা প্লাঙ্ক সূত্র আহরণে কী সে অসংগতি যা নতুনভাবে নির্ধারণ করতে গিয়ে বোস কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের জন্ম দান করেছিলেন? এ ব্যাপারে আমাদের আরেকটু পেছনের দিকে যেতে হবে।

১৯০৪ সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক তত্ত্বীয়ভাবে 'কৃষ্ণকায়া বিকিরণের' সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পরীক্ষণের ও পর্যবেক্ষণের সাথে সুন্দরভাবে মিলে যায়। এতদিন

---

[194] এ. এম . হারুন অর রশীদ, বিজ্ঞান সমগ্র, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১০।

সনাতনী তাড়িত-চৌম্বক তত্ত্বের ভিত্তিতে এই বিকিরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে আলো তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ হলেও কোনো পরমাণু বা অণু কর্তৃক বিশোষণ বা নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় এই তাড়িত-চৌম্বক শক্তি অবিরত ধারায় শোষিত বা নিঃসৃত না হয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে শোষিত বা নিঃসৃত হয়। এখান থেকেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্মমুহূর্ত হিসাব করা যেতে পারে।

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করা যাক। প্লাঙ্কের দৃষ্টিতে, একটি কৃষ্ণবস্তুর গাত্র থেকে ক্রমাগত প্লাঙ্ক কল্পিত স্পন্দকসমূহ কর্তৃক গুচ্ছ তাড়িতচৌম্বক শক্তি শোষিত ও নিঃসৃত হচ্ছে; ফলে বস্তুর অভ্যন্তরস্থ বিকিরণ একটি তাপীয় সুস্থিতিতে রয়েছে এবং এই বিকিরণ তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে কৃষ্ণবস্তুর অভ্যন্তরে স্থির তরঙ্গ প্যাটার্ন রচনা করছে। প্লাঙ্ক তাঁর স্পন্দক নিঃসৃত বিকিরণ শক্তির গড় মান নির্ধারণ করলেন এবং কম্পাঙ্ক বিস্তারে স্থির তরঙ্গের প্যাটার্ন থেকে কম্পনের প্রকার সংখ্যা বের করলেন। এই প্রকার সংখ্যাকে গড় নিঃসৃত শক্তি দিয়ে গুণ করলেই বেরিয়ে আসে প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শোষণ ও নিঃসরণ কালে বিকিরণকে গুচ্ছ গুচ্ছ শক্তি কণিকা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষ্ণবস্তুর অভ্যন্তরে একে তরঙ্গরূপে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এটিই হলো সত্যেন বোসের দৃষ্টিতে প্লাঙ্কের নির্ধারণ পদ্ধতির অসংগতি; অবশ্য এ অসংগতি আইনস্টাইনের চোখেও ধরা পড়েছিল। সত্যেন বোসের কৃতিত্ব হলো, বিশুদ্ধ ফোটন কণিকার বণ্টনবিন্যাসের সংখ্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্লাঙ্কের সূত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন যা প্লাঙ্কের অসংগতি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ প্রবন্ধটি সম্পর্কে আইনস্টাইন তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সত্যেন বোসকে লেখা একটি চিঠিতে:

> আমি আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করে সাইটশ্রিফট ফুর ফিজি'কে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদান বলে মনে করি, যা আমাকে খুশি করেছে। ...আপনিই প্রথম 'উৎপাদকটিকে' কোয়ান্টাম তত্ত্ব

থেকে নির্ধারণ করেছেন, অবশ্য পোলারায়ন উৎপাদক সম্বন্ধে যুক্তি অতটা শক্তিশালী নয়। তবে, এটি প্রকৃতপক্ষেই একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সত্যেন বোস আহৃত সংখ্যায়নকে বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন বলা হয় কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, বোস সংখ্যায়ন ফোটনের জন্য প্রযোজ্য, যার স্থির ভর শূন্য এ ধরনের কণিকার জন্য বোস এ সূত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন। অন্যদিকে আইনস্টাইন বোস পদ্ধতিকে ভরযুক্ত কোয়ান্টাম গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বোসের সূত্রকে সাধারণীকরণ পর্যায়ে উন্নীত করেন, যা তিনি বোসের পত্রের পাদটীকায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বোস সংখ্যায়নের আবিষ্কারের পর তা পদার্থবিদ্যার নানা শাখার ব্যবহৃত হচ্ছে বা হয়েছে। বোসের বণ্টন বিন্যাসের মৌলিক সূত্রকে জড় কণিকার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে কোয়ান্টাম গ্যাসের আচরণ অতি শীতল তাপমাত্রায় বিস্ময়কর হতে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হলো 'বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন'। এই ভবিষ্যদ্বাণী পদার্থবিদ্যায় এক চমকপ্রদ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল।

সত্যেন বোস কর্তৃক কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের কাজটি কত গভীর তাৎপর্যময় ছিল বোস নিজেই সে সময় তা বুঝতে পারেননি। তাঁর মন্তব্য: 'আমার ধারণাই ছিল না যে আমি যা করেছি তা নতুন কিছু।' তবে ১৯২৫ সালে বার্লিনে আইনস্টাইনের সান্নিধ্যে এলে সত্যেন বোস তাঁর কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। সে সময়কার কথা তিনি এভাবে স্মরণ রেখেছেন, '...জার্মানিতে যখন উপস্থিত হলাম, তখন দেখি প্রায় সকলেই আমার প্রবন্ধ পড়ছেন ও আলোচনা করছেন। স্বয়ং আইনস্টাইন আমার নতুন সংখ্যায়ন রীতিতে বস্তুকণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর প্রয়োগ ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মূল কথা হলো, পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন বোসের অনন্যসাধারণ অবদান আছে, এবং সেই অবদানের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, গুরুত্বপূর্ণ একটা কণা-পরিবার তাঁর নাম

ধারণ করে আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সম্প্রতি লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে যে হিগস কণা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটা তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, কিংবা সত্যেন বোসের আইডিয়া ইউরোপিয়ানরা মেরে দিয়েছে। কী নিদারুণ অজ্ঞতা। বিজ্ঞানী উলফগ্যাং পাউলির মতোই বলতে হয়,'They are not even wrong'। একটা উদাহরণ দিই। নাসায় 'চন্দ্রশেখর টেলিস্কোপ' বলে একটা টেলিস্কোপ আছে যেটা পদার্থবিজ্ঞানে সুব্রাহ্মনিয়ান চন্দ্রশেখরের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কেউ যদি বলেন, এই টেলিস্কোপের আইডিয়াটা চন্দ্রশেখরের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল, আর নাসার বিজ্ঞানীরা তা মেরে দিয়ে একটা বড়সড় টেলিস্কোপ বানিয়ে নিজেদের করে রেখেছেন – এটা যেমন শোনাবে, সত্যেন বোসকে 'ঈশ্বর কণার' জনক বলে জাহির করার চেষ্টাটাও সেরকমই।

তবে আশার ব্যাপার হলো সবাই আবেগের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। এর মধ্যে সমকাল পত্রিকায় ব্যাপারটি নিয়ে কিছুটা হলেও নিরপেক্ষভাবে প্রতিবেদন হাজির করা হয়েছে। ১০ জুলাই তারিখে প্রকাশিত 'বসু ও বোসন কণা' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিজ্ঞান লেখিকা খালেদা ইয়াসমিন ইতি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন[195] –

> 'হিগস কণাকে বিজ্ঞানে হিগস বোসন বলেই উল্লেখ করা হয়। কারণ হিগস কণা একটি বোসন কণা। এর স্পিনও পূর্ণসংখ্যার। এ রকম অসাধারণ আবিষ্কারের খবর দেশের গণমাধ্যমে প্রচারের ক্ষেত্রে এমন কিছু বক্তব্য আসছে যা তরুণ প্রজন্মের কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দেবে। যেমন—'এই কণা আবিষ্কারে উৎফুল্ল বিজ্ঞানীরা স্মরণ করতেই ভুলে গেছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা উপেক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু।' এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু উপেক্ষিত। তবে তা নিজ দেশে, বাইরে নয় এবং হিগস বোসন কণার আবিষ্কারে এসব কথা প্রাসঙ্গিকও নয়। ড. আলী

[195] খালেদা ইয়াসমিন ইতি, বসু ও বোসন কণা, কালস্রোত, দৈনিক সমকাল, জুলাই ১০, ২০১২।

আসগর বলেছেন, যেকোনো তত্ত্ব বিকশিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। এর তাৎপর্য সম্পর্কে ওই বিজ্ঞানীও অতটা অবগত থাকেন না। হিগস বোসন ভর বাহক বোসন বৈশিষ্ট্যের একটা কণা যা বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে; এটুকুই। সার্নের গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সুবীর সরকার ডয়চে ভেলেকে বললেন, এই 'ঈশ্বর কণা' আবিষ্কারে সত্যেন বসুর কোনো অবদান নেই। তবে হ্যাঁ, পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র 'বোসন জাতের কণা সত্যেন বসুর সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলে। একই কথা ডয়চে ভেলেকে বললেন সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর হাই এনার্জি বিভাগের বিজ্ঞানী সুকল্যাণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৪ সালে বোসন কণার অস্তিত্বের কথা সবাই জানতে পারেন। কিন্তু এর সঙ্গে বোসের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে বোসের আবিষ্কৃত সংখ্যাতত্ত্বের অবদান আছে'।

খালেদা ইয়াসমিন ইতি তাঁর লেখায় পদার্থবিদ ড. আলী আসগরের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ঈশ্বর কণার সাথে সত্যেন বোসকে জুড়ে দেওয়ার কিংবা তাঁকে জনক বানানোর চেষ্টা আসলে খুবই ভ্রান্ত। আসলে সত্যি বলতে কী, যাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, কিংবা কণা-পদার্থবিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা সবাই আসলে এটার সাথে একমত হবেন। যেমন প্রথম আলোতে ১৩-০৭-২০১২ তারিখে প্রকাশিত ''ঈশ্বর' কণার খোঁজ' শিরোনামের প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেনের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি[196] –

সব মৌলিক কণারই ঘূর্ণন (স্পিন) বলে একটা বিশেষ ধর্ম রয়েছে, যা কিনা পূর্ণ সংখ্যা (০, ১, ২,...) বা অর্ধপূর্ণ সংখ্যা (১/২, ৩/২,...) দ্বারা নির্দেশিত হয়। যাদের মান পূর্ণ সংখ্যা, তাদের দলটিকে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সম্মানে বলা হয় 'বোসন'। উল্লেখ্য, অধ্যাপক বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

[196] আরশাদ মোমেন, 'ঈশ্বর' কণার খোঁজ, প্রথম আলো, তারিখ: ১৩-০৭-২০১২

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯২৪ সালে এ ধরনের কণার পরিসংখ্যান তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। যে বিশেষ কণাগুলোর আদান-প্রদানের কারণে মৌলিক বলগুলোর উদ্ভব হয়, তার সব কটি এই বোসন দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অতি পরিচিত আলোর কণা যে ফোটন, তা-ও একটি বোসন কণা। সার্নে আবিষ্কৃত কণাটির ঘূর্ণন সংখ্যা শূন্য। তাই এটিও একটি বোসন। মনে রাখতে হবে, বসুর অবদান ১৯২০-এর দশকের এবং পিটার হিগসের কাজ ১৯৬০-এর দশকের।

আমরা জানি, আইনস্টাইন যেমন বেহালা বাজাতে পছন্দ করতেন, রিচার্ড ফেইনম্যান যেমন বাজাতেন বঙ্গো, ঠিক তেমনি সত্যেন বোস বাজাতেন এস্রাজ। কিন্তু এস্রাজ বাদকের আসলে হিগস বোসন বা হিগস কণার অন্বেষণে কোনো অবদান ছিল না, এটা আমাদের কথা নয়, ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আহমেদ শফি, ১৪ জুলাই বিডিআর্টসের ইংরেজি বিভাগে প্রকাশিত তাঁর চমৎকার ‘Nearly finished brief biography of a well-known scintilla’ শিরোনামের লেখায়[197] –

> ‘Bose spent the rest of his life doing little important physics, and the proposal for using a Higgs particle for spontaneous symmetry breaking had nothing to do with the esraj player’

তার পরও যদি পাঠকদের ব্যাপারটা বুঝতে সমস্যা হয়, তবে আমার (অ.রা) নিজের লেখায় দেওয়া খুব প্রিয় অ্যানালজি দিয়ে শেষ করি। ‘পথের পাঁচালী’ নামের বিখ্যাত সিনেমাটার সাথে সত্যজিৎ রায়ের সম্পর্ক থাকলেও পরিচালকের নামের সাথে এই বইয়ের সহলেখক অভিজিৎ রায়ের কেবল নামের শেষাংশের কাকতালীয় মিল

---

[197] Ahmed Shafee, Nearly finished brief biography of a well-known scintilla, http://opinion.bdnews24.com/

ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু এই মিলের সূত্র ধরে যদি অভিজিৎ রায় বিখ্যাত সিনেমাটির জনক সাজার চেষ্টা করে, তাহলে যেমন দেখাবে, হিগস বোসন কণায় বোসন দেখেই সত্যেন বোসকে জনক বানানোর প্রচেষ্টাটাও সেরকমই।

ঈশ্বর কণা নিয়ে বিতর্ক

হিগস কণাকে 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে ডাকাটা আমার পছন্দের নয় মোটেই। কারণটা আমি (অ.রা) আমার সার্ন ভ্রমণের পর একটি সাম্প্রতিক লেখায় বলেছিলাম[198] । কিছু ব্যাপার এখানেও প্রাসঙ্গিক। হিগস বোসনের নাম ঈশ্বর কণা মোটেই ছিল না প্রথমে। এমনকি এখনো পদার্থবিজ্ঞানের সরকারি পরিভাষায় এটা নেই। এটা 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে পরিচিতি পায় নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যানের একটি বইয়ের প্রকাশনার পর। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ৪৫০ পৃষ্ঠার বইটার শিরোনাম ছিল– 'দ্য গড পার্টিকেল: ইফ দ্য ইউনিভার্স ইজ দ্য আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চন?'[199] বলা হয়, কণাটির গুরুত্ব বোঝাতে নাকি ঈশ্বর শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে মজার ব্যাপার হলো, লেখক নাকি নিজেই বইটির নাম ঈশ্বর কণা না রেখে 'গডড্যাম পার্টিকেল' বা 'ঈশ্বর-নিকুচি' কণা রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকাশক শেষ সময়ে গডড্যাম থেকে ড্যাম শব্দটা ছেঁটে ফেলেন। বইয়ের নাম হলো গড পার্টিকেল। সেই থেকে হিগস বোসনের নাম হয়ে গেল 'দ্য গড পার্টিকেল'! বাঙালি সাংবাদিকেরাও সাথে সাথে এর ভাষান্তর করলেন 'ঈশ্বর কণা'। নির্মলেন্দু গুণের মতোই তাইলে বলতে হয়, কেবল স্বাধীনতা শব্দটি বদলে দিয়ে—'ঈশ্বর শব্দটি এভাবে আমাদের হলো'।

লেখক যে নিজেই বইটির নাম ঈশ্বর কণা না রেখে 'ঈশ্বর-নিকুচি' কণা (Goddamn Particle) হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন আর সেটা প্রকাশকের কাঁচিতে কিভাবে কাটা

---

[198] আমার সাম্প্রতিক সার্ন ভ্রমণ এবং হিগস কণা নিয়ে ব্লগ আর্টিকেল (মুক্তমনা, জুলাই ৯, ২০১২) ।

[199] Leon Lederman, The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?, Delta, 1993

পড়ে ‘ঈশ্বর কণা’ (Goddamn Particle) তার একটা সরস বর্ণনা পাওয়া যায় ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় -

> ...অনাবিষ্কৃত কণাটির গুরুত্ব সাধারণ মানুষকে বোঝাতে ১৯৯৩ সালে কলম ধরেছেন লিও লেডারম্যান। বইয়ের নাম কী হবে? লেডারম্যান বললেন, ‘নাম হোক হিগস বোসন।’ ঘোর আপত্তি প্রকাশকের। বললেন।, ‘এমন নামের বই বিক্রি হবে না। ভাবা হোক জুতসই কোনো নাম।’ বিরক্ত লেডারম্যান বললেন, ‘তা হলে নাম থাক গডড্যাম পার্টিক্যাল।’ অর্থাৎ, দূর-ছাই কণা। প্রকাশক একটু ছেঁটে নিলেন সেটা। বইয়ের নাম হলো ‘দ্য গড পার্টিকেল’। নামের মধ্যে ঈশ্বর! বই বিক্রি হলো হুহু করে। ...

ব্যাপারটা ঠিক এরকমভাবেই ঘটেছিল কি না তা পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে না বলা গেলেও লেখক আসলে তাঁর বইয়ের জন্য গড পার্টিকেলের বদলে গডড্যাম পার্টিকেল (Goddamn Particle) প্রস্তাব করেছিলেন,আর প্রকাশক শেষ সময়ে সেটা পরিবর্তন করেন, তার উল্লেখ বহু জায়গায় পাওয়া যাবে[200]।

লিওন লেডারম্যানের ‘গড পার্টিকেল’ শিরোনামের বইটা আমার কাছে আছে, সেটা ২০০৬ সালে পুনর্মুদ্রিত। সেটার জন্য আলাদা করে ভূমিকাও লিখেছেন তিনি। বইটা এমনিতে খুবই দুর্দান্ত, সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় রসিকতা করে বইটা লেখা। জানি না পাঠকেরা বইটি পড়েছেন কি না, বইটা কিন্তু খুব মজাদার একটা বই। এমন নয় যে ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বর কণা সম্বন্ধে শ্রদ্ধায় মরে গিয়ে কিংবা ভাবে বিগলিত হয়ে বইটি লিখেছেন, বরং বইটি পড়লে বোঝা যায়, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-

---

[200] প্রসঙ্গত দেখুন, John Horgan, If You Want More Higgs Hype, Don’t Read This Column, http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-this-column/

Luca Mazzucato, Higgs Boson: That god(damn) particle... http://scallywagandvagabond.com/2012/07/higgs-boson-that-goddamn-particle/

The Higgs boson Fantasy turned reality http://www.economist.com/node/21541797 ইত্যাদি

তামাশাই করেছেন বেশি। যেমন একটা জায়গায় (পৃষ্ঠা ২২) তথাকথিত ঈশ্বর কণাকে ‘সবচেয়ে বড় শয়তান/খলনায়ক’ আখ্যায়িত করে লিখেছেন[201]:

> কণা-পদার্থবিদেরা সম্প্রতি এ ধরনের একটি ফাঁদ পাততে সমর্থ হয়েছেন। চুয়ান্ন মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটা টানেল আমরা তৈরি করছি যেখানে অতিপরিবাহী কণাত্বরকের মধ্যে যুগল রশ্মির আপতনের সাহায্যে সেই শয়তানকে ধরবার প্রত্যাশা করি।
>
> আহ্ কী প্রচণ্ড শয়তান সেই ব্যাটা! ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শয়তান...

এ ধরনের রসিকতা আছে বইটা জুড়েই। একে তো বিশ্বাসীরা লিওন লেডারম্যানের রসিকতা বোঝেননি, তার ওপর এখন সার্নের বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর কণাপ্রাপ্তির প্রমাণকে ধরে নিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে।

লিওন লেডারম্যানের পাশাপাশি পিটার হিগসের কথাও বলতে হয়। পিটার হিগস নিজে নাস্তিক, সেটা তাঁর উইকি পেইজেই লেখা আছে[202]। তিনি হিগস বোসন কণাকে ঈশ্বর কণা হিসেবে আখ্যায়িত করারও ঘোর বিরোধী। তাঁর ভাষ্যেই[203] –

> এটা আমার জন্য একধরনের অপ্রস্তুত হবার (embarrassing) মতোই ব্যাপার; কারণ এটা পরিভাষার একধরনের ভুল প্রয়োগ, যা কিছু মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারে’।

বিজ্ঞানীরা হিগস কণার সন্ধান পাবার পর মুক্তমনা ব্লগার অপার্থিব একটি লেখা লিখেছিলেন মুক্তমনায় ‘ঈশ্বর কণা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব’ শিরোনামে। লেখাটিতে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যা প্রণিধানযোগ্য –

---

201 লিওন ল্যাডারম্যানের মূল বইয়ে ভাস্যটি এ রকমের –

> Particle physicists are currently setting just such a trap. We're building a tunnel fifty-four miles in circumference that will contain the twin beam tubes of the Superconducting Super Collider, in which we hope to trap our villain.
>
> And what a villain! The biggest of all time!....

202 পিটার হিগসের উইকি পেইজে Political and religious views অংশে লেখা আছে, ‘Higgs is an atheist, and is displeased that the Higgs particle is nicknamed the "God particle" (Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs)

203 James Randerson, Father of the 'God Particle', The Guardian, Sunday 29 June 2008

হিগস কণাকে ঈশ্বর কণা বলা হয় কেন? ঈশ্বর কণা পদার্থবিজ্ঞানের সরকারি পরিভাষায় নেই। নোবেল পদার্থবিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান তাঁর ১৯৯৩ সালে লেখা বইয়ের শিরোনামে হিগস কণাকে ঈশ্বর কণা বলে উল্লেখ করায় সাধারণ্যের ভাষায় এই নামকরণ স্থান পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানে কম সচেতন বা অজ্ঞদের অনেকেই এই কারণে হিগস কণা আবিষ্কারকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে ভুল করছে। যেমনটা স্টিফেন হকিং-এর 'A brief history of Time'-এর উপসংহারে 'ঈশ্বরের মন জানার' কথা বলায় এটাকে অনেকে হকিং-এর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সাক্ষ্য হিসেবে দেখেছিল[204]। কিন্তু হকিং, লেডারম্যান এঁরা কেউ আস্তিক নন। হিগস কণার প্রবক্তা হিগস একজন নাস্তিক। হকিং এবং লেডারম্যান উভয়ই রূপক অর্থে বা আলঙ্কারিকভাবে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বর কণার আবিষ্কারের সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্পর্ক, একটা কমলার সাথে বুধবারের যে সম্পর্ক, সেরকম।

কাজেই ঈশ্বর কণার আবিষ্কারের সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্পর্ক খোঁজাটা কেবল মিডিয়ার ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। যেমন, সার্নের হিগস বোসনপ্রাপ্তির খবরের পর জি নিউজ খবর দিয়েছিল এই শিরোনামে—'ইনসান খুঁজে পেল ভগবান'। আবার কেউ কেউ এর মধ্যেই করতে শুরু করেছেন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আয়াতের সন্ধান (এমন কিছু মন্তব্যের স্ক্রিনশট সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল যা মুক্তমনায় প্রকাশিত লেখাটিতে পাওয়া যাবে) , যা তাদের যুক্তিহীন আবেগী ও হুজুগপ্রিয় মনমানসিকতাই তুলে ধরে।

---

[204] ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত স্টিফেন হকিং-এর বিপুল জনপ্রিয় বই – 'ব্রিফ ফিস্ট্রি অব টাইম'। বইটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ভরপুর, এমনকি শূন্য থেকে কিভাবে মহাবিশ্ব উদ্ভুত হতে পারে তারও সম্ভাব্য ধারণা আছে ওতে—কিন্তু বইয়ের শেষ লাইনটিতে এসেই প্যান্ডোরার বাক্সের মতোই রহস্যের ঝাঁপি মেলে দিয়েছিলেন হকিং; বলেছিলেন, যেদিন আমরা সর্বজনীন তত্ত্ব (Theory of every thing) জানতে পারব, সেদিনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে 'ঈশ্বরের মন' (mind of god)-কে পরিপূর্ণভাবে বোঝা। তার পর থেকে হকিং-এর বলা এই 'মাইন্ড অব গড' নিয়ে হাজারো ব্যাখ্যা আর প্রতিব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সেটার অবসান ঘটেছে হকিং-এর শেষ বই 'গ্যান্ড ডিজাইন'-এ, যেখানে তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, 'মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোনো প্রয়োজন নেই ঈশ্বরের'। বইটি নিয়ে আমার আলোচনা আছে এখানে: http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=10307

অনেকে মনে করেন, এই ‘ঈশ্বর কণা’ নামকরণের পেছনে নাকি গবেষণায় সরকারি ফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারটা কাজ করেছিল। সে সময় রক্ষণশীলদের দখলে থাকা কংগ্রেস ‘গড’-এর টোপ গিলে অর্থায়নে রাজি হবে, এমন ভাবনাও হয়তো কাজ করে থাকবে এর পেছনে। তবে এর পেছনে উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন,আমরা মনে করি, হিগস বোসন কণাকে ঈশ্বর কণা হিসেবে উপস্থাপন করার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। বৈজ্ঞানিকভাবেও ব্যাপারটা অর্থহীন। হিগস কণা যত গুরুত্বপূর্ণ কণাই হোক না কেন, শেষ বিচারে একটা কণাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, হিগসের চেয়েও প্রাথমিক কিছুর সন্ধান যদি কখনো বিজ্ঞানীরা পান—যেমন স্ট্রিং—তখন তাদের কী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে? ‘মাদার অব গড পার্টিকেল? নাকি খোদার বাপ?

আর তাছাড়া হিগস সম্বন্ধে জেনে ফেলা মানেই সব জ্ঞান অর্জিত হয়ে যাওয়া নয়। মহাকর্ষ, গুপ্ত পদার্থ, গুপ্ত শক্তি, স্ট্রিং তত্ত্বের অতিরিক্ত মাত্রাসহ অনেক অমীমাংসিত বিষয়ের সমাধান হিগস দিতে পারেনি, সেজন্যই সার্নের মেনুতে আরো অসংখ্য খাবারের অর্ডার আছে[205]। সেগুলোর সমাধান হবার আগে কাউকে ঈশ্বর বানানো অনেকটা বালখিল্যই।

তবে আশার ব্যাপার হলো, আমরা জেনেছি, সার্নের পুরো কনফারেন্সে বিজ্ঞানী ও সাংবাদিক সবাই এই নামটা সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি সাংবাদিক সম্মেলনেও সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই নাম উচ্চারণ না করতে। চলুন আমরাও সার্নের বিজ্ঞানীদের মতো সচেতনভাবে এটিকে ঈশ্বর কণা হিসেবে আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকি, আর ড. ডেভ গোল্ডবার্গের মতো অন্যদেরও আহবান জানাই[206] – ‘স্টপ কলিং ইট গড পার্টিকেল’।

---

[205] Large Hadron Collider: Scientists' wish list for the LHC, Guardian, Wednesday 10 September 2008
[206] Dr. Dave Goldberg, Stop calling it “The God Particle!” http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-particle

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি

'এই মহাবিশ্বের প্রয়াণ কেমন করে,
চিতাগ্নি নাকি বরফশীতল ঘরে?'
—রবার্ট ফ্রস্ট

'এই মহাবিশ্বটা পরমাণু দিয়ে তৈরি নয়, গল্প দিয়ে তৈরি'। উক্তিটি প্রয়াত কবি ও রাজনৈতিক কর্মী মুরিয়েল রুকেসারের। রুকেসার উক্তিটি কী ভেবে করেছিলেন, তা এখন আর মনে নেই, কিন্তু আজ এই অধ্যায়টা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো ভুল বলেননি। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বই খুললে দেখতাম, আমাদের চেনাজানা বস্তুজগৎ অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। কিন্তু আজকের দিনের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই মহাবিশ্বের একটা বড় অংশ, সত্য বলতে কি—মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাই—আমাদের চেনাজানা কোনো পদার্থের অণুপরমাণু নয়, বরং অজ্ঞাত পদার্থ আর অজ্ঞাত শক্তিতে পরিপূর্ণ। আর বিজ্ঞানীদের এই নতুন আবিষ্কারগুলো জন্ম দিয়েছে নানা আকর্ষণীয় সব গল্পকাহিনির। সেই কাহিনির একটা বড় অংশ মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতিকে ঘিরে। আজকে আমরা সেই কাহিনিগুলোই শুনব।

এক সময়কার ডাকসাইটে আইনবিদ থেকে পরবর্তীতে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদে পরিণত হওয়া এডউইন হাবলের ১৯২৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পর থেকেই

বিজ্ঞানীরা জানেন যে এই মহাবিশ্ব আসলে প্রতি মুহূর্তেই প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এই মহাবিশ্ব কি ক্রমাগত এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকবে? নাকি মহাকর্ষের টান একসময় গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যকার প্রসারণের গতিকে মন্থর করে দেবে, যার ফলে এই প্রসারণ থেমে গিয়ে একদিন শুরু হবে সংকোচন? এই প্রশ্নের ওপরই কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নির্ভর করছে। প্রসারণ চলতেই থাকবে নাকি একসময় তা থেমে যাবে, এই ব্যাপারটি যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির ওপর নির্ভর করছে তা হলো মহাবিশ্বের 'ক্রান্তি ঘনত্ব' (critical density); একে 'সন্ধি-ঘনত্ব'ও বলতে পারি। এই সন্ধি বা ক্রান্তি ঘনত্বের বিষয়টি একটু পরিষ্কার করা যাক।

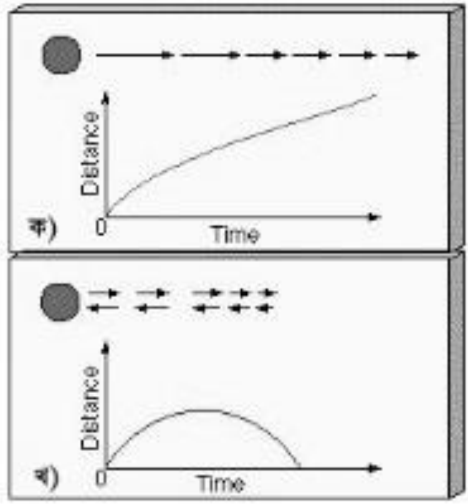

একটি প্রাসের দু রকমের গতিপথ। (ক) পৃথিবীর অভিকর্ষের মায়া কাটিয়ে বলটা উন্মুক্ত পথে ছুটছে। (খ) বলটা কিছুদূর উঠে আবার পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসছে

ধরা যাক, ভূপৃষ্ঠ থেকে একটি টেনিস বল মহাশূন্যে ছোড়া হলো। এর পরিণতি কী হতে পারে? এক্ষেত্রে সম্ভাবনা দুটি। যদি ইনক্রিডিবল হাল্ক কিংবা বাঁটুল দ্য গ্রেটের মতো কেউ বলটা ছোড়েন, আর বলের বেগ যদি কোনোভাবে পৃথিবীর

নিষ্ক্রমণ বা মুক্তি বেগকে (escape velocity) ছাড়িয়ে যেতে পারে, তবে বলটা আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। বলটার গতিপথ হবে অনেকটা প্রথম ছবির মতো উন্মুক্ত ও সীমাহীন (unbounded) হবে। আর আমার (অ.রা) মতো কমজোরি কেউ যদি বলটা ছোড়েন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে বলটার বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের চেয়ে অনেক কম হবে। সেক্ষেত্রে বলটা ওপরে উঠতে উঠতে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে মাধ্যাকর্ষণের টানে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এবারে কিন্তু প্রক্ষেপণ পথটি আগের বারের মতো উন্মুক্ত হবে না; বরং হবে বদ্ধ বা সংবৃত (bounded)।

মহাবিশ্বের অবস্থাও আমাদের উদাহরণের ওই বলের মতন। এর কাছেও এখন দুটি পথ খোলা। এক হচ্ছে পালোয়ান হাল্ক বা বাঁটুলের ছুড়ে দেওয়া বলের মতন সারা জীবন ধরে এমনিভাবে প্রসারিত হতে থাকা; এ ধরনের মহাবিশ্বের মডেলকে বলা হয় উন্মুক্ত বা সীমাহীন মহাবিশ্ব (Unbounded universe or Open Universe)। অথবা আরেকটি সম্ভাবনা হলো- মহাবিশ্বের প্রসারণ একসময় থেমে গিয়ে সংকোচনে রূপ নেওয়া, এ ধরনের মহাবিশ্বকে বলে সংবৃত বা বদ্ধ মহাবিশ্ব (Bounded universe or Closed Universe)।

এই ব্যাপারগুলো আজকের দিনে খুব সাধারণ মনে হয়। কিন্তু একটা সময় বিজ্ঞানীদের এগুলো গণনা করে বের করতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে মহাবিশ্বের পরিণতির ব্যাপারটা গণনা করা যায়? আমরা আগে ফ্রিডম্যানের যে মডেলের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম (পরে দেখা গিয়েছিল ডি সিটার এবং আইনস্টাইনের সমাধানগুলো আসলে ফ্রিডম্যানের মডেলেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমাধান), সেখান থেকেই মহাবিশ্বের পরিণতির চলকগুলো সম্বন্ধে পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি মহাবিশ্বের পরিণতির ওপর প্রভাব বিস্তার করা গুরুত্বপূর্ণ চলক আছে সর্বসাকল্যে তিনটি[207]-

---

[207] Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, 2006

ক. হাবলের ধ্রুবক (H): এ থেকে আমরা মহাবিশ্বের প্রসারণের হার সম্বন্ধে জানতে পারি।

খ. ওমেগা (Ω):এ থেকে আমরা মহাবিশ্বের পদার্থের গড় ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাই।

গ. ল্যামডা (Λ): এটা শূন্যতার মধ্যে থাকা বিকর্ষণ শক্তি কিংবা যা মহাবিশ্বকে ত্বরমাণ করে তুলছে।

বহু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ তাঁদের জীবনের পুরো সময়টাই কাটিয়ে দেন তিনটি চলকের নিখুঁত মান এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক বের করতে। এ ব্যাপারটা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলোর সঠিক মান জানা না থাকলে আমরা পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক অভিমত হাজির করতে পারব না। এ নিয়ে প্রাথমিক কাজের জন্য আমরা যার কাছে ঋণী তিনি ছিলেন এক বাঙালি বিজ্ঞানী। অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম। তিনি ১৯৭৭ সালের দিকে প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গবেষণা প্রবন্ধ 'Possible Ultimate Fate of the Universe'। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বিলেতের রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বিখ্যাত জার্নালে[208]। একই বিষয়ে তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বছর দুয়েক পর ভিস্তাস ইন অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে[209]। তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হবার পর সেগুলো অনেক বিদগ্ধজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত সাময়িকী *স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ* ম্যাগাজিন থেকে অনুরোধ করা হয় অধ্যাপক ইসলাম যেন তাঁর গবেষণা প্রবন্ধটির একটা 'জনপ্রিয় ভাষ্য' তৈরি করেন। তাদের অনুরোধে জামাল নজরুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ লেখেন 'মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি' (The Ultimate Fate of the Universe) নামে, যেটা ম্যাগাজিনটিতে প্রকাশিত হয়েছিল সত্তরের দশকের একদম শেষ দিকে[210]। তাঁর কাজ আরেক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল সে

208 J. N. Islam, Possible Ultimate Fate of the Universe, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, Vol. 18 (3), 1977.

209 J. N. Islam, The long-term future of the Universe, Vistas in Astronomy, Vol. 23 (265), 1979

210 J. N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe,, Sky & Telescope 57, 1979.

সময়। তিনি ফ্রিম্যান ডাইসন। ডাইসন একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপার প্রকাশ করেন 'সীমাহীন সময়: উন্মুক্ত মহাবিশ্বে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা' শিরোনামে[211]। পেপারটিতে একটা বড় অংশজুড়ে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের কাজের উল্লেখ ছিল। ফ্রিম্যান ডাইসন কেবল তাঁর পেপারে অধ্যাপক জামাল নজরুলের রেফারেন্স দিয়েই ক্ষান্ত হননি, পরবর্তীতে অধ্যাপক ইসলামকে এ বিষয়টি নিয়ে একটি জনপ্রিয় ধারার বই লিখতেও উৎসাহিত করেন। এরই ফলে ১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি' (The Ultimate Fate of the Universe)। অধ্যাপক ইসলামের বইটি যখন বেরোয় তখন মূলধারার জ্যোতিঃপদার্থবিদদের লেখা বই বাজারে দুর্লভ। স্টিফেন হকিং, পল ডেভিস, শন ক্যারল, ব্রায়ান গ্রিনরা তখনো জনপ্রিয় ধারার বই লেখায় হাত দেননি। মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে সবে ধন নীলমণি ছিল স্টিভেন ওয়েনবার্গের লেখা 'প্রথম তিন মিনিট'[212]। তবে সেটা মহাবিশ্বের শুরুর দিককার রহস্য নিয়ে। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের লেখা বই বাজারে ছিলই না বলা যায়। সেই অভাব প্রথমবারের মতো পূর্ণ করেছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর ওই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মাধ্যমে। বইটির তথ্য, বিষয়বস্তু, জনবোধ্যতা ও সাবলীলতার প্রেক্ষিতে বইটি সাথে সাথেই পাঠকসমাজে দারুণভাবে সমাদৃত হয়, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, পর্তুগিজ, সার্ব, ক্রোয়েটসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে যায় বইটি। বলা বাহুল্য, তাঁর এ বইটি কেবল সাধারণ মানুষদেরই আকৃষ্ট করেনি, ভাবনার খোরাক জুগিয়েছিল বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীদেরও। তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন স্টিফেন হকিং, জয়ন্ত নারলিকার, সায়মন মিটন, জি সি টেলর ও মার্টিন রিসের মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা। তাঁদের অবদানের

[211] Freeman J. Dyson, Time without End: Physics and Biology in an Open Universe. Reviews of Modern Physics, Vol. 51, No. 3, pages 447–460; July 1979.

[212] Steven Weinberg, The First Three Minutes: A Modern View Of The Origin Of The Universe, Basic Books, 1993

কথা অধ্যাপক ইসলাম তাঁর বইয়ের ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। আর বইটির পেছনে মূল অনুপ্রেরণাদাতা হিসেবে বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের উল্লেখ তো ছিলই।

বস্তুত অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম ও ফ্রিম্যান ডাইসনের প্রথম দিককার কাজগুলোই যে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করার খোরাক জুগিয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের ১৯৯৯ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। 'মহাবিশ্বে জীবনের পরিণতি' শীর্ষক এই রচনায় বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস ও গ্লেন স্টার্কম্যান বলেন[213],

> বিগত শতকের সময়গুলোতে বিজ্ঞানীদের দার্শনিক অভিব্যক্তি আশাবাদ আর নৈরাশ্যবাদের দোলাচলে দুলছিল। ডারউইনের আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বাণীর খুব বেশিদিন পরে নয় —ভিক্টোরিয়ান যুগের বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের 'তাপীয় মৃত্যু' (heat death) নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছিলেন—যখন তাঁরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে সমগ্র মহাবিশ্ব একটা সময় সাধারণ তাপমাত্রায় এসে পৌঁছুবে, যার পর কোনোকিছুরই আর পরিবর্তন করা যাবে না। কিন্তু বিশের দশকে মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হবার পর থেকে বিজ্ঞানীদের উদ্বিগ্নতা একটু কমে আসে, কারণ মহাবিশ্বের প্রসারণ সেই সাম্যাবস্থায় পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করে। সে সময় খুব কমসংখ্যক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই প্রসারণশীল মহাবিশ্বে প্রাণের অন্যান্য ধারা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যত দিন পর্যন্ত না পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসনের ১৯৭৯ সালে লেখা ক্লাসিক পেপারটা ['সীমাহীন সময়: উন্মুক্ত মহাবিশ্বে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা'] প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্রিম্যান ডাইসনের কাজ আবার প্রভাবিত

---

213 "...But few cosmologists thought through the other implications for life in an ever expanding universe, until a classic paper in 1979 by physicist Freeman Dyson of the Institute for Advanced Study in Princeton, N.J., itself motivated by earlier work by Jamal Islam, now at the University of Chittagong in Bangladesh" [Lawrence M. Krauss and Glenn D. Starkman, The Fate of Life in the Universe, Scientific American, November 1999].

হয়েছিল তাঁর পূর্ববর্তী জামাল ইসলামের কাজ দিয়ে যিনি এখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন।

লরেন্স ক্রাউস ও গ্লেন স্টার্কম্যান যখন নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার জন্য ওপরের প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তখন জামাল নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন বটে, তবে আজ আমরা জানি, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এ বছরের (২০১৩) ১৬ মার্চ। কিন্তু মারা গেলেও তিনি তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন বিশাল মণিমাণিক্য, যার ঠিকানা পাওয়া যায় সমসাময়িক অন্য বিজ্ঞানীদের কাজে। যেমন, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে প্রকাশিত হয় আরেক প্রতিভাধর বিজ্ঞানী পল ডেভিসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘শেষ তিন মিনিট’[214]। ওয়েনবার্গের পূর্ববর্তী ক্লাসিক ‘প্রথম তিন মিনিট’-এর শিরোনামের আদলে লেখা এ গ্রন্থে জামাল নজরুল ইসলামের কাজের উল্লেখ রয়েছে। পল ডেভিসের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থেও অধ্যাপক ইসলামের কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়[215]।

মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নির্ভর করছে মহাবিশ্বের প্রকৃতি কী রকমের তার ওপর। মহাবিশ্ব বদ্ধ হলে এর পরিণতি হবে এক রকমের, আর উন্মুক্ত হলে সেটা হবে আরেক রকমের। জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর গবেষণাপত্র ও বইয়ে বিস্তৃতভাবে নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন আমাদের এই মহাবিশ্ব ‘বদ্ধ’ নাকি ‘উন্মুক্ত’। তাঁর বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনামই ছিল – ‘মহাবিশ্ব কি উন্মুক্ত নাকি বদ্ধ?’ তিনি এই অধ্যায়ে উন্মুক্ত ও বদ্ধ মহাবিশ্বের মডেলের যে রেখচিত্র উপস্থাপন করেন তা এরকমের:

---

[214] Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New York, New York, Basic Books, 1994

[215] [illegible]- Paul Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster; First Edition edition, 1983

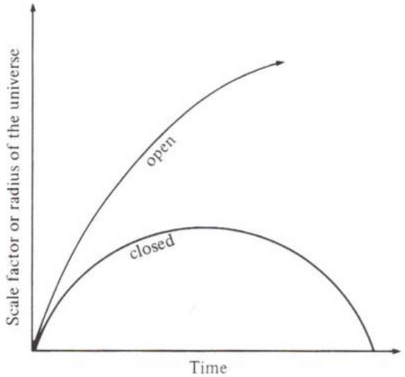

Fig. 5.1. Depending on the density of matter in the universe, gravity may eventually halt the present expansion of the universe and cause it to collapse, or the universe may expand forever. The former corresponds to the closed model, and the latter to the open model.

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের ‘মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি’
বইয়ে ব্যবহৃত বদ্ধ ও উন্মুক্ত মহাবিশ্বের রেখচিত্র

আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ দুই সম্ভাবনার মাঝামাঝি আরেকটি সম্ভাবনাকেও হাতে রেখেছেন। এর নাম দেওয়া যাক ‘বদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব’ (marginally bounded universe)। চলতি কথায় একে সামতলিক মহাবিশ্ব বা ‘ফ্ল্যাট ইউনিভার্স’ নামেও অভিহিত করা হয়। স্ফীতি তত্ত্ব থেকে পাওয়া আধুনিক অনুসিদ্ধান্তগুলো এই সমতল মহাবিশ্বকে সমর্থন করে বলে পদার্থবিদদের বড় একটা অংশই এখন এই মহাবিশ্বের ওপরই আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। এই সমতল ধরনের মহাবিশ্ব সব সময়ই প্রসারিত হতে থাকবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে– অনেকটা পাস-নম্বর পেয়ে কোনো রকমে পাস করে যেতে থাকা ছাত্রদের মতোন। আমাদের বলের উদাহরণে ঠিক নিষ্ক্রমণ বেগের সমান (এর বেশিও নয়, কমও নয়) বেগ দিয়ে বলটিকে উৎক্ষেপণ করলে যেরকম অবস্থা হতো, অনেকটা

সেরকম। মহাবিশ্বের পরিণতির এই তিন ধরনের সম্ভাবনাকে নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

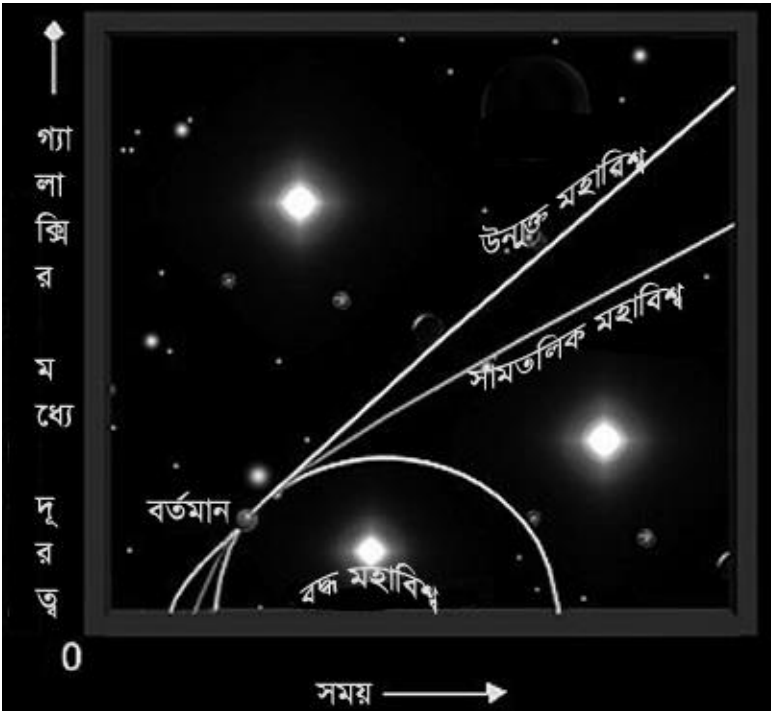

মহাবিশ্বের পরিণতির সম্ভাবনা: বদ্ধ মহাবিশ্ব, উন্মুক্ত মহাবিশ্ব ও সামতলিক মহাবিশ্ব

জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর বইয়ে সামতলিক মহাবিশ্বের জন্য কোনো আলাদা রেখা বরাদ্দ না করলেও তিনি জানতেন, সমতল মহাবিশ্বের প্রকৃতি কী রকম হতে পারে। আমরা এই বইয়ের আগের অধ্যায় থেকে জেনেছি যে, সামতলিক মহাবিশ্বের প্রকৃতি হয় ইউক্লেডিয়ান। সামতলিক জ্যামিতির মহাবিশ্বে দুটি সমান্তরাল রেখা সব সময় সমান্তরালভাবেই চলতে থাকে। আর সেখানে ত্রিভুজের তিন কোনের সমষ্টি হয় ঠিক ১৮০ ডিগ্রি। বদ্ধ মহাবিশ্বে আবার ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রিকে ছাড়িয়ে যায়, আর সমান্তরাল আলোর রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। আবার উন্মুক্ত কিংবা পরাবৃত্তাকার (hyperbolic) মহাবিশ্বে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় ১৮০

ডিগ্রির চেয়ে কম। সেখানে সমান্তরাল আলোর রেখাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। জামাল নজরুল ইসলাম একই ব্যাপার আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন, তবে ত্রিভুজের বদলে বৃত্ত দিয়ে। সমতল মহাবিশ্বে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হয় $A = \pi r^2$, এবং পরিধি $C = 2\pi r$। কিন্তু উন্মুক্ত পরাবৃত্তাকার মহাবিশ্বে বৃত্তের ক্ষেত্রফল πr^2-এর চেয়ে বড় হবে আর পরিধি মাপলে পাওয়া যাবে $2\pi r$-এর চেয়ে বেশি। আর বদ্ধ মহাবিশ্বে এই দুটো মান সব সময়ই কম পাওয়া যাবে। অধ্যাপক ইসলাম ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

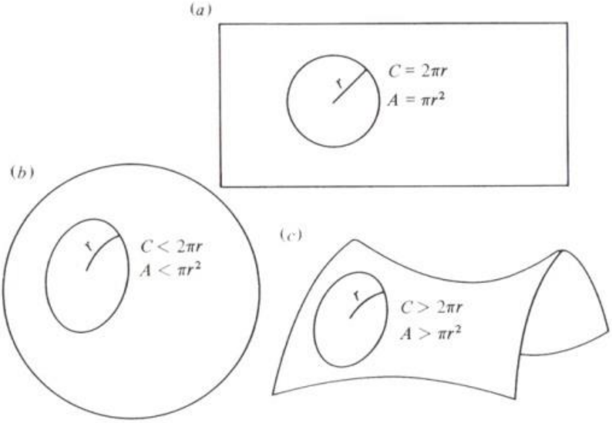

Fig. 5.2. The circumference C and area A of a 'circle' (a) in a plane, (b) on the surface of a sphere and (c) on the surface of a hyperboloid of one sheet.

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম তাঁর 'মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি' বইয়ে মহাবিশ্বের জ্যামিতি বুঝিয়েছেন বৃত্তের ক্ষেত্রফল ও পরিধির সাহায্যে

এখন কথা হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝা যাবে কিভাবে? এই অধ্যায়ের শুরুতে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের উল্লেখ করেছিলাম তার মধ্যে একটি হলো ওমেগা (Ω), যা থেকে আমরা মহাবিশ্বের পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাই। মহাবিশ্বের ঘনত্ব বলতে সমগ্র

মহাবিশ্ব যে জড়পদার্থ দিয়ে তৈরি তার ঘনত্বের কথাই বলছি। পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হবে মহাবিশ্বও তত ঘন হবে, আর সেই সাথে বাড়বে প্রসারণকে থামিয়ে দেওয়ার মতো মহাকর্ষের শক্তিশালী টান। জিনিসটি বুঝতে আবার আমাদের আগেকার বলের উদাহরণে ফেরত যেতে হবে। বলের ওজন যত বেশি হবে মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে নিষ্ক্রমণ বেগ অর্জন করতে তাকে তত বেশি কষ্ট করতে হবে। সেজন্যই টেনিস বলের বদলে শট পুটের বলকে একই উচ্চতায় তুলতে আমাদের গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়। ঠিক তেমনিভাবে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্ব উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট হলে প্রসারণকে থামিয়ে দিয়ে সংকোচনের দিকে ঠেলে দেওয়ার মত যথেষ্ট পদার্থ এতে থাকবে, ফলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ (closed)। আর কম ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্ব সংগত কারণেই হবে মুক্ত (Open), যা প্রসারিত হতে থাকবে অনন্ত কাল ধরে। তাহলে এর মাঝামাঝি এমন একটা ঘনত্ব নিশ্চয়ই আছে যার ওপরে গেলে মহাবিশ্ব একসময় আর প্রসারিত হবে না। সন্ধি বা ক্রান্তি ঘনত্ব (critical density) হচ্ছে সেই ঘনত্ব যার চেয়ে বেশি হলেই মহাবিশ্বের প্রসারণ থেমে গিয়ে তৈরি করবে সংকোচনের ক্ষেত্র। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর মান প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ৪.৫ x $১০^{-৩০}$ গ্রাম থেকে ১৮ x $১০^{-২৯}$ গ্রামের মধ্যে বিচরণ করছে[216]। মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব (actual density) আর ক্রান্তি ঘনত্বের (critical density) অনুপাতটিই হচ্ছে সেই ওমেগা (Ω), যাকে বিজ্ঞানীরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। এই ওমেগার মান ১-এর কম (Ω < ১) হলে মহাবিশ্ব হবে উন্মুক্ত। আর ওমেগার মান ১-এর বেশি (Ω > ১)হলে মহাবিশ্ব হবে বদ্ধ বা সংবৃত। আর ওমেগার মান পুরোপুরি ১ (Ω = ১) হলে সেটা হবে সামতলিক মহাবিশ্ব। এখানে প্রসারণের হার ধীরে ধীরে কমে যেতে যেতেও টায়ে টায়ে প্রসারিত হতে থাকবে শেষ পর্যন্ত, অনেকটা সেই কোনো রকমে পাস মার্ক পেয়ে পাস করে যাওয়া ছাত্রের মতোই। কাজেই ১ হলো ওমেগার সীমান্তিক মান।

---

[216] Alan H Guth, The Inflationary Universe. New York: Addison Wesley, 1997: pp 22.

জামাল নজরুল ইসলাম ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

‘মহাবিশ্বের অধ্যয়ন মোটা দাগে অনন্য এক অভিজ্ঞতা। অন্তত এক দিক থেকে এটা সামগ্রিকটাকে বোঝার একটা প্রয়াস। আমরা, চিন্তাশীল সত্তার অধিকারীরা নিউট্রন তারকা আর শ্বেত বামনদের নিয়ে গঠিত এই মহাবিশ্বের অংশ, এবং আমাদের গন্তব্য অনুদ্ধরণীয়ভাবে এই মহাবিশ্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে’।

- **অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম**

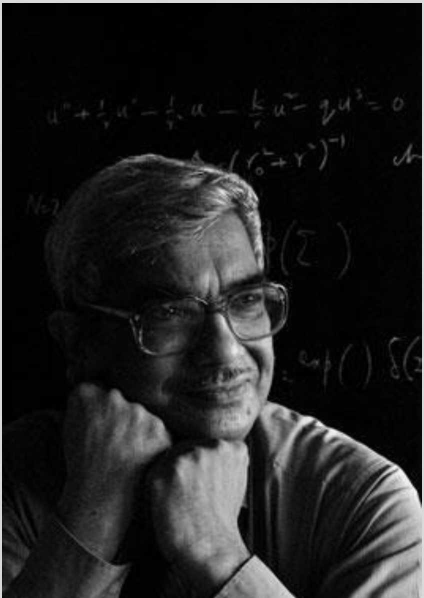

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের নাম আমি (অ.রা) শুনি ২০০৫ সালে, আমার (অ.রা) 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটি লেখার সময়। বইটির পঞ্চম অধ্যায়টির ওপর কাজ করছিলাম। অধ্যায়টির শিরোনাম ছিল 'রহস্যময় জড় পদার্থ, অদৃশ্য শক্তি ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ'। মহাবিশ্বের অন্তিম ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কাজকর্মগুলো পড়ার সময়ই আমার নজরে আসে বাংলাদেশের একজন পদার্থবিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম এর ওপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, এবং তাঁর একটি চমৎকার বই আছে ইংরেজিতে – 'The Ultimate Fate of the Universe'। বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৮৩ সালে। বেরিয়েছিল বিখ্যাত কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। বইটির পেপারব্যাক বেরোয় ২০০৯ সালে।

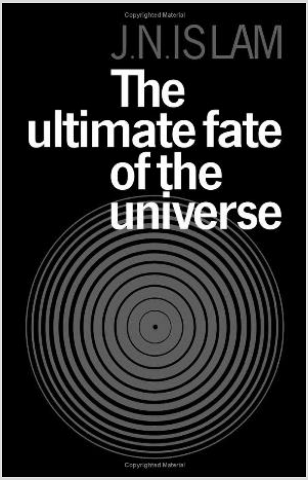

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের সুপরিচিত ইংরেজি গ্রন্থ 'দ্য আল্টিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স'

আমি ভাবতাম, মহাবিশ্বের কপালে ঠিক কী আছে এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা আর ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিং, ফেইনম্যান, অ্যালেন গুথ, মাইকেল টার্নার, লরেন্স ক্রাউসের মতো দুনিয়া কাঁপানো বিজ্ঞানীরাই। কিন্তু বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী—জামাল নজরুল ইসলাম যাঁর নাম—তিনিও যে এ নিয়ে কাজ করেছেন, এবং কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের মতো প্রকাশনা থেকে বই বের করছেন, সেটা জানা সে সময় শুধু আমাকে আনন্দ দেয়নি, রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিল। আরো অবাক হলাম যখন জানলাম বইটি নাকি ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, পর্তুগিজ, সার্ব, ক্রোয়েটসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আমার অবাক হবার পাল্লা বাড়তেই থাকল যখন জানলাম, এই নিভৃতচারী বিজ্ঞানীর কেবল একটি নয় বেশ কয়েকটি ভালো বই বাজারে আছে। 'রোটেটিং ফিল্ডস্ ইন রিলেটিভিটি', 'ইনট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যল কসমোলজি', ও 'ক্লাসিকাল জেনারেল রিলেটিভিটি' নামের কঠিন কঠিন সব বই। বইগুলো আমেরিকার বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। বাংলাতেও তাঁর একটা বই আছে 'কৃষ্ণবিবর' নামে। বাংলা একাডেমি থেকে একসময় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের বাংলা গ্রন্থ 'কৃষ্ণ বিবর'

আমি তত দিনে তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে জানতে শুরু করেছি। জানলাম, তিনি লন্ডনস্থ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিকস অ্যান্ড থিওরেটিক্যাল ফিজিকস বিভাগ থেকে পিএইচডি করেছিলেন ১৯৬৪ সালে। সাধারণত একাডেমিক লাইনে থাকলে পিএচডি করাই যথেষ্ট, এর বেশি কিছু করার দরকার পড়ে না। পড়ে না যদি না তিনি জামাল নজরুল ইসলামের মতো কেউ না হন। ১৯৮২ সালে অর্জন করেন ডিএসসি বা ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি, যে ডিগ্রি সারা পৃথিবীতেই খুব কমসংখ্যক বিজ্ঞানী অর্জন করতে পেরেছেন। অবশ্য কৃতবিদ্য এই অধ্যাপকের একাডেমিক অঙ্গনে সাফল্যের ব্যাপারটা ধরা পরেছিল অনেক আগেই। মর্নিং শোজ দ্য ডে। সেই যে, ১৯৫৭ সালে কলকাতা থেকে অনার্স শেষ করে কেম্ব্রজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে গণিতশাস্ত্রে ট্রাইপস করতে গিয়েছিলেন। তিন বছরের কোর্স, তিনি সেটা দুই বছরেই শেষ করে ফেলেন। ভারতের বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকার যাঁর নাম ফ্রেডরিক হয়েলের সাথে একই সাথে উচ্চারিত হয় ‘হয়েল নারলিকার তত্ত্ব’-এর কারণে, তিনি সেখানে নজরুল ইসলামের সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে তাঁর বন্ধুতালিকায় যুক্ত হয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ব্রায়ান জোসেফসন, স্টিফেন হকিং আব্দুস সালাম ও রিচার্ড ফেইনম্যান-এর মতো বিজ্ঞানীরা। ফেইনম্যান তাঁকে তাঁর নিজের বাড়িতে দাওয়াত করেও খাইয়েছিলেন, আর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন একটা মেক্সিকান নকশিকাঁথাও।

অবশ্য কার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল আর না ছিল সেটা তাঁকে পরিচিত করেছে ভাবলে ভুল হবে। তিনি পরিচিত ছিলেন নিজের যোগ্যতাবলেই। পিএইচডি শেষ করে তিনি দুবছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড-এ কাজ করেন। মাঝে কাজ করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্বখ্যাত ক্যালটেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবেও। ১৯৭৮ সালে লন্ডনের সিটি

ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে রিডার পদে উন্নীত হন। তখনকার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন নামকরা বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রবন্ধ জমা দেওয়া হতো কোনো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী মারফত। জামাল ইসলামের প্রবন্ধ জমা দিতেন ফ্রেড হয়েল, স্টিফেন হকিং, মার্টিন রিজের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা। যেমন, মহাজাগতিক ধ্রুবকের মানসংক্রান্ত জামাল নজরুলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র প্রকাশ করার জন্য সম্পাদকের কাছে জমা দিয়েছিলেন বর্তমান ব্রিটিশ রাজকীয় জ্যোতির্বিদ মার্টিন রিজ[217]। আর গবেষণাপত্রটি লেখায় অনুপ্রেরণা আর পরামর্শ জুগিয়েছিলেন এ যুগের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং।

সেভাবেই থাকতে পারতেন অধ্যাপক ইসলাম। কিন্তু তা না করে ১৯৮৪ সালে তিনি একটা বড় সিদ্ধান্ত নিলেন। জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তগুলোর একটি। বিলেত আমেরিকার লক্ষ টাকা বেতনের লোভনীয় চাকরি, গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ, আর নিশ্চিত নিপাট জীবন সব ছেড়েছুড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন হাজার টাকার প্রফেসর পদে এসে যোগ দিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে এমনকি এই তিন হাজার টাকা দিতেও গড়িমসি করেছিল। তারা বেতন সাব্যস্ত করেছিল আটশ টাকা। কিন্তু তার পরও পাশ্চাত্য চাকচিক্য আর ডলার-পাউন্ডের মোহকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক নজরুল বিলেতের বাড়িঘর, জায়গাজমি বেঁচে চলে এলেন বাংলাদেশে। দেশটাকে বড়ই ভালবাসতেন তিনি। তিনি নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘স্থায়ীভাবে বিদেশে থাকার চিন্তা আমার কখনোই ছিল না। দেশে ফিরে আসার চিন্তাটা প্রথম থেকেই আমার মধ্যে ছিল, এটার ভিন্নতা ঘটেনি কখনোই। আরেকটা দিক হলো, বিদেশে আপনি যতই ভালো থাকুন না কেন, নিজের দেশে নিজের মানুষের মধ্যে আপনার যে

[217] দীপেন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম – একটি কর্মময় জীবন,বিডিনিউজ২৪, মার্চ ৩১, ২০১৩

গ্রহণযোগ্যতা ও অবস্থান সেটা বিদেশে কখনোই সম্ভব না’। তাঁর দেশপ্রেমের নিদর্শন ১৯৭১ সালেও তিনি দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নির্বিচারে হত্যা-খুন-ধর্ষণে মত্ত হয়েছিল, তখন পাকবাহিনীর এই আক্রমণ বন্ধের উদ্যোগ নিতে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

দেশে ফিরে বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম কাজ করে গেছেন নিরলসভাবে। শুধু বিজ্ঞানেই তাঁর অবদান ছিল না, তিনি কাজ করেছেন দারিদ্র দূরীকরণে, শিল্পব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের দেশটা যেহেতু কৃষিনির্ভর, তাই, আমাদের শিল্পনীতি হওয়া চাই ‘কৃষিভিত্তিক, ‘শ্রমঘন’, ‘কুটিরশিল্প-প্রধান’ এবং ‘প্রধানত দেশজ কাঁচামালনির্ভর’। তিনি বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ-এর ক্ষতিকারক প্রেসক্রিপশন বাদ দিয়ে নিজেদের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা সুষ্ঠু শিল্পনীতির প্রতি সবসময় গুরুত্ব দিতেন। পাশ্চাত্য সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে –

> ‘তোমরা শুধু আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও, আমাদের ভালোমন্দ আমাদেরকেই ভাবতে দাও। আমি মনে করি, এটাই সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়।’

অনেকে আছেন যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার কথা শুনলেই নাক সিটকান। ভাবেন, উচ্চতর গবেষণা হতে পারে কেবল ইংরেজিতেই। জামাল নজরুল ইসলাম সে ধরনের মানসিকতা সমর্থন করতেন না। ওপরে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত যে ‘কৃষ্ণ বিবর’ বইটার উল্লেখ করা হয়েছে, তার বাইরেও তিনি বাংলায় আরো দুটো বই লিখেছেন। একটি হলো ‘মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ’ এবং ‘শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ’। দুটি বই-ই রাহাত-সিরাজ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত।

বইগুলো বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ওপর অনুরাগ তুলে ধরে। পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কলামে তিনি বলেছেন,

> “অনেকের ধারণা, ভালো ইংরেজি না জানলে বিজ্ঞানচর্চা করা যাবে না। এটি ভুল ধারণা। মাতৃভাষায়ও ভালো বিজ্ঞানচর্চা ও উচ্চতর গবেষণা হতে পারে... বাংলায় বিজ্ঞানের অনেক ভালো বই রয়েছে। আমি নিজেও বিজ্ঞানের অনেক প্রবন্ধ লিখেছি বাংলায়। এদেশে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন এমন অনেকেই বাংলায় বই লিখেছেন ও লিখছেন। তাঁদের বই পড়তে তেমন কারও অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং বাংলায় বিজ্ঞানচর্চাটা গুরুত্বপূর্ণ।”

আইনস্টাইন যেমন বেহালা বাজাতেন, সত্যেন বোস যেমন এস্রাজ, ঠিক তেমনি জামাল নজরুল ইসলাম পছন্দ করতেন পিয়ানো বাজানো। তিনি ছিলেন গজল ও রবীন্দ্রসংগীতের বড় ভক্ত, পিয়ানোতে রবীন্দ্রসংগীতের সুর তুলতে তিনি পছন্দ করতেন। বাড়িতে বন্ধুর ছোট মেয়েটিকে প্রতি শুক্রবার ‘গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ’ পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনাতেন।

আর ভালোবাসতেন স্ত্রী সুরাইয়া ইসলামকে! তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ডক্টরেট। একটা কনফারেন্সে তাঁদের দেখা, প্রেম ও পরিণয়। শোনা যায়, ৫৩ বছরের দাম্পত্য জীবনে জামাল নজরুল তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া কোথাও যেতেন না। কোনো অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে চলার সময় সব সময় স্ত্রীর হাত ধরে রাখতেন।

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ২০১৩ ১৬ মার্চ। এই নিভৃতচারী কর্মমুখর ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের এই ক্ষুদ্র এবং মূল্যহীন বইটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ নিবেদিত।

সম্ভাবনাগুলোর কথা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু মহাবিশ্বের আসল ঘনত্ব না জানলে তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে আমাদের মহাবিশ্বের কপালে ঠিক কী অপেক্ষা করছে! চিতাগ্নি নাকি বরফশীতল ঘর? তাহলে তো মহাবিশ্বের প্রকৃত ঘনত্ব জানতেই হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘনত্ব বের করার উপায় কী? একটা উপায় হলো মহাশূন্যের সকল দৃশ্যমান গ্যালাক্সির ভর যোগ করে তাকে পর্যবেক্ষিত স্থানের আয়তন দিয়ে ভাগ করা। মহাবিশ্বের একটা গড় ঘনত্ব এভাবে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো, এভাবে হিসাব করে ঘনত্বের যে মান পাওয়া গেছে তা খুব কম; সন্ধি ঘনত্বের শতকরা ১ ভাগ মাত্র। এর বাইরে গ্যাসট্যাস মিলিয়ে অন্যান্য চেনাজানা পদার্থ গোনায় নিয়ে হিসাব করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সেটা শতকরা ৪ ভাগের বেশি হয় না। অর্থাৎ আমাদের দৃশ্যমান যে জগৎ আমরা দেখি সেটা মহাবিশ্বের সামগ্রিক ভরের মাত্র ৪ ভাগ। তার মানে ঠিক কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে এই মান সঠিক হলে ওমেগার মান দাঁড়ায় ১-এর অনেক অনেক কম। তাহলে আমাদের সামনে চলে এল সেই উন্মুক্ত বা অনন্ত মহাবিশ্বের মডেল। তার মানে কি এই যে, মহাশূন্য কেবল প্রসারিত হতেই থাকবে?

না, তা নিশ্চিতভাবে এখনই বলা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, আমাদের দৃশ্যমান পদার্থের বাইরেও মহাশূন্যে এক ধরনের রহস্যময় জড় পদার্থ রয়েছে যাকে বলা হয় গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter)। এই অদৃশ্য জড়ের অস্তিত্ব শুধু গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষের প্রভাব থেকেই জানা গিয়েছে,কোনো প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে নয়। বিজ্ঞানের জগতে এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত হয়নি, হয়েছে পরবর্তীকালে পরোক্ষ প্রমাণ, অনুসিদ্ধান্ত কিংবা ফলাফল থেকে। তবে তাই বলে সেগুলো বিজ্ঞানবিরোধীও নয়। যেমন, মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং এর ধারণা। কেউ চোখের সামনে এটি ঘটতে দেখেনি। কিন্তু মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ বা কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড

রেডিয়েশনসহ অন্যান্য অসংখ্য পরোক্ষ প্রমাণ কিন্তু ঠিকই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আবার আমরা অন্ধকারময় গুপ্ত পদার্থের জগতে ফিরে যাই। কিভাবে জানা গিয়েছিল এই অদৃশ্য জড়ের অস্তিত্ব? এই বিষয়ে কথা বলতে হলে ভেরা রুবিনের প্রসঙ্গ টানতে হবে। যদিও সেই ত্রিশের দশকেই ক্যালটেকের প্রতিভাবান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিৎস জুইস্কির প্রাথমিক কিছু কাজ থেকে ডার্ক ম্যাটারের আলামত বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু রুবিনই সর্বপ্রথম আমাদের ছায়াপথ আর অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলোতে লুকিয়ে থাকা জড়ের বা ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত রুবিনের কাজই পরবর্তীতে টনি টাইসনের মত জ্যোতির্বিদদের গুপ্ত পদার্থ সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহী করে তোলে। ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

আমাদের গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে অনেক দূরবর্তী নক্ষত্ররাজির গতিবেগ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত নক্ষত্ররাজির বেগের তুলনায় কম হওয়ার কথা; ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে। সূর্য থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, গ্রহগুলোর গতিবেগও সেই হারে কমতে থাকে। কারণটা খুবই সোজা। নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জেনেছি যে, মাধ্যাকর্ষণ বলের মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বলের মান কমবে তার বর্গের অনুপাতে। টান কম হওয়ার জন্য দূরবর্তী গ্রহগুলো আস্তে চলে। আমাদের ছায়াপথের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটবার কথা। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী নক্ষত্রগুলো তাদের কক্ষপথে কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চেয়ে আস্তে ঘুরবার কথা। কিন্তু রুবিন যে ফলাফল পেলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। দূরবর্তী নক্ষত্রগুলির ক্ষেত্রে গতিবেগ কম পাওয়া তো গেলই না বরং একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পর সকল নক্ষত্রের বেগ প্রায় একই সমান পাওয়া গেল। অন্যান্য সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো (যেমন অ্যান্ড্রোমিডা) পর্যবেক্ষণ করেও রুবিন সেই একই ধরনের ফলাফল পেলেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের ভাবনায়

ফেলল। হয় রুবিন কোথাও ভুল করেছেন, অথবা এই গ্যালাক্সির প্রায় পুরোটাই এক অজ্ঞাত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জড় পদার্থে পূর্ণ। রুবিন যে ভুল করছেন না এই ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বোঝা গেল অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি পর্যবেক্ষণ করে। দেখা গেল, ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের এই গ্যালাক্সিটি ঘণ্টায় প্রায় ২ লক্ষ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এই অস্বাভাবিক গতিবেগকে মহাকর্ষজনিত আকর্ষণ দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু দৃশ্যমান জড়পদার্থ তো পরিমাণে অনেক কম; ফলে মহাকর্ষের টান তো এত ব্যাপক হবার কথা নয়! তাহলে? তাহলে কোথাও নিশ্চয়ই বিশাল আকারের অদৃশ্য জড়পদার্থ এই দুই গ্যালাক্সির মাঝে লুকিয়ে আছে। বিশাল আকার বললাম বটে, তবে সেটা যে কতটা বিশাল তা বোধ হয় অনুমান করা যাচ্ছে না। এই অদৃশ্য পদার্থের আকার আমাদের যে ছায়াপথ সেই 'মিল্কিওয়ে'এর মোটামুটি দশ গুণ! আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বহুভাবে ফ্রিৎস জুইস্কি কিংবা ভেরা রুবিনের কাজের সত্যতা নির্ণয় করেছেন। ছায়াপথের ঘূর্ণন কার্ভ, ক্লাস্টার নিয়ে গবেষণা, মহাজাগতিক কাঠামোর সিমুলেশন, মহাকর্ষীয় লেন্সিংসহ বহু ক্ষেত্রেই এই গুপ্ত পদার্থের হদিসের ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণ হিসেবে উঠে এসেছে।

অদৃশ্য গুপ্ত জড়পদার্থ আছে, তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু কেমনতর এই জড়পদার্থগুলো? এদের বৈশিষ্ট্যই বা কী রকম? সত্যি বলতে কি, আমরা এখনো তা বুঝে উঠতে পারিনি। গুপ্ত পদার্থে নিশ্চিতভাবে কোনো ঝলমলে নক্ষত্র নেই - থাকলে তো আর তারা অদৃশ্য থাকত না। এতে ধূলিকণাও থাকতে পারে না, কেন না এই ধূলিকণাগুলো দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে আগত আলো'কে আটকে দেবার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের চোখে ধরা পড়বার জন্য যথেষ্টই বড়। তাহলে কি আছে এতে? আসলে বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, গুপ্ত জড় বস্তুসমূহ আমাদের চেনাজানা কোনো পদার্থ দিয়েই তৈরি হওয়ার কথা নয়। সে জন্যই তারা রহস্যময় ও গুপ্ত। অনেকে বলছেন, এরা তৈরি হয়েছে নিউট্রিনো কণিকাপুঞ্জ দিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি মেক্সিকান পদার্থবিজ্ঞানী কার্লোস ফ্র্যাঙ্ক কম্পিউটারে সিমুলেশন করে

দেখিয়েছেন যে শুধু নিউট্রিনোকে ধরে হিসাব করলে আসলে এই অন্ধকার জড়ের সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না[218]। কাজেই এই সব নিউট্রিনোর বাইরেও বিশাল ভরের অজানা কণিকার অস্তিত্ব আছে যেগুলো মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠনে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ডার্ক ম্যাটারকে ব্যাখ্যার জন্য বেশ কিছু নতুন ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে অগ্রগামী প্রার্থী হচ্ছে WIMPs – এরা দুর্বল মিথস্ক্রিয়াসম্পন্ন (কল্পিত) ভারী কণা[219]। এদের নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনেক তত্ত্ব আছে। ধারণা করা হয়, এদের উদ্ভব ঘটেছিল বিশেষ ধরনের প্রতিসাম্যের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে, এবং এদের ভর প্রায় ১০০ জিইভির কাছাকাছি। এর বাইরেও বিজ্ঞানীদের তালিকায় আছে নিউট্রালিনো, হিগসিনো, স্টেরাইল নিউট্রিনো ও এক্সিয়ন[220]। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যত দূর সম্ভব এদের সম্বন্ধে জেনে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে, কারণ মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থার সাথে ডার্ক ম্যাটারের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আরেকটি কারণেও ডার্ক ম্যাটার গুরুত্বপূর্ণ। সেই ওমেগার ব্যাপারটি। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানীদের ধারণা গুপ্ত পদার্থ মহাবিশ্বের মোট ভরের ২৩ ভাগের বেশি নয়; কিন্তু মহাবিশ্বের উদ্ভবের সময়গুলোতে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ পদার্থই ছিল এ ধরনের অদৃশ্য জড়। সেরকম কিছু অদৃশ্য পদার্থ যদি এখনো থেকে থাকে, তবে মহাশূন্যের বিশাল এলাকা যাদের আমরা শূন্য বলে ভাবছি, সেগুলো সেই অর্থে 'শূন্য' নয়; মহাবিশ্ব আসলে হতে পারে এই অদৃশ্য গুপ্ত জড়পদার্থের এক অথই মহাসমুদ্র, আর দৃশ্যমান জড়পিণ্ডগুলো হচ্ছে তার মাঝে নগণ্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আলোকিত 'দ্বীপপুঞ্জ'। এই ব্যাপারটা সত্য হলে

---

[218] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৬)

[219] Guido D'Amico, Marc Kamionkowski and Kris Sigurdson, "Dark Matter Astrophysics", in *Dark Matter and Dark Energy: A Challenge for Modern Cosmology*, ed. Sabino Matarrese, Monica Colpi, Vittorio Gorini and Ugo Moschella, Springer, 2011

[220] Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013

কিন্তু ওমেগার মান ১-এর চেয়ে বড় হয়ে যেতে পারে[221]। সে ক্ষেত্রে এক সময় মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হয়ে যেতে পারে সংকোচনের পালাবদল।

মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে থাকলে কী হবে? যখন সংকোচনের পালা আসবে, আশপাশের গ্যালাক্সির দিকে তাকালে তখন আর লোহিত ভ্রংশ (Red Shift) দেখা যাবে না, তার বদলে দেখা যাবে নীলাভ ভ্রংশ (Blue Shift)। নিজেদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে থাকায় পদার্থের ঘনত্ব, আর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তারপর যে সময় ধরে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছিল, সেই একই কিংবা কাছাকাছি সময় ধরে মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে আবারো সেই প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাবে, যেখান থেকে একসময় বিগ ব্যাং-এর সূচনা হয়েছিল! মহাবিশ্বের এই অন্তিম পতনের নাম দেওয়া হয়েছে মহাশাব্দিক সংকোচন (Big Crunch)। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহা বিস্ফোরণ আর মহা সংকোচনের মাঝে আজীবন দুলতে থাকাও মহাবিশ্বের পক্ষে অসম্ভব নয়। বরং এই মহাবিশ্ব হতে পারে দোদুল্যমান (Oscillating)। যেমন, এ কালের খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং একটা সময় এমন একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এই দোদুল্যমান মহাবিশ্বকে (Oscillating universe) যে অদ্বৈত বিন্দু থেকেই শুরু করতে বা এতে গিয়ে শেষ হতে হবে, এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। সঙ্কুচিত হতে হতে অন্তিম পতনের আগ মুহূর্তে কোনো একভাবে যথেষ্ট পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়ে মহাকর্ষের টানকে অতিক্রম করবার মতো যথেষ্ট শক্তি অর্জিত হবে, যা ধাক্কা দিয়ে মহাবিশ্বকে আরেকটি প্রসারণের চক্রে ঠেলে দিতে পারে। এর তাৎপর্য হলো মহাবিশ্বের চরম পতনজাতীয় অদ্বৈত বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটবে না, বরং প্রবলভাবে ‘প্রত্যাবৃত্ত’ হবে অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ‘বাউন্স’ করবে (চিত্র

---

[221] যদিও আমাদের আজকের জানা জ্ঞান থেকে ব্যাপারটা (অর্থাৎ $\Omega > ১$) অসম্ভবই মনে হচ্ছে। মহাবিশ্বের শুরুতে সামগ্রিক পদার্থের ঘনত্ব বেশি ছিল বটে, কিন্তু প্রসারণের ফলে এটার $\text{ঘনত্ব} = \frac{\text{আদি ঘনত্ব}}{(\text{স্কেল ফ্যাক্টর})^3}$ হারে ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে। যেহেতু ডার্ক এনার্জি যার ঘনত্ব একই থাকছে, কখনোই ওমেগার মান ১-এর বেশি করতে পারবে না। এমনকি, নতুন গুপ্ত পদার্থ আবিষ্কার হলেও এতে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হবে না। তবে, ভবিষ্যতে যদি দেখা যায়, মহাবিশ্বে অদৃশ্য শক্তি নেই এবং গুপ্ত জড় পদার্থই কেবল রাজত্ব করছে, তাহলে অতিদূর ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ হয়ে সংকোচনে যাবার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে।

দ্রষ্টব্য)। সৃষ্টি ও ধ্বংসের এই দুটি অদ্বৈত বিন্দুর মধ্যে মহাবিশ্বের এ ধরনের সৃষ্টি-লয়ের 'স্পন্দনময় গমনাগমন' হয়তো চলতে থাকবে অন্তহীনভাবে।

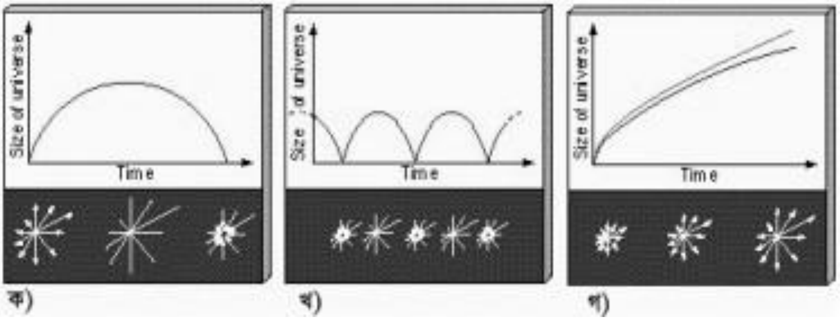

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য পরিণতি:(ক) উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্বের রয়েছে একটি প্রারম্ভ, একটি সমাপ্তি, এবং তাই একটি সীমিত আয়ুষ্কাল। এই চিত্রের গ্রাফের নিচের বাক্সে এর বিস্ফোরণ থেকে সর্বোচ্চ আয়তনে পৌঁছানো এবং পুনরায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবার বিবর্তন দেখানো হচ্ছে। (খ) একটি স্পন্দনশীল মহাবিশ্বের আরম্ভ নেই, আর সমাপ্তিও নেই। প্রতিটি সম্প্রসারণ-সংকোচন দশা একটি 'প্রবল প্রত্যাবৃত্ত' বা বাউন্সে এসে উপনীত হয়, যা তৈরি করে পরবর্তী 'বিগ ব্যাং'-এর ক্ষেত্র। (গ) স্বল্প ঘনত্ববিশিষ্ট মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং এর পর থেকে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হতে থাকবে।

এই 'বাউন্সিং ইউনিভার্স' মডেল ত্রিশের দশকের দিকে পদার্থবিদদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করলেও ক্রমশ মূলধারা থেকে পরিত্যক্ত হয়। এর একটা বড় কারণ তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রের আপাত লঙ্ঘন[222]। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে, এন্ট্রপি, যেটাকে আমরা মোটা দাগে বিশৃঙ্খলার পরিমাপ হিসেবে জানি, সময়ের সাথে সাথে বাড়ে। কাজেই দোদুল্যমান মহাবিশ্বেও মহাজাগতিক বিবর্তনের প্রতিটি চক্রে এন্ট্রপি বাড়বে বলে ধরে নেওয়া হয়। এখন আমাদের মহাবিশ্ব যদি বিস্ফোরণ ও সংকোচনের অসীম চক্রের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছায়,

[222] Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007

তবে ইতোমধ্যেই তার সর্বোচ্চ এন্ট্রপিতে পৌঁছিয়ে গিয়ে তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাবার কথা ছিল। এ ধরনের মহাবিশ্বের অনিবার্য নিয়তি 'তাপগতীয় মৃত্যু'। কিন্তু বলাই বাহুল্য, মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে আমরা তার সাথে মিল পাই না। কাজেই এই মডেল কাজ করে না বলেই অধিকাংশ বিজ্ঞানী ধরে নিয়েছেন।

এই দোদুল্যমান মহাবিশ্ব নিয়ে আজকে আর কথা বলার প্রয়োজন পড়ত না যদি না, সেই 'একদা পরিত্যক্ত' এই তত্ত্ব আবার নতুনভাবে স্ট্রিং তত্ত্বের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে ফিরে না আসত। ২০০২ সালের দিকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পল স্টেইনহার্ট এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিল টুরক সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে প্রস্তাব করেন যে, মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের কথিত দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের (collision of branes)ফলে[223]। 'স্ফীতি তত্ত্বের বিকল্প' হিসেবে দাবি করা তাঁদের এ তত্ত্বে 'বিগ ব্যাং' দিয়ে স্থানকালের শুরু নয়, বিগ ব্যাং-কে তাঁরা দেখেছেন চোদ্দ শ কোটি বছর আগেকার ব্রেনীয় সাংঘর্ষিক একটি ঘটনা হিসাবে। আর কেবল একবারই এই মহাবিস্ফোরণ ঘটবে বা ঘটেছে তা-ও নয়, বরং এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক বিবর্তনের চক্রে চির চলমান। মহাবিশ্বের যাত্রাপথের প্রতিটি চক্রে বিগ ব্যাং উদ্ভব ঘটায় উত্তপ্ত পদার্থ ও শক্তির। কালের পরিক্রমায় ক্রমশ শীতল হয়ে এর থেকে তৈরি হয় গ্যালাক্সি আর তারকারাজি। আজ থেকে ট্রিলিয়ন বছর পরে আবারো হয়তো এ ধরনের বিগ ব্যাং ঘটবে এবং তৈরি করবে নতুন চক্রের। কিভাবে এই নতুন বিগ ব্যাং ঘটবে তা এই মডেলের সাহায্যে একটু ব্যাখ্যা করা যাক। স্টেইনহার্টরা মনে করছেন, সেই দুটো ব্রেন প্রথম বিগ ব্যাংটির পরে দূরে সরে যেতে থাকলেও, তাদের মধ্যের স্থিতিশক্তি এমনভাবে কাজ করবে যে সেই ব্রেন দুটি আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসে ধাক্কা খাবে এবং আর একটি বিগ ব্যাং-এর সৃষ্টি করবে। এই রকম সংঘর্ষ ও দূরে সরে যাওয়া অনন্তকাল ধরে চলবে। এই মডেলে এই সংঘর্ষের শক্তি নতুন মহাবিশ্বের যাবতীয় উপাদান সৃষ্টি করবে। এই মডেল প্রমিত বিগ ব্যাং মডেলের

---

[223] Paul J. Steinhardt and Neil Turok, *A Cyclic Model of the Universe*, Science, Vol. 296, No. 5572, May 24, 2002.

সিংগুলারিটি সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এই মডেলে তাপমাত্রা কম হওয়াতে কোনো চৌম্বকীয় মনোপোলও সৃষ্টি হবে না। পল স্টেইনহার্ট ও নিল টুরক তাঁদের প্রস্তাবিত মডেলকে সাধারণ পাঠকদের কাছে নিয়ে এসেছেন সম্প্রতি 'অফুরন্ত মহাবিশ্ব' (Endless Universe) শীর্ষক একটি বইয়ের মাধ্যমে[224]।

পল স্টেইনহার্ট ও নিল টুরক তাঁদের প্রস্তাবিত এই চক্রাকার মহাবিশ্ব বা 'সাইক্লিক মডেলে' দাবি করেছেন মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের ফেল,এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে চক্রাকার পথে অনন্তকাল ধরে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, মহাবিশ্বের 'তাপীয় মৃত্যুর' ব্যাপারটা স্টেইনহার্ট ও টুরকের চক্রাকার মডেলে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। কারণ এই মডেলে প্রতিটি চক্রে প্রসারণের পরিমাণ সংকোচনের পরিমাণের চেয়ে বড় হয়, ফলে প্রতিটি চক্র শেষে মহাবিশ্ব আয়তনে বিবর্ধিত হয়। যত সময় যাবে মহাবিশ্বও তত প্রসারিত হবে, এবং সেই সাথে বাড়বে এন্ট্রপি। কিন্তু সর্বোচ্চ এন্ট্রপিতে কখনোই পৌঁছাবে না, কারণ এই মডেলে সর্বোচ্চ এন্ট্রপি বলে কিছু নেই[225]। তবে বলা বাহুল্য, প্রান্তিক এ ধারণাগুলো বাহ্যত তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যদিও তাদের অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম[226]।

---

[224] Paul J. Steinhardt and Neil Turok, *Endless Universe: Beyond the Big Bang*, Doubleday, 2007

[225] Alex Vilenkin, *Many Worlds in One: The Search for Other Universes*, Hill and Wang, 2007

[226] একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। স্টেইনহার্ট ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করেন মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বিকিরণ বিশ্লেষণ করে চক্রাকার মডেল না স্ফীতি তত্ত্বের মডেল সঠিক সেটা একসময় বের করা যাবে। ইদানীংকালের বেশ কিছু পরীক্ষার ফলাফল

চক্রাকার মহাবিশ্ব তো পরের কথা, মহাসংকোচন ব্যাপারটা এখনো স্রেফ ধারণা হিসেবেই কেবল বিজ্ঞানীরা বিবেচনা করছেন। মহাবিস্ফোরণের পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে অনেক আগেই, কিন্তু মহা সংকোচনের ব্যাপারটা অনেকটাই অনিশ্চিত; মহা সংকোচন এখনো একটি অনুকল্প বা হাইপোথিসিস মাত্র, আর সেই হাইপোথিসিসকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য (অর্থাৎ Ω > ১ হতে হলে) যে পরিমাণ জড় পদার্থ মহাবিশ্বে থাকা প্রয়োজন তার মাত্র একশ ভাগের তিন থেকে চার ভাগ পদার্থের এ পর্যন্ত 'দেখা' মিলেছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ তাই মনে করেন এই 'বাউন্স' কিংবা মহা সংকোচনের ব্যাপারটা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। তাঁরা মনে করেন, মহাবিশ্ব হয়তো প্রসারিত হতে থাকবে অবিরামভাবে এবং এর সমাপ্তি ঘটবে 'বিগ ফ্রিজ' কিংবা 'তাপীয় মৃত্যুর' মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানীদের এহেন চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে পরের অনুচ্ছেদগুলোতে।

এর মধ্যে আরেকটি ব্যাপার হল। এ ব্যাপারটা অবশ্য আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছিলাম (অষ্টম ও নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, মহাবিশ্বের ওপর মহাকর্ষ বল যদি ক্রিয়াশীল থাকে, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়া উচিত। মহাবিশ্বের মোট শক্তি তার মহাকর্ষের বদৌলতে ক্রমশ প্রসারণকে স্তিমিত করে আনবে এটাই স্বাভাবিক।

স্ফীতি মডেলের পক্ষে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষতঃ সম্প্রতি BICEP2 পরীক্ষায় মহাকর্ষ তরঙ্গের খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারটা মিডিয়ায় আসার পর পল স্টেইনহার্ট নিজেই স্বীকার করেছেন এটি স্ফীতিতত্ত্বকে সঠিক এবং 'চক্রাকার' মডেলকে একেবারে ভুল প্রমাণের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তবে, এখানে মনে রাখতে হবে যে স্ফীতি তত্ত্ব নির্মাণে স্টেইনহার্ট নিজেও একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মডেল যদি ভুল প্রমাণিতও হয়, তাঁর এই নতুন প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানীরা সত্যের সন্ধানে নিজের কাজকেও দূরে ঠেলে এগিয়ে যেতে পারেন। বিজ্ঞান কখনোই কোনো কিছুকে 'বিশ্বাস' করে বসে থাকে না, বরং পুনঃপুন পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত 'জ্ঞান'-এর আলোয় নিজেকে আলোকিত করে এগিয়ে যেতে চায়। বিজ্ঞান স্থবির নয়,প্রগতিশীল। বিজ্ঞানে হিরো আছে,কিন্তু পয়গম্বর নেই কোনো। আজ অ্যালেন গুথের স্ফীতি তত্ত্ব হোক,আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তত্ত্ব হোক,কিংবা হোক না হকিং-এর ব্ল্যাক হোল নিয়ে কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, এগুলোর ভুল পাওয়া গেলে সেই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হতে সময় লাগবে না। প্রাচীনকালের কোনো পয়গম্বরের কিংবা দেবদূতের বাণীর মতো আঁকড়ে ধরে ফুল-চন্দনযোগে পূজা হয় না বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানে 'পবিত্র তত্ত্ব' বলে কিছু নেই। এখনে 'একশ জন বিশেষজ্ঞের' অভিমতের মূল্য নগণ্য। বরং নিগূঢ় ও নির্ভুল পরীক্ষণ, এবং সেই পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, যা আবার অন্যদের দ্বারা পুনপরীক্ষিত ও সমর্থিত হবে, সেটাই 'বিজ্ঞানের রায়' বলে বিবেচিত।

একটা পাথরকে ওপরের দিকে ছুড়ে দিলে যত ওপরে ওঠে ততই এর বেগ কমতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের টানে। সেরকমই ব্যাপার অনেকটা। এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু গোল বাঁধাল ১৯৯৮ সালের একটি ঘটনা। সুপারনোভা বিস্ফোরণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের ভিন্ন ভিন্ন দুটি গ্রুপ যে ফলাফল পেল তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিজ্ঞানীদের ধারণা উল্টে দিয়ে দেখা গেল মহাবিশ্বের প্রসারণ আসলে হ্রাস পাচ্ছে না, বরং দ্রুত হারে বাড়ছে। ১৯৯৮ সালের এই পর্যবেক্ষণটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাপারটা সে সময় বিজ্ঞানী সমাজে এত আলোড়ন তুলেছিল যে এ বিষয়টি ‘ত্বরমাণ মহাবিশ্ব’ (Accelerating Universe) শিরোনামে বেশ কিছুদিন ধরে পত্রপত্রিকায় প্রথম পাতার খবর হয়েছিল। বিখ্যাত সায়েন্স ম্যাগাজিন হতবাক আইনস্টাইনের কল্পিত ছবিসংবলিত ‘কভার পেজ’ তৈরি করেছিল সে সময়।

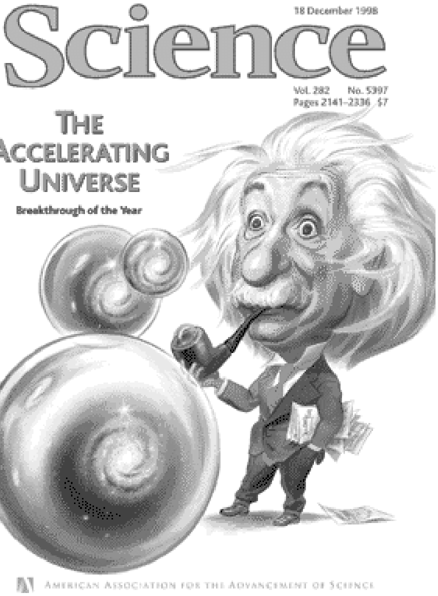

১৯৯৮ সালে ‘ত্বরমাণ মহাবিশ্ব’ আবিষ্কৃত হবার পর সায়েন্স পত্রিকার প্রচ্ছদ।

মহাবিশ্বের এই ত্বরণের পেছনে রয়েছে মহাকর্ষ-বিরোধী একধরনের ‘অদৃশ্য বা গুপ্ত শক্তি’ (Dark Energy), অন্তত বিজ্ঞানীদের তা-ই ধারণা। এই গুপ্ত শক্তির ধরনধারন গুপ্ত জড়ের চেয়েও বেশি রহস্যজনক। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য এখনো বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা, যা ইতোমধ্যে বোঝা গেছে তা হলো, গুপ্ত শক্তি আমাদের মহাবিশ্বের এক প্রধানতম উপাদান।

আমরা আগের অধ্যায় থেকে জেনেছি, আসলে বিশ শতকের শুরুতেই আপেক্ষিক তত্ত্বের মাধ্যমে আলবার্ট আইনস্টাইন প্রতি-মহাকর্ষ বলের (antigravitational force) একটা ধারণা দিয়েছিলেন। মহাকর্ষের প্রভাবে বস্তুসমূহের অবশ্যম্ভাবী পতন এড়াতে আর সেই সাথে মহাবিশ্বকে একটা স্থিতিশীল রূপ দিতেই আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণগুলোতে মহাবৈশ্বিক ধ্রুবক (Cosmological constant) নামে একটা কাল্পনিক ধ্রুবক যোগ করেছিলেন। কিন্তু হাবলের আবিষ্কারে যখন প্রমাণিত হলো যে এই মহাবিশ্ব স্থিতিশীল নয়, বরং প্রসারণশীল, তখন আইনস্টাইন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, মহাবৈশ্বিক ধ্রুবকসংক্রান্ত ধারণাটি ছিল তাঁর জীবনের ‘সবচেয়ে বড় ভুল’।

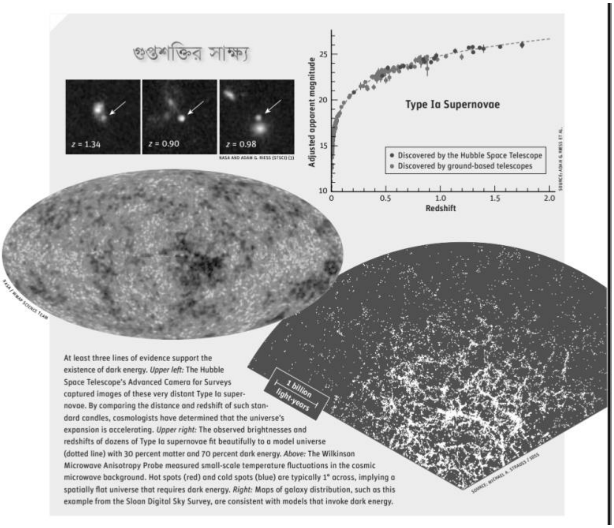

গুপ্ত শক্তির বিবিধ সাক্ষ্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, গুপ্ত শক্তি মহাবিশ্বের পরিণতি নির্ধারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

এখন দেখা যাচ্ছে, আইনস্টাইনের সেই ‘মহা ভুলের’ও ভুল ধরিয়ে দিয়ে এই একুশ শতকে প্রতি-মহাকর্ষ বা অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি আবার নতুন উদ্যমে ফিরে এসেছে এই গুপ্ত শক্তির মাধ্যমে। কিন্তু এই গুপ্ত শক্তি জিনিসটা লুকিয়ে আছে কোথায়? অবিশ্বাস্য মনে হবে শুনতে, কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এই গুপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে আমাদের চেনাজানা শূন্যস্থানে। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি যে, আসলে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় শূন্যতাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যেখানে কোনো পদার্থ নেই, সেখানেও কিছু পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। যে শূন্য দেশকে আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত ভাবা হচ্ছে, তার মধ্যেও সূক্ষ্মস্তরে ঘটে চলেছে নানা প্রক্রিয়া। শূন্যতার মাঝে জড়কণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হচ্ছে, আবার তারা নিজেদের ধ্বংস করে শক্তিতে বিলীন হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা শূন্যস্থানে লুকানো শক্তির নাম দিয়েছেন ‘ভ্যাকুয়াম এনার্জি’। কিন্তু মুশকিল হলো, এই ভ্যাকুয়াম শক্তির পর্যবেক্ষণ আর গণনায় বিস্তর ফারাক পাচ্ছেন তাঁরা। মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করে যে শক্তির হদিস তাঁরা পাচ্ছেন, গণিতের গণনার ফলাফল তার থেকে ১০^{১২০} গুণ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। যদি পর্যবেক্ষণের ফলাফল সত্যি হয়ে থাকে তবে পৃথিবীর সমান আয়তনের মধ্যে লুকানো গুপ্ত শক্তির পরিমাণ সর্বসাকল্যে আমেরিকার বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচের সমান। আর যদি গণিত সঠিক হয়ে থাকে, তবে এক কিউবিক সেন্টিমিটার ভ্যাকুয়াম এনার্জি দিয়ে সারা আমেরিকা ১০^{৮৫} বছর চলবে[227]। বোঝাই যাচ্ছে, ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়’।

[227] Sean Carroll (California Institute of Technology), What is Dark Energy?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

'মহাজাগতিক ধ্রুবক সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত এই বিদঘুটে সমস্যাটির কথা আমরা অবশ্য আগের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পদার্থবিদদের জন্য এটা বড় ধরনের সমস্যা অনেক দিন ধরেই। তবে সম্প্রতি হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপাল, সুপার সিমেট্রি এবং স্ট্রিং তত্ত্বের অতিরিক্ত মাত্রার নিরিখে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যেমন, হলোগ্রাফিক প্রিন্সিপালের কথা আমরা আগে অষ্টম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। দেখেছি যে, এই নীতি গোনায় ধরে গণনা ধরলে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান পর্যবেক্ষণের অনেক কাছাকাছি চলে আসে। তার পরও এটা সম্ভাব্য সমাধান কি না বিজ্ঞানীরা একেবারেই নিশ্চিত নন। এর বাইরে 'সুপার সিমেট্রি' বা পরম প্রতিসাম্যের ধারণা ব্যবহার করে এবং স্থান-কালের অতিরিক্ত মাত্রার ধারণা ব্যবহার করেও সমাধান খুঁজছেন তাঁরা। তাদের গণনা থেকে যে বিশাল মানের শক্তির হিসাব পাওয়া যাচ্ছে, তার কিছু অতিরিক্ত মাত্রার ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে কি না কিংবা মাত্রাগুলো বেশির ভাগ শক্তি শুষে নিচ্ছে কি না সেটাও পরখ করে দেখছেন তাঁরা। তবে এ সমাধানগুলোর বেশিরভাগই তাত্ত্বিক এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মডেলও অনুপস্থিত।

এর ফলে কিছু বিজ্ঞানী একটু ভিন্নভাবে সমস্যাটি দেখার চেষ্টা করছেন বর্তমানে। তাঁরা ভাবছেন, এই গুপ্ত শক্তির ব্যাপারটা হয়তো একেবারেই ভ্যাকুয়াম এনার্জি বা মহাজাগতিক ধ্রুবকের সাথে সম্পর্কিত নয়। হতে পারে যে, এই গুপ্ত শক্তি একেবারেই ভিন্ন একটা ক্ষেত্র (তাড়িত চুম্বক বা মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মতো কিছু) থেকে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্র স্থির নয়, বরং গতিময়। মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এর ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। এর নাম দেওয়া হয়েছে কুইন্টেসেন্স (quintessence)। এই কুইন্টেসেন্সসহ গুপ্ত শক্তির নানামুখী বিবর্তন বোঝার জন্য

ইস্টিশন ইবুক

বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গণিতের রাশি তৈরি করেছেন। এরকমের একটি রাশি হচ্ছে ‘অবস্থা-সমীকরণ চলক’ (equation-of-state parameter)। এটা মূলত গুপ্ত শক্তির চাপ এবং এর শক্তি ঘনত্বের অনুপাত। এই অনুপাতকে প্রকাশ করা হয় *w*-এর মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই অনুপাতটির তারতম্য এবং হেরফেরের মাধ্যমে আমাদের জন্য মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতির একটি সফল ছবি তৈরির চেষ্টারত আছেন বলা যায়।

তাহলে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণগুলোর সারমর্ম হলো, মহাবিশ্বে একধরনের শক্তি আছে যার উৎস ‘এখনো অজানা’। এটার উৎস হতে পারে স্রেফ ভ্যাকুয়াম শক্তি, কিংবা হতে পারে কুইন্টেসেন্সের মতো কিছু। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটা বড় কাজ এই মুহূর্তে এই গুপ্ত শক্তির সঠিক প্রকৃতি কী রকমের তা নির্ণয় করা – এটা কি কুইন্টেসেন্স-এর মতো ‘গতিময়’ নাকি ভ্যাকুয়াম শক্তির মতো ‘স্থির’? এ ব্যাপারটা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিন্তু যেটা তাঁরা জানেন তা হলো, এই শক্তি বিকর্ষণমূলক । ফলে এই শক্তি মহাবিশ্বকে সীমিত রাখতে সহায়তা করছে না, বরং প্রসারণের হার ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে।

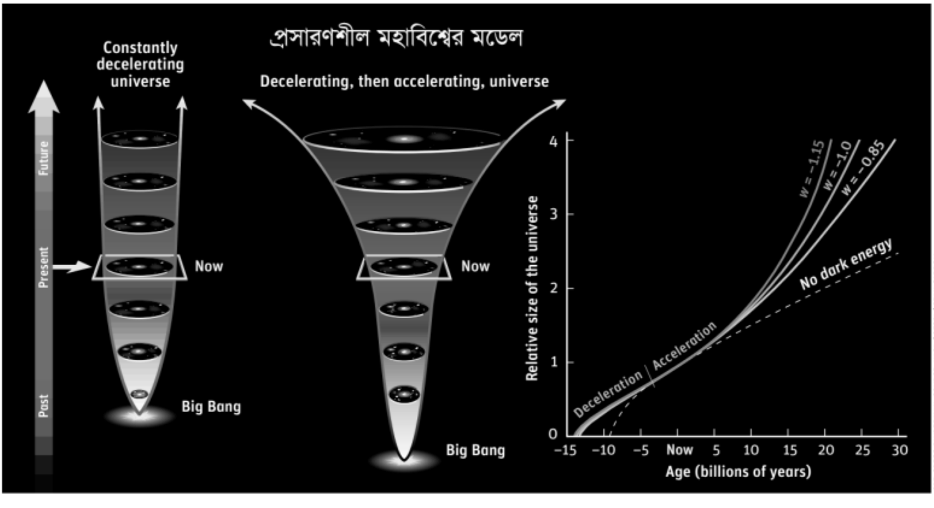

প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মডেল। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে 'অবস্থা-সমীকরণ চলক' নামের অনুপাতটির তারতম্য এবং হেরফেরের মাধ্যমে আমাদের জন্য মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতির একটি সফল ছবি তৈরির চেষ্টারত আছেন

প্রসারণের হার যদি এমনভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের পরিণতি কী হবে? প্রসারণ যদি বাড়তেই থাকে তাহলে গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে, আর আলোর উৎসগুলো (বিপুল নক্ষত্ররাজি) শক্তি ক্ষয় করে একসময় অন্ধকারে ডুবে যাবে; অর্থাৎ মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার! আমরা ওপরে 'অবস্থা-সমীকরণ চলক'-এর যে হিসেব দিয়েছি, সেখানে *w*-এর মান ১-এর কাছাকাছি (অর্থাৎ গুপ্ত শক্তির পুরোটাই অপরিবর্ত ভ্যাকুয়াম শক্তিবিশিষ্ট) হলে এমন অবস্থা হবে। আমাদের আজকের যে মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ তা এ ধরনের পরিণতির দিকেই রায় দেয়। এই পরিণতি সত্য হলে, আজ থেকে এক থেকে দুই ট্রিলিয়ন বছরের মধ্যে আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ছাড়া আর কোনো ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করতে পারব না। আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত মহাবিশ্বের নক্ষত্ররাজি পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মহাশূন্য চলে যাবে অন্ধকার আর শৈত্যময় এক নির্জীব অবস্থায়[228]। বিজ্ঞানীরা এই পরিণতির নাম দিয়েছেন মহাশৈত্য বা 'বিগ চিল' (Big Chill) ।

সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে বছর কয়েক আগে উঠে এসেছে আরেকটি নতুন মতবাদ। যদি *w*-এর মান ১-এর চেয়ে আরো কম হয়, মানে অধিকতর ঋণাত্মক (যেমন $w = -1.15$), তাহলে তা তৈরি করবে আরেক ধরনের চরম পরিণতির ক্ষেত্র। গুপ্তশক্তির প্রভাব সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকবে। প্রসারণ বাড়তে থাকবে অচিন্তনীয়ভাবে। ডার্টমাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কাল্ডওয়েল মনে করেন যে, দুই হাজার কোটি বছরের মধ্যে প্রসারণ এতই বেড়ে যাবে যে, এই বহির্মুখী প্রসারণ-চাপ আক্ষরিক অর্থেই গ্যালাক্সিগুলোকে একসময় ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে; ছিঁড়ে ফেলবে নক্ষত্রকে, ছিঁড়ে ফেলবে গ্রহদের, ছিঁড়ে ফেলবে আমাদের সৌরজগৎকে আর শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে

[228] Mario Livio (Space Telescope Science Institute), What is the Fate of Our Universe?, Astronomy's 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013

ফেলবে সকল শ্রেণীর জড় পদার্থকে। এমনকি পরমাণু পর্যন্ত ছিঁড়ে যাবে অন্তিম সময়ের ১০$^{-১৯}$ সেকেন্ড আগে[229]। এই মতবাদকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে বিগ রিপ (Big Rip) বা 'মহাচ্ছেদন' অভিধায়। তবে এই মহাচ্ছেদন সত্যই ঘটবে কি না, শুধু ভবিষ্যৎ গবেষণা থেকেই তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব। অনেকেই মনে করেন, এখনকার পর্যবেক্ষণ যা থেকে গুপ্ত শক্তি আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের সমতুল মনে মনে করা হচ্ছে, সেটা সঠিক হলে বিজ্ঞানীদের 'বিগ রিপ' নিয়ে এতটা চিন্তিত না হলেও চলবে।

মহাবিশ্বের সম্ভাব্য তিন পরিণতি– মহাসংকোচন, মহাশৈত্য অথবা মহাচ্ছেদন

বিগ চিল আর বিগ রিপের বাইরেও আরেকটি সম্ভাবনা আছে। এটার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সেই 'বিগ ক্রাঞ্চ' বা মহাসংকোচন। যদিও এই মুহূর্তে গুপ্ত শক্তির যে হালহকিকত, তাতে করে মহাসংকোচন বা বিগ ক্রাঞ্চ ঘটার সম্ভাবনা খুব কম বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

---

229 Chris Impey, How It Ends: From You to the Universe, W. W. Norton & Company; Reprint edition, 2011

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে গুপ্ত শক্তি পাওয়া যাবার আগ পর্যন্ত মহাসংকোচনের ব্যাপারটা একটা জোরালো সম্ভাবনা হিসেবেই বিজ্ঞানীদের তালিকায় ছিল। কিন্তু বিকর্ষণমূলক গুপ্ত শক্তির আগমনে দাবার ছক মোটামুটি উল্টে গেছে। গুপ্ত শক্তি ব্যাপারটা এখন এতটাই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে যে, সবাই এখন মহাবিশ্বের প্রসারণজনিত মৃত্যুদূত মহাশৈত্য আর মহাচ্ছেদন নিয়েই ভাবিত। মহাসংকোচন ক্রমশ হারিয়েই যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্তরালে। তার পরও কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটার সম্ভাবনা ফিরেও আসতে পারে। যদি w-এর মান -১-এর চেয়ে বেশি হয়, মানে কম ঋণাত্মক (যেমন w = - 0.85 বা এ ধরনের কিছু),তাহলে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে হতে একসময় হয়তো আগের মতোই মহাশৈত্য কিংবা মহাচ্ছেদনে এসে শেষ হবে। কিন্তু এমনও হতে পারে, একটা সময় পর এই গুপ্ত শক্তিজনিত প্রসারণ ধীর হয়ে থেমে গেল, আর পুনরায় শুরু হলো চিরচেনা পদার্থের রাজত্ব। আর এই প্রেক্ষিতে মহাবিশ্বের জ্যামিতির প্রকৃতি, গুপ্ত শক্তির হতদরিদ্র অবস্থা এবং পদার্থের প্রাচুর্য, আর মাধ্যাকর্ষণজনিত আকর্ষণ বলের প্রভাব সব মিলিয়ে মহাসংকোচন সদম্ভে আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসতে পারে, অনেকটা নিচের ছবির একদম তলার রেখাটির মতো।

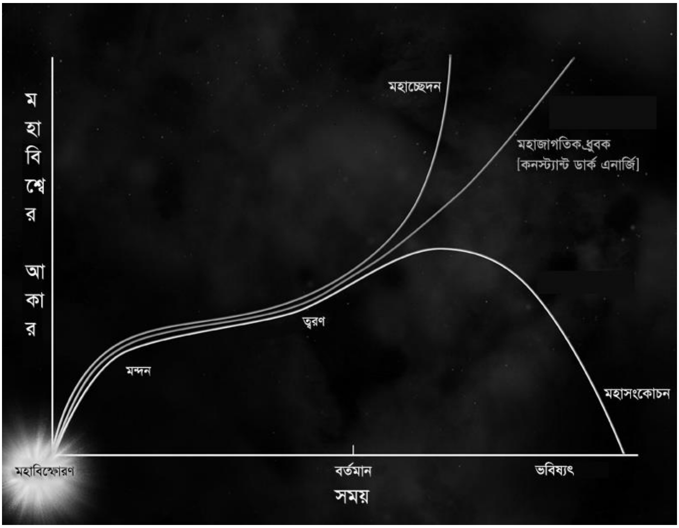

গুপ্ত শক্তি ব্যাপারটা এখন এতটাই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে যে, সবাই এখন মহাবিশ্বের প্রসারণজনিত মৃত্যুদূত মহাশৈত্য আর মহাচ্ছেদন নিয়েই ভাবিত। মহাসংকোচন ক্রমশ হারিয়েই যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্তরালে। তার পরও কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটার সম্ভাবনা ফিরেও আসতে পারে

হয়তো বিজ্ঞানী পল ডেভিসের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হবে, যার উল্লেখ তিনি করেছিলেন তাঁর 'শেষ তিন মিনিট' গ্রন্থে[230], 'মহাবিশ্ব শূন্য থেকে এসেছে বিগ ব্যাং-এর পথ ধরে। একসময় শূন্যে মিলিয়ে যাবে মহাসংকোচনের পথ ধরে। মাঝখানের দ্যুতিময় কয়েক জিলিয়ান বছরের অস্তিত্ব কারো স্মৃতিতেও রইবে না'।

জ্যোতির্বিদ্যার মৃত্যু?

আমরা জানলাম মহাবিশ্বের মৃত্যু ঘটতে পারে তিনভাবে। মহাসংকোচন, মহাচ্ছেদন কিংবা মহাশৈত্য। কিন্তু সব পরিণতির সম্ভাবনা সমান নয়। বিজ্ঞানীদের এই মুহূর্তের হিসাব-নিকাশ বলছে, মহাবিশ্বের পরিণতির পাল্লা মহাশৈত্যের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে বেশি। তবে সেখানে যাওয়ার আগে আরো কিছু ব্যাপার আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে যেটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই।

গুপ্ত শক্তির প্রভাবে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, সেটা আমরা জেনেছি। আমরা যখন মহাবিশ্বের প্রসারণের কথা বলি তখন মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রসারণের কথা বলি না। বলি কেবল স্থানের প্রসারণের কথা। মহাবিশ্বের সবকিছু যদি প্রসারিত হতো, তাহলে আমাদের দেহের অণু-পরমাণুগুলো একটা আরেকটা থেকে দূরে চলে যেত। আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখতেন, আপনার বাসার ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা মোটরসাইকেল কিংবা গাড়িটাও আয়তনে বেড়ে গেছে। তা কিন্তু আমরা দেখি না। এমনকি আমরা দেখিনা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও ক্রমশ বেড়ে যেতে। আমরা প্রসারণ বলতে মূলত বুঝি আমাদের ছায়াপথের সাথে অন্য ছায়াপথের মধ্যবর্তী স্থানের বিস্তার। ১৯২৯

[230] Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New York, New York, Basic Books, 1994

সালে বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দুরবিন দিয়ে যে দেখেছিলেন চারপাশের গ্যালাক্সিগুলো আমাদের আকাশগঙ্গা থেকে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সেখান থেকেই কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন মহাবিশ্বের প্রসারণের ইঙ্গিত। হাবল যে মহাজাগতিক সত্যটা প্রায় চুরাশি বছর আগে আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা এখনো একইভাবে সত্য। এর সাথে অবশ্য এখন যুক্ত হয়েছে গুপ্ত শক্তিজনিত ত্বরণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যে ত্বরণে মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে তাতে একদিন সকল গ্যালাক্সি আমাদের ছায়াপথের 'দৃষ্টিসীমা'র বাইরে চলে যাবে।

দৃষ্টিসীমার ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা যাক। এখানে দৃষ্টিসীমা বলতে কেবল আমাদের চোখের দৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক বস্তুদের পর্যবেক্ষণ করেন খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে। আর তারা মহাজাগতিক বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন কেবল চোখের দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে নয়, বরং অবলোহিত (infrared), অণুতরঙ্গ (microwave), বেতার তরঙ্গ (radio wave) প্রভৃতি নানা তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে। যদি কোনো আন্তনাক্ষত্রিক বস্তু আমাদের থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকে, বস্তুকণা থেকে প্রক্ষেপিত আলোর তত লোহিত সরণ ঘটতে থাকে। একটা সময় পর প্রক্ষিপ্ত তরঙ্গ অবলোহিত, অণুতরঙ্গ, বেতার তরঙ্গের পথ পাড়ি দিয়ে এতই দীর্ঘ তরঙ্গে রূপ নিবে যে, মহাবিশ্বের আকারকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই অবস্থায় তারা চলে যাবে 'অফিশিয়ালি' অদৃশ্য স্ট্যাটাসে।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করতে পারেন ঠিক কত সময় পরে এটা ঘটবে। তাদের গণনা অনুযায়ী, প্রায় ১৫ হাজার কোটি বছর পরে, যখন মহাবিশ্বের বয়স হবে আজকের বয়সের দশগুণ, তখন কাছাকাছি গ্যালাক্সির তারাদের থেকে আগত সকল আলোকরশ্মির প্রায় ৫০০০ গুণ লোহিত সরণ ঘটবে। আর ২০০ হাজার কোটি (অর্থাৎ দুই ট্রিলিয়ন) বছরের মধ্যে তাদের আলো লালাভ সরণের মাধ্যমে পৃথিবীর আকৃতিতে পৌঁছে যাবে। আর মহাবিশ্বের বাকি অংশ হয়ে যাবে রীতিমতো 'অদৃশ্য'।

দুই ট্রিলিয়ন বা ২০০ হাজার কোটি বছর শুনতে অনেক মনে হয়, কিন্তু মহাজাগতিক বয়সের ক্ষেত্রে এটা মোটেই বেশি নয়। মহাকাশে বহু তারাই আছে যাদের আয়ু এরকম দুই ট্রিলিয়ন বছরের মতো। এমনকি আমাদের চিরপরিচিত সূর্যও অন্তত পাঁচ শ কোটি বছর বেঁচে থাকবে বলে আমরা জানি। আজ আমরা টেলিস্কোপে চোখ রেখে আমাদের চারপাশে অন্তত ৪০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সির খোঁজ দিতে পারি। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন টেলিস্কোপে চোখ রাখলে এগুলো কিছুই দেখা যাবে না।

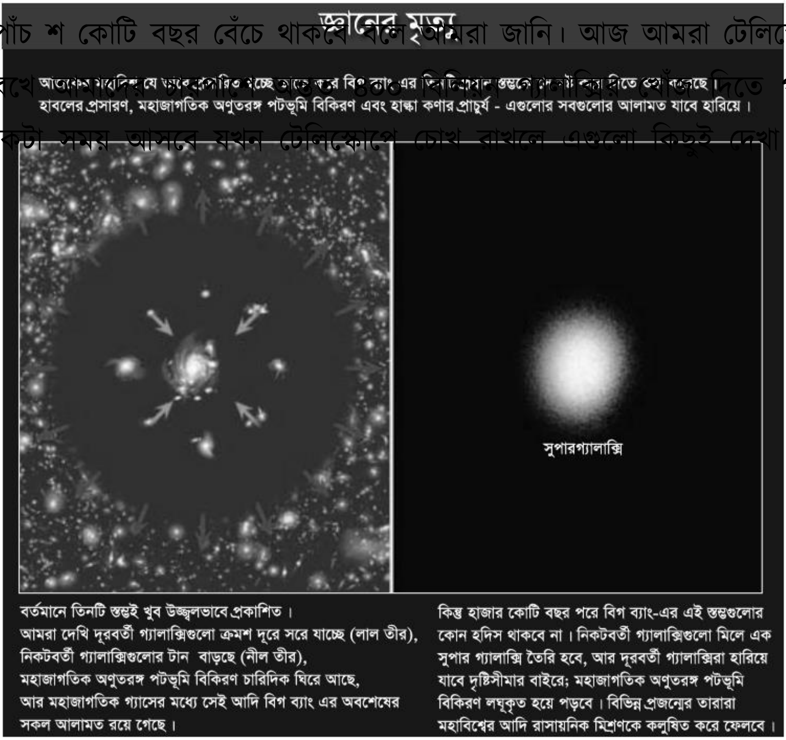

আজকের প্রসারমাণ মহাবিশ্ব কি ভবিষ্যতের অধিবাসীদের জন্য জ্ঞানের মৃত্যুর পদধ্বনি?

পরিস্থিতিটা হবে অনেকটা ১৯০৮ সালের সময়কার কিংবা তারও আগেকার মানুষজনের মহাকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানবুদ্ধির মতো। সে সময় সাধারণ লোকজন শুধু নয়,

বড় বড় বিজ্ঞানীরাও ভাবতেন, মহাকাশে মহাজাগতিক বস্তু বলতে আছে আমাদের এই গ্যালাক্সি। এর চারপাশে আর কোনো কিছুর হদিস তাঁরা জানতেন না। তাঁদের চোখে মহাবিশ্ব ছিল 'স্থির' (static) ও 'চিরন্তন' (eternal)। হয়তো বহু কোটি বছর পরের অধিবাসীরাও হয়তো এভাবেই চিন্তা করতে বাধ্য হবে, কারণ তারা পর্যবেক্ষণ করেও নিজেদের 'সুপারগ্যালাক্সি' (ধারণা করা হয়, আমাদের আকাশগঙ্গা, এন্ড্রোমিডা, আর M33 গ্যালাক্সি মিলে এই সুপার গ্যালাক্সি তৈরি হবে) ছাড়া চারপাশে আর কিছু খুঁজে পাবে না। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণের প্রমাণ হিসেবে যে তিনিটি প্রধান স্তম্ভের কথা আমরা এখন জানি, হাবলের প্রসারণ, মহাজাগতিক অণুতরঙ্গ পটভূমি বিকিরণ এবং হাল্কা কণার প্রাচুর্য—এর সবগুলোর আলামত যাবে হারিয়ে।

তার পরও সেসময়ের বড় কোনো বিজ্ঞানী হয়তো পরোক্ষভাবে কিংবা গণিত সমাধান করে 'বিপ্লবাত্মক' উপসংহারে পৌঁছাবেন, সুপারগ্যালাক্সির বাইরেও মহাকাশে আরো অনেক গ্যালাক্সি আছে, আর মহাবিশ্বের প্রসারণ এত বেশি হয়েছে যে আমরা তাদের দেখতে পাই না। কে জানে হয়তো সেই বিজ্ঞানীটির দশা আমাদের পূর্বসূরি কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও কিংবা ব্রুনোর মতোই হবে। হয়তো তাঁকে পাগল ঠাওরানো হবে, কিংবা করে রাখা হবে অন্তরীণ। পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাঁর গণিতের ফলাফল অনেকেই মানতে চাইবেন না, যেমন আমাদের অনেকেই মানতে চাই না যে, এই মহাবিশ্বের বাইরেও আরো মহাবিশ্বের অর্থাৎ মাল্টিভার্সের অস্তিত্ব থাকতে পারে! আজকের এই লেখাগুলো যদি তত দিন পর্যন্ত টিকে থাকে, তবে হয়তো পাগল বিজ্ঞানীটির কোনো সমর্থক এই তথ্যগুলো পেশ করে বলবে, কয়েক'শ হাজার কোটি বছর আগেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, দৃশ্যমান গ্যালাক্সির বাইরেও অন্য অনেক গ্যালাক্সি আছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ হয়তো এই 'খেলো যুক্তি'গুলো উড়িয়ে দিয়ে বলবে, 'আরে সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান এত উন্নত ছিল না। মানুষেরা সে সময় কী বুঝতে কী বুঝেছে কে জানে'। আসলে আমরা বোধ

হয় এখন, মানে এই বর্তমান সময়েই জ্যোতির্বিদ্যা, মানব-অনুসন্ধিৎসা এবং আমাদের কারিগরি দক্ষতার প্রেক্ষাপটে খুব প্রাঞ্জল একটা কাল অতিক্রম করছি, যে সময়টাতে আমরা মহাকাশের দিকে তাকিয়ে এর বিবিধ আলামতের ভিত্তিতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছাতে পারছি। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে অন্য চলকগুলো ঠিক থাকলেও জ্যোতির্বিদ্যার 'চাক্ষুষ' আলামতগুলো থাকবে অনুপস্থিত। এই অবস্থা আমাদের 'জ্ঞানের মৃত্যুর' নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত দুর্ভাবনা থেকেই বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস তাঁর সহকর্মী রবার্ট জে. শেরারের সাথে মিলে ২০০৭ সালে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন একটি জার্নালে– 'স্থির মহাবিশ্বের পুনরাগমন ও জ্যোতির্বিদ্যার বিদায়' শিরোনামে[231]। গবেষণাটির জনপ্রিয় সংস্করণ পাওয়া যাবে সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০৮ সালের একটি সংখ্যায়[232] কিংবা ক্রাউসের ২০১২ সালে লেখা 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইয়ের একটি অধ্যায়ে[233]।

হিগস —মৃত্যুর শীতল ছায়া?

মহাশৈত্য, মহাসংকোচন কিংবা মহাচ্ছেদনের বাইরেও মহাবিশ্বের ভিন্ন একটি মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনাটি এসেছে হিগস ক্ষেত্রের বিদ্যমান প্রকৃতি থেকে। হ্যাঁ, হিগস কণার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অমিত সম্ভাবনায় আমরা সবাই উল্লসিত, কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় উল্লাস আবার সাথে করে নিয়ে এসেছে যেন সেই কাল কেউটের ফণার করাল ছায়া!

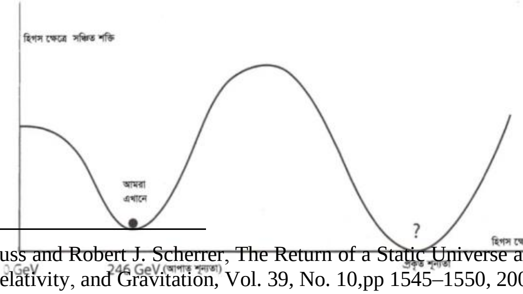

[231] Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The Return of a Static Universe and the End of Cosmology. Journal of General Relativity, and Gravitation, Vol. 39, No. 10,pp 1545–1550, 2007.
[232] Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The End of Cosmology?, Scientific American, February 25, 2008
[233] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Atria Books, 2012

হিগস কণার সাম্প্রতিক আবিষ্কারের অমিত সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে বিভীষিকাময় ধ্বংসের ছায়াও! আমাদের মহাবিশ্ব প্রকৃত শূন্যতায় আছে বলে মনে করা হলেও, হিগসের যে মান আমরা পেয়েছি তাতে করে আমাদের মহাবিশ্বটা আসলে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে নেই। হয়তো পুরো মহাবিশ্বই অস্থায়ী একটা স্তরে আটকে আছে। হয়তো বহু বছর পরে সেই খাদ থেকে গড়িয়ে সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় (প্রকৃত শূন্যতায়) চলে আসবে।

আমরা আগের (দ্বাদশ) অধ্যায় থেকে জেনেছি, শূন্যতার মধ্যেও হিগস ক্ষেত্রের একটা মান থাকে। অন্য ক্ষেত্রগুলো সর্বনিম্ন শক্তিস্তরে যেখানে শূন্য মান ধারণ করে সেখানে হিগসের মান আমরা পাই ২৪৬ জিইভি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হিগসের কি এই একটামাত্র মানে এসেই থেমে যাবার কথা? একটা বল পাহাড়ের শীর্ষ থেকে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকলে সরাসরি মাটিতেই নেমে আসবে এমন কোনো কথা নেই, মাটিতে পৌঁছানোর আগে পাহাড়ের খাদে যেকোনো জায়গায় আটকে যেতে পারে। আমাদের মহাবিশ্বটাও যদি সেরকম খাদে আটকানো অস্থায়ী অবস্থা হয়? বহু বছর পরে হয়তো সেই খাদ থেকে গড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়বে, যেখানে হিগস ক্ষেত্রের মান সত্য সত্যই 'শূন্য' হবে। শুধু হিগস নয়, স্ট্রিং তত্ত্বের কিছু গণনা থেকেও আন্দাজ করা হচ্ছে যে, আমরা আমাদের মহাবিশ্বকে যে 'ট্রু ভ্যাকুয়াম' বা প্রকৃত শূন্যতায় অবস্থান করছে বলে ঢালাওভাবে ভেবে নিচ্ছি, সেটা সঠিক না-ও হতে পারে। আমরা হয়তো আরেকটি আপাত শূন্যতার স্তরে বিরাজ করছি অনেকটা পাহাড়ের খাদে আটকানো অবস্থায়। বহু বছর পরে হয়তো তা আপাত শূন্যতার স্তর থেকে গড়িয়ে প্রকৃত শূন্যতায় এসে থামবে।

সেটা ঘটলে আমাদের এই মহাবিশ্বের জন্য বিপদ। কারণ পাহাড়ের উদাহরণের মতো কেবল গড়িয়ে পড়ার মতো এত সরল হবে না ব্যাপারটা, বরং এটা হবে সত্য সত্যই এক মহাবিপর্যয়, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'ক্যাটাস্ট্রফি'। এই মহাবিশ্বকে ধ্বংস

করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত আরেকটি ভিন্ন মহাবিশ্বে গিয়ে পৌঁছাবে যেখানে এর অবস্থা শক্তিস্তরের প্রেক্ষাপটে অধিকতর স্থায়ী। ফার্মি ল্যাবের জোসেফ লেকিন এবং ওহাইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার হিলসহ কিছু বিজ্ঞানী গণনা করে দেখেছেন কখন আর কিভাবে এই মহাবিপর্যয় ঘটতে পারে। তাঁদের গণনা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এখনই এত চিন্তিত হবার কিছু নেই। এটা ঘটলেও হাজার কোটি বছরের আগে তো নয়[234]।

হিগস ক্ষেত্রের অশূন্য মানের পাশাপাশি হিগসের ভরের ব্যাপারটাও এখানে প্রাসঙ্গিক। সার্নের বিজ্ঞানীরা লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে সম্প্রতি যে হিগস কণার সন্ধান পেয়েছেন, তার ভর ১২৫ জিইভি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, হিগসের ভর যদি আরেকটু বেশি হতো তাহলে আমরা আরেকটু নিরাপদ থাকতাম, কারণ আমাদের মহাবিশ্ব থাকত সর্বনিম্ন শক্তিস্তরের কাছাকাছি। আর হিগসের ভর যদি আরেকটু হাল্কা হতো, তবে অবস্থা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠত[235]। আমদের খাদের পাশে আরেকটা খাদ হয়তো থাকত যেটার গভীরতা হতো বিশাল। সেখানে মহাবিশ্বের পতন হতো প্রায় অবশ্যম্ভাবী। একটা ছোট খাদের পাশে যদি একটা বিরাট বড় খাদ থাকে, তবে ছোট খাদে থাকা বল যেকোনো সময়ই গড়িয়ে চলে যেতে পারে বড় খাদের মধ্যে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এসে সেই দুর্যোগ বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী, শূন্যস্থানের মধ্যে অনবরত ‘ফ্লাকচুয়েশন’ চলতে থাকে। ফলে যেকোনো সময়ই বলের পক্ষে কোয়ান্টাম টানেলিং-এর ফাঁক গলে উচ্চ শক্তিস্তরের অবস্থান থেকে নিম্ন শক্তিস্তরের জায়গায় চলে যাওয়া সম্ভব। হিগসের ভর কম হলে সেটা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যেত অনেক। তার তুলনায় হিগসের মানসমেত যে

---

[234] "This calculation tells you that many tens of billions of years from now there'll be a catastrophe," Joseph Lykken, a theoretical physicist at the Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Ill., said Monday (Feb. 18,2013) here at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science. [Clara Moskowitz, Higgs Boson Particle May Spell Doom For the Universe, LiveScience Senior Writer, February 19, 2013]

[235] Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World [Paperback ed., with a new epilogue], Plume, 2013

মহাবিশ্বে আমরা বাস করছি, তা অনেক নিরাপদ, তার পরও একেবারে শঙ্কামুক্ত তা বলা যাবে না।

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তাঁর জীবদ্দশায় মহাবিশ্বের মহাশৈত্য কিংবা হিগসের শীতল মৃত্যুর সাথে পরিচিত হতে পারেননি। কিন্তু বিবর্তন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তখনই ডারউইন বুঝেছিলেন, যেখানে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে শতকরা নিরানব্বই ভাগ প্রজাতিই কোনো-না-কোনো সময়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়, সেখানে মানুষের ভবিষ্যৎও খুব বেশি আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। তাই তিনি তাঁর একটি রচনায় বলেছিলেন[236],

> ভবিষ্যতের মানুষ অনেক বেশি নিখুঁত হয়ে উঠবে, এটা হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু পাশাপাশি এক অসহনীয় চিন্তাও মনের আঙিনায় উঁকি দিতে শুরু করে যে, মানুষ এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য সংবেদনশীল প্রজাতিরা একটা মহাজাগতিক ধীর প্রক্রিয়ায় ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সাম্প্রতিক ডব্লিউ ম্যাপ থেকে পাওয়া সাম্প্রতিক মহাজাগতিক উপাত্তগুলো যেন ডারউইনের সেই ভয়াল দুঃস্বপ্নকে সত্যতা দিতে চলেছে। যে ডব্লিউ ম্যাপ ডেটা থেকে আমরা বিগ ব্যাং-এর আলামত পাই, সেই ডেটা থেকেই আবার আমরা আলামত পেতে শুরু করেছি—এই মহাবিশ্ব সত্যই ধীর প্রক্রিয়ায় একটা সময় বিলীন হয়ে যাবে। শূন্য থেকে জন্ম হওয়া এই মহাবিশ্ব একসময় হারিয়ে যাবে শূন্যতারই গহিন গহ্বরে। বিখ্যাত মুক্তমনা লেখক ক্রিস্টোফার হিচেন্স সেজন্যই বলতেন, 'আহ্ ... যারা এই মহাবিশ্বের মধ্যে বাস করে ভাবছেন আমরা 'বিশাল কিছু'র মধ্যে আছি... তারা একটু অপেক্ষা করেন; শূন্যতার সংঘাত আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে'।

---

[236] Charles Darwin, Religion, volume I, chapter VIII, pp 312.

মহাবিশ্বের এই অন্তিম পরিণতির ধারণাগুলো হয়তো আমাদের 'নৈরাশ্যবাদী' বানিয়ে দিতে পারে, কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের কাজ কেবল মিথ্যা প্রবোধ বা সান্ত্বনা দেওয়া নয়। সত্যনিষ্ঠভাবে বাস্তবতার মুখোমুখি করানোও বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব। বাস্তবতা রূঢ় বা কঠিন হলে সেটাকে মিথ্যার 'সান্ত্বনার প্রলেপ' না লাগিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবেই সেটাকে বর্ণনা করেন তাঁরা। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের মহাবিশ্ব যেমন, ঠিক তেমনিভাবেই একে ব্যাখ্যা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা'।

হাইপারস্পেসে পাড়ি

বিজ্ঞানীরা 'কঠিনেরে ভালোবাসেন' বটে কিন্তু দিনশেষে তাঁরাও রক্তমাংসেরই মানুষ। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো তারাও রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ দুর্দশা আর আবেগে কম-বেশি আক্রান্ত হন। মহাবিশ্বের নৈরাশ্যকর পরিণতি, সেটা যত কোটি বছর পরেই ঘটুক না কেন, তা তাঁদের আলোড়িত করে। কিছু বিজ্ঞানী এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কোনো পন্থা পাওয়া যায় কি না সেটা খুঁজে দেখতে।

কিছু আশাবাদী সমাধান সত্যই পাওয়া গেছে, যদিও সেগুলো এখনো তত্ত্বকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিউ ইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিচিও কাকু তাঁর জনপ্রিয় বই 'প্যারালাল ওয়ার্ল্ডাস'[237] ও 'ফিজিক্স অব দ্য ইম্পসিবল'[238] গ্রন্থ দুটিতে অন্তিম পরিণতি থেকে মুক্তির কিছু আকর্ষণীয় সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মিচিও কাকু মনে করেন, যত দিনে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা আসবে, অর্থাৎ হাজার কোটি বছর পরে, তত দিনে মানবসভ্যতা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও

[237] Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor, 2006

[238] Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force Fields, Teleportation, and Time Travel, Anchor, 2009

কারিগরি দক্ষতায় এগিয়ে থাকবে অনেক দূর। আমাদের বর্তমান সভ্যতা যদি কারিগরি দক্ষতায় 'পর্যায় ০' কিংবা বড়জোর 'পর্যায় ১' ধরনের হয়, তবে, সে সময়কার অধিবাসীরা হবে অন্তত 'পর্যায় ৩' ধরনের। সে সময়ের অধিবাসীরা চোখের সামনে মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি ঘটতে দেখেও হয়তো চোখ বুজে বসে থাকবে না। তারা তখন কারিগরি দক্ষতায় এতোই উন্নত থাকবে যে, হয়তো প্রায় আলোর বেগে মহাকাশযানে চলাচল করবে, সময় পরিভ্রমণের উপায় বাতলে ফেলবে, কৃষ্ণগহ্বর কিংবা গুপ্তশক্তি থেকে শক্তি আহরণ করবে, আর ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে 'হাইপারডাইভ' দিয়ে ভিন্ন মহাবিশ্বে পৌঁছে যাবে।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, 'ওয়ার্মহোল যদি থেকে থাকে তবে, সেটা হবে স্থান ও সময় পরিভ্রমণের জন্য আদর্শ'। ভবিষ্যতের অধিবাসীরা হয়তো ওয়ার্মহোলকে ব্যবহার করে মৃত্যুন্মুখ মৃতপ্রায় মহাবিশ্বকে ফেলে আস্তানা গাড়বে কোনো 'সজীব' মহাবিশ্বে। কিংবা হয়তো স্টারট্রেকের ক্যাপ্টেন কার্কের মতোই নিজেকে 'টেলিপোর্টেশন' করে চলে যাবে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরের কোনো পৃথিবীতে।

আজকের দিনে ব্যাপারগুলো 'অসম্ভব' কিংবা 'আজগুবি' মনে হলেও হয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবীতে সেগুলো আর সেরকমের কিছু থাকবে না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকেই অবশ্য আমরা এর কিছুটা আঁচ পাই। একটা সময় যে ব্যাপারগুলোকে অসম্ভব বলে ভাবা হতো, তার অনেক কিছুই বর্তমানে খুব স্বাভাবিক' হিসেবে আমরা গ্রহণ করছি, সেসব প্রযুক্তির সুফলও ভোগ করছি পুরোদমে। শুধু আমাদের মতো ছাপোষা সাধারণেরা 'অসম্ভব' বলে বাতিল করলে না হয় মানা যেত, অনেক রথী-মহারথীই কালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি। অনেক কিছুই তাঁরা ঢালাওভাবে 'অবাস্তব' কিংবা 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেগুলো পরবর্তী পৃথিবীতে হাজির হয়েছিল খুব সাধারণ বাস্তবতা হিসেবে। যেমন, ভিক্টরীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসনের কথা আমরা সাবাই জানি। পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের কারণে তাঁকে 'লর্ড কেলভিন' উপাধিতে

ভূষিত করা হয়েছিল। তিনি ভবিষ্যতে উড়োজাহাজ আবিষ্কারের সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়ে ১৮৯৫ সালে বলেছিলেন, 'বাতাসের চেয়ে ভারী বস্তু উড়বে না'। ১৮৯৭ সালে তিনি বলেছিলেন, 'রেডিওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই'। আর ১৯০০ সালে বলেছিলেন, 'পদার্থবিজ্ঞানে যা আবিষ্কার করার সবকিছুই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, নতুন কিছু আর আবিষ্কার করার কিছু নেই'। 'এক্স-রে' ছিল কেলভিনের মতে 'হোক্স'। বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড যিনি নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনের পরিভ্রমণের সেই পরমাণুর 'রাদারফোর্ড মডেলের' জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তিনি পারমাণবিক বোমা বানানোকে অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, পরমাণু ভেঙে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা এতই দুর্বল হবে যে সেটা চাঁদের আলোর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এমনকি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও ১৯৩০ সালে পর্যন্ত ঢালাওভাবে ভাবতেন, পারমাণবিক বোমা কখনোই বানানো যাবে না। তিনি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিলেন সারা জীবন ধরে। আজ আমরা জানি, তাঁদের কালে এ ব্যাপারগুলো অসম্ভব মনে হলেও আজকের পৃথিবীতে তা নয়। বরং তাঁদের এইসব 'অপরিণামদর্শী' উক্তিগুলো এখন হাসির খোরাক।

আমি (অ.রা) বছর খানেক আগে মুক্তমনায় 'অসম্ভবের বিজ্ঞান' নামে একটা সিরিজ লিখতে শুরু করেছিলাম[239]। সেখানে বলেছিলাম, মাত্র বছর কয়েক আগেও যে বিষয়গুলোকে 'অসম্ভব' বলে ভাবা হতো, ধরে নেওয়া হতো স্রেফ আধি-ভৌতিক ফ্যান্টাসি হিসেবে,তার অনেকগুলোই আমাদের চোখের সামনেই বাস্তবতা পেতে চলেছে। হ্যারি পটারের 'ইনভিসিবল ক্লোক' আর বিজ্ঞানীদের জন্য আজ আর আকাশকুসুম কল্পনার বিষয় নয়, মেটা-পদার্থ নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার অগ্রগতি কল্পকাহিনিকে নিয়ে এসেছে বাস্তবতার খুব কাছাকাছি[240]। আবার টেলিপোর্টেশনের কথাই ধরা যাক। এটাকে কেবল স্টারট্রেকের মতো সিনেমায় দেখানো সায়েন্স

---

[239] অভিজিৎ রায়, অসম্ভবের বিজ্ঞান, মুক্তমনা, অক্টোবর ১৫, ২০০৮

[240] Cavan Sieczkowsk, 'Perfect' Invisibility Cloak Uses Metamaterials To Bend Light, The Huffington Post, Posted: 11/12/2012.

ফিকশন বলেই এত দিন মনে করতেন সবাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত করে বলছেন, টেলিপোর্টেশন সম্ভব। অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিলের কোয়ান্টাম অ্যাটম অপটিক্স ল্যাবের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পারমাণবিক স্কেলে সফলভাবে টেলিপোর্ট করে দেখিয়েছেন। আরেক বিজ্ঞানীর দল ফোটনকে 'টেলিপোর্ট' করে পাঠাতে পেরেছেন দানিয়ুব নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, কয়েক দশকের মধ্যেই ভাইরাসের মতো 'জটিল' অণু কিংবা আমাদের ডিএনএ টেলিপোর্ট করা সম্ভব হবে। কিন্তু স্টারট্রেকে যেরকম দেখানো হয়েছে সেরকম পূর্ণ অবয়বের টেলিপোর্ট যন্ত্র বানাতে হয়তো বিজ্ঞানীদের লেগে যাবে শ'খানেক বছর। তা লাগুক। অন্তত তাত্ত্বিকভাবে যে টেলিপোর্টেশন আর 'অসম্ভব' কোনো বিষয় না, তা কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে এখনই। আশা করতে কোনো দোষ নেই লক্ষ-কোটি বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষেরা টেলিপোর্টেশন প্রযুক্তির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে যাবে, নিশ্চয়তা দেবে কেবল গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণের নয়, এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে পরিভ্রমণেরও।

যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দু লাখ বছর আগে একটা সময় আফ্রিকার গহিন বনে উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আহার আর বাসস্থানের তাগিদে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের উত্তরসূরিরাও হয়তো পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একটা সময় পা রাখবে আন্তনাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলে, এবং একসময় হয়তো এই মহাবিশ্বেরও মায়া কাটিয়ে পাড়ি দেবে ভিন্ন কোন মহাবিশ্বে। খুঁজে নেবে হাজারো মাল্টিভার্সের মাঝে লুকিয়ে থাকা কোনো এক 'দ্বিতীয় পৃথিবী'। মহাজাগতিক উপনিবেশের জন্য নয়, হয়তো অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই। এভাবেই হয়তো পূর্ণতা পাবে কোপার্নিকাস ও ডারউইনের 'অসমাপ্ত বিপ্লবের'। কবে সেটা? হাজার বছর, লক্ষ বছর নাকি কোটি বছর পরে? আমরা কেউ তা জানি না। আমি বা আপনি কেউ বেঁচে থাকব না সে সময়, 'বেঁচে রবে আমাদের স্বপ্ন তখন'। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় –

‘তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
পৃথিবীর সব গল্প ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন।...’

চতুর্দশ অধ্যায়

অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধান

শূন্য ও অসীমের মেলবন্ধন

'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

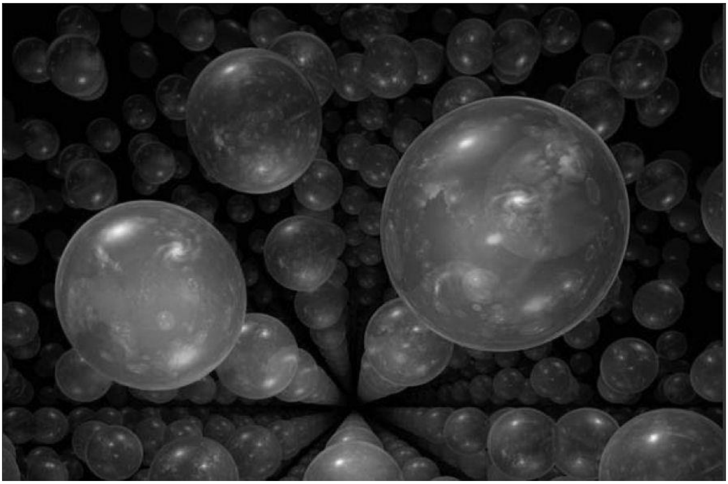

আপনার উর্বর মস্তিষ্কের রঙিন কল্পনায়ও কি কখনো - একটিবারও মনে হয়েছে, আকাশের বুকে হাজারো লক্ষ কোটি গ্রহ-তারা-নীহারিকা আর গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে তৈরি এই যে আমাদের এত পরিচিত বিশাল মহাবিশ্ব, এর বাইরেও এমনি ধরনের অসংখ্য

মহাবিশ্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে? আপনার আমার কাছে তা যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক না কেন, পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে এই সম্ভাবনার ব্যাপারটি ভাবছিলেন অনেক দিন ধরেই, এবং অতি সম্প্রতি দাবি করা হয়েছে, এর কিছু পরীক্ষালব্ধ প্রমাণেরও হদিস পেতে শুরু করেছেন তাঁরা[241,242,243] । কিন্তু সেখানে যাবার আগে চলুন আমরা একটু চোখ বুলিয়ে নিই মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটি আসলে কী বলছে, কিভাবেই বা এই ধারণাটি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

মাল্টিভার্স কী?

অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা কিন্তু অনেক পুরনো। সেই যে প্রাচীন দার্শনিক জিয়োর্দিনো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০), যার কথা আমরা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে জেনেছি; তিনি কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করতে গিয়ে চার্চের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বাইবেলবিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থনের অপরাধে ঈশ্বর-পুত্রের দল তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। সেই ব্রুনো কেবল সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করেই ক্ষান্ত হননি, ১৫৮৪ সালে একটি ভয়ংকর বই লিখে ফেলেছিলেন De l'Infinito Universo et Mondi নামে, যার বাংলা করলে দাঁড়াবে, 'অনন্ত মহাবিশ্ব এবং বহু বিশ্ব নিয়ে'। সে বইটিতে তিনি অনন্ত মহাবিশ্ব থাকার জোরালো সম্ভাবনার ব্যাপারটি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী তো সৌরজগতের কেন্দ্র নয়ই, এমনকি এই মহাবিশ্বের সংখ্যাও একটি নয়, বরং এর সংখ্যা হতে পারে অনন্ত অসীম। ব্রুনো আরো বললেন, এই মহাবিশ্বের অন্যান্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আবার, সেরকম প্রাণওয়ালা একাধিক গ্রহ থাকতে পারে অন্য মহাবিশ্বেও।

---

[241] Scientists find first evidence that many universes exist; http://phys.org/news/2010-12-scientists-evidence-universes.html

[242] Epic Discovery Update: "We are One of Many Universes", http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/epic-discovery-update-we-are-one-of-many-universes.html

[243] Astronomers Find First Evidence Of Other Universes, http://www.technologyreview.com/view/421999/astronomers-find-first-evidence-of-other-universes/

ব্রুনোর এ ধারণাগুলো সে সময়ের তুলনায় ছিল ভীষণ বিপ্লবী, এমনকি আজকের প্রেক্ষাপটেও তা কম কী? অতিমাত্রায় আজগুবিও হয়তো বলবেন কেউ কেউ। কিন্তু তার পরও ব্রুনোর কথার গুরুত্ব কিছু কিছু দার্শনিক ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যেমন, জার্মান দার্শনিক এর্নস্ট ক্যাসির ব্রুনোর অনন্ত মহাবিশ্বের চিন্তাধারাকে 'চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্তির' প্রথম সোপান উল্লেখ করে লেখেন[244] —

> 'ব্রুনোর অসীম মহাবিশ্বের এই মতবাদটি ...মানুষের চিন্তার দাসত্ব থেকে সচেতনভাবে মুক্তির সর্বপ্রথম সোপান। মানুষকে আর সসীম মহাবিশ্বের সংকীর্ণ চৌহদ্দির কারাগারে বন্দী আসামির মতো জীবন কাটিয়ে যেতে হবে না, সে হবে সত্যিকারের মুক্ত বিহঙ্গ; সে ভেঙেচুরে ফেলবে কাল্পনিক যত দেয়াল, যা মিথ্যে অধিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে তার অস্তিত্বকে বন্দী করে রেখেছিল এক স্বর্গীয় গোলকের অভ্যন্তরে। অনন্ত অসীম মহাবিশ্বের ধারণা মানুষকে দেয় মানুষ হিসেবে সত্যিকার মুক্তির আস্বাদন, সে মানুষের জন্য নির্ধারণ করে না কোনো কৃত্রিম দেয়ালের সীমা-পরিসীমা, বরং মানবযুক্তির জন্য হয়ে উঠে সত্যিকারের অনুপ্রেরণা। মানব বুদ্ধিবৃত্তি নিজের অসীমত্ব নিয়ে সচেতন হয়ে উঠে অসীম মহাবিশ্বের মায়াবী ক্ষমতায়' (Infinite worlds of Giordano Bruno by Antoinette Mann Patterson, 1970)।

এর্নস্ট ক্যাসিরের মতো দার্শনিকেরা গুরুত্ব বুঝলে কী হবে, চার্চের মাথায় যেন বাজ পড়ল। এমনিতেই কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থন করা নিয়ে ব্রুনোর ওপর চার্চ মহাখাপ্পা ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন, এই পৃথিবীটা একটা বিশিষ্ট গ্রহ যা ঈশ্বরের তৈরি এক বিশেষ সৃষ্টি।

পৃথিবীটা বিশিষ্ট গ্রহ বলেই পৃথিবীকে স্থির রেখে এর চারদিকে সমস্ত গ্রহ, তারিকামণ্ডলীসহ সকল মহাজাগতিক বস্তুকণা ঘুরছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে লেখা

---

[244] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পুনর্মুদ্রণ ২০০৬)

আছে বাইবেলে। কাজেই কোপার্নিকাসের তত্ত্ব ছিল তাঁদের চোখে সাক্ষাৎ ব্লাসফেমি, কারণ তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বে আস্থা রাখলে পৃথিবীর বিশিষ্টতা নিমেষেই ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। আর এর মধ্যে অসীম মহাবিশ্ব আমদানি করলে তো পোয়াবারো— মানবজাতি আর তার পুরোধা চার্চের ভূমিকাও গৌণ হয়ে যাবে। অসীম মহাবিশ্বে কি অগণিত মানবজাতি থাকবে, আর তাদের জন্য অগণিত পোপ, কিংবা অগণিত যিশু? ছি ছি রাম রাম...মাথা খারাপ নাকি? 'দে শালারে পুড়াইয়া' ...

ঈশ্বরপুত্রদের তাণ্ডবে ব্রুনোর নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই গয়ে গেল। দিনটি ছিল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ।

চার্চ হয়তো ভেবেছিল গ্যালিলিওকে অন্তরীণ করে রেখে কিংবা ব্রুনোকে পুড়িয়ে দিয়েই পৃথিবীর ঘূর্ণন থামাবেন তাঁরা। আর পুঁড়ানোর সাথে সাথেই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাও বোধ হয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! কিন্তু চার্চের হয়তো জানার বাকি ছিল যে, ব্যক্তিকে পোড়ানো যায়, কিন্তু তার মতবাদকে নয়। ব্রুনোর অনন্ত মহাবিশ্বের মতবাদ আবারো ফিরে এসেছে বিজ্ঞানে মূলত আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদদের হাত দিয়ে। আধুনিক পদার্থবিদের কিছু গবেষক অনেক দিন ধরেই আলামত পাচ্ছিলেন যে, আমাদের পরিচিত মহাবিশ্ব এটি কোনো অনন্য বা ইউনিক কিছু নয়, বরং এমনি ধরনের হাজারো মহাবিশ্ব হয়তো ছড়িয়ে আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা একদমই ওয়াকিবহাল নই। বিগ ব্যাং তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর আশির দশকে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রান্তিক গণিতগুলো সমাধান করতে গিয়েই এই অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারটা বেরিয়ে আসছিল ক্রমশ। যাঁরা সে সময় এ নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুজন গবেষক — আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন ও আঁদ্রে লিন্ডে খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন মহাজাগতিক স্ফীতি একবার শুরু হলে আর থামে না[245]। এ ব্যাপারটাকেই বিজ্ঞানীরা আজ 'চিরন্তন

[245] বিস্তারিত তথ্যের জন্য The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দেখুন।

স্ফীতি’ (Eternal Inflation) নামে অভিহিত করছেন। অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা মূলত এই চিরন্তন স্ফীতি তত্ত্বেরই স্বাভাবিক একটি গাণিতিক পরিণতি। অতি সংক্ষেপে অনন্ত মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক ধারণাটি এরকম:

> আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভেতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন আর পরবর্তীতে মূলত আঁদ্রে লিন্ডে ও আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিনের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতোই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়তো আমরা অবস্থান করছি অন্যগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

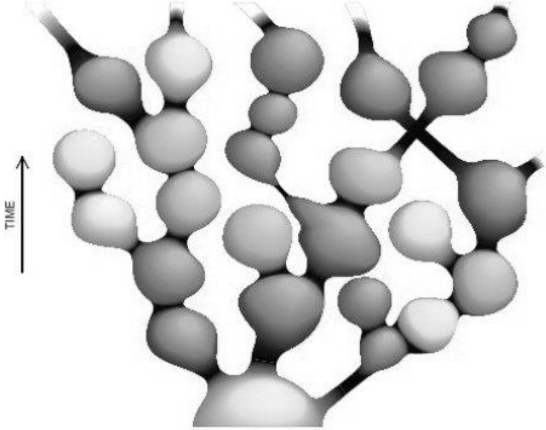

SELF-REPRODUCING COSMOS appears as an extended branching of inflationary bubbles. Changes in color represent "mutations" in the laws of physics from parent universes. The properties of space in each bubble do not depend on the time when the bubble formed. In this sense, the universe as a whole may be stationary, even though the interior of each bubble is described by the big bang theory.

Picture Courtesy: Scientific American

আঁদ্রে লিন্ডের দেওয়া তত্ত্ব কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বুদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক-একটি 'বিগ-ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ-ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক-একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি

আসলে নব্বইয়ের দশকে দেশকাল (spacetime) কিভাবে ‘ফ্লাকচুয়েট’ করে এ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী (যেমন, এডওয়ার্ড ফার্হি, অ্যালেন গুথ ও জেমাল গুভেন প্রমুখ) দেখলেন, দেশকালকে কেবল আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী ইচ্ছেমতো বাঁকানো কিংবা প্রসারিত করাই যাচ্ছে না, সেই সাথে একে টুকরো করে ভেঙেচুরেও ফেলাও সম্ভব। কখনোসখনো বৃহৎ মহাবিশ্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে খুব ক্ষুদ্র স্থান বা দেশ জন্ম নিতে পারে। এটিই সেই ‘শিশু মহাবিশ্বের’ উৎপত্তির ধারণা, যেটি নিয়ে স্টিফেন হকিং একটি বই লিখেছিলেন ১৯৯৪ সালে ‘কৃষ্ণগহ্বর এবং শিশু মহাবিশ্ব’ নামে[246]।

সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টটিউট অব টেকনোলজির স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ শন ক্যারল একটি সুলিখিত বই লিখেছেন ‘ফ্রম এটর্নিটি টু হেয়ার’ নামে। কিভাবে ডিসিটার স্পেস থেকে (যে স্থানে খুব স্বল্প পরিমাণ ধনাত্মক ‘ভ্যাকুয়াম এনার্জি’ লুকিয়ে থাকে) ফলস ভ্যাকুয়াম বুদ্বুদের মাধ্যমে শিশু মহাবিশ্বের জন্ম হতে পারে, তা শন ক্যারল ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বইয়ে। সেই সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সদ্যজাত মহাবিশ্বকে জনপ্রিয় মিডিয়ায় ‘শিশু মহাবিশ্ব’ নামে অভিহিত করলেও মনে রাখতে হবে যে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে শিশু বিচ্ছিন্ন হবার পর অভিভাবকের সাথে সেই শিশু মহাবিশ্বের কোনো সম্পর্কই থাকে না। কাজেই মানুষের জৈবিক সন্তানের সাথে সাদৃশ্য করার চেষ্টা হলেও বেবি ইউনিভার্সের

---

[246] Stephen W. Hawking, Black Holes and Baby Universes and Other Essays, Bantam; First Bantam trade paper edition edition, 1994

সাথে বায়োলজিক্যাল চাইল্ডের পার্থক্য রয়েছে। খুব বেশি গাণিতিক জটিলতায় না ঢুকে নিচের ছবির মাধ্যমে শিশু মহাবিশ্ব উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হলো:

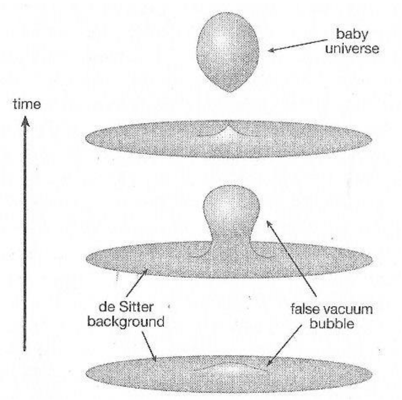

ডিসিটার স্পেসে কোয়ান্টাম দোদুল্যময়তার ফলে অসদ বুদ্বুদ তৈরির মাধ্যমে শিশু মহাবিশ্ব উদ্ভবের প্রক্রিয়া, এবং পুরো প্রক্রিয়াটি অসংখ্যবার অসংখ্যভাবে চালিত হয়ে তৈরি করতে পারে প্রায় অসীমসংখ্যক মহাবিশ্বের (শন ক্যারলের 'ফ্রম এটার্নিটি টু হেয়ার' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত)।

মাল্টিভার্সের আরেকটা জোরালো প্রমাণ এসেছে সম্প্রতি স্ট্রিং তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে, খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই। তবে সেখানে যাবার আগে চলুন স্ট্রিং তত্ত্ব নিয়েই কিছু প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেওয়া যাক।

প্রথমে আসা যাক মূল প্রশ্নে - হঠাৎ স্ট্রিং তত্ত্বের দরকার পড়ল কেন? আসলে প্রকৃতি জগতের চারটি মৌলিক বল—মহাকর্ষ, দুর্বল নিউক্লীয় তাড়িত চৌম্বক এবং সবল নিউক্লীয়—এই চারটি বল যে এক সুতায় গাঁথা, তা বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মাথায় ঘুরছিল। আইনস্টাইন প্রকৃতি জগতের বলগুলোকে একটিমাত্র সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করবার লক্ষ্যে জীবনের ত্রিশ বছর ধরে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সফল হননি। আইনস্টাইন যে প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই জায়গাটিতেই

আশার প্রদীপ হয়ে যেন হাজির হয়েছে আমাদের এই স্ট্রিং বা তন্তু তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভেতরকার বিরোধ মিটিয়ে প্রকৃতি জগতের বলগুলোকে এক সুতায় গাঁথার আভাস দিচ্ছে। সেজন্যই স্ট্রিং তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সমস্যাটা হলো স্ট্রিং তত্ত্ব মেনে নিলে আমাদের চেনাজানা জগতের ছবিটা অনেকখানি পাল্টে যায়। আমরা এত দিন ধরে ভাবতাম, ইলেকট্রন আর কোয়ার্ক-এর মতো প্রাথমিক কণিকাগুলোই মূল কণিকা (এই বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রঃ)। কিন্তু স্ট্রিং তত্ত্ব কণিকা জগতের পরিচিত এই পরিচিত ছবিকে চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করছে এই ইলেকট্রন আর কোয়ার্কগুলো আর কিছুই নয়, বরং একমাত্রিক একধরণের কম্পনশীল সুতোর কম্পনসৃষ্ট শক্তির এক -একটি রূপ। এই তন্তু বা সুতোগুলো কিন্তু সত্যই খুব ছোট, প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সমান ($১০^{-৩৩}$ সে.মি)। একটি পরমাণু কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াসেরও লক্ষ লক্ষ গুণ ছোট এরা। এরাই আসলে পদার্থের ক্ষুদ্রতম গঠন একক। এই ধারণা অনুযায়ী, যে সমস্ত কণিকাকে প্রাথমিক কণিকা বলে বিজ্ঞানে উল্লেখ করা হয় তারা সবই আসলে $১০^{-৩৩}$ সে.মি দৈর্ঘ্যের সুতার বিভিন্ন মাত্রায় কম্পনের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। গিটারের একটি তারকে বিভিন্নভাবে আঘাত করলে আমরা যেমন বিভিন্ন মাত্রার শব্দ শুনতে পাই, প্রায় একই রকম ব্যাপার ঘটে স্ট্রিং তত্ত্বের বেলাতেও। তবে স্ট্রিং তত্ত্বের স্ট্রিংগুলো কম্পিত হলে বিভিন্ন মাত্রার সুরধ্বনি পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের কণিকা। কণিকাগুলোর ভর, চার্জ, ঘূর্ণন সবকিছুই আসলে নির্ধারিত হয় স্ট্রিং-এর কম্পনের বিভিন্ন রকমফেরে। ইলেকট্রনের বেলায় স্ট্রিং এক রকমভাবে কাঁপে, আর কোয়ার্কের ক্ষেত্রে কাঁপে অন্যভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটিমাত্র স্ট্রিংই বিভিন্নভাবে স্পন্দিত হয়ে বস্তুকণার নির্দিষ্ট ভর, নির্দিষ্ট তড়িৎ আধান, নির্দিষ্ট ঘূর্ণন — এ ধরনের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু একধরনের কণা থেকে আরেক ধরনের কণাকে আলাদা করছে।

এখানেই শেষ নয়। স্ট্রিং তত্ত্ব আমাদের আরেকটি চেনা-পরিচিত ছবিতেও আঘাত করেছে খুব জোরেশোরে। এত দিন আমরা আমদের চেনাজানা বিশ্বজগৎকে জানতাম তিনটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা)। সময়কে আরেকটি মাত্রা ধরলে মাত্রার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় চারে। এই তিন মাত্রার (সময়সহ চার) ব্যাপারটা আমাদের কাছে এত দিন ধরে যেন ধ্রুব সত্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। নিউটন থেকে ম্যাক্সওয়েল, আর ম্যাক্সওয়েল থেকে আইনস্টাইন—সবাই তাঁদের পরিচিত বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক বিশ্ব (সময়সহ চার) হিসেবেই দেখেছেন—এ যেন অনেকটা আগামীকাল সূর্য ওঠার মতোই নিশ্চিত কিছু। কিন্তু স্ট্রিং তত্ত্ব আমাদের এত দিনকার বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করে বলছে—আমাদের বিশ্বজগৎ তিন বা চার মাত্রার নয়, একেবারে দশ মাত্রার। বর্তমানে স্ট্রিং তত্ত্বের যে গ্রহণযোগ্য তত্ত্বটিকে হিসেবে 'থিওরি অব এভ্রিথিং'-এর জোরালো দাবিদার হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেটাকে বলে 'এম তত্ত্ব'। এম তত্ত্বের 'এম' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা কেউ জানে না, কেউ বলেন 'মিস্ট্রি', কেউ বলেন' ম্যাজিক'। এর বাইরে 'মনস্টার', 'মেট্রিক্স', 'মাদার' থেকে শুরু করে 'মেমব্রেন' পর্যন্ত সবকিছুর অনুকল্পই আছে। কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এম তত্ত্ব আগেকার পাঁচটি স্ট্রিং তত্ত্বকে এক সুতায় গাঁথতে পেরেছে, আর এই তত্ত্বে প্রস্তাবিত মাত্রার সংখ্যা আবার একটি বেশি—এগারোটি।

এখানেই গল্প শেষ হলে তা-ও না হয় কথা ছিল। এম তত্ত্বের সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, তাঁরা সমীকরণটির অসংখ্য সমাধান পাচ্ছেন। সমাধানের সংখ্যাটা কতটা বিশাল তা হয়তো কল্পনাতেও আসবে না — ১০^{৫০০} টির মতো। যে সমস্যাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে অসীমসংখ্যক সমাধান উঠে আসে, সেই সমাধান নিঃসন্দেহে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। হচ্ছিলও। বহু স্ট্রিং তাত্ত্বিকই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সে সময়। হননি 'ব্যাড বয় অব ফিজিকস্' হিসেবে পরিচিত লিওনার্ড সাসকিন্ড-এর মতো গবেষকেরা। সাসকিন্ড হতাশ হননি, বরং উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন—'আরে এই ধরনের সমাধানই তো আমরা খুঁজছিলাম'। তিনি বললেন, ১০^{৫০০}টি

সমাধানের অর্থ হলো, কোয়ান্টাম দোদুল্যময়তার মাধ্যমে ১০^{৫০০}টির মতো ভ্যাকুয়াম স্তরের (vacuum state) উদ্ভব ঘটছে, এবং এ স্তরগুলো থেকে জন্ম নিচ্ছে আলাদা আলাদা মহাবিশ্ব, যে সমস্ত মহাবিশ্বে একেক ধরনের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র কার্যকরী হতে পারে[247]। এটাই সেই বিখ্যাত 'স্ট্রিং ল্যান্ডস্কেপ' বা 'তন্তু ভূদৃশ্যের'-এর ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয় যে আমাদের চেনাজানা কোনো নয়নাভিরাম ভূদৃশ্যের মতোই এখানেও পর্বতশীর্ষ আর আর উপত্যকার সমারোহ থাকে, তবে 'স্ট্রিং ল্যান্ডস্কেপ'-এর ক্ষেত্রে উপত্যকার খাঁজগুলোতে তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মহাবিশ্বের।

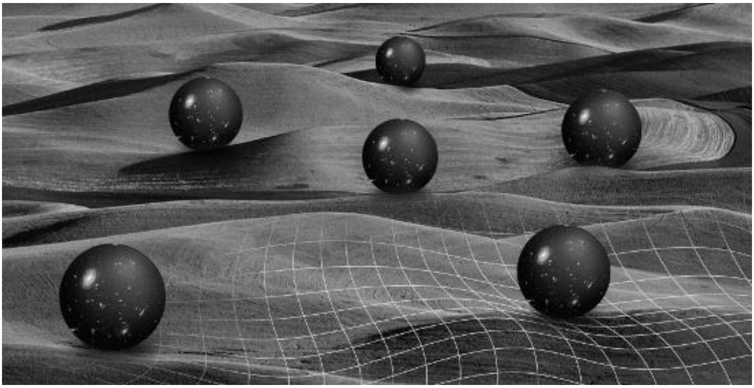

স্ট্রিং তত্ত্বের সাম্প্রতিক গণনা ১০^{৫০০} টির মতো ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বের 'ল্যান্ডস্কেপ'-এর ভবিষ্যদ্বাণী করছে।

এ প্রসঙ্গে স্টিফেন হকিং তাঁর সাম্প্রতিক 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' গ্রন্থে বলেন, এম তত্ত্বের নিয়মগুলো ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ধারণাকে সম্ভাব্য করে তুলে। মহাবিশ্বগুলোর প্রকৃতি কী রকম হবে তা নির্ভর করবে আন্তস্থানের (internal space) বক্রতার প্রকৃতির ওপর। কাজেই, এম তত্ত্ব থেকে পাওয়া সমাধান অসংখ্য

[247] Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design, Back Bay Books, 2006

মহাবিশ্ব থাকার সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তার সংখ্যা হতে পারে এমনকি $১০^{৫০০}$টিও। এর মানে হলো, আমাদের চারপাশে $১০^{৫০০}$টির মতো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং প্রতিটির ওপর কাজ করতে পারে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সূত্র।

এভাবেই সাধিত হলো স্ফীতি তত্ত্ব আর স্ট্রিং তত্ত্বের মেলবন্ধন। লিন্ডের 'চিরন্তন স্ফীতি' মডেলে যে অসংখ্য মহাবিশ্বের প্রস্তাবনা ছিল, সেগুলোকেই স্ট্রিং তাত্ত্বিকেরা খুঁজে পেতে শুরু করলেন যেন তাঁদের গাণিতিক সমীকরণের নির্ধারিত উপত্যকায়।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও সমাধান হাজির করেছে মাল্টিভার্স। পদার্থবিদদের সবচেয়ে বড় সমস্যা 'মহাজাগতিক ধ্রুবক সমস্যা'—যার কথা আমরা আগের অধ্যায়ে কিছুটা জেনেছি, সেটারও একধরনের সমাধান হাজির করেছে মাল্টিভার্স। যদি মহাজাগতিক স্ফীতির ফলে অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি হয়, তবে বিভিন্ন মহাবিশ্বে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান ভিন্ন হবে, এবং এটাই সম্ভবত বাস্তবে ঘটেছে। আমরা এমন এক মহাবিশ্বে রয়েছি যেখানে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান খুব কম; যেটা প্রকারান্তরে প্রাণের অভ্যুদয়ের জন্য সহায়ক। অন্য অনেক মহাবিশ্বেই ধ্রুবকের মান এমন যে, সে নিয়ে প্রশ্ন করার মতো হয়তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ব্যাপারটাকে অনেকটা বিজ্ঞানী কেপলারের 'সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থানগত ধাঁধার' সাথে তুলনা করা যায়। বিজ্ঞানী কেপলারের একসময় মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন: সৌরজগতের সব গ্রহ বাদ দিয়ে কেন এই পৃথিবীতেই প্রাণের উদ্ভব হলো—এই রহস্য নিয়ে। তিনি ভাবলেন, এমন কোনো মহাজাগতিক নিয়ম নিশ্চয় আছে যার কারণে পৃথিবীটা সূর্য থেকে ঠিক ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে আছে; আর ঠিক এই অবস্থানে থাকার ফলেই একসময় এখানে প্রাণের অভ্যুদয় ঘটার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কী সেই নিয়ম? তিনি দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট করে নানা ধরনের গণিত সমাধান করলেন, কিন্তু ব্যাপারটির কোনো সুরাহা করতে পারলেন না। এখন আমরা কিন্তু সহজেই বুঝতে পারি, আসলে কেপলার এক্ষেত্রে ভুল পথে চিন্তা করছিলেন।

কেপলারের পছন্দমতো কোনো 'প্রাণের উন্মেষকারী মহাজাগতিক নিয়ম' পাওয়া যায়নি, কেননা সে ধরনের কোনো নিয়মই আসলে নেই। মূল কথা হলো—সৌরজগতের অন্য সব গ্রহের মধ্যে সেই গ্রহেই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে যেখানে সূর্যের থেকে দূরত্ব, তাপ, চাপ, বায়ুমণ্ডল, আর্দ্রতা সবকিছু মিলিয়ে অনুকূল পরিবেশ ছিল। সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহগুলোতে এই প্রশ্ন করার মতো কেউ নেই, কারণ সেখানে কোনো অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আর এমন কোনো নিয়ম আসলে নেই যার বদৌলতে পৃথিবীটা সূর্য থেকে ঠিক মাপমতো জায়গায় (মানে ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে) বসবে বলে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এটা আসলে মহাবিশ্বের অসংখ্য এলোপাতাড়ি ঘটনার মাঝে ঘটে যাওয়া সাধারণ একটি ঘটনা বই কিছু নয়।

মাল্টিভার্সের ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান কেন আমাদের মহাবিশ্বে এত কম (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ১০$^{-৮}$ আর্গ)—এটা আসলে কেপলারের ঐ প্রশ্নের মতো ভুল প্রশ্ন। আসলে মাল্টিভার্সকে গোনায় ধরলে মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান একটি নয়, অসংখ্য। এই অসংখ্য মান ভিন্ন ভিন্ন মহাবিশ্বে ভিন্ন ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। অসংখ্য মহাবিশ্বের ভিড়ে আমাদের মহাবিশ্ব ধ্রুবকের একটা ক্ষুদ্র পরিসীমায় থাকা মান নিয়ে আছে বলেই, এটা নিয়ে কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে রয়েছি আমরা ।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বনাম মাল্টিভার্স

১৮৩৭ সালে ইংরেজ সাহিত্যিক রবার্ট সৌথি বাচ্চাদের জন্য একটি রূপকথার গল্প লেখেন 'গোল্ডিলক্স এবং তিন ভালুকের গল্প' শিরোনামে। সেই গল্পে গোল্ডিলক্স নামের এক কিশোরী বনের মধ্যে পথ হারিয়ে এক ভালুক-দম্পতির বাসা খুঁজে পায়। ক্ষুধার্ত কিশোরীটি বাবা ভালুকের খাবার খেয়ে দেখল সেটি খুব গরম—মুখে দিলেই মুখ পুড়ে যায়। মা ভালুকের খাবারটি খেয়ে গোল্ডিলক্স দেখল সেটি আবার খুব ঠান্ডা।

আর বাচ্চা ভালুকের খাবারটা চেখে দেখে, সেটা না গরম না ঠান্ডা একদম ঠিকঠাক তাপমাত্রার, ও সুস্বাদু। ঠিক একইভাবে বসার চেয়ার আর শোয়ার বিছানাটা পরীক্ষা করতে গিয়েও দেখে বাবা ভালুকের চেয়ারটা বেশি বড়, আর বিছানাটা খুব শক্ত, মা-ভালুকের চেয়ারটা খুব ছোট, আর বিছানাটা অনেক বেশি নরম। কিন্তু বাচ্চা ভালুকের বিছানা আর চেয়ার তার খাবারের মতোই নিখুঁত; চেয়ারটা মাপমতো, মানে না বড় না ছোট, আর বিছানাটা না নরম না শক্ত, বড়ই আরামের। অর্থাৎ বাচ্চা ভালুকের জিনিসগুলো একদম গোল্ডিলক্সের মনোমতো করেই যেন তৈরি; আর গোল্ডিলক্সের পছন্দ সেটাই।

অনেক দার্শনিক বলেন, আমাদের মহাবিশ্বটাও নাকি ঠিক গোল্ডিলক্সের মতো আমাদের জন্য ‘জাস্ট রাইট’। আর এটি এমনি এমনি হয়নি, এর পেছনে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও ডিজাইনের আলামত আছে। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস, জন ডি. ব্যারো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার প্রমুখ এ ধারণাগুলোর ধারক ও সমর্থক। এঁদের যুক্তি হলো, আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (ফাইন টিউনিং) সাহায্যে তৈরি হয়েছে যে এর একচুল হেরফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনোই প্রাণ সৃষ্টি হতো না। তাঁদের বক্তব্য হলো, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমোলজিক্যাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল, সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটেনি, বরং এর পেছনে হয়তো এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত রক্ষণশীল পদার্থবিজ্ঞানী হিউ রস, যিনি মনে করেন ‘বিগ ব্যাং তত্ত্বের জনক হচ্ছে বাইবেল’, তিনি তাঁর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ক্রিয়েটর অ্যান্ড দ্য কসমস’ নামক এক ছদ্মবিজ্ঞানময় গ্রন্থে দাবি

করেছেন, মহাজগতের প্রায় ছাব্বিশটি প্যারামিটার নাকি সূক্ষ্মভাবে সমন্বিত, একচুল এদিকওদিক হলে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটত না, আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে এরকম জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। আর হিউ রসের মতে, এটি যিশুখ্রিষ্টে বিশ্বাসী হবার জন্য ‘বাস্তব প্রমাণ’।

মূলধারার বিজ্ঞানীরা অবশ্য হিউ রস কথিত ছাব্বিশটি প্যারামিটারকে মোটেই গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন না; তাঁরা এটিকে বরং রক্ষণশীল প্রোপাগান্ডাই মনে করেন। তার পরও অনেকে বলেন, ছাব্বিশটি না হোক, অন্তত ছয়টি প্যারামিটার আছে যেগুলো মহাবিশ্বের বুকে আমাদের অস্তিত্বের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী এবং কেম্ব্রিজের রয়েল সোসাইটির রিসার্চ প্রফেসর মার্টিন রিস ২০০০ সালে একটি বই লিখেছেন এ নিয়ে ‘কেবল ছয়টি সংখ্যা’ (Just Six Numbers) শিরোনামে[248]। মার্টিন রিসের বই এবং অন্যান্য প্রামাণিক গবেষণাপত্র থেকে হদিস পাওয়া যে প্যারামিটারগুলোকে সূক্ষ্ম সমন্বয়ের জন্য জরুরি বলে মনে করা হয় সেগুলো হলো –

প্যারামিটার	**সর্বোচ্চ বিচ্যুতি**
ইলেকট্রন ও প্রোটনের অনুপাত	$১০^{৩৭}$ ভাগের ১ ভাগ
তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও মাধ্যাকর্ষণ বলের অনুপাত	$১০^{৪০}$ ভাগের ১ ভাগ
মহাবিশ্বের প্রসারণের হার	$১০^{৫৫}$ ভাগের ১ ভাগ
মহাবিশ্বের ঘনত্ব	$১০^{৫৯}$ ভাগের ১ ভাগ
মহাজাগতিক ধ্রুবক	$১০^{১২০}$ ভাগের ১ ভাগ

এর বাইরে জাগতিক মাত্রার সংখ্যা ৩ হওয়াটাও একধরনের সূক্ষ্ম সমন্বয় বলে অধ্যাপক রিস মনে করেন।

---

[248] Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape The Universe, Basic Books, 2000

সংশয়বাদী পদার্থবিজ্ঞানীরা অবশ্য বহুভাবেই দেখিয়েছেন যে, এই ছয়টি প্যারামিটারের এ ধরনের মান গ্রহণ করার পেছনে কোনো সূক্ষ্ম সমন্বয় নেই[249], বরং জানা পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যেই এর এগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব[250]।

এ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা সবাই জানি, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে একটি ধ্রুবক আছে, যাকে আমরা বলি মহাকর্ষ ধ্রুবক, G। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে দেখা যায় যে দুটি বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণ নির্ধারিত হবে ঐ মহাকর্ষ ধ্রুবকের সংখ্যাবাচক মান দ্বারা। যদি ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত তাহলে দুটি কণিকার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণও বদলে যেত। সাদা চোখে ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে। আকর্ষণ বলের তারতম্য ঘটলে এমন কী এসে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি সামান্য নয়, এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর। তাঁরা বলেন যে ঐ মহাকর্ষ ধ্রুবকের বর্তমান মান আসলে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ধ্রুবকটির মান একটু অন্যরকম হলে তারকাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে বদলে দিত। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই মহাকর্ষ ধ্রুবকের ওপরই অবশ্য নয়, মহাকর্ষ ও দুর্বল নিউক্লীয় বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে দুর্বল নিউক্লীয় বলের শক্তি যদি সামান্য একটু বেশি হতো, এই মহাবিশ্ব পুরোটাই অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেন পরমাণুতে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মামাতো ভাই, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'আইসোটোপ') হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার এর উল্টোটি ঘটলে, অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লীয় বলের শক্তিমত্তা আর একটু কম

---

[249] Victor J. Stenger, The Universe Shows No Evidence for Design,
ক্ষ্ম ধ্— http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Fallacy/NoDesign.pdf

[250] ভ শ্চক্সা্ দ স্মাশ্রক্রটস্ষ্ট্রি- Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us, Prometheus Books, 2011

হলে সারা মহাবিশ্বে কেবল থাকত শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম। কারণ সেক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রোটনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন তৈরিতে বাধা দিত। কাজেই এ ধরনের দুই চরম অবস্থার যেকোনো একটি ঘটলে মহাবিশ্বে কোনো নক্ষত্ররাজি তৈরি হওয়ার মতো অবস্থা কখন সৃষ্টি হতো না, ঘটত না আমাদের এই মলয় শীতলা ধরণীতে 'কার্বন-ভিত্তিক' প্রাণের নান্দনিক বিকাশ।

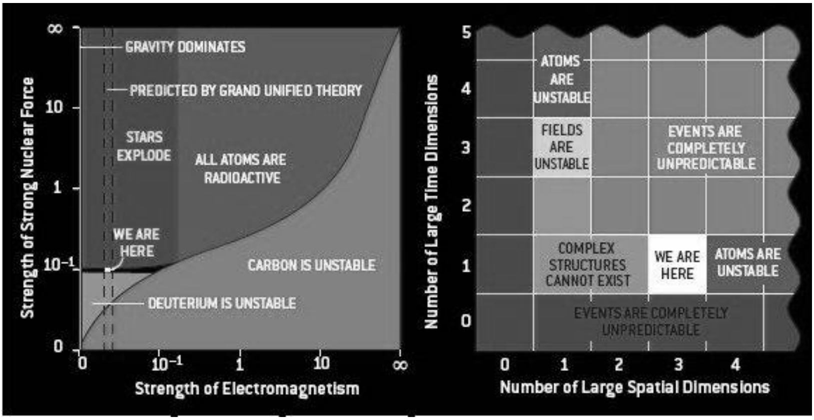

অনেক বিজ্ঞানী বলেন, খুব সীমিত পরিসরে (গোল্ডিলক্স এলাকা) জীবনের বিকাশ ঘটেছে; এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ ও মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে।

আবার, বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন ও প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম। তাঁরা মনে করেন যে এর ফলে একটি মুক্ত নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও প্রতি-নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপাদিত সকল প্রোটন ও ইলেকট্রন মিলেমিশে নিউট্রনে পরিণত হতো। এর ফলে যা ঘটত সেটি আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। এমনতর পরিস্থিতিতে খুব কম পরিমাণ হাইড্রোজেন টিকে থাকত, আর তাহলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি অবশিষ্ট থাকত না। জন ডি. ব্যারো ও ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের

রহস্যময় নানা যোগাযোগ তুলে ধরে একটি বই লিখেছিলেন ১৯৮৬ সালে, নাম 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হলো, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল কিংবা অন্য মহাজাগতিক ধ্রুবকসমূহের মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে এর উত্তর পেতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ ও মানুষের আবির্ভাবের মধ্যে। প্রাণের বিকাশ ও সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য এসব মৌলিক ধ্রুবকও পরিবর্ত রাশিগুলির মান ঠিক এমনই হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল, আর সেজন্যই ধ্রুবকগুলোর মান এ রকম হয়েছে। হঠাৎ বা দৈবক্রমে এটি ঘটেনি, বরং এর পেছনে বিধাতা পুরুষের একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা নিহিত ছিল।

মানুষকে সৃষ্টির কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মনীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ব-বাচক যুক্তি'। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটির শেষ অধ্যায়ে এ সমস্ত যুক্তির বৈজ্ঞানিক খণ্ডন উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আমি (অ.রা) দেখিয়েছি, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর পরিবর্ত রাশিগুলির মান পরিবর্তন করে বিজ্ঞানীরা (যেমন, ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'মাঙ্কি গড' কম্পিউটার প্রোগ্রাম[251]) সিমুলেশন করে আমাদের মহাবিশ্বের মতো আরও অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি করতে পারেন, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মতো পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে; এবং এ জন্য 'ফাইন টিউনিংয়ের' কোনো প্রয়োজন নেই। এছাড়া ফিজিক্যাল রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে বিজ্ঞানী অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে নীহারিকা, তারা এবং পরিশেষে কোনো একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব[252]। এখানে সেগুলো নিয়ে পুনর্বার

[251] "Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." *Philo* 3(2000): 50-67.
[252] Anthony Aguirre, "The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments", Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001.

আলোচনায় যাবার খুব বেশি ইচ্ছে নেই। এ অধ্যায়ে আমরা দেখাব যে, এত ধরনের জটিলতায় (অ্যান্থনি অ্যাগুরিসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানীর যে সমস্ত সমাধান উল্লেখ করেছি) না গিয়েও মাল্টিভার্স তত্ত্বের মাধ্যমেও এই রহস্যময় 'ফাইন টিউনিং'-এর আরো একটি সহজ সমাধান আমরা পেতে পারি।

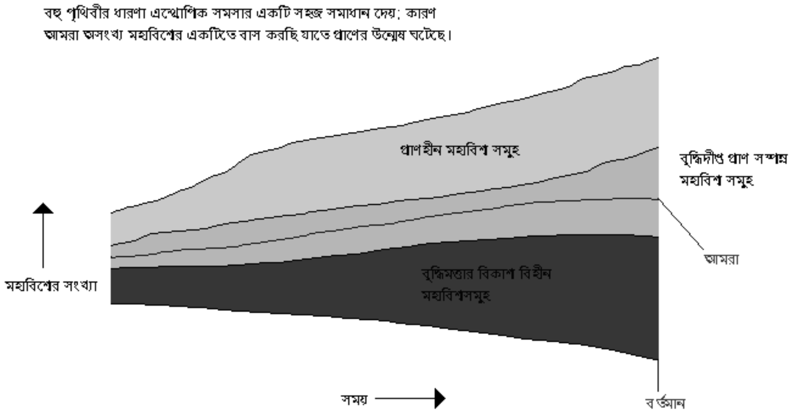

মাল্টিভার্স হাইপোথিসিস অ্যান্থ্রোপিক ও ফাইন টিউনিং আর্গুমেন্টগুলোর একটি সহজ সমাধান দেয়।

আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি, সাদামাটা কথায় মাল্টিভার্স তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভিড়ে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই একটি মহাবিশ্বে চলকগুলোর মান এমনিতেই অমন সূক্ষ্মভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়তো হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বে চলকগুলো কোনো একভাবে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! অধ্যাপক মার্টিন রিস সেটিই খুব চমৎকারভাবে একটি উপমার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন[253]:

> অসংখ্য মহাবিশ্বের ভিড়ে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। অন্য মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের সূত্র আর চলকগুলো হয়তো একেবারেই অন্যরকম হবে।...কাজেই

[253] Martin J. Rees, Other Universes - A Scientific Perspective,

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্য এখানে একেবারেই অচল। তার বদলে বরং আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অনেকটা পরিত্যক্ত সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দোকানের মজুদ যদি বিশাল হয় তবে দোকানের কোনো একটি জামা আপনার গায়ে ঠিকমতো লেগে গেলে আপনি নিশ্চয় তাতে বিস্মিত হবেন না! ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্ব যদি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহাবিশ্বের একটি হয়ে থাকে, দোকানের একটি জামার মতোই সূক্ষ্মসমন্বয় দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সম্প্রতি স্টিফেন হকিংও তাঁর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়ের 'আপাত অলৌকিকতা' অধ্যায়ে একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন[254]। তিনি তাঁর বইয়ে বলেন (গ্র্যান্ড ডিজাইন, পৃষ্ঠা ১৬৪)–

> মহাবিশ্বের পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর এতসব যাবতীয় সূক্ষ্মসমন্বয় দেখে অনেকেই ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন, এটি বোধ হয় কোনো গ্র্যান্ড ডিজাইনারের গ্র্যান্ড ডিজাইন। কিন্তু এটি কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর হলো না। আমরা বরং বৈজ্ঞানিকভাবে দেখেছি, আমাদের এই মহাবিশ্ব অসংখ্য অগণিত মহাবিশ্বরই একটি যার প্রতিটিতে কাজ করবে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সূত্রাবলি। এই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা সূক্ষ্মসমন্বয়ের অলৌকিকতাকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি, বরং এটা 'নো বাউন্ডারি কন্ডিশন'[255] এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্যান্য আধুনিক তত্ত্বেরই সফল অনুসিদ্ধান্ত।...ঠিক যেভাবে ডারউইন ও ওয়ালেস ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন - জীবজগতের আপাত অলৌকিক ডিজাইনের মতো ব্যাপারগুলো যেমনি উদ্ভূত হতে পারে কোনো ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই, ঠিক তেমনি অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা প্রাকৃতিক

---

[254] Stephen Hawking, The Grand Design, Bantam;, 2010

[255] এখানে স্টিফেন হকিং তাঁর ১৯৮৩ সালের হকিং-হার্টলে মডেলের নো-বাউন্ডারি কন্ডিশনের কথা উল্লেখ করেছেন, যে মডেলে তাঁরা সিংগুলারিটিকে বাতিল করেছেন এবং দেখিয়েছেন কোয়ান্টাম প্রভাব গোনায় ধরলে মহাবিশ্বের কোনো আদি বিন্দু থাকার দরকার নেই।

সূত্রগুলোর সূক্ষ্ম সমন্বয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে কোনো পরম করুণাময় কোনো সত্তার উপস্থিতি ছাড়াই।

অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা অনুযায়ী, আমাদের মহাবিশ্ব, যাকে এত দিন প্রকৃতির পুরো অংশ বলে ভেবে নেওয়া হতো, আসলে হয়তো এটি এক বিশাল কোনো মহাজাগতিক দানবের (অমনিভার্স) খুব ক্ষুদ্র অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থাটা এত দিন ছিল সেই বহুল প্রচলিত 'অন্ধের হস্তিদর্শন' গল্পের অন্ধ লোকটির মতো - হাতীর কান ছুঁয়েই যে ভেবে নিয়েছিল ওইটাই বুঝি হাতির পুরো দেহটা!

এখানেই কিন্তু গল্প শেষ নয়। এই মাল্টিভার্স থিওরির বাই প্রোডাক্ট বা উপজাত হিসেবে আবার ইদানীং উঠে এসেছে আরো এক ডিগ্রি মজাদার তত্ত্ব—‘সমান্তরাল মহাবিশ্ব’ বা ‘প্যারালাল ইউনিভার্স’-এর ধারণা। মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি আছে সমান্তরাল মহাবিশ্ব নিয়ে, নাম ইরন। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির পাশাপাশি সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধারণা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতেও ঠাঁই করে নিয়েছে। যেমন, সমান্তরাল মহাবিশ্ব নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিড ডেটচস ১৯৯৭ সালে একটি বই লিখেছেন The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes - And Its Implications নামে। একই দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু ২০০৬ সালে বই লিখেছেন ‘সমান্তরাল বিশ্ব’ নামে[256] ।

২০০৩ সালের মে মাসের সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সংখ্যায় ম্যাক্স টেগমার্ক Parallel Universes নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন[257]। লেখাটিতে টেগমার্ক তিনটি মডেলের সাহায্যে অত্যন্ত বিস্তৃত ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে ‘প্যারালাল ইউনিভার্স’-এর ধারণাকে পাঠকদের মাঝে তুলে ধরেন। প্যারালাল ইউনিভার্সের তত্ত্ব বলছে যে,

[256] Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor, 2006
[257] Max Tegmark, "Parallel Universes", Scientific American, May 2003

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের মধ্যে কোনো কোনোটি যে আকার, আয়তন আর বৈশিষ্ট্যে একদম ঠিক ঠিক আমাদের মহাবিশ্বের মতোই হবে না, এমন তো কোনো গ্যারান্টি নেই।

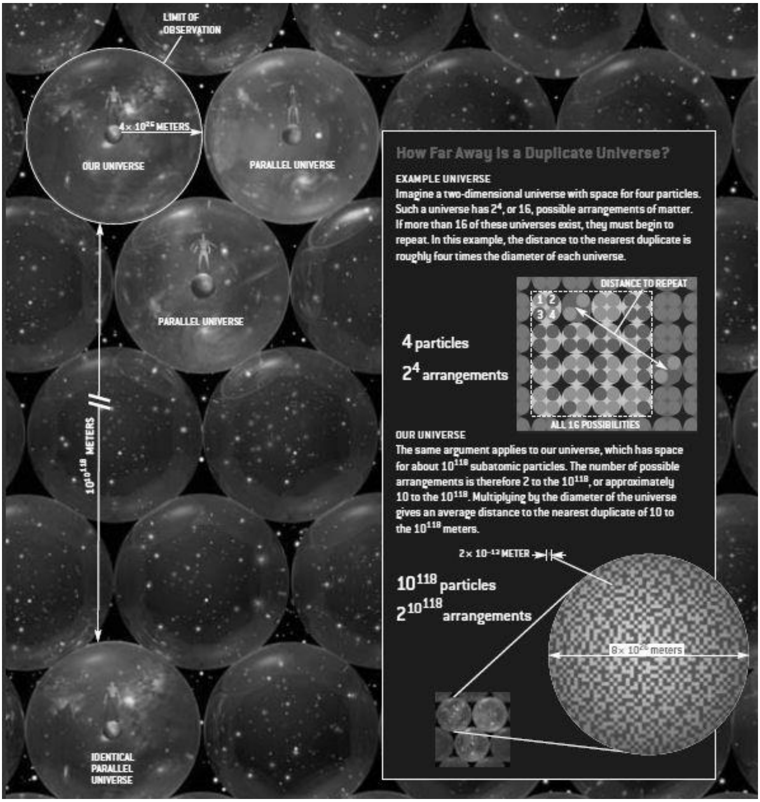

বিজ্ঞানী ম্যাক্স টেগমার্ক আমাদের জানা গণিতের সম্ভাবনার নিরিখেই হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব থেকে পায় $(১০^{১০}\ )^{১১৮}$ মিটার আমাদের মহাবিশ্বের মতোই অবিকল মহাবিশ্ব থাকতে পারে যেখানে আমাদের মহাবিশ্বের মতোই একই ধরনের প্রাকৃতিক সূত্র কাজ করছে, এমনকি সেখানে হয়তো আপনারই একজন নকল প্রতিরূপ কম্পিউটারের সামনে বসে এই লেখাটি পড়ছে, তা আপনি কোনো দিন জানতেও পারবেন না!

পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোও সেই মহাবিশ্বে একই রকমভাবে কাজ করার কথা। ম্যাক্স টেগমার্ক আমাদের জানা গণিতের সম্ভাবনার নিরিখেই হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব থেকে পায় $(১০^{১০})^{২৮}$ মিটার দূরে আপনারই এক 'আইডেন্টিকাল টুইন' হয়তো কম্পিউটারের সামনে বসে এই লেখাটি পড়ছে, তা আপনি কোনো দিন জানতেও পারবেন না!

বেশ বুঝতে পারছি, মাল্টিভার্সের ধারণাই হয়তো পাঠকদের অনেকে হজম করতে পারছেন না, তার ওপর আবার প্যারালাল ইউনিভার্স, আইডেন্টিকাল টুইন - হেনতেন চলে আসায় নিশ্চয় মাথা তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওপরের ধারণা, কিংবা তত্ত্বগুলো যতই আজগুবি মনে হোক না কেন ওগুলো নির্মাণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেননি। তার পরও সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধারণা এখনো 'সাই-ফাই', বড়জোর গাণিতিক সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবের পর্যায়েই রয়েছে, তার চেয়ে প্রচলিত মাল্টিভার্সের ধারণাগুলো বরং অনেক বাস্তব হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে। কিন্তু সেখানে যাবার আগে আমাদের একটু অক্কামের ক্ষুর সম্বন্ধে দু'-চার কথা জানা প্রয়োজন।

মাল্টিভার্সের ধারণা কি অক্কামের ক্ষুরের লঙ্ঘন?

দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের ক্ষুর' নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে। এ নিয়ে আমি (অ.রা) একটা পোস্ট লিখেছিলাম মুক্তমনা ব্লগে[258]। সোজা বাংলায় এই সূত্রটি বলে, 'অনর্থক বাহুল্য সর্বদাই বর্জনীয়'। আইডির সমর্থক অধ্যাপক জর্জ এলিস অক্কামের ক্ষুরকে ব্যবহার করেছেন মাল্টিভার্সের ধারণার বিরুদ্ধে, বলেছেন, এই তত্ত্ব অক্কামের ক্ষুরের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাঁর যুক্তি হলো, একটা মহাবিশ্ব দিয়েই যখন সমস্যা সমাধান করা যায়, হাজার কোটি মহাবিশ্ব টেনে এনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আসলে বাতুলতা মাত্র, অনর্থক অপচয়। কিন্তু এ যুক্তি ধোপে টেকে না। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের

---

[258] অক্কামের ক্ষুর (occam's razor) এবং বাহুল্যময় ঈশ্বর, মুক্তমনা, জানুয়ারি ১৯, ২০১০

অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তাঁর 'টাইমলেস রিয়ালিটি' এবং 'হ্যাজ সায়েন্স ফাউন্ড গড' বইয়ে এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলোর কোনোটাই অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে বাতিল করে দেয় না। বরং যেখানে লিন্ডের তত্ত্ব কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টির দিকেই ইঙ্গিত করছে, সেখানে কেউ যদি অযথা বাড়তি একটি প্রকল্প আরোপ করে বলেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব ছাড়া আর কোনো মহাবিশ্ব নেই, কিংবা কখনোই তৈরি হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে সেটাই বরং হবে অক্কামের ক্ষুরের লঙ্ঘন। অধ্যাপক স্টেঙ্গরের মতে, লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসা সমাধানের ভুল ধরিয়ে দিয়ে নিজের সজ্ঞাত ধারণাটি—'একটি মহাবিশ্বই টিকে থাকতে পারবে'— প্রমাণ করার দায়িত্ব থাকছে কিন্তু ওই দাবিদারদের ঘাড়েই -যারা একটিমাত্র মহাবিশ্বের ধারণায় আস্থাশীল । এখন পর্যন্ত কেউই সে ধরনের কোনো 'স্পেশাল নিয়ম' হাজির করতে পারেননি, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে কেবল একটি মহাবিশ্বই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে, অন্যগুলো বাতিল হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানী ম্যাক্স টেগমার্কও তাঁর সায়েন্টিফিক আমেরিকানের প্রবন্ধে অক্কামের ক্ষুরকে খণ্ডন করে লেখেন, একটিমাত্র মহাবিশ্বের চেয়ে অনন্ত মহাবিশ্বই বরং এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত 'সহজ সমাধান' হাজির করেছে। তাই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা অক্কামের ক্ষুরের কোনো লঙ্ঘন নয়।

কানাডার প্রিমিয়ার ইনস্টটিউটের অধ্যাপক লি স্মোলিন একটু অন্যভাবে সমস্যাটা নিয়ে ভাবছিলেন। কেন আমাদের মহাবিশ্বই টিকে রইল, অন্যগুলো রইল না এ প্রশ্নটির সমাধান দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, বায়োলজি বা জীববিদ্যা হয়তো এক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখাতে পারে। জীববিজ্ঞানে এ ধরনের ঘটনার হাজারো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। কড মাছ মিলিয়ন মিলিয়ন ডিম পাড়ে, তার মধ্যে খুব কমই শেষ পর্যন্ত নিষিক্ত হয়, আর নিষিক্ত ডিম থেকে জন্ম নেওয়া অধিকাংশ পোনাই আবার বিভিন্ন কারণে মারা যায়, কিংবা অন্য মাছদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, শেষ পর্যন্ত

দেখা যায়, খুব কম পোনাই টিকে থাকে আর তারপর পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে একটা কড মাছের ডিমের নিরানব্বই শতাংশই প্রথম মাসে কোনো- না-কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, আর বাকি যা বেঁচে থাকে তারও নব্বই ভাগ প্রথম বছরেই ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষসহ প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীরই কোটি কোটি স্পার্মের প্রয়োজন হয় কেবল এটি নিশ্চিত করতে যে এদের মধ্যে একটিমাত্র স্পার্মই বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে আর শেষপর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখবে। অর্থাৎ প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। এ ব্যাপারটিকেই চলতি কথায় যোগ্যতমের বিজয় বা 'সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট' বলা হয়। ডারউইন প্রকৃতির এই নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' যার মাধ্যমে তিনি জীবজগতের বিবর্তনকে সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন।

লি স্মোলিন ভাবলেন, জীবজগতের বিবর্তনের নিয়মের মতো 'কিছু একটা' সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের বিবর্তনের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে কি না। ইনফ্লেশনের ফলে মহাবিশ্বের ইতিহাসে যে অগুনতি সিংগুলারিটি তৈরি হয়েছিল, এমনও তো হতে পারে যে, এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটিমাত্রই টিকে রইল, যেভাবে মানবদেহে নিষেক ঘটানোর অভিপ্রায়ে মিলিয়ন শুক্রাণুর মধ্যে টিকে রয় একটিমাত্র স্পার্ম বা শুক্রাণু। তাহলে কি যোগ্যতম শুক্রাণুর মত কোন এক যোগ্যতম অদ্বৈত বিন্দু থেকেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব? কে জানে, হতেও তো পারে! তা-ই যদি হয়, তবে 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যান্থ্রোপিক আর্গুমেন্ট'-এর জন্য অতিপ্রাকৃত স্বর্গীয় সমাধান খুঁজে আর লাভ নেই। কারণ ডারউইনীয় বিবর্তনবাদী ধারণা বলছে, হয়তো এ প্রকরণগুলোই আমাদের মহাবিশ্বকে অন্যগুলো থেকে অধিকতর 'যোগ্যতম' হিসেবে আলাদা করে দিয়েছিল! তাই এটি টিকে গেছে।

অনন্ত মহাবিশ্বের সমস্যা সমাধানে লি স্মোলিনের এই বিবর্তনবাদী দর্শন খুব আকর্ষণীয় সমাধান দিলেও এটি জ্যোতিঃপদার্থবিদদের কাছ থেকে কখনোই তেমন সমর্থন পায়নি। এর কারণ মূলত দুটি। অধিকাংশ পদার্থবিদদের সবাই পদার্থবিদ্যার জানা নিয়মনীতির মধ্যে থেকেই এই রহস্যের সমাধান চান- হঠাৎ করেই এক ভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মাধ্যমে একধরনের 'গোঁজামিল' দেওয়া ব্যাখ্যা নয়; আর তাছাড়া লি স্মোলিন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলছেন তার কোন গাণিতিক মডেল উপহার দিতে পারেননি যা পদার্থবিদদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার এক অন্যতম পূর্বশর্ত।

আর তার চেয়েও বড় কথা হলো বিজ্ঞানীরা মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পেতে শুরু করেছেন সম্প্রতি।

এলো মাল্টিভার্সের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ

মাল্টিভার্সের ধারণা বিজ্ঞানীরা হাজির করার পর থেকেই একে বিভিন্ন সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত মাল্টিভার্স নামের এই বিপ্লবাত্মক ধারণার প্রতি সমালোচনার তীর ছুড়ে বলা হতো- এই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা সঠিক নাকি ভুল, তা এই মুহূর্তে পরীক্ষা করে বলবার কোনো উপায় নেই। কার্ল পপার 'ফলসিফায়েবিলিটি'র যে বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে নির্ধারিত করে রেখেছেন, তার আওতায় কিন্তু মাল্টিভার্স পড়তো না বলে ভাবা হতো। সমালোচকরা বলতেন, গাণিতিক বিমূর্ততায় ঠাসা মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা যতটুকু না বাস্তবতার কাছাকাছি, তার চাইতে ঢের বেশি কাছাকাছি অধিপদার্থবিদ্যার (মেটা ফিজিকস)। কাজেই এটি বিজ্ঞান হয় কী করে?

মাল্টিভার্সের সমর্থকরা ফলসিফায়াবিলিটি বা যাচাইযোগ্যতার খুব ভালো জবাব দিতে না পারলেও সে সময় মিনমিন করে বলতেন, ওই অধিপদার্থবিদ্যা আর পদার্থবিদ্যার মাঝখানের সীমারেখাটা যতই দিন যাচ্ছে ততই ছোট হয়ে আসছে।

অতীতে আমরা দেখেছি পর্যবেক্ষণবিরোধী বহু তত্ত্বই—যেমন গোলাকার পৃথিবীর ধারণা, অদৃশ্য বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র, উচ্চগতিতে ভ্রমণকালে সময় শ্লথতা, কোয়ান্টাম উপরিপাতন, স্থান-কালের বক্রতা, কৃষ্ণগহ্বর ইত্যাদি সবকিছুই শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে। অনন্ত মহাবিশ্বকেই বা আমরা তালিকায় রাখতে পারব না কেন?

এখন অবশ্য সময় পাল্টেছে। মাল্টিভার্সের সমর্থকদের আর মিনমিন করে জবাব দিতে হচ্ছে না। আগেই বলেছি, পদার্থবিজ্ঞানের অন্তত তিনটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্র—স্ট্রিং তত্ত্বের ‘ল্যান্ডস্কেপ’, স্ফীতি-তত্ত্ব থেকে পাওয়া সমাধান এবং গুপ্ত শক্তির নিম্নমান—সবাই এক বাক্যে মাল্টিভার্সের অস্তিত্বের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। এর বাইরে আছে ‘কোয়ান্টাম মাল্টিভার্স’ এবং ‘হলোগ্রাফিক মাল্টিভার্সের’ নীরব উপস্থিতি[259]। আরো বড় ব্যাপার, এই সব তত্ত্বকথার পাশাপাশি কিছু পরীক্ষালব্ধ প্রমাণও হাজির করা যাচ্ছে। অনেকেই বলছেন, মাল্টিভার্স আর ধারণা কিংবা ‘স্পেকুলেশন’-এর পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং ক্রমশ হয়ে উঠেছে যেন শক্তপোক্ত বিজ্ঞান!

বছর কয়েক আগে স্ফীতি তত্ত্বের জনক অ্যালেন গুথ এবিসি নিউজ রিপোর্টারের কাছ থেকে অদ্ভুত এক ফোন কল পেলেন। রিপোর্টার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আমাদের মহাবিশ্ব যদি ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদের একটি হয়ে থাকে, তাহলে অন্য মহাবিশ্বের (মহাবিশ্বগুলোকে বাতাসে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য সাবানের বুদ্বুদের মতো কল্পনা করুন) কোনো একটির সাথে টক্কর লেগে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু? গুথের হাতে তাৎক্ষণিক কোন হিসাব ছিল না। তবে নিজের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এর একটি সম্ভাব্য উত্তর দিয়েছিলেন তিনি, এবং বলা বাহুল্য, তাঁর উত্তরটি তেমন কোনো নাটকীয় কিছু ছিল না। কিন্তু এবিসির অনুষ্ঠান শেষ হবার পর গুথ প্রশ্নটি নিয়ে খুব গুরুত্ব দিয়ে ভাবা শুরু করলেন। সত্যিই তো এরকম টক্কর লাগলে কী হবে? সেটা কি আমাদের মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি নিয়ে

[259] Brian Greene, The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos, Vintage, 2011

আসবে? আমাদের পর্যবেক্ষণে কি সেটা ধরা পড়বে? তিনি ব্যাপারটি সমাধানের জন্য তাঁর দুই দিকপাল বন্ধু আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন ও জমি গ্যারিগার সাথে মিলে এক গবেষকদল তৈরি করলেন[260]।

তাঁরা হিসাব করে দেখলেন এ ধরনের সংঘর্ষ হবার এবং সেই সংঘর্ষে আমাদের মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু ধ্বংস না হলেও ছোটখাটো ঠোকাঠুকি কি হতে পারে, যাতে মহাবিশ্বের জীবন সংশয় হয়তো ঘটবে না, কিন্তু মহাবিশ্বের গায়ে তৈরি করবে বেদনার রক্তিম কিছু ক্ষত?

এই ব্যাপারটিই বেরিয়ে এল লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক স্টিফেন ফিনি আর তাঁর দলবলের অনুসন্ধানী গবেষণা থেকে। তাঁরা জানতেন যে এ ধরনের 'ক্ষত' আবিষ্কার করার একমাত্র জায়গা হচ্ছে নাসার উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ এনিসোট্রপি প্রোব ডেটা যাকে প্রচলিতভাবে অভিহিত করা হয় WMAP ডেটা হিসেবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ পরিমাপের জন্য এই WMAP ডেটা ব্যবহার করে থাকেন। মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্ব প্রসারণের ফলে ধীরে ধীরে যে শীতল হয়ে পরম শূন্যের প্রায় ৩ ডিগ্রি ওপরে এসে পৌঁছেছে, সেটা এই WMAP ডেটায় ধরা পড়েছিল, এবং এটিই ছিল মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং-এর প্রথম পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ, এর জন্য পেনজিয়াস এবং উইলসন একসময় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই WMAP ডেটাকে এখন গুপ্ত পদার্থ ও গুপ্ত শক্তি শনাক্তকরণ, মহাবিশ্বের স্ফীতির নিখুঁত হার নির্ণয়সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি নাসা তার বিগত সাত বছরের WMAP ফলাফল প্রকাশ করেছে[261]। সেই ফলাফলের ওপরেই চোখ রাখলেন স্টিফেন ফিনি। তাঁরা জানতেন, অতীতে যদি মহাজাগতিক বুদ্বুদীয় কোনো সংঘর্ষ ঘটে থাকে, তবে তার প্রভাব

[260] Zeeya Merali, Will Our Universe Collide With a Neighboring One?, Discover, October 2009 issue; published online November 4, 2009

[261] WMAP PRODUCES NEW RESULTS, http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html

WMAP ডেটায় পড়বে। কারণ এ ধরনের সংঘর্ষ 'আন্তবুদ্বুদীয় মহাজগতে একধরনের বিষমস্বাত্বক বিকৃতি (inhomogeneities in the inner-bubble cosmology) তৈরি করবে, যা মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণে ধরা পড়তে বাধ্য। স্টিফেন ফিনি এবং তাঁর দল 'মডুলার এজ ডিটেকশন এলগোরিদমের' সাহায্যে WMAP ডেটায় সংঘর্ষের ক্ষতস্থানগুলো নির্ণয় করলেন। তারা দেখলেন অন্তত চারটি জায়গায় এরকম সংঘর্ষের আলামত পাওয়া যাচ্ছে; তার মানে অতীতে অন্তত চারবার আমাদের মহাবিশ্বের সাথে খুব ছোট স্কেলে হলেও অন্য মহাবিশ্বের বুদ্বুদীয় সংঘর্ষ ঘটেছিল। স্টিফেন ফিনির সম্পূর্ণ পেপারটি মুক্তমনা থেকে পড়া যাবে[262]।

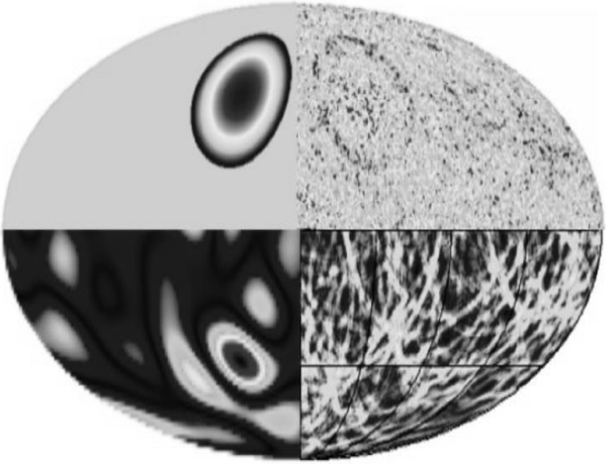

মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণের উপাত্তে খুঁজে পাওয়া চক্রাকার ক্ষত — বুদ্বুদীয় সংঘর্ষ এর আলামত। স্টিফেন ফিনির গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে জানা যাচ্ছে, অতীতে অন্তত চারবার আমাদের মহাবিশ্বের সাথে খুব ছোট স্কেলে অন্য মহাবিশ্বের সাথে বুদ্বুদীয় সংঘর্ষ ঘটেছিল। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরেও অন্য অনেক মহাবিশ্ব থাকার প্রথম পরোক্ষ প্রমাণ বলে একে অভিহিত করা হচ্ছে

[262] Stephen M. Feeney, First Observational Tests of Eternal Inflation, http://mukto-mona.net/Articles/avijit/multiverse/supporting_doc/Feeney_multiverse_observational_test.pdf

একটি ব্যাপার এখনো বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা এখনো কিন্তু এই ফলাফলকে সংশয়ের চোখেই দেখছেন, এবং স্টিফেন ফিনি নিজেও এটি ভালো করে জানেন। তিনি নিজেই সেটি স্বীকার করে বলেন,

> মহাজাগতিক বিকিরণের মতো এত বড় উপাত্ত-সমাবেশে এ ধরনের ছোটখাটো ভিন্নতা থাকাটা আর সেটা খুঁজে পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিঃসন্দেহে আমাদের এই গবেষণা এ ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ, কিন্তু এখনো নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নয় যদিও।

আমাদেরও কিন্তু এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে। তার পরও বলব, যদিও স্টিফেন ফিনীর এই পরীক্ষার ফলাফল এখনো চূড়ান্ত নিশ্চয়তা প্রদানকারী কিছু নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের জগতে এটি একটি আশাবাদী ঘটনা। আর দর্শনগত দিক থেকে তো ব্যাপারটির গুরুত্ব অসীম। মাল্টিভার্স হাইপোথিসিসকে অনেকেই এত দিন ভ্রু কুঁচকে বিজ্ঞানের বাইরে ঠেলে দিতে চাইতেন। এ ধরনের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো যেন একে বিজ্ঞানের জগতে প্রথমবারের মতো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল শক্তিশালীভাবে। এই ধরনের গবেষণা থেকেই বেরিয়ে আসছে যে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরেও অসংখ্য মহাবিশ্ব হয়তো ছড়িয়ে আছে, যেগুলোর কোনোটির সাথে হয়তো আমাদের মহাবিশ্বের সংঘর্ষ সংগঠিত হয়েছিল সুদূর অতীতে। আর বিজ্ঞানীরা কেবল এই ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করে বসে নেই; আমরা জানি, তাঁরা ভবিষ্যতে আরো অনেক পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন এই অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য। এমনি একটি ভবিষ্যৎ পরীক্ষা হচ্ছে লিসা স্যাটেলাইটের (Laser Interferometer Space Antenna, সংক্ষেপে LISA) উৎক্ষেপণ। বিজ্ঞানীরা এর জন্য এখনই উদগ্রীব হয়ে বসে রয়েছেন। লিসা ভবিষ্যতে আমাদের শক-তরঙ্গ শনাক্তকরণের মাধ্যমে আরো নিশ্চিতভাবে জানাতে পারবে সত্যিই বহির্বিশ্বে আরো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে কি না, আর সত্যই অতীতে আমাদের সাথে লেগেছিল নাকি কারো বুদ্বুদীয় টক্কর। যদি

লিসা আমাদের অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করতে পারে, তবে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, কারণ এই ফলাফল দেবে অনন্ত মহাবিশ্বের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, যা সূচনা করবে আরেকটি কোপার্নিকাসীয় বিপ্লবের।

আমরা বইটি শুরুই করেছিলাম এই বলে—'শূন্য আর অসীম, এরা যেন একে অন্যের যমজ। যেখানে শূন্য সেখানেই সীমাহীনতা'। মাল্টিভার্স যেন সেই দার্শনিক অভিব্যক্তিরই সার্থক প্রতিচ্ছবি। বিজ্ঞান আজ আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, স্ফীতি তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হচ্ছে, এবং সংখ্যায় সেগুলো এটি দুটি নয়, প্রায় অসীমসংখ্যক! শূন্য আর অসীম যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মাল্টিভার্সের জগতে এসে। রবি ঠাকুরের গানের কথাগুলো মনে পড়ছে খুব - 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর' ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অন্তিম প্রশ্নের মুখোমুখি: কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?

‘বিশ্বাস কোনো কিছুরই উত্তর দেয় না, কেবল প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখে’।

— **ফ্রেটার রেভাস**

কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?—প্রথম কবে এ প্রশ্নটির মুখোমুখি হয়েছিলাম তা আজ মনে নেই। সম্ভবত জঁ-পল সাত্রের (১৯০৫-১৯৮০) অস্তিত্ববাদী দর্শন ‘বিয়িং এ্যাণ্ড নাথিংনেস’ কিংবা মার্টিন হাইডেগারের (১৮৮৯-১৯৭৬) অধিপদার্থবিদ্যা-বিষয়ক বই ‘ইন্ট্রোডাকশন টু মেটাফিজিকস্’ পড়তে গিয়ে। শেষোক্ত বইটির প্রথম লাইনটিই বোধ করি ছিল—‘হোয়াই দেয়ার ইজ সামথিং রাদার দেন নাথিং?’। তার পর থেকে বহু বইয়ে, অসংখ্য জায়গাতেই এর উপস্থিতি টের পেয়েছি। দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০) তাঁর ‘সাম প্রবলেমস অব ফিলসফি’ গ্রন্থে এ প্রশ্নটিকে চিহ্নিত করেছিলেন ‘অন্ধকারতম দর্শন’ হিসেবে। জ্যোতিঃপদার্থবিদ স্যার আর্থার বার্নার্ড লোভেল (১৯১৩-২০১২) একে দেখেছেন ‘ব্যক্তির মনকে ছিন্নভিন্ন করা’ প্রশ্ন হিসেবে। এ বিষয়ে আমার পড়া এখন পর্যন্ত সর্বশেষ বই জিম জোল্টের ‘হোয়াই ডাস দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সিস্ট’ (২০১২)[263]। বাংলা করলে দাঁড়ায়—‘কেন বিশ্ব অস্তিত্বমান?’

[263] Jim Holt, Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story, Liveright, 2012

বইয়ের এক জায়গায় লেখক রসিকতা করে বলেছেন, ‘সাইকিয়াট্রিক রোগীরা বরাবরই এই প্রশ্ন দিয়ে আচ্ছন্ন থাকে’!

মানসিক রোগীরা সত্যই এই ধরনের প্রশ্ন দিয়ে আচ্ছন্ন থাকে কিনা জানি না, তবে জিম জোল্ট বইয়ের শুরুতেই রসিকতা করে ‘অস্তিত্বের সহজ প্রমাণ’ হিসেবে যা লেখা আছে, তা মানসিক রোগীর মতোই শোনায় বটে -

ধরুন, দেয়ার ওয়্যার ‘নাথিং’। নাথিং মানে কিছু না, এমনকি কোনো নিয়মনীতি কিছুই নাই। কারণ, নিয়ম থাকা মানেই কিছু একটা থাকা।
কোনো নিয়ম না থাকার মানে, যেকোনো কিছুই সেখানে ‘পারমিটেড’।
যদি সবকিছুই পারমিটেড হয়, তাইলে ‘নাথিং উইল বি ফরবিডেন’!
তাই, ‘নাথিং’ বলে কিছু থাকলে ‘নাথিং উইল বি ফরবিডেন’।
অর্থাৎ, নাথিং ব্যাপারটা ‘সেলফ ফরবিডিং’।
সো, দেয়ার মাস্ট বি ‘সামথিং’।

দার্শনিকদের পাশাপাশি আছেন ধার্মিকরাও। কিছুদিন আগ পর্যন্ত এ প্রশ্নটি ধর্মবেত্তাদের প্রিয় একটি প্রশ্ন হিসেবে বিরাজ করেছিল। বিজ্ঞানীদের মুখে কুলুপ আঁটাতে এ প্রশ্নটি উচ্ছ্বাসভরে ব্যবহার করা হতো। হ্যাঁ, ‘হোয়াই দেয়ার ইস সামথিং রাদার দ্যান নাথিং’-এ প্রশ্নটি সত্যই ছিল বিজ্ঞানীদের প্রতি বড়সড় চ্যালেঞ্জ; প্যালের ঘড়ি, হয়েলের বোয়িং, কিংবা হাল আমলের হুমায়ুনের নাইকন ক্যামেরা যেমন ধার্মিকদের তৃপ্তির ঢেকুর উৎপাদন করত, এই প্রশ্নটিও অনেকটা বিজ্ঞান-ধর্মের বিতর্কে বিজ্ঞানের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার মতোই হয়ে উঠেছিল যেন অনেকের কাছে[264]। মূল ধারার বিজ্ঞানীরা এত দিন ধরে এর উত্তর প্রদানে অনীহ এবং নিশ্চুপই

[264] প্যালের ঘড়ি, হয়েলের বোয়িংসহ বিভিন্ন সৃষ্টিবাদী যুক্তির খণ্ডন পাওয়া যাবে অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীর লিখিত ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুনর্মুদ্রণ ২০১২) গ্রন্থে। এ ছাড়া দেখা যেতে পারে মুক্তমনায় প্রকাশিত নিচের লেখাগুলোও—
* ভ্রান্ত ধারণা: ঘড়ির যেমন কারিগর লাগে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরির পেছনেও কারিগর লাগবে; লিঙ্ক - http://mukto-

ছিলেন বলা যায়। অনেকে আবার এ ধরনের প্রশ্ন 'বিজ্ঞানের বিষয় নয়' বলে পাশ কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। এখন অনেক বিজ্ঞানীই আস্থার সাথে অভিমত দিচ্ছেন যে তাঁরা এর উত্তর জানেন। উত্তরের নিশ্চয়তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ধর্ম ও দর্শনের বলয়ে পড়ে থাকা এ প্রশ্নটিতে পদার্থবিজ্ঞানীরা যে নাক গলাতে শুরু করেছেন, এবং এ নিয়ে একটা অবস্থানে পৌঁছুতে চাইছেন সেটি এখন মোটামুটি নিশ্চিত। সেজন্য বেশ ক'বছর ধরেই দেখছি পদার্থবিজ্ঞানীদের লেখা বইগুলোতে বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসতে। আমরা পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'গড দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস' শীর্ষক গ্রন্থে এর উল্লেখ ও ব্যাখ্যা দেখেছি, দেখেছি বিজ্ঞানী হকিং-ম্লোডিনোর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়েও। আর এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিদ লরেন্স ক্রাউসের 'A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing'[265]। বাংলা করলে বলতে পারি—'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব —কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?' বইটিতে পদার্থবিদ ক্রাউস পদার্থবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে শূন্য থেকে আমাদের চিরচেনা বিপুল মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে একেবারেই প্রাকৃতিক উপায়ে। যারা লরেন্স ক্রাউসের ব্যাপারে জানেন না,তাঁদের জন্য দু লাইন বলি। অধ্যাপক লরেন্স ক্রাউস বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সুপরিচিত জ্যোতিঃপদার্থবিদ, পিএইচডি করেছিলেন এমআইটি থেকে ১৯৮২ সালে এবং বর্তমানে অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অরিজিন' নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের কর্ণধার। এই প্রজেক্টে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, পদার্থের উৎপত্তি থেকে প্রাণের

---

mona.com/evolution/QA/first_WilliamPaley_ design_physics.htm

* ভ্রান্ত ধারণা: সরল অবস্থা থেকে এত জটিল জীবজগতের উদ্ভব ঘটা জাঙ্ক ইয়ার্ডে ফেলে রাখা জঞ্জাল থেকে এক ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে এক বোয়িং বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মতোই অসম্ভব। লিঙ্ক -http://mukto-mona.com/evolution/QA/hoyle_boeing.htm

* রায়হান আবীর, মঙ্গলের বুকে পড়ে থাকা সেই নাইকন ক্যামেরাটি, মুক্তমনা, জুলাই ৩১, ২০১২, লিঙ্ক - http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=27782

[265] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012.

উৎপত্তিসহ নানা ধরনের প্রান্তিক বিষয়-আশয় নিয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করা হয়।

ক্রাউসের বইটিতে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে দর্শনের সবচেয়ে প্রগাঢ় সমস্যাটি—আমাদের অস্তিত্বের একদম গোড়ার সমস্যা – কেনইবা একেবারে কিছু না থাকার বদলে গ্যালাক্সি, তারকাপুঞ্জ, সৌরজগৎ, পৃথিবী, জীবজগৎসহ এত কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের চারপাশজুড়ে। এত কিছু থাকার বদলে নিঃসীম আঁধার থাকলেই বা কী ক্ষতি ছিল?

ক্রাউসের বইটির মুখবন্ধে বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স বলেছেন, 'জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিজ যেমনি, জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রাউসের শূন্য থেকে মহাবিশ্বও তেমনি'। ডারউইনের বইয়ে বর্ণিত বিবর্তন তত্ত্ব যেমন জীবজগতের ক্ষেত্রে কোন অপ্রাকৃত সত্ত্বা থাকার অনুকল্পকে বাতিল করে দিয়েছে, ক্রাউসের বইও জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে কোনো অপ্রাকৃত বা অপার্থিব সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকার সকল দাবিকে বাতিল করে দিয়েছে। ক্রাউসের বইটির শিরোনামটিই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ধার্মিকদের ছুড়ে দেওয়া প্রিয় এ প্রশ্নকে উপজীব্য করে। বলা বাহুল্য যে সমস্ত মূলধারার পদার্থবিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ লেখায়, তাঁরা সবাই বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই সমস্যাটি মোকাবিলা করেছেন এবং সমাধানে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন, ধর্মবেত্তা কিংবা দার্শনিকদের মতো জল ঘোলা না করে। যেমন, ক্রাউস তাঁর বইয়ে বলেছেন ('শূন্য থেকে মহাবিশ্ব', পৃষ্ঠা ১৪৩) –

> আমাদের মহাবিশ্বের আধুনিক বিজ্ঞানের ছবি, এর ইতিহাস, সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ, ও সর্বোপরি শূন্য বলতে আসলে কী বোঝায় তা অনুধাবন এবং পর্যালোচনা করে আমরা এটুকু বলতে পারি যে, এখন এ প্রশ্নটিকে মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছি।

লরেন্স ক্রাউস কোনো অতিশয়োক্তি করেননি। একটা সময় ভাবা হতো 'নাথিং' ব্যাপারটা হচ্ছে বস্তুর কিংবা জগতের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা, আর 'সামথিং' ব্যাপারটা আরোপিত। যেমন জার্মান গণিতবিদ লিবনিজ তাঁর ১৬৯৭ সালে লেখা 'অন আল্টিমেট অরিজিন অব থিংস' নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে অভিমত দেন এই বলে যে, 'নাথিং' ব্যাপারটা স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু অন্যদিকে 'সামথিং' ব্যাপারটা অর্জন করতে কাজ করতে হয়[266]। আর বাইরের কোনো কিছুর হস্তক্ষেপ ছাড়া এমনি এমনি নাথিং থেকে সামথিং-এ উত্তরণ ঘটে না। লিবনিজের কাছে এর সমাধান ছিল যথারীতি 'ঈশ্বর'।

তার পর থেকে এভাবেই আমাদের দিন গেছে। 'কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?' উত্তর খুব সোজা কারণ হলেন ঈশ্বর। আসলে স্টিফেন হকিং এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য 'ট্যাট্না' বিজ্ঞানীদের হাতে সত্তরের দশকে 'কোয়ান্টাম কসমোলজির' জন্ম হবার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞান এর বিপরীতে সফল উত্তর দিতে পারেনি, ঠিক যেমনি ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত আমরা প্যালের ডিজাইন আর্গুমেন্টকে ঠিকমতো দলাইমলাই করার উপকরণ খুঁজে পেতাম না। তারপরেও কিছু ঘাড়ত্যাড়া দার্শনিক যে ছিলেন না তা নয়। তাঁরা এ ধরণের 'হোয়াই দেয়ার ইজ সামথিং রাদার দ্যান নাথিং' মার্কা প্রশ্ন মুচকি হেসে বলতেন, তা যদি 'নাথিং' ব্যাপারটা এতো স্বাভাবিক আর স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তাহলে ঈশ্বরেরই বা থাকার দরকার কী ছিল? Why there is God rather than nothing?[267] 'নাথিং' বাবাজিকে প্রতিহত করতে অদৃশ্য অপ্রমাণিত ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে দেখানো যাবে, কিন্তু বাস্তব যে মহাবিশ্বটা আমরা চোখের সামনে হরহামেশা দেখছি সেটাকে 'কুত্রাপি নয়', এ ব্যাপারটা একটু হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে না? এমনকি অন্তিম প্রশ্নগুলোর উত্তর হিসেবে ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল করে হাজির করার ব্যাপারটা যে আসলে কোনো উত্তর নয়, তা

[266] Leibniz, "On the Ultimate Origination of the Universe", 1697
[267] Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007

কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের মাথায়ও এসেছিল। এ জন্যই 'সত্যের সন্ধান' বইয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন – 'ঈশ্বর সময়কে সৃষ্টি করেছেন কোন সময়ে?' অথবা 'স্থানকে সৃষ্টি করা হলো কোন স্থান থেকে?' কিংবা 'শক্তি সৃষ্টি করা হলো কোন শক্তি দ্বারা?'[268]। ধার্মিকেরা এই ধরনের প্রত্যুত্তরে খুব একটা ভালো উত্তর কখনোই দিতে পারেননি। বরং গোস্বা করেছেন। এক দুর্মুখ নাস্তিক একবার খ্রিষ্টীয় ধর্মবেত্তা সেন্ট অগাস্টিনকে জিজ্ঞেসা করেছিল – 'ফাদার, এই মহাবিশ্ব বানানোর আগে ঈশ্বর বাবাজি কী করছিলেন বলুন তো?' অগাস্টিন রাগে ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোদের মতো লোক, যারা এ ধরনের প্রশ্ন করে, তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করছিলেন ঈশ্বর'!

তবে ধার্মিকেরা গোস্বা করলেও সংশয়বাদী দার্শনিকেরা সবসময়ই লিবনিজের উপসংহারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে গেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। আগেও করেছেন, এখনো করছেন। যেমন, জার্মান দার্শনিক এডলফ গ্রুনবোম তাঁর 'দ্য পভার্টি অব থিইস্টিক কসমোলজি' শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে পদ্ধতিগতভাবে লিবনিজের উপসংহারের সমালোচনা হাজির করেছেন[269], এই সময়ের প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী শন ক্যারল সেটা তাঁর একটি ব্লগে উল্লেখ করেছেন[270]।

তবে দার্শনিকেরা তাঁদের দার্শনিক প্যাঁচঘোচ থেকে উত্তর বের করতে পারলেও আমার মতে সেগুলো ছিল মোটা দাগে স্রেফ 'পিছলামি কথার খেলা', বৈজ্ঞানিক কোনো সমাধান নয়। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো লিবনিজের সময়কালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং এ-সংক্রান্ত অগ্রগতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। চোখের সামনে দেখা বিশ্বজগতের জন্য যে নিয়ম প্রযোজ্য, সেটার ভিত্তিতেই

---

[268] আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ।

[269] Grunbaum, Adolf. "The Poverty of Theistic Cosmology" in Brit. J. Phil. Sci. 55, 4, 2004.

[270] দেখুন, Sean Carroll, Why Is There Something Rather Than Nothing?, http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2007/08/30/why-is-there-something-rather-than-nothing/#.UMTdlHep2L8

তাঁরা এবং তাঁদের মতো দার্শনিকেরা সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁরা জানতেন না যে, তাঁদের দৃশ্যমান জগতের বাইরে বিশাল একটা জগৎ আছে; এই সেই আন্তপারমাণবিক জগৎ, যে জগতের নিয়মগুলো অনেকটা হ্যারি পটারের গল্পের 'হগওয়ার্টস স্কুল'-এর নিয়মকানুনের মতোই অদ্ভুত। আমাদের দৃশ্যমান জগতে আমরা শূন্য থেকে কিছু তৈরি হতে দেখি না, কিংবা আমরা আমাদের বাড়ির ইটের দেয়াল ভেদ করে হেঁটে ওপারে চলে যেতে পারি না। কিন্তু কোয়ান্টাম জগৎ যেন ভিন্ন, এখানে কণা আর প্রতিকণারা রীতিমতো শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়, নিশ্চিত অবস্থান নেওয়ার বদলে সম্ভাবনার বলয়ে থাকতে পছন্দ করে, আর মাঝেমধ্যেই তারা 'কোয়ান্টাম টানেলিং'-এর মাধ্যমে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীর গলে চলে যায় অশরীরী সত্তার মতোই। কোয়ান্টাম জগতের নিয়মকানুনগুলোকে অবাস্তব ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। এটা আমার এই প্রবন্ধের মতোই নিখাদ বাস্তব। যাঁরা ইলেকট্রনিকসের যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁরা সবাই টানেল ডায়োড ও জোসেফসন জংশনের কথা জানেন[271], এগুলো কিন্তু কোয়ান্টাম রাজ্যের হ্যারি পটারের সেই 'হগওয়ার্টস স্কুল'-এর মতো নিয়মকানুনের উপর ভর করেই চলে। এমনকি আমাদের পরিচিত সুয্যি মামার ভেতরে অনবরত যে হাইড্রোজেনের ফিউশন ঘটে চলছে বলে আমরা জানি, সেটাও কিন্তু কোয়ান্টাম জগতের নীতি মেনেই হচ্ছে[272]।

বিগত সত্তর এবং আশির দশকে বিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখলেন, কোয়ান্টাম জগতে 'নাথিং' ব্যাপারটি ডিফল্ট কিছু নয়, বরং 'সামথিং' ব্যাপারটাই বরং সেখানে 'ডিফল্ট'। নাথিং ব্যাপারটা সেখানে মোটা দাগে 'আনস্টেবল' বা অস্থিতিশীল। শূন্যতা অস্থিতিশীল বলেই ওটা কখনো শান্ত-সমাহিতভাবে পড়ে থাকতে পারে না, সেখানে অনবরতভাবে তৈরি হতে থাকে অসদ

[271] লিও এসাকি, ইভার গিয়াভার ও ব্রায়ান জোসেফসন ১৯৭৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এসাকি টানেল ডায়োড আবিষ্কার করেছিলেন, এবং ব্রায়ান জোসেফসন আবিষ্কার করেছিলেন জোসেফসন জাংশন। এ দুটো যন্ত্রই কোয়ান্টাম টানেলিং-এর মাধ্যমে কাজ করে।

[272] বিজ্ঞানী হ্যান্স বিথে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরস্কার পান তারার ভেতরকার ফিউশন-প্রক্রিয়া সফলভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।

কণিকা, অহর্নিশি চলতে থাকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের রহস্যময় খেলা। আমরা আমাদের বইয়ে আগে আলোচনা করেছি—অ্যারিস্টটল একসময় প্রকৃতিজগৎ দেখে মন্তব্য করেছিলেন, ‘প্রকৃতি শূন্যতাকে একদম পছন্দ করে না’ (Nature abhors a vacuum)। এমনকি শূন্যতাকে দেখা হতো ‘ব্লাসফেমি’ হিসেবে। কিন্তু পরে বিজ্ঞানী টরিসেলি পারদ নিয়ে ঐতিহাসিক পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়ে দেন যে, শূন্যতা ইচ্ছে করলেই তৈরি করা যায়, এতে ব্লাসফেমিও হয় না, কারো মাথায় আকাশও ভেঙে পড়ে না। অবাক ব্যাপার হচ্ছে ‘প্রকৃতি শূন্যতাকে একদম পছন্দ করে না’—অ্যারিস্টটলের করা প্রাচীন এ উক্তিটি যেন কোয়ান্টাম জগতের জন্য সত্য হয়ে ফিরে এসেছে। বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ক্লোস তাঁর ‘নাথিং’ বইয়ে এ জন্যই বলেছেন, ‘অ্যারিস্টটল কোয়ান্টাম জগৎকে দেখে যাওয়ার সুযোগ পাননি, কিন্তু তাঁর এই উচ্চারণ কোয়ান্টাম জগতের জন্য যেন হাড়ে হাড়ে সত্য হয়ে গেছে’[273]।

‘নাথিং’ ব্যাপারটা যে অস্থিত ও নড়বড়ে টাইপের কিছু, তা আশির দশকে উল্লেখ করেছিলেন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক উইলজেক সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে[274]। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘The Cosmic Asymmetry Between Matter and Antimatter’। মহাবিশ্বের উৎপত্তির উষালগ্নে পদার্থ এবং প্রতিপদার্থ যখন উদ্ভূত হয়েছিল এক রহস্যময় কারণে প্রকৃতি প্রতি-পদার্থের তুলনায় পদার্থের প্রতি খুব সামান্য হলেও পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল। এই পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারটা যদি না ঘটত, তাহলে আজ আমরা এখানে বসে বসে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে এই আঁতেলেকচুয়াল প্রশ্ন করার সুযোগ পেতাম না। ম্যাটার ও অ্যান্টিম্যাটার একে অপরকে আলিঙ্গন করে ধ্বংস করে দিত, আর আমাদের সামনে তখন চেনাজানা পদার্থ, জীবজগৎ নক্ষত্ররাজির বদলে থাকত কেবল তেজস্ক্রিয়তায় পরিপূর্ণ অবারিত এক শূন্যতা।

---

273 Frank Close, Nothing: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2009

274 Frank Wilczek, “The Cosmic Asymmetry Between Matter and Antimatter,” Scientific American 243, no. 6, 82-90, 1980

আমাদের এই পার্থিব প্রাণচাঞ্চল্যের বদলে বিরাজ করত একেবারে কবরের নিস্তব্ধতা। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। ‘অলৌকিক’ কোনো কারণে এই পক্ষপাতিত্ব ঘটেনি। আর এমনও নয় যে প্রকৃতিকে বিশাল কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখাতে হয়েছিল এর জন্য। বরং বিজ্ঞানীরা গণনা করে দেখেছেন সূচনালগ্নে পদার্থ-প্রতিপদার্থের মধ্যে এক বিলিয়নের এক ভাগ মাত্র অসমতাই খুলে দিতে পারত আমাদের এই চেনাজানা মহাবিশ্ব তৈরি হবার দুয়ার। আর সত্য বলতে কি—ঠিক তাই সম্ভবত হয়েছে[275]। আজকের মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ বিশ্লেষণ করেও বিজ্ঞানীরা ঠিক তেমনটিই দেখছেন[276]। ফ্র্যাঙ্ক উইলজেক তাঁর সেই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে অলৌকিক নয়, বরং নিতান্ত প্রাকৃতিক উপায়ে প্রতিসমতার ভাঙনের মাধ্যমে শুরুতে পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থের মধ্যকার অসমতা তৈরি হয়েছিল, এবং তার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, ‘শূন্য ব্যাপারটার অস্থিতিশীলতা’। উইলজেক তাঁর পেপারে লিখেছিলেন এভাবে[277] –

> ধারণা করা যায় যে, মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল যতদূর সম্ভব সর্বোচ্চ প্রতিসম দশার (symmetrical state) মধ্য দিয়ে, এবং এ দশায় কোনো পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না, মহাবিশ্ব ছিল একটি ভ্যাকুয়াম। দ্বিতীয় দশায় পদার্থ এল। এই দশায় প্রতিসাম্যতা ছিল কিছুটা কম, কিন্তু শক্তিও ছিল কম। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসম দশা এসে সেটি বেড়ে গেল খুব দ্রুত। এই অবস্থান্তরের ফলে যে শক্তি নির্গত হলো সেটা কণা তৈরি করল। এই ঘটনা মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং হিসেবে চিহ্নিত করা যায় … কাজেই ‘কেন কিছু

---

[275] এ ব্যাপারটি নিয়ে প্রথম কাজ ছিল রুশ বিজ্ঞানী আঁদ্রে শাখারভের, যিনি তার শান্তিকামী আন্দোলনের জন্য স্ট্যালিনের জামানায় নির্যাতিত হন, এবং তাকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের জন্যও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হবার অনুমতি দেয়া হয়নি। শাখারভ তার ১৯৭৬ সালে লেখা গবেষণাপত্রে সমাধান দিয়েছিলেন কিভাবে পদার্থ এবং প্রতিপদার্থের মধ্যে অসমতা তৈরি হতে পারে। তার সমাধান ‘ব্যারিওজেনেসিসের সমাধান’ হিসেবে পরিচিত (A. D. Sakharov, Violation of CP invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the universe. Sov. Phys. Usp. 34 (5), pp.392–393.)

[276] Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012

[277] Frank Wilczek, পূর্বোক্ত।

> না থাকার বদলে কিছু আছে?' – প্রাচীন এ প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর হলো – 'নাথিং' ব্যাপারটা অস্থিতিশীল'[278]।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের দেয়া সর্বাধুনিক তত্ত্ব থেকে আমরা এখন জানি যে, আমাদের এই মহাবিশ্ব একটি 'কোয়ান্টাম ঘটনা' হিসেবেই একসময় আত্মপ্রকাশ করেছিল[279]। কাজেই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল সূত্রগুলো মহাবিশ্বের উৎপত্তির সময়ও একইভাবে প্রযোজ্য হবে, সে আর নতুন কী! সেটা করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা দেখলেন শূন্য থেকে মহাবিশ্বের আবির্ভাব কেবল সম্ভব তা-ই নয়, রীতিমতো অবশ্যম্ভাবী। সেজন্যই 'গ্র্যান্ড ডিজাইন' বইয়ে স্টিফেন হকিং ও ম্লোডিনো বলেছেন বহুল পঠিত এই উক্তিতে –

> মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র কার্যকর রয়েছে, তাই একদম শূন্যতা থেকেও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব এবং সেটি অবশ্যম্ভাবী। 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি' হওয়ার কারণেই 'দেয়ার ইজ সামথিং, রাদার দ্যান নাথিং', সে কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের। মহাবিশ্ব উৎপত্তির সময় বাতি জ্বালানোর জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।

আসলে কোয়ান্টাম শূন্যতা অস্থিতিশীল বলেই সেখানে 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি'র মাধ্যমে বস্তুকণার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপারটি খোলাসা করেছেন লরেন্স ক্রাউসও তাঁর সাম্প্রতিক 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইয়ে ('ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং', পৃষ্ঠা ১৬৯):

---

[278] বোল্ড করা অংশটির মূল ইংরেজি পেপারে ছিল এরকম – "The answer to the ancient question 'Why is there something rather than nothing?' would then be that 'nothing' is unstable."

[279] এ প্রসঙ্গে স্টিফেন হকিং তাঁর 'গ্র্যান্ড ডিজাইন বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখেছেন (অনুবাদ তানভীরুল ইসলাম) – 'যদিও আমরা এখনো কোয়ান্টাম মহাকর্ষের কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পাইনি, তার পরও আমরা জানি, মহাবিশ্বের সূচনা একটি কোয়ান্টাম ঘটনা। ফলে, আমরা যেভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাকে বিশেষভাবে মিলিয়ে মহাস্ফীতির তত্ত্ব নিরূপণ করেছি, সেভাবে যদি আরো অতীতে যাই এবং মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কেই জানতে চাই, তাহলেও অবশ্যই সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে আমর যা কিছু জানি তার সাথে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মেলাতে হবে।'।

কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির ক্ষেত্রে মহাবিশ্ব শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে, এবং হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সে সমস্ত মহাবিশ্ব ফাঁকা হবার দরকার নেই, তাতে পদার্থ ও শক্তি থাকতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর মাধ্যাকর্ষণের সাথে যুক্ত ঋণাত্মক শক্তিসহ এর সর্বমোট শক্তি শূন্য হবে।

এবং ক্রাউসের সুচিন্তিত উপসংহার (‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’, পৃষ্ঠা ১৭০) – ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণ কেবল মহাবিশ্বকে শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, একেবারে অবশ্যম্ভাবী করে তুলে। কারণ, স্থানকালের অবর্তমানে যে শূন্যাবস্থার কথা আমরা বলছি সেটা একেবারেই আনস্টেবল বা অস্থিতিশীল।

একই ধারণার প্রতিফলন আমরা দেখি পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গরের বিভিন্ন বইয়ে[280] এবং প্রবন্ধে[281]। তিনি তাঁর ‘কমপ্রিহেনসিবল কসমস’ বইয়ে দেখিয়েছেন যে, কোনো কিছু থাকা এবং না থাকার সম্ভাবনার ব্যাপারটি আসলে গণনা করা সম্ভব, এবং থাকার সম্ভাবনা ষাট শতাংশেরও বেশি পাওয়া যায়[282]। অধ্যাপক স্টেঙ্গার তাঁর প্রবন্ধটি শেষ করেছেন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক উইলজেকের পেপার থেকে উদ্ধৃতিটি হাজির করে, যেখানে তিনি অভিমত দিয়েছেন ‘নাথিং ব্যাপারটা অস্থিতিশীল’।

সংশয়বাদী দার্শনিক মাইকেল শারমার সম্প্রতি ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’[283] এবং তাঁর সম্পাদিত ‘স্কেপ্টিক’[284] পত্রিকায় এ নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। স্কেপ্টিক পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কেন কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে – এই

---

[280] Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books; Reprint edition, 2008

[281] Victor Stenger, Why Is There Something Rather Than Nothing?,CSI, Volume 16.2, June, 2006

[282] Victor Stenger, God: The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?, Prometheus Books; 2006

[283] Michael Shermer, Much Ado about Nothing, Scientific American, April 27, 2012.

[284] Michael Shermer, Nothing is Negligible: Why There is Something Rather than Nothing, Skeptic, Vol 17, No. 3, 2012.

রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে অন্তত বারোটি সমাধান হাজির করেছেন। তার মধ্যে ধার্মিকদের 'ঈশ্বর অনুকল্প'টি বাদ দিলে শারমার আরো যে এগারোটি সমাধান হাজির করেছেন তার সবগুলোই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের দেওয়া বৈজ্ঞানিক সমাধান, যেগুলোতে অপার্থিব ও অলৌকিক কোনো সত্তা আমদানি না করেই ব্যাপারটিকে মোকাবিলা করা যায়। এর মধ্যে যে সমাধানটিকে সবচেয়ে শেষে রেখেছেন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমাধান বলে মত দিয়েছেন শারমার— 'শূন্যতা অস্থিতিশীল'।

আমরা আমদের এই বইয়ে গণিতবিদ ও জ্যোতিঃপদার্থবিদদের আধুনিক ধারণাগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছি। সেজন্যই এ বইটিতে আমরা গণিতের শূন্যতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের শূন্যতা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি মহাবিশ্বের উৎপত্তির সাম্প্রতিক ধারণাগুলো নিয়ে; বিশেষত দীর্ঘ পরিসরে সাম্প্রতিক স্ফীতি তত্ত্ব (inflation theory) নিয়ে। স্ফীতি তত্ত্বকে অধিকাংশ মূলধারার জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরাই মহাবিশ্বের উৎপত্তির রহস্য সমাধানের সবচেয়ে জোরালো তত্ত্ব বলে আজ মেনে নিয়েছেন। সুগ্রন্থিত এ তত্ত্বের আলোকে দেখানো যায়, শুরুতে শূন্যতা থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত দশা পরিবর্তনের (phase transition) মাধ্যমে পদার্থের উদ্ভব ঘটা সম্ভব, এবং বাস্তবে হয়তো সেভাবেই মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে। ব্যাপারটি অস্বাভাবিকও নয়, অবৈজ্ঞানিকও নয়। মহাবিশ্বকে যেহেতু কোয়ান্টাম শূন্যতার মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হতে হয়েছে, তাই তার উদ্ভব ঘটেছে কোয়ান্টাম স্তরের 'অস্থিতিশীলতা' সামলিয়েই। আমরা আমাদের বইয়ে দেখিয়েছি যে, 'কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে?' – এটা কোনো ধর্মীয় কিংবা দার্শনিক প্রশ্ন নয়, এটা একান্তভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। বিগত কয়েক শতকে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটেছে, তার নিরিখে আমরা বলতে পারি, আমরা এ প্রশ্নকে মোকাবিলা

করতে সক্ষম, এবং তা বৈজ্ঞানিকভাবেই। আসলে এ ধরনের প্রশ্ন মোকাবিলায় এতো দিন যে সনাতন ছবিটি আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হতো, সেটা এরকমের –

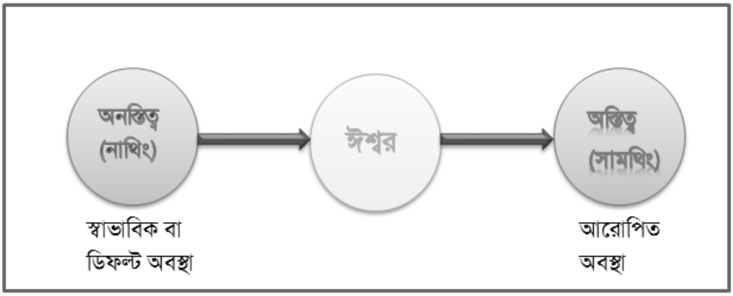

আমাদের বইয়ের মাধ্যমে অস্তিত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে যে নতুন বৈজ্ঞানিক ছবিটি আমরা পাঠকদের কাছে নিবেদন করেছি সেটার সারমর্ম হলো এরকমের –

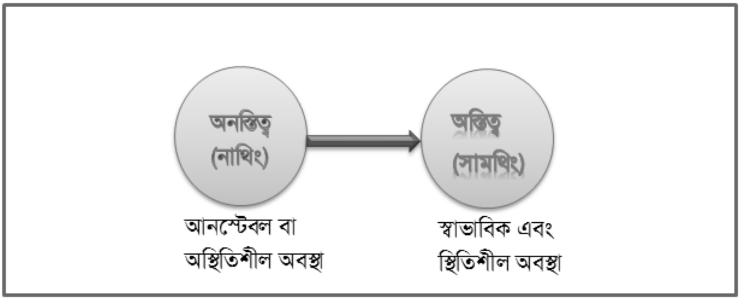

কোয়ান্টাম জগতের নিয়মকানুনের কথা মাথায় রাখলে কিছু 'না থাকার' অবস্থা থেকে 'কিছু থাকার' পরিস্থিতিতে পৌঁছানো যায় সহজেই। আর এটা তদারকির জন্য আমাদের ঈশ্বর নামে কোনো মধ্যস্বত্ত্বভোগী ওপরওয়ালার দরকার নেই; প্রাকৃতিকভাবেই এটা সম্ভব। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে শূন্যতা ব্যাপারটি মোটাদাগে অস্থিতিশীল।

এবং এটাই 'বিজ্ঞানের চোখে' আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ। এই জন্যই কিছু একদম না থাকার বদলে কিছু আছে বলে আমরা জানি। অন্তত আধুনিক বিজ্ঞানের

চোখ দিয়ে দেখলে সেটাই ‘আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে’ এখন পর্যন্ত পাওয়া সর্বশেষ উত্তর।

শেষ কথা

আমাদের বইটি শূন্য নিয়ে। শূন্য নিয়ে আমাদের এই আলোচনা আবর্তিত হয়েছে মূলত দুটি এলাকা ঘিরে—একটি হলো গণিতের শূন্যতা, আর অন্যটি পদার্থবিজ্ঞানের। গণিতের শূন্যতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই এসেছে শূন্য সংখ্যাটির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। শূন্য সংখ্যাটা আমাদের কাছে এখন এতই স্বাভাবিক যে প্রাইমারি স্কুলের ছেলেপিলেদের শূন্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। একদিন কিন্তু তা এরকম ‘জলবৎ তরলং’ ছিল না। আসলে শূন্য বলে কোনো কিছু আমাদের সংখ্যার সাম্রাজ্যে ছিলই না। ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক তাও বলা যাবে না অবশ্য। এমন তো নয় যে প্রাত্যহিক জীবনে এর বিশাল কোনো ব্যবহার আছে। জমিজমা কিংবা সন্তানসন্ততির হিসাব রাখতেই হোক,কিংবা হোক না বিয়ারের ক্যান খালি করতে, কিংবা বাজার থেকে কলা কিনতে—কেউ শূন্যের ঝামেলায় যায় না; যেতে হয় না। এ নিয়ে বইয়ের প্রথমদিকে আমরা বলেছিলাম খেতের চাষিকে কখনো ‘শূন্য’ সংখ্যক বীজ বপন করতে হয়না, ‘শূন্য’ গরুর দুধ দোয়াতে হয় না, কিংবা হতে হয় না ‘শূন্য’ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর। কাজেই শূন্য সংখ্যার উপকারিতা বুঝতে আমাদের সময় লেগেছে।

সময় লাগার আরও একটা বড় কারণ শূন্য সংখ্যাটির প্রকৃতি। আমরা দেখেছি, শূন্য সংখ্যাটা অন্য সব সংখ্যার মতো নয়। যেকোনো সংখ্যাকে নিজের সাথে যোগ করলে সংখ্যার মান বাড়ে। যেমন ১ কে ১-এর সাথে যোগ দিলে আমরা পাই ২। ২-এর সাথে ২ যোগ করলে আমরা পাই ৪। কিন্তু শূন্যকে শূন্যের সাথে যোগ দিলে কেবল শূন্যই পাওয়া যায়। ব্যাপারটা সংখ্যার সর্বজনীন ধর্মের বিরোধী যেন। সে নিজে বাড়তে চায় না, এমনকি অন্য সংখ্যাকেও বাড়তে দেয় না। ২-এর সাথে ০

যোগ করুন। আপনি পাবেন ২। অথচ শূন্যের ক্ষেত্রে ফলাফল দেখে মনে হবে, কেউ কখনো কোনো কিছু যোগ করার চেষ্টাই করেনি যেন। আর পূরণ ভাগের ক্ষেত্রে এই রহস্য যেন আরও ব্যাপক। শূন্য আমাদের তাড়া করে ফেরে অশরীরী সত্তর মতোই। যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে কেবল শূন্যই পাওয়া যায়, সেটা যত বড় কিংবা ছোট সংখ্যা যা-ই হোক না কেন। আর শূন্য দিয়ে ভাগ করতে গেলে যেন অঙ্কের জানা সব কাঠামোই ভেঙে পড়তে চায়।

শূন্যের এই রহস্যময় ব্যাপারস্যাপারগুলো প্রাচীনকালের দার্শনিকদের ভীতবিহ্বল করে তুলেছিল। তাই আমরা ইতিহাসের একটা বড় সময়জুড়ে শূন্যকে ঠেকানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি, অন্তত পশ্চিমে তো বটেই। গণিতবিদ পিথাগোরাস আর তাঁর অনুরক্ত বাহিনী মিলে একধরনের 'কাল্ট'ই গড়ে তুলেছিলেন তথাকথিত শূন্য আর অমূলদ সংখ্যা ঠেকাতে। তাঁদের ধারণা ছিল, প্রকৃতির পবিত্র সুসামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে এইটাই করণীয়। কিন্তু প্রকৃতি তো এত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তার বহু বৈশিষ্ট্যেই, বহু কাঠামোতেই খুঁজলে অমূলদ সংখ্যা বেরিয়ে আসে। বেচারা হিপসাসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এই গুমোর ফাঁস করে দেওয়ার জন্য। তাই আমরা দেখি, খ্রিষ্টের জন্মেরও বহু আগে ব্যাবিলনে শূন্যের ধারণার উদ্ভব ঘটলেও কিংবা মায়া সভ্যতায় এবং তাদের বিখ্যাত ক্যালেন্ডারে এর নিদর্শন থাকলেও পশ্চিম শূন্যকে গ্রহণ করেনি। শূন্যকে পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত করতে আসলে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিলো। পিথাগোরাসের জ্যামিতি থেকে শুরু করে, ভারতীয়-আরবীয় সংখ্যাপদ্ধতি, জেনোর ধাঁধা, সুবর্ণ অনুপাত, ফিবোনাচির রাশিমালা, লিমিট, লোপিতালের সূত্রসহ বহু সিঁড়ি পার হয়ে, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে আমরা শূন্যের সঠিক ব্যবহার করায়ত্ত করেছি।

পিথাগোরাসের মতো অ্যারিস্টটলের কাছেও শূন্যতার ব্যাপারটি ছিল অগ্রহণীয়। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতিতে শূন্যতা থাকতে পারে না ('Nature abhors a vacuum')। একটা সময় অ্যারিস্টটলের এ সমস্ত বাণীকে দেখা হতো যেন সাক্ষাৎ দৈববাণী হিসেবে। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল বিশাল। সেজন্য পদার্থবিজ্ঞানের

জগতেও শূন্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঢের ঘাম ঝরাতে হয়েছে। পিথাগোরাসের মতো অ্যারিস্টটলের অনুগত বাহিনীও প্রায় দুই হাজার বছর ধরে শূন্যকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। শূন্যতাকে সে সময় দেখা হতো ‘ব্লাসফেমি’ হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানী টরিসেলি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, শূন্যতা ইচ্ছে করলেই তৈরি করা যায়। এখনকার স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানের বইগুলোতেও টরিসেলির সেই ভ্যাকুয়ামের ছবি দেখি হরহামেশাই। বিজ্ঞানী প্যাস্কালও পানি আর পারদ নিয়ে টরিসেলির মতো পরীক্ষা করেছিলেন। টরিসেলির শিক্ষক বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি সাকশন পাম্প নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক আগেই দেখেছিলেন, পাম্প দিয়ে ১০ মিটারের বেশি উচ্চতায় পানি তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এর বেশি উচ্চতায় পানি তুলতে গেলে সাকশন টিউবে তৈরি হবে ভ্যাকুয়াম। তিনিই পরে টরিসেলিকে তাঁর পরীক্ষাটি পারদ নিয়ে করার বুদ্ধি দিয়েছিলেন। শিক্ষকের প্রস্তাবমতো সুযোগ্য ছাত্র টরিসেলি ১ মিটার লম্বা একটা টিউবে পারদ পূর্ণ করে একটি পারদপূর্ণ বাটিতে টিউবটি খাড়া করে দেখেছিলেন পারদ টিউবের মধ্যে এভাবে খাড়া হয়ে থাকতে পারে ৭৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। তার ওপরে ২৪ সেন্টিমিটার উচ্চতার ‘খালি জায়গা’জুড়ে তৈরি হয়েছে ভ্যাকুয়াম। আরেক বিজ্ঞানী এবং জার্মান শহরের মেয়র অটো ভন গুয়েরিক শূন্যতা তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি দেখিয়েছিলেন শুধু দুটো ব্রোঞ্জের গোলকের ভেতরের বাতাস বের করে দিলে তা এমন শক্তভাবে আটকে থাকে যে বিপরীত দিক থেকে আটিটি করে ঘোড়া জোরা দিয়ে টানাটানি করলেও তা খোলা যায় না। আজ আমরা জানি অটো ভন গুয়েরিকের বানানো সেই শূন্যস্থানের ওপর আসলে ক্রিয়া করছিল প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ১০ টন ওজনের অমানুষিক চাপ। আর এই চাপ আসছিল আসলে আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডল থেকে। এই পরীক্ষাগুলোর কথা আমরা স্কুলেই পড়েছি।

কিন্তু স্কুল-কলেজের বইগুলোতে আমরা যা পাইনি তা হলো শূন্যতার আধুনিক ধারণার সাথে পরিচিত হতে। আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এসে যেন নতুন করে

শূন্যতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে। স্কুল-কলেজের বইপত্রে টরিসেলি বা অটো ভন গুয়েরিককের শূন্যতার যে বর্ণনা আমরা পেয়েছিলাম, তা আসলে প্রকৃত শূন্যতা ছিল না। আমরা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং পরে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে দেখেছি, আমাদের মহাবিশ্বের সকল পদার্থ বিলীন করে দিলেও আমরা ‘প্রকৃত শূন্যতা’র হদিস পাই না, পাব না। মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থকে রাতারাতি উধাও করে দেয়া ব্যবহারিকভাবে সম্ভব ও হয়তো নয়; কিন্তু আমরা সেটা আমাদের মানস পরীক্ষার সাহায্যে করতে পারি। মনের আঙিনা থেকে মহাবিশ্বের প্রতিটি নক্ষত্র, প্রতিটি গ্রহ, গাছপালা, পাহাড়পর্বত, মানুষজন, পশু-পাখি থেকে শুরু করে প্রতিটি পদার্থ, প্রতিটি কণা, প্রতিটি প্রতি-কণা একে একে বিলীন করে দিতে পারি আমরা। কিন্তু কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্ব অনুযায়ী এভাবে মই বেয়ে একদম নিচে নেমে আসলেও শূন্য শক্তির দেখা আমরা পাব না। মইয়ের একদম তলায় শূন্যস্থান বলে কথিত যে জায়গার হদিস আমরা পাই, সেখানে নেমেও আমরা দেখি তার মধ্যে কিছু শক্তি লুকিয়ে আছে। এটাই সেই ‘জিরো পয়েন্ট এনার্জি’। এই ‘জিরো পয়েন্ট এনার্জি’ আছে বলেই শূন্যস্থানকে আমরা শান্তভাবে পড়ে থাকতে দেখি না, বরং দেখি অনবরত ‘ফ্লাকচুয়েট’ করতে।

অর্থাৎ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী, শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়। শূন্যস্থানে প্রতিনিয়ত চলছে কণা ও প্রতিকণার সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিরন্তর খেলা। যে শূন্যদেশকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত বলে মনে করেছিলাম, তার মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে পদার্থকণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের বাস্তব প্রমাণ আমরা পেয়েছি কয়েক দশক আগেই বিজ্ঞানীদের করা ‘ল্যাম্ব শিফট’ কিংবা ‘কাসিমিরের পরীক্ষা’ থেকে খুব জোরালো-ভাবে।

আধুনিক ‘কোয়ান্টাম জ্যোতির্বিদ্যা’— যেটাকে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী জন গ্রিবিন অভিহিত করেছেন ‘নিউটনের পর বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন’ হিসেবে[285]– সে শাখার গবেষকদের পাওয়া ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের ‘ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’ থেকেই আমাদের এই মহাবিশ্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ, এই বিপুলা মহাবিশ্বের আবির্ভাব স্রেফ শূন্য থেকে — কোয়ান্টাম ঝলকানির মাধ্যমে। এ তত্ত্ব থেকে আমরা আরও জানতে পেরেছি, মহাবিশ্বের উদ্ভবের পর $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ড পরে এর তাপমাত্রা ছিল $১০^{২৭}$ ডিগ্রির মতো। এ সময় ভ্যাকুয়ামকে বিভিন্ন ধরনের ‘ফেজ ট্রাঞ্জিশন’-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, ত্বরান্বিত হয়েছিল প্রতিসাম্যের ভাঙন। প্রকৃতির মৌলিক বলগুলো পৃথক হয়ে গিয়েছিল এভাবেই। যেমন, যখন তাপমাত্রা $১০^{১৫}$ ডিগ্রির কাছাকাছি চলে আসল, তখন তাড়িত চুম্বক এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল আলাদা সত্তা হিসেবে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা এর মধ্যেই পেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, $১০^{-১২}$ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ভ্যাকুয়াম আরো শীতল হলে হিগস ক্ষেত্র ‘ঠান্ডায় জমাটবদ্ধ’ হয়ে প্রসারিত করেছিল উপপারমাণবিক কণাদের ভরপ্রাপ্ত হবার সুযোগ (সম্প্রতি সার্নের বিজ্ঞানীদের হিগস কণার সন্ধান লাভ এই তত্ত্বকে আরো জোরালো করেছে)।

একটা সময় মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে আরো শীতল হয়েছে, মহাজাগতিক বিবর্তনের ক্রমধারায় তৈরি হয়েছে ছায়াপথ, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ। বিগ ব্যাং নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম কিংবা লিথিয়ামের মত মৌল মহাবিশ্বের উদ্ভবের উষালগ্নে তৈরি হলেও আমাদের জীবনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে মৌলগুলো – কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন কিংবা লৌহ – এরা কিন্তু সে সময় তৈরি হয়নি। এগুলো তৈরি হয়েছে অনেক অনেক পরে কোনো-না কোনো নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ থেকে। বলেছিলাম, ‘আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান, আমাদের সবার দেহ তৈরি হয়েছে কেবল নাক্ষত্রিক ধূলিকণা দিয়ে’। এখন কোয়ান্টাম

[285] John Gribbin, Q IS FOR QUANTUM: An Encyclopedia of Particle Physics, Touchstone, 2000

জ্যোতির্বিদ্যা ও স্ফীতি তত্ত্ব থেকে পাওয়া ফলাফলগুলো সত্য হলে এ-ও আমরা বলতে পারি, আমাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে শূন্যতার মাঝে কোয়ান্টাম ঝলকানির কারণেই। সে হিসেবে নিঃসীম শূন্যতার মাঝে হঠাৎ ঘটা নান্দনিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনই যেন আমাদের হারানো প্রপিতামহ।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এ ধরনের মহাবিশ্বকে দীর্ঘকাল টিকে থাকতে হলে এর মোট 'ভার্চুয়াল শক্তি' হতে হবে শূন্যের কাছাকাছি। আমাদের মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। আমাদের মহাবিশ্বে ধনাত্মক শক্তি ও ঋণাত্মক শক্তির যোগফল সর্বদা শূন্যই পাওয়া যায়। একইভাবে মহাবিশ্বের ঘূর্ণন কিংবা নেট চার্জ পরিমাপ করেও দেখা গেছে এদের মান থাকে শূন্য। অর্থাৎ পুরো মহাবিশ্বটাই যেন শূন্য থেকে পাওয়া, যাকে বিজ্ঞানী অ্যালেন গুথ অভিহিত করেন 'আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ' অভিধায়।

এখন কথা হচ্ছে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের মতো অতিকায় কিছুর উদ্ভব যদি এতই স্বাভাবিক হতো, তাহলে আমরা সচরাচর শূন্য থেকে কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটতে দেখি না কেন? মুক্তমনায় মহাবিশ্বের উদ্ভব নিয়ে লেখাটির শেষ পর্ব প্রকাশের পর এ ধরনের প্রশ্ন অনেক পাঠকের কাছ থেকে এসেছে। এ ধরনের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিকই। এ ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হচ্ছে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের ব্যাপারটা কেবল 'এম্পটি স্পেসে' হয়। আমাদের বিশ্বজগৎ এখন আর শূন্য নেই – পদার্থ এবং তার তেজস্ক্রিয়তা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছে। তবে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে শূন্যস্থানে হয়তো এভাবে ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে অনবরত মহাবিশ্ব তৈরি হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, স্ফীতি তত্ত্বের সর্বাধুনিক ভাষ্য 'চিরন্তন স্ফীতি' আর স্ট্রিং তত্ত্বের গণনাগুলো যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে উদ্ভূত মহাবিশ্বের সংখ্যা একটি-দুটি নয়, অসীম-সংখ্যক।

কেন শূন্যতা থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে? আমরা যে শূন্যতার কথা বলছি সেখানে ভর নেই, শক্তি নেই, স্থান নেই, সময় নেই, ঘূর্ণন নেই, ইলেকট্রন নেই, প্রোটন নেই, বোসন নেই, ফার্মিয়ন নেই – একেবারে যাকে বলে অবারিত নিঃসীম শূন্যতা। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এ ধরনের শূন্যতা 'অস্থিতিশীল'। তাঁরা মনে করেন, এ ধরনের শূন্যতা থেকে প্রতিসমতার ভাঙনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উদ্ভব 'অবশ্যম্ভাবী'। বহুদিন আগে অ্যারিস্টটল যে উক্তি করেছিলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে পছন্দ করে না' তা মাঝে ভুল প্রমাণিত হলেও, সেটা কোয়ান্টাম জগতের জন্য আবার যেন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।

আসলে শূন্যতা আমাদের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শূন্যতার মাধ্যমেই আমাদের অস্তিত্ব প্রকাশমান, হয়তো শূন্যতার মাঝেই আমরা সবাই হব বিলীন একদিন। আমাদের অস্তিত্বকে ঠিকমতো বুঝতে হলে শূন্যতাকে বোঝা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। জীবনানন্দ দাশকে উদ্ধৃত করেই শেষ করি বইটি –

'আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা — প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়'!

ড. মীজান রহমান, জন্ম ১৯৩২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, পরবর্তীকালে বিলেতের কেমব্রিজ ও কানাডার নিউ ব্রান্সউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৫ সালে অটোয়াস্থ কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। একটানা তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯৮ সালে। এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন Distinguished Research Professor হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত জর্জ গ্যাসপারের সঙ্গে রচিত তাঁর গণিতবিষয়ক গ্রন্থ *Basic Hypergeometric Series* (১৯৯০), আধুনিক গণিতের একটি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।
মীজান রহমান বিবাহিত ও দুই কৃতী পুত্রসন্তানের জনক।
৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সংগ্রহ করুন আজই

ইস্টিশন ইবুক ওয়েব থেকে!

অভিজিৎ রায়

(১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বাংলাদেশী-মার্কিন প্রকৌশলী, লেখক ও ব্লগার। তিনি বাংলাদেশের মুক্ত চিন্তার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে সরকারের সেন্সরশিপ এবং ব্লগারদের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের সমন্বয়কারক ছিলেন। তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী হলেও তার স্ব-প্রতিষ্ঠিত সাইট মুক্তমনা'য় লেখালেখির জন্য অধিক পরিচিত ছিলেন। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলা থেকে বের হওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে কুপিয়ে হত্যা ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাকে আহত করে

অভিজিৎ রায় ইন্টারনেট, ম্যাগাজিন এবং দৈনিক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার লেখার বিষয় ছিলো আধুনিক বিজ্ঞান, নাস্তিকতা, সমকামিতা এবং দর্শন।

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com